সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

৯ম খন্ড

কোরআনের অনুবাদ

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

৯ম খন্ড

সূরা আত্ তাওবা

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

(৯ম খন্ড সূরা আত্ তাওবা)

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
স্যুট ৫০১ ইন্টারন্যাশনাল হাউজ ২২৩ রিজেন্ট ষ্ট্রীট, লন্ডন ডব্লিউ ১বি ২কিউডি
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৯৫৬ ৪৬৬৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টার
১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ ওয়েস্ট পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা
১১ ইসলামী টাওয়ার, (নীচতলা), দোকান নং ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮
৭ম সংস্করণ
শাবান ১৪২৯ ভাদ্র ১৪১৫ আগস্ট ২০০৮
কম্পোজ : আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: দুইশত টাকা

❒

Bengali Translation of Tafseer

'Fi Zilalil Quran'

Author

Syed Qutb Shaheed

Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed

9th Volume
(Surah At Toubah)

Published by
Khadija Akhtar Rezayee
Director Al Quran Academy London
Suite 501 International House 223 Regent Street London W1B 2QD
Phone & Fax : 0044 020 7274 9164 Mob : 07956 466955

Bangladesh Centre
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526
Sales Centre: 507/1 Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st Floor)
11 Islami Tower (Garand Floor), Stall No- 36, Bangla Bazar, Dhaka.
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997

1st Edition 1998
7th Edition
Shaban 1429 August 2008
Price Tk. 200 .00
E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk
ISBN NO- 984-8490-15-9

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমানযমীন, চাঁদসুরুজ, মহাদেশমহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তার নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?
কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়

এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আ'লামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক-এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়– হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত– এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'–এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা ইতিমধ্যেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে ঊর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'–'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ক্রটি-বিচ্যুতি করে বসি–তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন

জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আয যুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ-আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্তেও নিজেদের গুনাহ্র ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না—এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে—কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা–শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না—না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যর সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'
অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও
ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

এই খন্ডে যা আছে

সূরা আত্ তাওবা

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটি কোরআনের সর্বশেষ সূরা না হলেও সর্বশেষে নাযিল হওয়া অংশের অন্যতম।(১) এ জন্যে এতে মুসলিম ও অমুসলিম জাতিগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে সর্বশেষ বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মুসলিম সমাজের বিন্যাস, তার মান ও মর্যাদা নির্ধারণ, মুসলমানদের প্রতিটি শ্রেণী(২) ও গোষ্ঠীর অবস্থা চিহ্নিতকরণ, মুসলিম সমাজের সার্বিক অবস্থা এবং এর প্রতিটি দল ও গোষ্ঠীর বাস্তব অবস্থার সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট বিবরণও।

এ দিক দিয়ে সূরাটি বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃতি, স্তর ও কর্মসূচীর বিবরণের দিক দিয়ে এটি গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী সুরায় বর্ণিত আহকাম ও বিধিসমূহের সাথে এ সূরায় বর্ণিত আহকাম ও বিধিসমূহের তুলনামূলক পর্যলোচনা করলে ইসলামী বিধানের নমনীয়তা ও কঠোরতার পরিমাণ আঁচ করা যায়। এই পর্যালোচনা না করলে আহকাম ও বিধিসমূহের তারতম্য নির্ণয় করা যাবে না, বরং সবই একাকার হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে, যে সকল আয়াতে নির্দিষ্ট স্তরের জন্যে প্রয়োজনীয় বিধান দেয়া হয়, সেই আয়াতগুলোকে যখন স্থগিত করা হয়, তার বিধানকে যখন চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়, অতপর এই সব চূড়ান্ত বিধান সম্বলিত আয়াতগুলোকে ওই সকল সাময়িক বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্যে যখন নতুনভাবে ব্যাখ্যা পেশ করা হয়, বিশেষত, ইসলামী জেহাদ ও মুসলিম জাতির সাথে অমুসলিম জাতিসমূহের সম্পর্কের বিষয়ে, তখনও আইন ও বিধিসমূহ অস্পষ্ট ও একাকার হয়ে যায়। আমি আশা করি, এই ভুমিকা ও বিভিন্ন স্থানের ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ সব অস্পষ্টতা ও জটিলতা দূর করার জন্যে আল্লাহ আমাকে তাওফীক দেবেন।

সূরার আয়াতগুলোর যথাযথ পর্যালোচনা, সূরার বিভিন্ন অংশের নাযিল হওয়ার উপলক্ষ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের পর্যালোচনা এবং রসূল (স.)-এর জীবনে ইতিহাসের ঘটনাবলীর অধ্যয়ন থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সূরাটা নবম হিজরী সনে পুরাপুরিভাবে নাযিল হয়েছে। তবে এটা ঠিক যে, এটা এক সাথে নাযিল হয়নি। যদিও আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না নবম হিজরীর কোন কোন সময়ে এই সূরার কোন কোন অংশ নাযিল হয়েছে। তবে এ কথাটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সূরাটা তিন পর্যায়ে নাযিল হয়েছিলো। প্রথম অংশটা এই রজব মাসে তাবুক অভিযানের পূর্বে। দ্বিতীয় অংশ তাবুক অভিযানের প্রস্তুতিকালে ও অভিযান চলাকালে এবং শেষাংশ তাবুক থেকে ফেরার পর নাযিল হয়। তবে সূরার প্রথম থেকে ২৮ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত নাযিল হয় নবম হিজরীর হজ্জের প্রাক্কালে যিলকদ অথবা যিলহজ্জ মাসে। সংক্ষেপে এতটুকুই আমরা জোর দিয়ে বলা যায়।

প্রথম আয়াত থেকে ২৮নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত সূরার প্রথমাংশে মুসলমানদের তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে আরব উপদীপের তাবত মোশরেকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং এই সম্পর্কচ্ছেদের বাস্তব, ঐতিহাসিক ও আকীদাগত সম্পর্কের কারণ কোরআনের প্রভাবশালী ও

(১) সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে সূরা আন-নাসর হচ্ছে সর্বশেষ নাযিল হওয়া পূর্ণাংগ সূরা।

(২) এখানে যে শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা আমি ইদানীং যে সংকীর্ণ অর্থে সামাজিক শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তাকে বুঝাচ্ছি না। এ হচ্ছে সেই সব শ্রেণী, যারা নিছক ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যেমন মোহাজের, আনসার বদরযোদ্ধা, বাইয়াতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীরা, মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ, ইসলামের জন্য জেহাদ ও অর্থ ব্যয়কারিগণ এবং মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ, ইসলামের জন্য জেহাদ ও অর্থ ব্যয়কারিগণ, মোনাফেক গোষ্ঠী ও জেহাদ পালানো গোষ্ঠী ইত্যাদি।

শক্তিশালী বাচনভংগিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বাচন ভংগির নমুনাগুলো লক্ষ্য করুন প্রথম আয়াত থেকে ২নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত। যথা,

'সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সেই মোশরেকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে.... হে মোমেনরা, মোশরেকরা অপবিত্র, কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের ধারে-কাছেও আসতে না পারে। আর তোমরা যদি দারিদ্রের আশংকা কর, তবে আল্লাহ অচিরেই তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহ বলে ধনী বানিয়ে দেবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী।'

আমাদের উদ্ধৃত এ আয়াতগুলোর মধ্যে যে কোরআনী বাচনভংগি পরিদৃষ্ট হয়, তা থেকে স্পষ্ট যে, বিভিন্ন কারণে এ সময়ে মুসলমানরা সমগ্র আরবের সকল মোশরেকের সাথে একযোগে সম্পর্কচ্ছেদের মতো গুরুতর পদক্ষেপ নিতে ভয় ও সংকোচ বোধ করছিলো। এ কারণগুলো কী কী, তা আমি অচিরেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো।

সূরার দ্বিতীয় অংশে আহলে কেতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে ইসলামী রাষ্টের সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং তার সেই সব ঐতিহাসিক আদর্শিক ও বাস্তব কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা এই সম্পর্কচ্ছেদকে অনিবার্য করে তুলেছিলো। সেই সাথে ইসলামের আসল ও চিরস্থায়ী রূপ কী, আহলে কেতাবের কাছে আল্লাহর যে বিধান নাযিল করেছিলেন তা থেকে তারা কিভাবে বিপথগামী হয়ে গেছে, তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ২৯নং আয়াত থেকে ৩৫নং আয়াত পর্যন্ত এ অংশটি বিস্তৃত। যথা,

'আহলে কেতাবের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তাকে হারাম করে না এবং আল্লাহর সত্য দ্বীনের অনুগত হয় না, তারা যতোক্ষণ নতশিরে জিযিয়া প্রদান না করে, ততক্ষণ তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও। ....'

কোরআনের বাচনভংগি থেকে এই অংশে এটাও ফুটে উঠেছে যে, সমগ্র আহলে কেতাব বা তাদের সংখ্যাগুরু অংশের সাথে লড়াই চালানোর ব্যাপারে মুসলমানরা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও ভীতিতে আক্রান্ত ছিলো। এ ভয়ভীতি ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিশেষ কারণ ছিলো এই যে, এই যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য ছিলো রোম সাম্রাজ্য এবং সিরিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত তাদের আরবীয় খৃষ্টান মিত্ররা। ভয়ভীতি ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের জন্যে এই একটা কারণই যথেষ্ট। কেননা আরব উপদ্বীপের লোকদের কাছে রোম সাম্রাজ্যের দোর্দন্ড প্রতাপ সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানা ছিলো। তবে আয়াতের বক্তব্য শুধু খৃষ্টানদের জন্যে নির্দিষ্ট নয়, বরং বর্ণিত লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী সকল আহলে কেতাবকে লক্ষ্য করেই তা বলা হয়েছে। আগামীতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সময় এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করবো।

তৃতীয় অংশে, পর্বে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশপ্রাপ্ত হওয়ার পর যারা অলসতা ও দুর্বলতাবশত পশ্চাদমুখী হয়েছে এবং যুদ্ধে যায়নি, তাদের সমালোচনা শুরু হয়েছে। এ সব লোকের সবাই যে মোনাফেক নয়, তা পরবর্তীতে জানা যাবে। তবে এই সব যুদ্ধ বিগ্রহ যে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিলো তা আমি আগামীতে কারণসহ ব্যাখ্যা করবো। যেমন আল্লাহ বলেন,

'হে মোমেনরা, তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমাদেরকে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলে তোমরা মাটির সাথে লেগে গেলে? ..... (আয়াত ৩৮ থেকে ৪১)

এ পর্বে যে সব হুমকি, ধমকি ও শাসানিমূলক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, মুসলমানদেরকে যেভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কোনো মানুষের পক্ষ থেকে কিছু মাত্র সাহায্য না আসা সত্তেও

মক্কা থেকে বিতাড়িত হবার পর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে সাহায্য করেছেন এবং যেভাবে কঠোরতম ভাষায় হুকুম দেয়া হয়েছে যে, হালকা সাজে বা ভারী সাজে যেভাবেই থাকো লড়াইতে চলে যাও। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এ সময়ে যুদ্ধে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিলো এবং অনেকে তা থেকে পিছু হটছিলো। ভয় পাচ্ছিলো ও দ্বিধান্বিত হচ্ছিলো। যার কারণে এতো কঠোর ভাষা, এতো হুমকি, এতো ধমক ও এতো পেছনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ও এতো কড়া আদেশ দিতে হয়েছে।

এরপর আসবে সূরার চতুর্থ পর্ব। এটি সবচেয়ে দীর্ঘ এবং সূরার অর্ধেকেরও বেশী অংশ জুড়ে বিস্তৃত। এ পর্বে মোনাফেকদের সমালোচনা ও ভর্ৎসনা, মুসলিম সমাজে তাদের অপতৎপরতার নিন্দা ও তিরস্কার, তাদের মানসিক ও বাস্তব অবস্থার বিবরণ, তাবুক অভিযানের পূর্বে, পরে ও মাঝখানে তাদের অবস্থান ও কর্মকান্ডের বিবরণ, জেহাদ থেকে তাদের পিছু হটার ছল ছুঁতো, ওযর বাহানা ও দুরভিসন্ধির স্বরূপ উদঘাটন, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, ভুল বুঝাবুঝি ও কাপুরুষতার বিস্তার ঘটানো এবং রসূল (স.) ও নিষ্ঠাবান মোমেনদের নানাভাবে কষ্ট দেয়া ও উত্ত্যক্ত করার বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে মোনাফেকদের চক্রান্ত থেকে নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। মুসলমানদের ও মোনাফেকদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করানো হয়েছে এবং মুসলমান ও মোনাফেকদেরকে তাদের কার্যকলাপ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পর্বটাই আসলে সূরার প্রধান অংশ। এ অংশটি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, মক্কা বিজয়ের আগে যে মোনাফেকীর ব্যাধি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো, তা মক্কা বিজয়ের পর কিভাবে মুসলিম সমাজে ফিরে এলো। পরবর্তীতে আমি এর কারণ ব্যাখ্যা করবো। এই পর্বটি পুরোপুরি ভাবে তুলে ধরা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কেবল বিভিন্ন আয়াত বা আয়াতাংশের উল্লেখ করে মোনাফেকীর চরিত্র ও প্রকৃতি তুলে ধরার চেষ্ট করবো।

'সহজলভ্য স্বার্থ ও স্বল্প দূরবর্তী সফর হলে ওরা তোমার অনুসরণ করতো ....'

'তাদের যদি তোমাদের সাথে যাওয়ার ইচ্ছা থাকতো, তবে তারা সে জন্যে সম্বল যোগাড় করতো। তারা যদি তোমাদের সাথে যেতো, তবে তারা তোমাদের মধ্যে কেবল সন্দেহ সংশয় ও বিভ্রান্তিই বাড়াতো, ... তোমাদেরকে বিপথগামী করার চেষ্টা করতো এবং তাদের মধ্যে অনেক গুপ্তচর রয়েছে। .... ইতিপূর্বেও তারা অনেক বিপর্যয় ঘটিয়েছে এবং তোমার অনেক জিনিসকে ওলট পালট করে দিয়েছে ....

'কেউ কেউ বলে, আমাকে ঘরে বসে থাকার অনুমতি দিন এবং আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না। ওরা তো ফেতনার মধ্যেই পড়ে আছে। তোমার বিপদ হলেই ওরা খুশী। তোমার সুখ হলে ওরা দুঃখ পায়।'

'ওরা কসম খেয়ে বলে, ওরা তোমাদের লোক। আসলে ওরা তোমাদের লোক নয়। তারা ভীরু কাপুরুষের দল। আশ্রয় নেয়ার জায়গা পেলেই তারা সেদিকে গিয়ে আশ্রয় নিতো।'

'তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার সদকার ব্যাপারে তোমার কুৎসা রটায়। তবে তাদেরকে কিছু দিলেই তারা খুশী। না দিলেই বেজার।'

'তাদের কেউ কেউ নবীকে এই বলে কষ্ট দেয় যে, উনি যা শোনেন তাই বিশ্বাস করেন। তুমি বলো, তিনি সদুদ্দেশ্যপ্রবণ সরল বিশ্বাসী, আল্লাহর ওপরও বিশ্বাসী, মোমেনদেরও বিশ্বাস করেন।'

'তারা তোমাদেরকে খুশী করার জন্যে ঘনঘন শপথ করে। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে খুশী করাই বৃহত্তর কর্তব্য।...............'

'মোনাফেকরা ভয় পায় যে, তাদের মনের কথা ফাঁস করে দিয়ে কোনো সূরা নাযিল হয় কিনা। বলো, (যতো খুশী) ঠাট্টা করতে থাকো। আল্লাহ তোমাদের ঠাট্টা ফাঁস করে ....'

'তোমরা আর ছলচাতুরী করো না। ঈমান আনার পর তোমরা কুফরী করেছো।'

'মোনাফেক নারী ও পুরুষরা পরস্পরের মিত্র। অসৎ কাজ করতে আদেশ ও সৎ কাজ করতে নিষেধ করে, কার্পণ্য করে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। তাই তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন।'

'হে নবী! কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো এবং তাদের ওপর কঠোরতা প্রয়োগ করো। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম ....তারা কসম খেয়ে বলে, এমন কথা বলেনি। অথচ তারা কুফরী কথা বলেছে। ইসলামের পরে তারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে এবং তারা যা করতে চেয়েছিলো তা পারেনি। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল তাদেরকে অভাবশূন্য করে দিয়েছেন বলেই তারা এতোটা আস্কারা পেয়েছে। তারা তাওবা করলে সেটা তাদের জন্যে ভালো হবে। নচেত দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে' ....তাদের কেউ কেউ আল্লাহর সাথে ওয়াদা করে যে, আল্লাহ সম্পদ দিলে আমরা অবশ্যই দান করবো। অতপর যখন আল্লাহ সম্পদ দিলেন। অমনি কৃপণতা করলো। ....এই ওয়াদাখেলাপি ও মিথ্যাচারের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাদের মনে মোনাফেকী ঢুকিয়ে দিলেন। ....

'স্বেচ্ছায় দানকারী মোমেনদেরকে এবং কায়িক পরিশ্রম ছাড়া আর কিছু যারা করতে সক্ষম নয় তাদেরকে তারা টিটকারি দেয় ও নিন্দা করে। আল্লাহই তাদেরকে টিটকারি দিয়েছেন এবং তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা চাও বা না চাও, তুমি সত্তর বার ক্ষমা চাইলেও আল্লাহ ক্ষমা করবেন না.................'

'যারা রসূল (স.)-এর সাথে না গিয়ে পিছিয়ে থেকেছে, আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করা অপছন্দ করেছে এবং লোকদেরকে বলেছে যে, তোমরা এমন গরমে সফরে যেয়ো না, তারা খুবই আনন্দিত। বলো, জাহান্নামের আগুন আরো বেশী গরম। যদি তারা বুঝতো।...........'

এই সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মোনাফেকরা এ সময়ে মুসলমানদেরকে উত্যক্ত করা, বিপথগামী করা ও নানা রকমের মিথ্যাচার ও ধোকাবাজি ছাড়া তাদেরকে বিপর্যস্ত করার অনেক চেষ্টা চালাচ্ছিলো। সেই সাথে এটাও বুঝা যায় যে, মুসলমানদের সামাজিক ব্যবস্থায়ও সমন্বয়ের অভাব এবং কিছু বিশৃংখলা ছিলো, বিশেষত, 'তোমাদের মধ্যে তাদের গুপ্তচর রয়েছে' এই আয়াতাংশ দ্বারা এটা বেশ পরিষ্কার। অনুরূপভাবে, মোনাফেকদের জানাযা নামায পড়তে ও তাদের জন্যে ক্ষমা চাইতে কঠোর ভাবে নিষেধ করা দ্বারাও এটা বুঝা যায়। এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো মক্কা বিজয়ের পর ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণের কারণে। সময়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণের কারণে এমন অনেক লোক মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়ে, যাদের অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল হয়নি এবং যাদের চরিত্রেও ইসলামের ছাপ পড়েনি। এ সময়ে মুসলমানদের সমাজে যে রকমারি শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সমাগম ঘটে, তাদের ব্যাপারে আলোচনার পর আমি এই সামাজিক বিশৃংখলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

সূরার পঞ্চম অংশটি এই শ্রেণী বিন্যাসের ওপর আলোকপাত করে। এই অংশ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলামী সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান আনসার ও মোহাজেররা ছাড়া তাদের চারপাশে আরো কিছু দল ও শ্রেণী ছিলো। যেমন বেদুইনরা। তাদের ভেতরে নিষ্ঠাবান মোমেন, মোনাফেক ও দুর্বল মোমেন ছিলো। এদের মধ্যে মদীনাবাসী মোনাফেকও ছিলো।

অনুরূপ আরেকটি দল এমন ছিলো যাদের মধ্যে সৎ কাজ ও অসৎ কাজের মিশ্রণ ঘটেছিলো এবং যাদের চরিত্রে ইসলামের মযবুত প্রভাব ছিলো না এবং তাদের ইসলামের প্রতি তেমন গভীর আকর্ষণ ছিলো না। আরো একটা দল ছিলো, যাদের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানতো না। তাদের পরিণাম কি হবে তা আল্লাহই জানেন। আরো একটা দল ছিলো, যারা ইসলামের নামে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। কোরআন এ সব দল ও শ্রেণী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছে। মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে এদের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে, তা জানিয়ে দিয়েছে এবং রসূল (স.) ও একনিষ্ঠ মুসলমানদেরকে এদের প্রত্যেকের সাথে আচরণের কী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, তা শিখিয়েছে। ৯৭নং আয়াত থেকে ১১০নং আয়াত পর্যন্ত এই অংশটি বিস্তৃত।

এসব আয়াত থেকে মুলমানদের মধ্যে রকমারি দলের বিদ্যমানতা ও তাদের ঈমানের স্তরভেদ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা থেকে জানা যায় যে, এই সমাজে মক্কা বিজয়ের পরে কতটা বিশৃংখলা ঢুকে গিয়েছিলো, যা বিজয়ের আগে হয় একেবারেই ছিলো না অথবা নাম মাত্র ছিলো।

৬ষ্ঠ পর্ব বা অংশে আল্লাহর সাথে মোমেনদের জেহাদের অংগীকার এবং এই জেহাদের স্বরূপ ও পরিধি এবং মদীনাবাসী ও তার আশপাশের বেদুইনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, মদীনাবাসীর জন্যে এটা বৈদ্ব নয় যে, তারা আল্লার রসূল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং রসূলুলুল্লাহর জীবন রক্ষার বিষয়ে উদাসীন হয়ে কেবল নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত হবে। এ অংশে মোনাফেক ও মোশরেকদের সাথে মোমেনদের সম্পর্কচ্ছেদের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ অংশের এক পর্যায়ে এমন কয়েকজন মোমেনের যুদ্ধে অনুপস্থিতির ঘটনা ও তার শাস্তি বিধানের ঘটনা বর্ণনা হয়েছে, যারা মোনাফেক নয়, খাঁটি মোমেন ছিলেন। এই সাথে মোনাফেকদের অবস্থাও তুলে ধরা হয়েছে এবং কোরআনের প্রতি তাদের আনুগত্যহীনতার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ অংশটি ১১১নং থেকে ১২৭নং আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত।

উপসংহারে রসূল (স.)-এর গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ১২৮ ও ১২৯ নং আয়াতদ্বয় দ্রষ্টব্য।

সূরার তাফসীরের পূর্বে ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সূরার আয়াতসমূহের উদ্ধৃতি অনেক বেশী দিয়েছি ইচ্ছাকৃতভাবেই। কেননা এই সূরাটা মক্কা বিজয়ের পরবর্তী ইসলামী সমাজের পূর্ণাংগ চিত্র তুলে ধরে এরা এবং সাংগঠনিক বিন্যাস কেমন ছিলো, তা ব্যাখ্যা করে। এই চিত্র থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামী সমাজের বিভিন্ন ঈমানী স্তরে অবস্থিত মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা শৃংখলা ও সমন্বয়ের অভাব ছিলো। অনুরূপভাবে, কিছুটা স্বার্থপরতা, লোভ, ঈমানী দুর্বলতা, কপটতা, কর্তব্য পালনে দ্বিধা ও শৈথিল্য, মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যকার সম্পর্কের সঠিক ধারণার অভাব এবং আদর্শের ভিত্তিতে পরিপূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের অভাব এ অংশ থেকে পরিষ্কার ফুটে ওঠে। অবশ্য মোহাজের ও আনসারদের পরিপূর্ণ একনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার চিত্রও সুস্পষ্ট। কিন্তু এই দুই পুণ্যবান গোষ্ঠী ছাড়া অন্য সকল শ্রেণীর মধ্যে সমন্বয়, শৃংখলা, নিষ্ঠা ও পরিপক্কতার যে অভাব ছিলো, তা সুদীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে।

আগেই বলেছি যে, এই পরিস্থিতির উদ্ভবের একমাত্র কারণ ছিলো ইসলামের পূর্ণাংগ প্রশিক্ষণ পায়নি এবং ইসলামের আলোকে চরিত্র গঠিত হয়নি এমন ধরনের লোকদের মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে ও পাইকারী হারে ইসলাম গ্রহণ। তবে ওই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যকে মক্কা বিজয়ের পূর্বের ও পরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট না জেনে সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব নয়। এখানে এই প্রেক্ষাপর্বটা যতো

সংক্ষেপে সম্ভব আলোচনা করার চেষ্টা করবো। ওই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের তাৎপর্য ও মর্ম কী দাঁড়ায় এবং এতদসংক্রান্ত আয়াতসমূহের মর্মার্থ বা কী, সে সম্পর্কে আলোচনা করার আগেই প্রেক্ষাপট তুলে ধরবো।

এ কথা সবার জানা যে, ইসলামী আন্দোলন মক্কায় অত্যন্ত কঠিন ও প্রতিকূল পরিবেশে জন্ম নিয়েছিলো। জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত সাধারণ আরব জনগণ ও কোরায়শরা তখনো কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' তে নিহিত প্রকৃত বিপদটাকে উপলব্ধি করতে পারেনি। তখনো তারা বুঝতে পারেনি যে, ওই কলেমা পৃথিবীর এমন প্রতিটি শক্তির বিরুদ্ধে চরম ও সর্বাত্মক বিদ্রোহ ও বিপ্লব করার আহ্বান জানায়, যা আল্লাহর অনুমোদিত ও সমর্থিত নয় এবং প্রত্যেক খোদাদ্রোহী শক্তিকে উৎখাত করে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণের আহ্বান জানায়। বিশেষত এই দাওয়াতের ফলে রসূল (স.)-এর নেতৃত্বে যে নতুন বিপ্লবী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, যা প্রথম দিন থেকেই আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের আনুগত্য, কোরায়শদের জাহেলী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহ ও প্রতিষ্ঠিত জাহেলী সমাজ ব্যবস্থাকে উৎখাতের সংকল্প গ্রহণ করেছে, তার দিক থেকে সম্ভাব্য বিপদাশংকা সম্পর্কেও মক্কার জাহেলী সমাজ শুরুতে যথাযথভাবে সচেতন ছিলো না।

অবশেষে যখন ইসলামী দাওয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য তারা উপলব্ধি করলো, তখন এই নতুন দাওয়াতের বিরুদ্ধে এই দাওয়াতের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ নতুন সমাজের বিরুদ্ধে এবং নতুন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করে দিলো। শুধু প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধ নয়, আরো যতো রকমের নির্যাতন, নিপীড়ন, অত্যাচার, ষড়যন্ত্র, ছল চাতুরী তাদের সাধ্যে কুলাতো, তার সবই চালাতে লাগলো। যে কোনো একটি প্রাণী নিজের মৃত্যুর আশংকা দেখা দিলে সেই আশংকা থেকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে যেমন সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করে দেয়, আরবের জাহেলী সমাজ ব্যবস্থা ঠিক তেমনিভাবে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষার নিমিত্ত সর্বাত্মক চেষ্টা তৎপরতা শুরু করে দিয়েছিলো। বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার জন্যে যখনই কোনো দাওয়াত এমন কোনো জাহেলী সমাজের দেয়া হয়, যা আল্লাহর এক দাসদের ওপর অপর দাসদের প্রভুত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তখন এরূপ যুদ্ধ ও সংঘর্ষ বেধে যাওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বিশেষত যখন এই দাওয়াতের ভিত্তিতে নতুন কোনো বিপ্লবী সমাজ ও সংগঠন গড়ে ওঠে, নতুন কোনো নেতৃত্ব তার পরিচালনার ভার হাতে নেয় এবং সেই নয়া সমাজ ব্যবস্থা প্রাচীন জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তখন এই যুদ্ধ ও সংঘাত বাধা একেবারেই অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। (সূরা আনফালের শেষ দিককার আয়াতগুলো সংক্রান্ত আলোচনা দেখুন)

এরূপ পরিস্থিতিতেই নয়া ইসলামী সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি সর্ব প্রকারের অত্যাচার নির্যাতন ও বিপদ মুসীবতের সম্মুখীন হয়, এমনকি এই নির্যাতন নিপীড়ন প্রায়শ রক্তপাত পর্যন্ত গড়ায়। এ জন্যে সে দিন 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' এই কলেমায় সাক্ষ্যদান করতে, নতুন ইসলামী সমাজের সদস্য হতে এবং তার নয়া নেতৃত্বের আনুগত্য করতে শুধুমাত্র এমন লোকেরাই এগিয়ে আসতো, যারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহর পথে বিসর্জন দেয়ার সংকল্প নিতো এবং ক্ষেত্র বিশেষে নিষ্ঠুরতম অত্যাচার, নির্যাতন, ক্ষুধা, অভাব, নির্বাসন, মৃত্যু ও বিপর্যয়কে বরদাশত করতে প্রস্তুত থাকতো।

এভাবে আরব সমাজের উৎকৃষ্টতম ও বলিষ্ঠতম লোকগুলোর সমন্বয়ে ইসলামের ভিত্তি গড়ে ওঠে। যে সব লোক এ ধরনের চাপ ও অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি, তারা ইসলাম ত্যাগ করে জাহেলিয়াতে ফিরে গিয়েছিলো। অবশ্য এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম ছিলো। কেননা

ইসলাম গ্রহণের আগেই সবার কাছে এ বিষয়টা পরিষ্কার ও সুবিদিত থাকতো। তাই জাহেলিয়াত ছেড়ে ইসলাম গ্রহণের বিপজ্জনক ও কন্টকাকীর্ণ পথ কেবলমাত্র বিশিষ্ট ও বিরল চরিত্রের লোকেরাই অবলম্বন করতো।

এ ধরনের বিরল চরিত্রের লোকদেরকে আল্লাহ প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ও মোহাজের রূপে বাছাই করেছিলেন যাতে তারা প্রথমে মক্কায় ও পরে মদীনায় ইসলামের অটুট ভিত্তি গড়ে তোলে। মদীনায় তাদের সাথে যে আনসাররা যুক্ত হয়েছিলেন, তারা যদিও মোহাজেরদের ন্যায় কঠিন নির্যাতনে ভোগেননি, কিন্তু আকাবায় রসূল (স.)-এর সাথে সম্পাদিত তাদের বায়আত বা চুক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা ইসলামের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল আসল উপাদান দ্বারাই গঠিত ছিলেন। ইবনে কাসীর স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা আকাবার রাত্রিতে রসূল (স.)-কে বললেন, 'আপনার প্রতিপালকের জন্যে ও আপনার জন্যে আমাদের ওপর যে শর্তই আরোপ করতে চান, করুন।' রসূল (স.) বললেন, 'আমার প্রতিপালকের জন্যে এই শর্ত আরোপ করছি যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আমার জন্যে এই শর্ত আরোপ করছি যে, তোমরা তোমাদের প্রাণ ও সহায় সম্পদকে যে সব জিনিস থেকে রক্ষা করে থাক, আমাকেও সে সব জিনিস থেকে রক্ষা করবে।' সমবেত সবাই বললো, 'এটা যখন আমরা করবো, তখন আমাদের কী লাভ হবে?' রসূল (স.) বললেন, 'জান্নাত'। তখন সবাই বললো, এটা লাভজনক চুক্তি। এ চুক্তি থেকে আমরা কখনো কাউকে সরাবোও না, নিজেরাও সরবো না।'

রসূল (স.)-এর সাথে চুক্তি সম্পাদনকারী এই আনসারগণ এর বিনিময়ে জান্নাত ছাড়া আর কিছুই চাইতেন না। তারা এই বলে চুক্তির প্রতি দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন যে, আমরা এই চুক্তি থেকে নিজেরাও সরবো না এবং রসূল (স.)-কেও সরাবো না। তারা জানতেন যে, তারা কোনো সহজ জিনিসের ওপর চুক্তি সম্পাদন করছেন না। বরং তারা নিশ্চিত ছিলেন যে, কোরায়শরা তাদের বিরুদ্ধে ওঁৎ পেতে আছে, সমগ্র আরব জাতি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং এরপর তারা মদীনায় ও সমগ্র আরবের কোথাও জাহেলিয়াতের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন না।

ইবনে কাসীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ 'আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতে লিখেছেন যে, ইমাম আহমদ হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন, 'রসূল (স.) মক্কায় দশ বছর এভাবে কাটান যে, বাড়ীতে বাড়ীতে, উকায ও মাজান্নার বাজারে এবং হজ্জের মওসুমে লোকজনের সাথে দেখা করতেন ও বলতেন, 'কে আমাকে আশ্রয় দেবে, কে আমাকে সাহায্য করবে, যাতে আমি আমার প্রতিপালকের বার্তা তার কাছে পৌঁছে দিতে পারি এবং সে জান্নাতের অধিকারী হবে?' অথচ তাঁকে সাহায্য করে ও আশ্রয় দেয় এমন একজনকেও পাচ্ছিলেন না। এমন কি সুদূর ইয়ামান বা মুদার থেকেও কেউ মক্কায় এলে তাঁর গোত্র ও রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা সেই ব্যক্তির পিছু নিতো এবং বলতো, 'সাবধান, কোরায়শ বংশের এ যুবকটা যেন তোমাকে আকৃষ্ট না করে। রসূল (স.) তাদের লোকজনদের মধ্যে একটু ঘোরাফেরা করলেই তারা তাঁর দিকে আংগুল দিয়ে ইংগিত করে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ ইয়াসরিব থেকে আমাদেরকে তাঁর কাছে পাঠালেন। আমরা তাকে সমর্থন ও আশ্রয় দিলাম। এরপর ইয়াসরিববাসী যেয়ে যেয়ে একে একে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। এ ধরনের প্রত্যেককে তিনি কোরআন পড়ে শোনাতেন। আর সে নিজ পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যেতো এবং তার ইসলাম গ্রহণের ফলে সবাই ইসলাম গ্রহণ করতো। এভাবে মদীনার আনসারদের মধ্যে এমন একটি পরিবারও অবশিষ্ট রইলো না, যে পরিবারে

প্রকাশ্যে একাধিক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেনি। এরপর মদীনার মুসলমানরা পরামর্শ করা শুরু করলো। সবার প্রশ্ন একটাই, মক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে প্রাণ ভয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে আমরা রসূল (স.)-কে আর কতদিন একাকী থাকতে দেবো? একদিন আমাদের মধ্য থেকে ৭০ জন (১) হজ্জের মওসুমে রসূল (স.)-এর সাথে দেখা করতে গেলাম। আমরা পাহাড়ের ভেতরে তাঁর সাথে দেখা করার সময় ও স্থান নির্ধারণ করলাম। অতপর একজন দু'জন করে যেতে যেতে সবাই একত্রে তার কাছে সমবেত হলাম। তারপর আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'হে রসূল! আমরা কোন বিষয়ে আপনার কাছে অংগীকার দেব?' তিনি বললেন, 'তোমরা অংগীকার করবে যে, ব্যস্ততা কিংবা অবসর এবং অভাব কিংবা প্রাচূর্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম শুনবে ও আনুগত্য করবে। সৎ কাজের আদেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকতে গিয়ে কারো নিন্দা সমালোচনার ভয় করবে না। আমি যখন তোমাদের কাছে আসবো, তখন আমাকে সাহায্য করবে এবং তোমরা নিজেদেরকে, স্ত্রীদেরকে ও সন্তানদেরকে যেভাবে সংরক্ষণ কর আমাকেও সেই ভাবে সংরক্ষণ করবে, এটা করলে তোমাদের জন্যে জান্নাত নির্ধারিত থাকবে।' এরপর আমরা রসূলের কাছে এগিয়ে গেলাম। আমাদের ৭০ জনের মধ্যে আমার পরেই কনিষ্ঠতম ব্যক্তি আসয়াদ বিন যুরারা রসূল (স.)-এর হাত ধরে বসলো। আসয়াদ বললো, 'হে ইয়াসরিববাসী! তাড়াহুড়ো করো না। আমরা তাঁকে আল্লাহর রসূল হিসাবে বিশ্বাস করেছি বলেই তার কাছে এসেছি। আজ তাকে এখান থেকে বের করে নেয়ার অর্থ দাঁড়াবে সমগ্র আরব জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দেয়া এবং আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের হত্যার ঝুঁকি গ্রহণ। তোমরা যদি এ সবের ওপর ধৈর্যধারণ করতে পার তাহলে তাঁকে গ্রহণ করো। এর প্রতিদান তোমরা আল্লাহর কাছে পাবে। আর যদি ভয় পাও, তা হলে তাঁকে ছেড়ে দাও এবং তা স্পষ্ট করে বলে দাও। এটা আল্লাহর কাছে তোমাদের সাফাই দেয়ার সর্বোত্তম ব্যবস্থা।' সবাই বললো, 'হে আসয়াদ! তুমি একটু থামো আল্লাহর কসম, আমরা এই অংগীকারকে কখনো ত্যাগ করবো না এবং তা কখনো লংঘনও করবো না। এরপর আমরা তার কাছে এগিয়ে গেলাম এবং অংগীকার করলাম। তিনি আমাদের অংগীকার নিলেন ও শর্ত আরোপ করলেন এবং তার বিনিময়ে জান্নাতের ওয়াদা দিলেন। (আহমদ, বায়হাকী ও বাযযার)

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, আনসাররা সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এই অংগীকারের দায় দায়িত্ব কী কী। তারা এও জানতেন যে, এই সব অংগীকারের বিনিময়ে তারা দুনিয়ায় কিছুই পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাননি, এমনকি বিজয়ও নয়। এর বিনিময়ে জান্নাত ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে বলে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি, তা তারা জানতেন। তা সত্তেও তারা এই অংগীকারের প্রতি এতো একনিষ্ঠ ও তা রক্ষার জন্যে এতো ব্যাকুল ছিলেন। সুতরাং একই ধরনের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ লাভকারী প্রথম ঈমান আনয়নকারী মোহাজেরদের সাথে সাথে এই আনসাররাও যে মদীনার প্রথম যুগের ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি বলে পরিগণিত হবেন, সেটা ছিলো অবধারিত।

তবে মদীনার ইসলামী সমাজে এই নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধতা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। মদীনায় ইসলাম বিজয়ী হয়েছিলো ও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো। ফলে অনেক লোক, বিশেষত নিজ নিজ গোত্রে যারা প্রভাবশালী, তারা তাদের পদমর্যাদা বজায় রাখার জন্যে তাদের গোত্রের সাধারণ

(১) প্রকৃতপক্ষে তাদের সংখ্যা ছিল ৭২, কিন্তু আরবরা দশের নীচের খুচরা সংখ্যাটা সাধারণত গণনা থেকে বাদ দিতে অভ্যস্ত ছিল।

মানুষদের সাথে সাযুজ্য রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলো। বদরযুদ্ধের পর এই জাতীয় লোকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল খোলাখুলি বলে ফেললা, 'এ জিনিসটা (ইসলাম) এখন প্রাধান্য লাভ করলো।' অতপর সে কপটতা ও ভন্ডামির আশ্রয় নিয়ে নিজেকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করলো। এ ছাড়া মোনাফেক না হয়েও ইসলামের ব্যাপক প্রসারের কারণে অন্যদের দেখাদেখিও অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। অথচ ইসলামকে তারা যথাযথভাবে বোঝেওনি এবং তাদের চরিত্রে ইসলামের ছাপও তেমন পড়েনি। এর ফলে মদীনার ইসলামী সমাজে ঈমানের স্তরভেদের দরুন কিছুটা বিশৃংখলা ও অসমতা দেখা দেয়।

এই সব নতুন ঈমান আনয়নকারীদের জন্যে রসূল (স.)-এর নেতৃত্বে কোরআন এক অভূতপূর্ব প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সে নয়া ইসলামী সমাজে ঈমানী ও নৈতিক দিক দিয়ে বিভিন্ন স্তরের মোমেনদের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টির চেষ্টা করে।

আমরা যখন নাযিল হওয়ার কালগত ধারাবাহিকতার আলোকে মদীনায় নাযিল হওয়া সূরাগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেই, তখন মুসলিম সমাজের বিবিধ স্তরের ওইসব মুসলমানকে সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে বিরাট চেষ্টা দেখতে পাই। বিশেষত, কোরায়শ ও ইহুদীদের পক্ষ থেকে সকল গোত্রের ওপর প্রহরা বসানো, বাধা দান ও কুটিল ষড়যন্ত্র চালানো সত্তেও এ ধরনের লোকদের ইসলাম গ্রহণ অব্যাহত থাকায় এই প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়ের কাজের প্রয়োজন আরো বেড়ে যেতে থাকে এবং এক মুহূর্তও এ কাজে শৈথিল্য, উদাসীনতা প্রদর্শনের অবকাশ ছিলো না।

এই সমস্ত চেষ্টা সত্তেও মাঝে মাঝে, বিশেষত কষ্টকর পরিস্থিতিতে ঈমানী দুর্বলতা, মোনাফেকী, দ্বিধাসংশয়, অর্থ ও শারীরিক শ্রম দানে কার্পণ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অংশ গ্রহণে ভয়ভীতি ও অনীহার লক্ষণ প্রকাশ পেতো। বিশেষত অমুসলিম নিকটাত্মীয়ের সাথে মুসলমানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আকীদা ও আদর্শের অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হতো। কোরআনের শুরু থেকেই এক নাগাড়ে কয়েকটি সূরায় এই সমস্ত লক্ষণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে এবং আল্লাহর মনোনীত পন্থায় তা দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ধরনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আয়াত হলো, সূরা আনফালের ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং আয়াত, সূরা আল ইমরানের ৭, ৮ ও ৯ নং আয়াত সূরা আল হাশরের ১১, ১২ ও ১৩নং আয়াত ও সূরা আল আহযাবের ৯ থেকে ১৪ নং আয়াত, সূরা নিসার ৭১, ৭২ ও ৭৩নং আয়াত, সূরা নিসার ৭৭ ও ৭৮নং আয়াত, সূরা মুহাম্মদের ৩৬, ৩৭ ও ৩৮নং আয়াত, সূরা মুজাদালার ১৪ থেকে ২২ নং আয়াত, সূরা মায়েদা ৫১, ৫২ ও ৫৩নং আয়াত এবং সূরা মুমতাহিনার ১ থেকে ৪নং আয়াত।

বিভিন্ন সূরা থেকে এই দশটা নমুনা তুলে দেয়াই আমি যথেষ্ট মনে করছি। মুসলিম সমাজে যে ঈমানী ও চারিত্রিক দুর্বলতাগুলোর লক্ষণ পরিলক্ষিত হতো, এ আয়াতগুলোতে তার উল্লেখ করা ও প্রতিকারের পন্থা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলামী সমাজে নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের ব্যাপকভাবে প্রবেশের ফলে এই পরিস্থিতির উদ্ভব অনিবার্য ও স্বাভাবিক ছিলো। এতো বিপুল সংখ্যক নতুন মুসলমানকে যথাযথ ও ক্রমাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশোধন, একীভূতকরণ ও প্রথম যুগের খাঁটি মোমেনদের সাথে তাদের সমন্বয় সাধন কিছুটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ছিলো।

তবে সামগ্রীকভাবে মদীনার ইসলামী সমাজ বিশুদ্ধই ছিলো। কেননা তা প্রধানত প্রাথমিক যুগের মোহাজের ও আনসার নামে পরিচিত খাঁটি ও বিশুদ্ধ মোমেনদের ওপরই নির্ভরশীল ছিলো। ওই সব মোহাজের ও আনসারের মধ্যে সমন্বয় ও একাত্মতার কোনো ঘাটতি ছিলো না, এমনকি নবাগতদের শৈথিল্য, সমন্বয়হীনতা ও অন্যান্য ত্রুটিও তাদের মধ্যে কোনো কমতি দেখা দেয়নি।

ক্রমান্বয়ে এই নবাগতদের ত্রুটি সংশোধিত হতে থেকেছে, পরিশুদ্ধি, পবিত্রতা, সমন্বয় ও একাত্মতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দুর্বল ঈমানধারী, মোনাফেক, সন্দেহ সংশয়ে দোদুল্যমান, ভীরু ও অমুসলিম আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের আকীদা ও আদর্শে অস্পষ্টতার প্রশ্রয়দানকারীদের সংখ্যা ক্রমেই কমে এসেছে। কমতে কমতে মক্কা বিজয়ের সময় ইসলামী সমাজ সামগ্রিকভাবে মোহাজের ও আনসারদের সাথে সমন্বয় ও একাত্মতার মাধ্যমে তাদের মানের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহর মনোনীত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি তাদেরকে যে মানে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলো, তারা প্রায় সেই মানেই পৌঁছে গিয়েছিলো।

এতদসত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, আদর্শগত আন্দোলনের প্রভাবেই মোমেনদের উৎকর্ষ ও পরিপক্বতার মানে কিছু না কিছু তারতম্য ছিলো। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ত্যাগ, তিতিক্ষা, অবিচলতা ও আপোসহীনতা, অগ্নিপরীক্ষায় কৃতকার্যতা ও প্রাথমিক যুগের মোমেন হওয়া ইত্যাদির কারণে মোমেনদের বিভিন্ন গোষ্ঠী বিশিষ্টতা লাভ করেছিলো। যেমন মোহাজের ও আনসাররা প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হিসাবে, তাদের মধ্য থেকে আবার এক গোষ্ঠী বদরযোদ্ধা হিসাবে, একটা গোষ্ঠী হোদায়বিআয় বায়য়াতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী হিসাবে এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বের

ত্যাগী মোজাহেদ ও পরের ত্যাগী মোজাহেদরা মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে বিশিষ্ট হয়েছিলেন।

এবার সংক্ষেপে এই সূরার প্রধান প্রধান আলোচিত বিষয়, বিশেষত মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্ক সংক্রান্ত চূড়ান্ত বিধিমালা তুলে ধরছি। বস্তুত এ সূরায় যে বিধি বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা হচ্ছে সর্বশেষ নাযিল হওয়া বিধান এবং তা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আন্দোলনী ধারারও সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা ও পদ্ধতি।

নবম পারায় সূরা আনফালের ভূমিকায় ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রকৃতি ও স্বভাব সম্পর্কে আমি কিছু জরুরী কথা বলে এসেছি। এই সূরায় বিধৃত সর্বশেষ বিধি বিধানকে বুঝার জন্যে ওই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করা প্রয়োজন মনে হচ্ছে। যদিও এতে 'ফী যিলালিল কোরআনের'ই কিছু বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি হবে, কিন্তু সূরা তাওবার আয়াতগুলোকে বুঝার জন্যে তা খুবই জরুরী। আনফালের ভূমিকার ওই অংশটি নিম্নরূপ

'ইমাম ইবনুল কাইয়েম স্বীয় গ্রন্থ 'যাদুল মায়াদে'র একটি অধ্যায়ে ইসলামের জেহাদ সংক্রান্ত বিধানের চমৎকার সার নির্যাস তুলে ধরেছেন। তিনি ওই অধ্যায়টার শিরোনাম দিয়েছেন।

'নবুওত থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত কাফের ও মোনাফেকদের ব্যাপারে অনুসৃত নীতি।' এই অধ্যায়ে তিনি বলেন, 'মহান আল্লাহ সর্ব প্রথম তাঁর কাছে যে ওহী নাযিল করেন তা ছিলো এই যে, তিনি যেন তাঁর সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে পাঠ করেন। এটি ছিলো তাঁর নবুয়তের সূচনা। এ সময় তিনি শুধু তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে পাঠ করার নির্দেশ দেন। এ সময় তাঁকে তাবলীগ বা প্রচারের কোনো আদেশ দেননি। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর ওপর নাযিল করা হয়, 'হে কম্বলাচ্ছাদিত, ওঠো এবং সতর্ক করো।' সুতরাং ইকরা' বা পাঠ করো বলে আল্লাহ তাঁকে নবী বানালেন, 'আর হে কম্বলাচ্ছাদিত, ওঠো এবং সতর্ক করো' বলে তাঁকে রসূল পদে উন্নীত করলেন। অতপর তিনি তাঁর নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করলেন, তাঁর গোত্রকে সতর্ক করলেন, প্রতিবেশী আরবদেরকে সতর্ক করলেন, সমগ্র আরব জাতিকে সতর্ক করলেন, সমগ্র বিশ্ববাসীকে সতর্ক করলেন। এভাবে তাঁর নবুওতের পর তিনি দশ বছরেরও অধিক সময় কোনো লড়াই বা জিযিয়া করো আরোপ

ছাড়াই শুধু দাওয়াতের কাজ করে কাটালেন। এই সময়ে তাঁকে কোনো অস্ত্র ধারণ থেকে বিরত থাকা, ধৈর্য ধারণ করা ও ক্ষমা করার আদেশ দেয়া হয়েছিলো। অতপর তাঁকে হিজরত করার ও যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হলো। প্রথমে তাকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হলো শুধু যারা তাঁর ওপর আক্রমণ চালায় তাদের বিরুদ্ধে, আর যারা তাঁর ওপর আক্রমণ করে না এবং দূরে সরে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকার আদেশ দেয়া হলো। অতপর তাঁকে সকল মোশরেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হলো। যাতে সমস্ত আনুগত্য কেবল আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন ও হুকুম মান্য করা না হয়।

অতপর জেহাদের নির্দেশ দেয়ার পর কাফেররা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হলো— (১) যাদের সাথে আপোস ও সন্ধির নীতি অবলম্বন করা হবে। (২) যাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে এবং (৩) যাদেরকে সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা দানের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হবে। প্রথম শ্রেণীটার সাথে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তি তাঁকে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হলো। যতোক্ষণ তারা চুক্তি মেনে চলে, ততোক্ষণ মুসলমানদেরও তা মেনে চলতে হবে। কিন্তু যখন তাদের পক্ষ থেকে চুক্তি লংঘনের আশংকা দেখা দেবে, তখন মুসলমানরা চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করবে। কিন্তু তারা চুক্তি লংঘন করা শুরু করেছে এমন সুনির্দিষ্ট তথ্য না জানা পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে না। যারা চুক্তি লংঘন করেছে, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হলো।

সূরা তাওবা নাযিল করার মাধ্যমে এই তিন প্রকারের কাফেরদের সকলের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। আহলে কেতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারা মুসলমানদের শত্রু, তারা ইসলাম গ্রহণ কিংবা জিযিয়া করো প্রদান না করলে মুসলমানদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়। কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ও তাদের ওপর কঠোরতা আরোপের আদেশ দেয়া হয়েছে। রসূল (স.) কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রশক্তি এবং মোনাফেকদের বিরুদ্ধে বাকশক্তি ও যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জেহাদ করলেন। আল্লাহ তাঁকে কাফেরদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল করার আদেশ দিলেন এবং তাদেরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন। প্রথমত, যারা চুক্তি লংঘন করেছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি তাদের সাথে লড়াই করলেন ও তাদেরকে পরাজিত করলেন। দ্বিতীয়ত, যাদের সাথে মুসলমানদের নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি রয়েছে, কিন্তু তারা চুক্তি লংঘনও করেনি এবং মুসলমানদের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আক্রমণও চালায়নি। তাদের সাথে কৃত চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তৃতীয় যাদের সাথে মুসলমানদের কোনো চুক্তি ছিলো না কিংবা মেয়াদহীন চুক্তি ছিলো এবং তারা রসূল (স.) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়নি। এই শ্রেণীর লোকদেরকে চার মাস সময় দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। এই চার মাস অতিবাহিত হলে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রসূল (স.) চুক্তি লংঘনকারীদেরকে হত্যা করলেন। যাদের সাথে চুক্তি ছিলো না কিংবা চুক্তির কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ ছিলো না, তাদেরকে তিনি চার মাস সময় দিলেন। আর চুক্তি মান্যকারীর সাথে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন। এই সব লোক ইসলাম গ্রহণ করলো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কুফরীর ওপর অবিচল থাকলো না। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত থাকার অংগীকারে আবদ্ধ অমুসলিমদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করলেন।

এভাবে সূরা তাওবা নাযিল হবার পর রসূল (স.)-এর সামনে তিন শ্রেণীর কাফের অবশিষ্ট রইলো, যারা যুদ্ধরত, যারা চুক্তিবদ্ধ এবং যারা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত। অতপর চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের ভাগ্য মুসলমানদের হাতে ন্যস্ত হলো। ইসলামের আওতায় এরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

হলো- ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত ও বিদ্রোহী। যারা বিদ্রোহী, তারা রসূল (স.)-কে ভয় পেতো। এভাবে গোটা দুনিয়ার মানুষ তিন রকমের দাঁড়ালো- মুসলমান, নিরাপদ আপোসকামী অমুসলিম এবং ভীরু বিদ্রোহী। মোনাফেকদের ব্যাপারে তাঁর নীতি ছিলো এই যে, আপাতদৃষ্টিতে তাদেরকে যেমন দেখা যায়, তেমনিই বিবেচনা করা, তাদের মনের অবস্থা আল্লাহর হাতে সোপর্দ করা, জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা, তাদেরকে এড়িয়ে চলা, তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ ও কঠোর নীতি অবলম্বন, হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দ্বারা তাদের মন জয় করা, তাদের জানাযা না পড়া এবং তাদের কবর যিয়ারত না করা। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এরূপ আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, কোনো মোনাফেকের জন্যে তিনি ক্ষমা চাইলেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। এই ছিলো রসূল, ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন কাফের ও মোনাফেকদের প্রতি রসূল (স.)-এর নীতি।'

ইসলামে জেহাদের বিভিন্ন স্তরের বিধান সম্বলিত দীর্ঘ আলোচনার এই চমৎকার সারসংক্ষেপ থেকে ইসলামের আন্দোলন পদ্ধতির কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য জানা গেলো, যা বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। কিন্তু আমি এ তাফসীরে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করবো!

প্রথম বৈশিষ্ট্য, জীবন পদ্ধতির বাস্তবমুখিতাই ইসলামের পয়লা বৈশিষ্ট্য। এটা মানব সমাজের বিদ্যমান একটা বাস্তব অবস্থার মোকাবেলা করে এবং পৃথিবীতে ইসলামের অস্তিত্বকে সংরক্ষণ করার জন্যে সম্ভাব্য যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করে। ইসলাম জাহেলী মতবাদ ও আদর্শের মোকাবেলা করে। এই জাহেলী মতবাদ ও মতাদর্শের ভিত্তিতে বহু বাস্তব রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং বস্তুগত শক্তিতে বলীয়ান বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান সেগুলোকে সমর্থন ও সাহায্য করে। এ জন্যে ইসলাম এই গোটা বাস্তব অবস্থাটারই মোকাবেলা করে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে। একদিকে আকীদা বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণার সংশোধনকল্পে দাওয়াত ও প্রচারমূলক কাজের মাধ্যমে এবং অপরদিকে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের উচ্ছেদকল্পে শক্তি প্রয়োগ ও জেহাদের মাধ্যমে এর মোকাবেলা করে। কেননা এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রচার ও দাওয়াতের মাধ্যমে জনগণের ধারণা বিশ্বাস সংশোধনে বাধা দেয়, তাদেরকে বলপ্রয়োগ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে নতি স্বীকার করায় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য প্রভুদের গোলামে পরিণত করে। বস্তুগত শক্তির মোকাবেলায় কেবল প্রচার ও দাওয়াতের মধ্যে এ আন্দোলনের তৎপরতা সীমাবদ্ধ থাকে না। অনুরূপভাবে তা মানুষের বিবেকের ওপর কোনো বস্তুগত বলও প্রয়োগ করে না। ইসলামের জীবন পদ্ধতিতে ওই দুটো জিনিসই সমান গুরুত্বসম্পন্ন। মোট কথা, ইসলামের যাবতীয় তৎপরতার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আল্লাহর বান্দাদের গোলামী থেকে মুক্ত করে শুধু আল্লাহর অনুগত বান্দায় পরিণত করা। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে আরো আলোচনা করা হবে।

ইসলামের জীবন পদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এর আন্দোলনের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবমুখিতা। এ হচ্ছে ধাপে ধাপে অগ্রসরমান একটা আন্দোলন। এর প্রত্যেকটি ধাপের দাবী ও বাস্তব প্রয়োজন পূরণের উপকরণাদি এর হাতে রয়েছে। প্রতিটি ধাপ এমন যে, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী ধাপ পর্যন্ত আন্দোলকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ইসলাম শুধুমাত্র মতবাদ ও মতাদর্শ দ্বারা বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির মোকাবেলা করে না। অনুরূপভাবে তা নিষ্ক্রিয় উপকরণাদি দ্বারাও বিরাজমান পরিস্থিতি ও পরিবেশের মোকাবেলা করে না। যারা কোরআনের আয়াতগুলোকে ইসলামের জেহাদ সংক্রান্ত বিধান প্রমাণ করার কাজে ব্যবহার করে, কিন্তু এই পর্যায়ক্রমিকতা ও ধারাবাহিকতার বৈশিষ্ট্যকে হিসাবে ধরে না এবং ইসলাম যে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় ও এর প্রতিটি

ধাপের সাথে যে কোরআনের আয়াতসমূহের সম্পর্ক রয়েছে তা উপলব্ধি করে না, তারা মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হয় এবং আয়াতগুলোর ভুল অর্থ করে তা থেকে এমন সব মতবাদ ও মতাদর্শ বের করে, যা আদৌ ওই আয়াতগুলোর বক্তব্য নয়। এরূপ হওয়ার কারণ হলো, তারা কোরআনের প্রতিটি উক্তিকে অন্যান্য উক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একমাত্র ও সর্বশেষ উক্তি মনে করে। তাদের ধারণা যে, ওই আয়াতেই ইসলামের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ নীতিমালা ব্যক্ত করা হয়েছে। তারা বিরাজমান শোচনীয় পরিস্থিতি ও পরিবেশের চাপের কাছে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পরাজিত হয়ে মুসলমানদের নতুন প্রজন্মকে বলে যে, ইসলাম শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্যে জেহাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে। এভাবে তারা পৃথিবী থেকে সকল আল্লাহ বিরোধী শাসনের অবসান ঘটানো এবং সকল মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে শুধু আল্লাহর গোলামে পরিণত করার মহান দায়িত্ব থেকে ইসলামকে অব্যাহতি দিয়ে ইসলামের একটা উপকার সাধন করলেন বলে মনে করেন। বস্তুত ইসলাম কাউকে তার আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ করতে বাধ্য করে না। কিন্তু মানুষ যাতে তার আকীদা বিশ্বাস স্বাধীনভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে, সে জন্যে যমীনে বিদ্যমান স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস অথবা পরাভূত করতে চায়। এই শাসন ব্যবস্থাকে জিযিয়া দিতে ও ইসলামের অধীনতা বরণ করতে সে বাধ্য করে, যাতে মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে ইসলামকে গ্রহণ বা বর্জনের ফয়সালা করতে পারে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলামের চিরস্থায়ী আন্দোলন ও তার নিত্য নতুন উপায় উপকরণ ইসলামকে কখনো তার স্থায়ী ও শাশ্বত নীতিমালা ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে না। প্রথম থেকেই এ আন্দোলন শুধু কোরায়শদেরকে নয় এবং শুধু আরবদেরকে নয়, বরং সমগ্র মানব জাতিকে একই মূলনীতি ও একই লক্ষ্যের দিকে আহবান জানাচ্ছে। এক আল্লাহর এবাদাত ও আনুগত্য করা এবং আল্লাহর বান্দাদের গোলামী থেকে মুক্ত হওয়ার আহবান জানাচ্ছে। এই মূলনীতির ব্যাপারে তার কোনো আপোস নেই। অতপর সে এই মূলনীতিকে পর্যায়ক্রমে ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাস্তবায়িত করে, যেমন দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রসংগে আমি বলে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, মুসলমানদের সাথে সকল অমুসলমানের সম্পর্ক আইনানুগভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে 'যাদুল মায়াদ' থেকে ইতিপূর্বে উদ্ধৃত নির্দেশিকার আলোকে। সেই নির্দেশিকা এই যে, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা অথবা অন্ততপক্ষে নমনীয় হওয়া, তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা, তাঁর এবাদাত ও আনুগত্যে কাউকে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উপকরণাদি দ্বারা বাধা না দেয়া এবং সবাইকে ইসলাম গ্রহণ বা বর্জনের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান নিশ্চিত করা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের কর্তব্য। কোনো মানুষ নিজে ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক এ ব্যাপারে সে পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু সে যদি অন্য কাউকে বাধা দেয়, তবে ইসলাম তা বরদাশত করে না। যে ব্যক্তি অন্যকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেবে, ইসলাম তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করবে, যতোক্ষণ না সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অথবা বাধা দান থেকে বিরত হয় ও বশ্যতা স্বীকার করে।

এই আলোচনার আলোকে আমরা এই সূরায় বর্ণিত চূড়ান্ত বিধানগুলোর যৌক্তিকতা বুঝতে পারি। এ বিধানগুলোর মধ্যে রয়েছে মোশরেকদের সাথে সম্পাতি সকল চুক্তি আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে বাতিল ঘোষণা। যাদের সাথে মেয়াদী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো, কিন্তু তারা চুক্তি ভংগ করেনি এবং কোনো শত্রুকে মুসলমানদের ওপর উস্কে দেয়নি বা লেলিয়ে দেয়নি, তাদেরকে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দানের নির্দেশ। অনুরূপভাবে যাদের সাথে মেয়াদবিহীন চুক্তি ছিলো, কিন্তু তারা চুক্তি লংঘন করেনি, কাউকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে বা উস্কে দেয়নি

এবং যাদের সাথে কোনো চুক্তিই ছিলো না এই উভয় শ্রেণীর মোশরেকদেরকে চার মাস সময় দানের নির্দেশ, আর চুক্তি লংঘনকারীদের চুক্তি বাতিল করা, তাদেরকে চারমাস নিরাপদে চলাফেরার অবকাশ দান এবং এরপর তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে হত্যা করা, অবরোধ করা ও নিরাপদে চলাফেলার সুযোগ না দেয়ার নির্দেশ। অনুরূপভাবে এ থেকে আমরা আল্লাহর প্রকৃত বিধান থেকে বিপথগামী আহলে কেতাবের সাথে তারা যতোক্ষণ সর্বান্তকরণে বশ্যতা স্বীকার পূর্বক জিযিয়া না দেয়, ততোক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশের যৌক্তিতা বুঝতে পারি, যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারি কাফের ও মোশরেকদের ওপর একই সাথে জেহাদ করার, মোনাফেকদের মৃতদের ওপর জানাযার নামায না পড়া ও তাদের কবর যিয়ারত না করার নির্দেশেরও। এই সমস্ত হুকুম বা বিধি ইতিপূর্বে নাযিল করা অন্য সকল বিধির পরিবর্তনকারী ও সংশোধনকারী। এই পরিবর্তন ও সংশোধনের যৌক্তিকতাও ইমাম ইবনুল কাইয়েমের ওই আলোচনার আলোকে বুঝা সহজ হয়েছে বলে মনে হয়।

এখানে এই সব পরিববর্তিত বিধি বা পরিবর্তনের পূর্বেকার বিধি নিয়ে বিশদ আলোচনা করার অবকাশ নেই। সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর তাফসীরে আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ।

তবে সংক্ষেপে শুধু এতোটুকু বলবো যে, পূর্ববর্তী ওই সব বিধি সূরা তাওবার বিধি দ্বারা রহিত হয়ে যায়নি যে, পরবর্তী কালের কোনো সময়ে ও কোনো পরিস্থিতিতেই মুসলিম উম্মা ওগুলোকে কার্যকর করতে পারবে না। কেননা ইসলামী আন্দোলন স্থান, কাল ও পাত্রভেদে যে সব বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে থাকে, স্বাধীন ইজতেহাদ তথা বিচার বিবেচনার মাধ্যমে সেই বাস্তব পরিস্থিতির আলোকেই স্থির করা হবে, কোনো স্থান, কাল বা অবস্থার কোন বিধান অপেক্ষাকৃত মানান সই হবে, সূরা তাওবার বিধান, না পূর্ববর্তী বিধান। তবে সর্বশেষ বিধানের কথা কখনো ভুলে যাওয়া যাবে না। কেননা এ বিধান কার্যকরী করার মত পরিস্থিতি যদি মুসলমানদের কখনো হয়, যেমন সূরা তাওবা নাযিল হবার সময় হয়েছিলো এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশ জয়ের সময় যেমন হয়েছিলো, তখন মোশরেক বা আহলে কেতাব যাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হোক, এই বিধান প্রয়োগ করা হবে।

আজ কাল যে নামধারী মুসলিম প্রজন্মটি আমাদের সামনে রয়েছে, তাদের বাস্তব অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এবং ইসলামের মৌল জেহাদ তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবাদী জাহেলিয়াত চক্রের আক্রমণাত্মক নিন্দা সমালোচনার মুখে দিশেহারা হয়ে যে মুসলমানরা পরাজিত মানসিকতা লালন করছে, তারা কোরআনের সময়োচিত বিধানসমূহের এমন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে! যাতে মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব খতম করা, সকল মানুষকে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের দিকে ফিরিয়ে নেয়া এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মানব রচিত আইন বিধানের আনুগত্য করতে বাধ্য করে এমন রাষ্ট্র, সরকার ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা সকল তাগূতী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্যে যে ইসলামী আন্দোলন চলছে, তা থেকে পালানোর আশ্রয়স্থল খুঁজে পাওয়া যায়।

এ জন্যেই তাদেরকে প্রায়ই বলতে দেখি যে, আল্লাহ তায়ালা তো বলেছেন, 'কাফেররা সন্ধি করতে চাইলে তুমিও সন্ধি করো', 'যারা তোমাদের সাথে ধর্মের ব্যাপারে লড়াই করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ীঘর থেকে বের করে দেয় না, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার ও সুবিচার করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না,' 'যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করো...। আহলে কেতাব সম্পর্কে বলেন, 'বলো, হে আহলে কেতাব, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সর্বসম্মত এ কথাটার দিকে এসো যে, আল্লাহ ছাড়া কারো এবাদাত করবো না, ...'

এসব আয়াত থেকে তো বুঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের ভেতর বা বাইরে থেকে তার অধিবাসীদের ওপর আক্রমণে উদ্যত হয়েছে, এমন লোকদের সাথে ছাড়া ইসলাম আর কারো সাথে যুদ্ধ করতে বলে না। রসূল (স.) তো হুদায়বিয়াতে মোশরেকদের সাথেও চুক্তি করেছেন এবং মদীনার ইহুদী ও মোশরেকদের সাথেও শান্তি চুক্তি করেছেন। অর্থাৎ তারা তাদের পরাজিত মানসিকতা দ্বারা এ সবের এই অর্থই বুঝে থাকে যে, পৃথিবীর তাবত মানুষের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই, তারা আল্লাহ ছাড়া যার ইচ্ছে তার পূজা উপাসনা করে বেড়াক এবং পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ একে অপরকে খোদা মেনে নিয়ে তার দাসত্ব করতে থাকুক, তাতে তার কিছু এসে যায় না। সে তার নিজ রাষ্ট্রীয় সীমানায় শান্তিতে থাকতে পারলেই হলো। এটা আসলে ইসলাম ও আল্লাহ উভয়ের সম্পর্কেই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ ও হীনমন্যতার নামান্তর। মুসলমানদের বিরাজমান শোচনীয় অবস্থা দেখে এবং বিশ্বের পরাক্রান্ত ও ইসলাম বিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর দাপটের সামনে নিজেকে শক্তিহীন ও অসহায় ভেবে লালন করা পরাজিতসুলভ মানসিকতা থেকেই মূলত এই হীনমন্যতার উৎপত্তি।

বিশ্বের এই সব পরাক্রান্ত শক্তির কাছে মানসিকভাবে হার মানার সময় তারা যদি তাদের এই পরাজয়ের দায় ইসলামের ওপর না চাপাতো, তা হলেও ব্যাপারটা তেমন গুরুতর মনে হতো না। মূলত তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকার কারণেই যে তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে এসেছে, তা যদি তারা বুঝতো, তা হলে সমস্যাটার সমাধান হয়তো সহজ হতো। কিন্তু তারা তো তাদের দুর্বলতা ও বিপর্যয়ের সমস্ত দায় দায়িত্ব আল্লাহর নিষ্কলংক ও নির্ভেজাল দ্বীনের ওপর চাপিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর!

কোরআনের যে আয়াতগুলোর দোহাই দিয়ে তারা নিজেদের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করে, সেগুলো একটা নির্দিষ্ট স্তর ও নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট। এই নির্দিষ্ট পরিস্থিতি মুসলিম উম্মাহর জীবনে বারবার আসতে পারবে না এমন কোনো কথা নেই। অবশ্যই বারবার আসতে পারে। যখন এ ধরনের পরিস্থিতি আসবে, তখন ওই সব আয়াতই বাস্তবায়িত হবে। কেননা ওই পরিস্থিতি দ্বারাই বুঝা যাবে যে, ওই আয়াতের বিধান দ্বারাই অনুরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করা হয়েছিলো। তাই ওই আয়াত এ ধরনের পরিস্থিতিতেই প্রযোজ্য। তবে এর অর্থ এ নয়, এটাই শেষ কথা ও চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং এটাই ইসলামের শেষ গন্তব্য এর অর্থ শুধু এই যে, নিজের অবস্থার পরিবর্তনে ও পথের বাধা অপসারণে মুসলিম উম্মাহকে অব্যাহতভাবে কাজ করে যেতে হবে, যাতে করে শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ সূরায় যে চূড়ান্ত বিধিসমূহ নাযিল হয়েছে তা বাস্তবায়িত করতে সমর্থ হয়। এ সূরা এমন পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিলো, যা পূর্ববর্তী সূরাগুলোর নাযিল হওয়ার সময় বিরাজমান ছিলো না। মোশরেকদের সম্পর্কে কোরআনের সর্বশেষ বিধান সূরা তাওবার প্রথম কয়েকটি আয়াতে বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যে সব মোশরেকের সাথে তোমাদের চুক্তি ছিলো,তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আর কোনো সম্পর্ক নেই .... (আয়াত ১ থেকে ৬ পর্যন্ত)

আহলে কেতাব সম্পর্কে বলা হয়েছে,

'আহলে কেতাবের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনে না, আল্লাহ ও রসূল যে সব জিনিস হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং আল্লাহর সত্য দ্বীনকে অনুসরণ করে না, তারা নতশিরে নিজ হাতে জিযিয়া না দেয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।' (তাওবা ২৯)

একথা সত্য আজকের যুগে মুসলমানরা সূরা তাওবার এই সব নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়। সাময়িকভাবে হলেও তারা অক্ষম। আর আল্লাহ কাউকে ক্ষমতার বাইরে কিছু করার দায়িত্ব দেন না। তাদের জন্যে এতোটুকু সুযোগ রাখা হয়েছে যে, এ সব চূড়ান্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তারা এ সূরার পূর্ববর্তী অন্যান্য সূরার বিধান অনুযায়ী কাজ করতে পারবে। (অর্থাৎ লড়াইর পরিবর্তে দাওয়াত ও উপদেশ দান ও অন্যান্য পর্যায়ক্রমিক নির্দেশাবলীর অনুসরণ তবে তাদের জন্যে এটা কোনো অবস্থাতেই বৈধ হবে না যে, পূর্ববর্তী স্তরের বিধানের সাথে সমন্বিত করার জন্যে সূরা তাওবার চরম স্তরের এই নির্দেশগুলোর অর্থই পাল্টে ফেলবে। তাদের বর্তমান দুর্বলতাকে আল্লাহর চির সবল ও চির উন্নতশির ইসলামের ওপর চাপিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকা তাদের কর্তব্য। ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম এই ওজুহাতে তাকে বিকৃত করা ও তাকে উপহাসের পাত্রে পরিণত করা থেকে সাবধান থাকা উচিত ও আল্লাহকে ভয় করা উচিত। নিসন্দেহে ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। তবে সেটা এই শর্তে যে, সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদাতে লিপ্ত থাকতে দেয়া হবে না এবং সমগ্র মানব জাতিকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। বস্তুত শান্তি ও নিরাপত্তার এই সর্বোচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া কেবল মাত্র আল্লাহর এই বিধান দ্বারাই সম্ভব, কোনো মানুষের তৈরী বিধান দ্বারা নয়।

পৃথিবীতে মানুষ যে সব ধর্ম, মতবাদ বা আইন কানুন অনুসরণ করে তার সব যদি মানুষের তৈরী ধর্ম, মতবাদ বা আইন কানুন হয়, তাহলে প্রত্যেক ধর্ম, মতবাদ বা আইনের আওতায়, যতোক্ষণ একে অপরের ওপর আগ্রাসন বা বাড়াবাড়ি না করে, ততোক্ষণ শান্তিতে ও নিরাপদে থাকা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মানব রচিত ধর্ম বা বিধানের অধিকার এভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে যে, তারা সবাই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবে এবং একে অপরকে উৎখাত করার চেষ্টা করবে না।

কিন্তু যখন পৃথিবীতে একদিকে আল্লাহর বিধানও থাকবে এবং অপরদিকে মানব রচিত বিধানও থাকবে, তখন পুরো পরিস্থিতিটা মৌলিকভাবে ভিন্নতর হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের অধিকার থাকবে মানব রচিত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করা, মানুষকে আল্লাহর পরিবর্তে তার বান্দাদের আনুগত্য থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং তাদেরকে তাদের পছন্দমত আদর্শ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দান করার।

পরাজিত মানসিকতাধারীরা, যারা সারা দুনিয়ার মানব জাতিকে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য প্রভুর দাসত্ব থেকে মুক্ত করার ইসলামী লক্ষ্যে কাজ করতে সংকোচ বোধ করার কারণে কোরআনের আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা করে ও অর্থ বিকৃত করে, তারা এ সত্যটা ভুলে যায়। তারা ভুলে যায় যে, আল্লাহর বিধান যেখানে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বকেই অনুমোদন করে, সেখানে বান্দার দাসত্ব অনুমোদনকারী মানব রচিত বিধানগুলোর সাথে তার সংঘাত স্বভাবতই অনিবার্য।

বস্তুত ইসলামে যে সর্বাত্মক জেহাদের বিধান দেয়া হয়েছে, সেটা আল্লাহর বিধানের স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত দাবী এবং এটাই তার অন্যতম যুক্তি। সুতরাং ওই সকল পরাজিত মানসিকতাধারী ও হীনমন্যতাভোগী লোকদের সেই যুক্তি অনুধাবন করা উচিত, যারা নিজেদের দুর্বলতা ও পরাজয়কে ইসলামের ঘাড়ে চাপায়। এতে আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে সবলতা ও দৃঢ়তা দান করবেন এবং খোদাভীরু বান্দাদেরকে তিনি হক ও বাতিলের মধ্যে বাছবিচারের ক্ষমতা দানের যে ওয়াদা করেছেন, তাও হয়তো দিতে পারেন।

সর্বশেষ কথা এই যে, এ সূরার শুরুতে অন্যান্য সূরার মতো 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা হয়নি। কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন 'মাসহাফে উসমানী' এভাবেই সংকলিত হয়েছে।

তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, 'আমি ওসমান বিন আফফান (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, সূরা আনফাল তো 'মাসানী' (যে সব সূরা একেবারে ক্ষুদ্রও নয় আবার তার আয়াত সংখ্যা একশো আয়াতের কম)-এর অন্তর্ভুক্ত এবং সূরা তাওবার আয়াত সংখ্যা একশোর ওপরে। আপনি কোন্ কারণে এ দুটো সূরাকে পাশাপাশি লিখলেন এবং এদের মাঝে বিসমিল্লাহ ....' লিখলেন না! আবার এ দুটোকে বৃহত্তম সাতটা সূরারও অন্তর্ভুক্ত করলেন? এর কারণ কী? উসমান (রা.) বললেন, রসূল (স.) যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন, তখন তাঁর ওপর বড় বড় সূরা নাযিল হতো। যখনই কোনো ওহী নাযিল হতো, অমনি কোনো না কোনো লেখককে ডেকে বলতেন, 'এই আয়াতটাকে অমুক সূরার অনুর্ভুক্ত করো।' সূরা আনফাল মদীনার জীবনের প্রথম দিককার এবং সূরা তাওবা কোরআনের শেষের দিককার সূরা। সূরা তাওবার বক্তব্য সূরা আনফালের বক্তব্যেরই মতো এবং আমি ভেবেছি যে, এ সূরা ওই সূরারই অন্তর্ভুক্ত। রসূল (স.) এ বিষয়টা আমাদেরকে জানানোর আগেই ইন্তিকাল করেন। এ জন্যেই দুটোকে পাশাপাশি রেখেছি, দুটোর মধ্যে 'বিসমিল্লাহ ....' লিখিনি এবং দুটোকে বড় বড় সাতটা সূরার অন্তর্ভুক্ত করেছি।

সূরা দুটোকে 'বিসমিল্লাহ.............' ছাড়া পাশাপাশি রাখার ব্যাখ্যা নিয়ে যতো হাদীস এসেছে, তন্মধ্যে এ হাদীসটাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এ হাদীসটা থেকে আমরা এ তথ্যও জানতে পারছি যে, রসূল (স.) জীবদ্দশায় প্রতিটি আয়াতকে যে সূরায় যে ধারাক্রম অনুসারে সাজাতে আদেশ দিতেন, সেই সূরায় সেইভাবেই তা সাজানো হতো। আমরা এও জানতে পারছি যে, একই সময়ে একাধিক সূরা খোলা রাখা হতো। যখন কোনো আয়াত কোনো আদেশ বা বিধান নিয়ে বা আদেশ ও বিধানের পরিবর্তন, পূর্ণতা দান অথবা চলতি ঘটনার বিবরণ সম্বলিত আয়াত নাযিল হতো বা ইসলামের বাস্তব আন্দোলন সংক্রান্ত পরিস্থিতির সাথে সংগতিপূর্ণ কোনো বক্তব্য আসতো, তখন রসূল (স.) তাকে নির্দিষ্ট সূরায় যথাস্থানে লিখে দিতে বলতেন। সুতরাং প্রতিটি সূরার কত সংখ্যক আয়াত হবে এবং কোন আয়াত বা সূরার আগে-পরে কোন্ আয়াত বা সূরা বসবে, সেটা তাঁরই নির্দেশে স্থির হতো এবং এর প্রতিটি নির্দেশই হতো সুচিন্তিত ও বিজ্ঞান সম্মত।

বিভিন্ন সূরার ভূমিকায় আমরা প্রমাণ করেছি এবং লক্ষ্য করেছি যে, প্রত্যেক সূরারই একটা বিশিষ্ট সত্ত্বা থাকে, সেই বিশিষ্ট সত্ত্বাকে চিহ্নিতকারী কিছু নির্দিষ্ট প্রতীকও থাকে এবং নির্দিষ্ট একটা পরিমন্ডলও থাকে। তা ছাড়া ওই একই সূরায় ওই বিশিষ্ট সত্ত্বাকে ফুটিয়ে তোলা ও ওই সব প্রতীককে চিহ্নিত করার জন্যে স্বতন্ত্র কিছু বাচনভংগিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সম্ভবত উপরোক্ত প্যারায় ও তার পূর্ববর্তী ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসটাতে এ বৈশিষ্ট্যটার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

তবে সূরার সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় এটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করি। এবার আলাদাভাবে সূরার এক এক অংশের ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করবো।

সূরা আত্ তাওবা

আয়াত ১২৯ রুকু ১৬

মদীনায় অবতীর্ণ

(এ সূরায় বিসমিল্লাহ পড়া নিষেধ)

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ (১) فَسِيْحُوْا
فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ
مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ (২) وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ
الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (৩) اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ
يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى
مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (৪) فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ

রুকু ১

১. (হে মুসলমানরা,) মোশরেকদের সাথে তোমরা যে (সন্ধি) চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিলে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের (তা থেকে) অব্যাহতি রয়েছে। ২. অতপর (হে মোশরেকরা), তোমরা (আরো) চার মাস পর্যন্ত (এ পবিত্র) ভূখণ্ডে চলাফেরা করে নাও এবং জেনে রেখো, তোমরা কখনো আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা থেকে পালাতে পারবে না এবং আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কাফেরদের অপমানিত করবেন। ৩. (আজ) মহান হজ্জের (এ) দিনে দুনিয়ার মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ঘোষণা (এই যে), আল্লাহ তায়ালা মোশরেকদের (সাথে চুক্তির বাধ্যবাধকতা) থেকে মুক্ত এবং (মুক্ত) তাঁর রসূলও; (হে মোশরেকরা,) যদি তোমরা (এখনো) তাওবা করো তাহলে তাই হবে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর; আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রাখো, তোমরা কখনো আল্লাহ তায়ালাকে হীনবল (ও অক্ষম) করতে পারবে না; (হে নবী,) যারা কুফরী করেছে তাদের তুমি এক কঠোর আযাবের সুসংবাদ দাও, ৪. তবে সেসব মোশরেকের কথা আলাদা, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছো, তারা (চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে) এতোটুকুও ক্রুটি করেনি– না তারা কখনো তোমাদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে সাহায্য করেছে, তাদের চুক্তি তাদের মেয়াদ (শেষ হওয়া) পর্যন্ত অবশ্যই তোমরা মেনে চলবে; আসলেই যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে তাদের অবশ্যই তিনি ভালোবাসেন। ৫. অতপর যখন (এ) নিষিদ্ধ চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মোশরেকদের

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا
لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا
سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ
فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا
الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا
لَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا
فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبٰى قُلُوبُهُمْ ۚ وَأَكْثَرُهُمْ
فٰسِقُونَ ﴿٨﴾ اشْتَرَوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ

তোমরা যেখানে পাবে সেখানেই তাদের হত্যা করবে, তাদের বন্দী করবে, তাদের অবরোধ করবে এবং তাদের (ধরার) জন্যে তোমরা প্রতিটি ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে বসে থাকবে, তবে এরপরও তারা যদি তাওবা করে (দ্বীনের পথে ফিরে আসে) এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও বড়ো দয়াময়। ৬. আর মোশরেকদের মধ্য থেকে যদি কোনো ব্যক্তি তোমার কাছে আশ্রয় চায় তবে অবশ্যই তাকে তুমি আশ্রয় দেবে, যাতে করে (তোমার আশ্রয়ে থেকে) সে আল্লাহ তায়ালার বাণী শুনতে পায়, অতপর তাকে তার (কোনো) নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবে; (এটা) এ জন্যেই যে, এরা (আসলেই) এমন এক সম্প্রদায়ের লোক যারা কিছুই জানে না।

রুকু ২

৭. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের কাছে মোশরেকদের এ চুক্তি কিভাবে (বহাল) থাকবে? তবে যাদের সাথে মাসজিদুল হারামের পাশে (বসে) তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছিলে (তাদের কথা আলাদা), যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে (সম্পাদিত এ) চুক্তির ওপর বহাল থাকে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও তাদের জন্যে (সম্পাদিত চুক্তিতে) বহাল থেকো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (চুক্তি ও ওয়াদার ব্যাপারে) সাবধানী ব্যক্তিদের ভালোবাসেন। ৮. কিভাবে (তোমরা তাদের বিশ্বাস করবে?) এরা যদি কখনো তোমাদের ওপর জয়লাভ করে, তাহলে তারা (যেমনি) আত্মীয়তার বন্ধনের তোয়াক্কা করবে না, (তেমনি) চুক্তির মর্যাদাও দেবে না; তারা (শুধু) মুখ দিয়ে তোমাদের খুশী রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের অন্তরগুলো সেসব কথা (কিছুতেই) মেনে নেয় না, (মূলত) এদের অধিকাংশ ব্যক্তিই হচ্ছে ফাসেক, ৯. এরা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ সামান্য (কিছু বৈষয়িক) মূল্যের বিনিময়ে

مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٩ لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۖ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُعْتَدُوْنَ ۝١٠ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّيْنِ ۖ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝١١ وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ
عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ
لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ۝١٢ اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ
الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝١٣ قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ
وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۝١٤ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ۖ
وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝١٥ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ

বিক্রি করে দিয়েছে এবং (মানুষকে) আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে দূরে রেখেছে; নিশ্চয়ই এটা খুব জঘন্য কাজ, যা তারা করছে। ১০. (কোনো) ঈমানদার লোকের ব্যাপারে এরা (যেমন) আত্মীয়তার ধার ধারে না, (তেমনি) কোনো অংগীকারের মর্যাদাও এরা রক্ষা করে না; (মূলত) এরা হচ্ছে সীমালংঘনকারী। ১১. (এ সত্ত্বেও) যদি তারা তাওবা করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (তাহলে) তারা হবে তোমাদেরই দ্বীনী ভাই; আমি সেসব মানুষের কাছে আমার আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করি, যারা (সত্য-মিথ্যার তারতম্য) বুঝতে পারে। ১২. তারা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও তাদের চুক্তি ভংগ করে এবং (ক্রমাগত) তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করতে থাকে, তাহলে তোমরা কাফের সরদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (ঘোষণা) করো, কেননা তাদের জন্যে (তখন) আর কোনো চুক্তিই (বহাল) নেই, (এর ফলে) আশা করা যায় তারা তাদের মন্দ কাজগুলো থেকে বিরত থাকবে। ১৩. তোমরা কি এমন একটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা (বার বার) নিজেদের অংগীকার ভংগ করেছে! যারা রসূলকে (স্বদেশ থেকে) বের করার সংকল্প করেছে এবং তারাই তো প্রথম (তোমাদের ওপর হামলা) শুরু করেছে; তোমরা কি (সত্যিই) তাদের ভয় করো? অথচ যদি তোমরা মোমেন হও তাহলে তোমাদের আল্লাহ তায়ালাকেই বেশী ভয় করা উচিত। ১৪. তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, আল্লাহ তায়ালা (আসলে) তোমাদের হাত দিয়েই ওদের শাস্তি দেবেন, তিনি তাদের অপমানিত করবেন, তাদের ওপর (বিজয় দিয়ে) তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং (এভাবে) তিনি মোমেন সম্প্রদায়ের মনগুলোকেও নিরাময় করে দেবেন, ১৫. তিনি (এর দ্বারা) তাদের দিলের ক্ষোভ বিদূরিত করে দেবেন; তিনি যাকে চাইবেন তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন; আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই জানেন এবং তিনি হচ্ছেন সুবিজ্ঞকুশলী। ১৬. তোমরা কি

تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ مَا
كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ
أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ
اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ
يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾ أَجَعَلْتُمْ
سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ

(একথা) মনে করে নিয়েছো, তোমাদের (এমনি এমনিই) ছেড়ে দেয়া হবে! অথচ (এখনো) আল্লাহ তায়ালা (ভালো করে) পরখ করে নেননি যে, তোমাদের মাঝে কারা (আল্লাহর পথে) জেহাদ করেছে, আর কারা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনদের ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে, (বস্তুত) তোমরা যা কিছু করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

রুকু ৩

১৭. মোশরেকরা যখন নিজেরাই নিজেদের ওপর কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে, তখন তারা আল্লাহ তায়ালার মাসজিদ আবাদ করবে এটা তো হতেই পারে না; মূলত এরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের যাবতীয় কর্মকান্ড বরবাদ হয়ে গেছে এবং চিরকাল এরা দোযখের আগুনেই কাটাবে। ১৮. আল্লাহ তায়ালার (ঘর) মাসজিদ তো আবাদ করবে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান আনে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, আর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তারা কাউকে ভয় করে না। এদের ব্যাপারেই আশা করা যায়, এরা হেদায়াতপ্রাপ্ত মানুষের অন্তর্ভুক্ত হবে। ১৯. তোমরা কি (হজ্জের মওসুমে) হাজীদের পানি পান করানো ও কাবা ঘরের খেদমত করাকে সে ব্যক্তির কাজের সমপর্যায়ের মনে করো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে, পরকালের ওপর ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করেছে; এরা কখনো আল্লাহর কাছে সমান (মর্যাদার) নয়; আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেমদের সঠিক পথ দেখান না। ২০. যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে, (তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে) হিজরত করেছে এবং আল্লাহ তায়ালার পথে তাদের জান-মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার

وَأَنْفُسِهِمْ ۙ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ
رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ
يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ
أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا

কাছে সবার চাইতে বড়ো এবং এ ধরনের লোকেরাই (পরিণামে) সফলকাম হবে। ২১. তাদের মালিক তাদের জন্যে নিজ তরফ থেকে দয়া, সন্তুষ্টি ও এমন এক (সুরম্য) জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী নেয়ামতের সামগ্রীসমূহ (সাজানো) রয়েছে, ২২. সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার কাছে (মোমেনদের জন্যে) মহাপুরস্কার (সংরক্ষিত) রয়েছে। ২৩. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যদি তোমাদের পিতা ও ভাইয়েরা কখনো ঈমানের ওপর কুফরীকেই বেশী ভালোবাসে, তাহলে তোমরা এমন লোকদের কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তোমাদের মধ্যে যারা এ (ধরনের) লোকদের (নিজেদের) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তারা হচ্ছে (সুস্পষ্ট) যালেম। ২৪. (হে নবী,) বলো, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের ভাই, তোমাদের পরিবার পরিজন ও তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য– যা অচল হয়ে যাবে বলে তোমরা ভয় করো, তোমাদের বাড়ীঘরসমূহ, যা তোমরা (একান্তভাবে) কামনা করো, যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও তাঁর পথে জেহাদ করার চাইতে (এগুলোকে) বেশী ভালোবাসো, তাহলে তোমরা আল্লাহ তায়ালার (পক্ষ থেকে তাঁর আযাবের) ঘোষণা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো (জেনে রেখো); আল্লাহ তায়ালা কখনো ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

রুকু ৪

২৫. আল্লাহ তায়ালা তো বহু জায়গায়ই তোমাদের সাহায্য করেছেন, (বিশেষ করে) হোনায়নের দিনে (যে সাহায্য করেছিলেন তা স্মরণ করো, সেদিন) যখন তোমাদের

رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ
وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط
وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ط
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٧﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا
يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ج وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ
يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ إِنْ شَآءَ ط إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٨﴾

সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করে দিয়েছিলো, অথচ সংখ্যার (এ) বিপুলতা তোমাদের কোনোই কাজে আসেনি, যমীন তার বিশালতা সত্ত্বেও (সেদিন) তোমাদের ওপর সংকুচিত হয়ে পড়েছিলো, অতপর তোমরা (এক সময়) ময়দান ছেড়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়েও গেলে। ২৬. অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল ও (ময়দানে অটল হয়ে থাকা) মোমেনদের ওপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করলেন, (ময়দানে) তিনি এমন এক লশকর (বাহিনী) পাঠালেন, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি এবং (তাদের দিয়ে) তিনি কাফেরদের (এক চরম) শাস্তি দিলেন, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, এ হচ্ছে তাদের (যথাযথ) পাওনা। ২৭. এর পরেও আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দেন, আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ২৮. ওহে (মানুষ), তোমরা যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছো (জেনে রেখো), মোশরেকরা হচ্ছে (চিন্তা ও আদর্শের দিক থেকে) অপবিত্র, অতএব (এ অপবিত্রতা নিয়ে) তারা যেন এ বছরের পর আর কখনো এ পবিত্র মাসজিদের কাছে না আসে, যদি (তাদের না আসার কারণে) তোমরা (আশু) দারিদ্রের আশংকা করো তাহলে (জেনে রেখো), অচিরেই আল্লাহ তায়ালা চাইলে নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দিবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও কুশলী।

তাফসীর
আয়াত ১-২৮

সূরার এ পর্বটা শুরুতে থাকলেও এটা সূরার অন্যান্য অংশের পরে নাযিল হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি যে, কোন সূরার ভেতরে কোন আয়াত কোন আয়াতের আগে বা পরে বসবে, সেটা স্বয়ং রসূলই (স.) স্থির করতেন এবং তিনিই আদেশ দিয়ে সেইভাবে লেখাতেন।

এই সময় পর্যন্ত মোশরেকদের সাথে মুসলমানদের যে সব চুক্তি ছিলো, সেগুলো বাতিল করার ঘোষণা এ অংশে দেয়া হয়েছে। অনির্দিষ্টকালের চুক্তিধারী অথবা চুক্তি লংঘনকারীদের বেলায় চার মাস পর চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। আর যাদের সাথে নির্দিষ্ট চুক্তি ছিলো কিন্তু তারা তা ভংগও করেনি এবং মুসলমানদের ওপর কোনো শত্রুকে আক্রমণ চালাতে প্ররোচনাও দেয়নি, তাদের ক্ষেত্রে ওই মেয়াদ শেষে চুক্তি বাতিল করা হয়েছে।

মোট কথা, চূড়ান্ত পরিণতি এই দাঁড়িয়েছিলো যে, সমগ্র আরব উপদ্বীপের সকল মোশরেকের সাথে সকল চুক্তির অবসান ঘটানো হয়েছিলো। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে মোশরেকদের সাথে

সর্বতোভাবে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে, মোশরেকদের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকাকে অবাঞ্ছিত বলে ব্যক্ত করার মাধ্যমে এরূপ মনোভাবও প্রকাশ করা হয়েছে যে, মূলত মোশরেকদের সাথে কোনো চুক্তি সম্পাদনের নীতি ও ধারণাই পরিত্যক্ত ও বাতিল হয়ে গেছে।

এই পর্বে আরো যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে, তার মধ্যে মোশরেকদেরকে মাসজিদুল হারামের তওয়াফ ও যে কোনো উপায়ে তার সেবাযত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের অনুমতি না দেয়া অন্যতম। অথচ ইতিপূর্বে রসূল (স.) ও মোশরেকদের মধ্যে এই মর্মে সাধারণ অলিখিত চুক্তি ছিলো যে, মাসজিদুল হারামে ও নিষিদ্ধ মাসে মোশরেকরা ও মুসলমানরা নিরাপদে চলাফেরা ও অবস্থান করবে, কেউ কারো ক্ষতি করবে না এবং মোশরেকরা শেরেকের নীতি অনুসরণ করে চললেও নিরাপত্তা পাবে।

যে ব্যক্তি নবী জীবনের ঘটনাবলী ও তার পটভূমি পর্যবেক্ষণ করবে এবং সেই ঐতিহাসিক পটভূমির আলোকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি, তার স্বাভাবিক রূপ, লক্ষ্য ও স্তরসমূহ পর্যালোচনা করবে, সে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে, আরবের সকল মোশরেক ও আহলে কেতাবের সাথে মুসলমানদের এই সম্পর্কচ্ছেদ অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছিলো। এর যথোচিত সময় তখন এসে গিয়েছিলো, গোটা দেশ এবং তার সার্বিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ এর উপযোগী হয়ে গিয়েছিলো এবং একটা সম্পূর্ণরূপে এটা অনিবার্য ও স্বাভাবিক পদক্ষেপ ছিলো।

আন্দোলনের প্রতিটি স্তর থেকে ও প্রতিটি অভিজ্ঞতা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যে, চিন্তা ও বিশ্বাস, চরিত্র ও আচরণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে পর্যন্ত তীব্র বিরোধি ও আকাশ পাতাল ব্যবধান সম্বলিত এই দুইটি জীবন ব্যবস্থায় সহাবস্থান একেবারেই সম্ভব নয়। কেননা এ দুটো জীবন ব্যবস্থার একটার ভিত্তি এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের ওপর এবং অপরটার ভিত্তি মানুষের ওপর মানুষের, তথাকথিত দেবদেবীর ও হরেক রকমের প্রভুর প্রভুত্বের ওপর। এর ফলে এই দুই জীবন ব্যবস্থা অনুসারীদের মধ্যে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। কেননা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যে উভয় জীবন ব্যবস্থার নীতি ও বিধান পৃথক ও পরস্পর বিরোধী।

কোরায়শ ও ইহুদীদের বিরোধিতা ছিলো পরিকল্পিত

'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' এই কালেমার দাওয়াতের বিরুদ্ধে মক্কায় কোরায়শদের চরম উগ্র অবস্থান গ্রহণ, মদীনায় আগ্রাসন পরিচালনা, ইহুদীদেরও তার বিরুদ্ধে একই রকম উগ্র অবস্থান গ্রহণ, আহলে কেতাব হয়েও কোরায়শদের সাথে তাঁদের জোট বাঁধা এবং ওই কলেমার ভিত্তিতে মদীনায় শুধুমাত্র একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হওয়া ও সেই রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা ওই কলেমার আইন ও বিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে ইহুদী ও কোরায়শ কর্তৃক আরবের সকল অমুসলিম গোত্রকে সংগঠিত করে খন্দক যুদ্ধ বাধানো– এর কোনোটাই কাকতালীয় ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিলো না। অনুরূপভাবে আমরা অচিরেই একথাও জানবো যে, আহলে কেতাব হয়ে খৃষ্টানরাও যে এই দাওয়াতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলো ইয়েমেনে, সিরিয়ায় এবং আরো বহু দেশে– আর ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত আরো বহু দেশে দাঁড়াবে, তাও অপ্রত্যাশিত নয়। এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। সকল ধর্মমত ও মতাদর্শের অনুসারীরা জানে ইসলামের নীতি কতো শক্ত ও অনড়। সবাই জানে এবং উপলব্ধিও করে যে, পৃথিবীতে আল্লাহর রাজ্য ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, মানুষকে মানুষের দাসত্ব ও আনুগত্য থেকে বের করে এনে আল্লাহর একক

আনুগত্য ও দাসত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে যে কোনো মত ও পথ অবলম্বনের সকল বাধা গুঁড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে ইসলাম আপোষহীন অনমনীয়। তাছাড়া এ দুটো জীবন বিধানে এত ব্যাপক বিরোধ যে, কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও উভয়ের মধ্যে মিল নেই। মানব রচিত বিধানের অনুসারীরা যেহেতু জানে যে, আল্লাহর বিধান তাদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট হুমকি এবং প্রথম সুযোগেই সে তাদেরকে খতম করে দেবে, তাই তারা আল্লাহর বিধানকে খতম করে দিতে নিজেদের বাধ্যকর মনে করে। সুতরাং এই দুই বিধানের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ ছিলো একেবারেই অবিনার্য ব্যাপার।

এই অনিবার্যতা সর্বকালের এবং সকল পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা থেকে তা পরিস্ফুট। আর এই অনিবার্যতাই এ সূরায় ঘোষিত চূড়ান্ত পদক্ষেপকে অপরিহার্য করে তুলেছে। কোনো কোনো বর্ণনায় এই চূড়ান্ত পদক্ষেপের যে প্রত্যক্ষ ও নিকটতম কারণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, তা ইসলামী আন্দোলন ও মহানবীর জীবনের প্রথম থেকে যে ঘটনা প্রবাহ চলে আসছে, তার কয়েকটা ঘটনামাত্র।

বস্তুত মূল পটভূমির প্রতি এরূপ ব্যাপক দৃষ্টি দেয়ার মাধ্যমেই এই সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদের যৌক্তিকতা বুঝা সম্ভব। তবে নিকটতম প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত ঘটনাবলীকেও উপেক্ষা করা চলে না। কেননা সেগুলোও ওই দীর্ঘ ঘটনাপ্রবাহের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রথম দিকের আয়াত প্রসংগে মোফাসসেরদের মতামত

ইমাম বাগাওয়ী তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তাফসীরকাররা বলেছেন, রসূল (স.) যখন তাবুক অভিযানে গেলেন, তখন মোনাফেকরা নানা রকম গুজব রটনায় মেতে উঠলো এবং মোশরেকরা চুক্তি লংঘন করতে লাগলো। এদের সবার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতগুলো নাযিল করলেন। যাদের চুক্তির মেয়াদ চার মাসের কম ছিলো তাদেরকে চার মাস এবং যাদের চুক্তির মেয়াদ চার মাসের বেশী ছিলো, তাদেরকে চার মাস সময় দেয়া হলো।

ইমাম তাবারী স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, 'সবচেয়ে সঠিক মত এই যে, আল্লাহ তায়ালা চুক্তিধরী মোশরেকদের জন্যে যে মেয়াদ নির্ধারণ করেছিলেন এবং 'দেশে চার মাস ঘোরাফেরা কর' এই বলে ঘোরাফেরা করার অনুমতি দিয়েছিলেন, সে মেয়াদটা ছিলো শুধুমাত্র চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার আগে চুক্তিভংগকারী ও রসূল (স.)-এর ওপর আক্রমণ করতে শত্রুদেরকে প্ররোচনা দানকারীদের জন্যে। পক্ষান্তরে যারা চুক্তি ভংগ করেনি এবং কাউকে আক্রমণ করতে প্ররোচনাও দেয়নি, তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত চুক্তি পালন করার আদেশ দিয়েছেন। এই আদেশ যে আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তা হলো,

'কিন্তু যে সকল মোশরেকের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ এবং তারা সে চুক্তি পালনে কোনো কসুরও করেনি, কাউকে তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে প্ররোচনাও দেয়নি, তাদের সাথে মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত চুক্তি মেনে চলো। আল্লাহ সংযমীদেরকে ভালোবাসেন।' (আয়াত ৪)

তাবারী এ প্রসংগে মোজাহেদের উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন। 'যে সকল মোশরেকের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছো, তাদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো।' (আয়াত ১)

এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে মোজাহেদ বলেন, চুক্তিধারীরা হচ্ছে মুদাল্লাজ ও আরব, যাদের সাথে তিনি চুক্তি সম্পাদন করেছেন এবং যাদের সাথে আগে থেকেই চুক্তি ছিলো। মোজাহেদ বলেন, তাবুকের অভিযান শেষে রসূল (স.) ফিরে এসে হজ্জ করার ইচ্ছা করলেন। অতপর বললেন, 'মোশরেকরা তো কা'বা শরীফে উপস্থিত হয়ে উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করবে। ওই রকম উলংগ তওয়াফ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমি হজ্জ করতে চাইনা।' অতপর তিনি আবু বকর (রা.)-কে

পাঠালেন। তারা যিলমাজাযে, সকল বেচাকেনার স্থানগুলোতে এবং সমগ্র হজ্জ মওসুমে ঘুরে ঘুরে লোকদের সাথে দেখা করতে লাগলেন। তারপর ঘুরে ঘুরে চুক্তিধারীদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, তারা ১০ই যিলহজ্জ থেকে ১০ই রবিউস সানী পর্যন্ত এই চার মাস নিরাপদে থাকতে পারবে। এরপরে তাদের সাথে কোনো চুক্তি থাকবে না। এই সময়ের মধ্যে ঈমান না আনলে তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো।(১) এ ঘোষণার সাথে সাথেই সকল মোশরেক ঈমান আনলো। কেউ আর চার মাস ঘোরাফেরা করার অবকাশ কাজে লাগালো না।'

এ কথা সত্য যে, এ সমস্ত প্রত্যক্ষ কারণও সর্বশেষ চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণকে অনিবার্য করে তুলেছিলো। কিন্তু এগুলো মূলত সেই দীর্ঘ ধারাবাহিক ঘটনা প্রবাহেরই অংশ, যা ইসলাম ও কুফর এই দুই মতবাদের পারস্পরিক মৌলিক বিরোধ ও উভয়ের সহাবস্থানের অসম্ভাব্যতাই স্পষ্ট করে দিয়েছিলো। একমাত্র অনিবার্য বলে বিবেচিত কোনো কোনো পরিস্থিতিতেই এই সহাবস্থান সাময়িকভাবে সম্ভব হয়েছিলো এবং সেই অনিবার্য পরিস্থিতি অবশ্যই ক্ষণস্থায়ী।

মরহুম রশীদ রেযা ইসলামের দাওয়াতের শুরু থেকেই সূচিত ওই ঘটনা প্রবাহের বিবরণ দিতে গিয়ে তাফসীরে আলমান-এ বলেন,

'এ কথা সর্বজন বিদিত, অকাট্য ও সর্ববাদীসম্মত যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সর্বশেষ নবী ও রসূল মোহাম্মদ (স.)-কে পরিপূর্ণ জীবন বিধান ইসলাম দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর সবচেয়ে বড় মোজেযা বানিয়েছেন এই কোরআনকে। কোরআন কিভাবে সবচেয়ে বড় মোজেযা হলো, সে বিষয়টা আমি সূরা বাকারার ২ নং আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছি। তারপর আল্লাহ তায়ালা ইসলামের দাওয়াত দেয়ার ভিত্তি স্থাপন করলেন বিবেক বুদ্ধিকে পরিতৃপ্তকারী ও বাধ্যকারী জ্ঞানগত ও যৌক্তিক প্রমাণাদির ওপর(২) এবং ইসলামের ব্যাপারে বলপ্রয়োগ নিষিদ্ধ করার ওপর, যেমন সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছি। এরপর মোশরেকরা তার দাওয়াত প্রতিরোধ করলো এবং মোমেনদের তা থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে যুলুম নির্যাতনের শিকার করতে লাগলো। তারা মানুষের কাছে ইসলাম প্রচার করা থেকে রসূল (স.)-কে বলপ্রয়োগে ফিরিয়ে রাখতে লাগলো। কোনো মিত্র বা আত্মীয় আশ্রয় দেয়া ছাড়া তাঁর অনুসারীদের কেউই খুন বা যখম হওয়া থেকে নিরাপদ ছিলো না। ফলে তাঁর অনুসারীরা একাধিকবার হিজরত করলো। এরপর রসূল (স.)-এর ওপর তাদের নিপীড়ন আরো বেড়ে গেলো। অবশেষে তারা তাদের পরামর্শ সভায় স্থির করলো যে, মোহাম্মদ (স.)-কে হয় যাবজ্জীবন বন্দী করে রাখতে হবে, অথবা তাড়িয়ে দিতে হবে অথবা প্রকাশ্যে হত্যা করতে হবে। এ পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে হিজরত করার নির্দেশ দিলেন যেমন ৮নং সূরার ৩০ নং আয়াতের '(যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছিলো......)' ব্যাখ্যায় বলেছি। এই আদেশের সাথে সাথেই তিনি হিজরত করলেন এবং তাঁর সাথীদের মধ্যে যারা যারা হিজরত করতে সমর্থ ছিলো, তারা তাঁর অনুসরণ করলো। তারা মদীনায় হিজরত করলো। সেখানে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের দ্বীনের সাহায্যকারীরা তাদেরকে ভালোবেসে ও নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে তাদেরকে গ্রহণ

(১) কোরআনের আয়াত থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানা যায় যে, যে সকল চুক্তিধারী ব্যক্তি চুক্তি ভংগ করেনি, তাদেরকে মেয়াদ সমাপ্তি পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছিল। সম্ভবত মোজাহেদ (র.) এটাই বুঝাতে চেয়েছেন।

(২) এখানে একথা জানিয়ে দেয়া অপরিহার্য মনে হচ্ছে যে, শায়খ মোহাম্মদ আবদুহুর চিন্তাধারা অনেকটা ইসলামের পরিপন্থী 'ডেকার্টে' দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। এই দর্শন 'যুক্তিবাদ'কে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং ইসলামী আকীদার ক্ষেত্রে তাকে অধিকতর স্থান দিয়ে থাকে। তাই জ্ঞানগত ও যৌক্তিক প্রমাণাদির সাথে সাথে স্বভাবগত ও স্বতসিদ্ধ যুক্তি প্রমাণগুলোও আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন, যা ইসলামে বিদ্যমান এবং যার প্রতি মানুষের মনমগজসহ সমগ্র সত্ত্বা সাড়া দিয়ে থাকে।

করলো। এ সময় তাদের মধ্যে ও কোরায়শসহ সারা আরবের মোশরেকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে এবং তৎকালীন প্রচলিত অর্থে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিলো। রসূল (স.) মদীনা ও তার আশপাশের ইহুদীদের সাথে সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করলেন। কিন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভংগ করলো। যখনই মোশরেকরা রসূল (স.)-এর সথে যুদ্ধে লিপ্ত হতো, তখনই ইহুদীরা মোশরেকদের উস্কানি, প্ররোচনা ও সহযোগিতা দিতো, যেমন সূরা আনফালের তাফসীরে উল্লেখ করেছি।'

'রসূল (স.) হোদায়বিয়াতে মোশরেকদের সাথে দশ বছর মেয়াদের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তি সম্পাদন করলেন। এই চুক্তিতে তিনি যে শর্তাবলী আরোপ করলেন তা ছিলো সর্বাধিক পরিমাণ নমনীয় ও উদার। তবে এই উদারতা তিনি শক্তি ও সবলতার অবস্থান থেকেই দেখিয়েছিলেন– দুর্বলতার অবস্থান থেকে নয়। কেবল শান্তি-প্রিয়তা ও যুক্তির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের(১) লক্ষ্যেই এই চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। এরপর বনু খুযায়া তাঁর সাথে ও বনু বকর কোরায়শের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করলো। এরপর বনু বকর বনু খুযায়ার ওপর আক্রমণ চালালো। আর কোরায়শ হোদায়বিয়ার চুক্তি লংঘন করে বনু বকরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করলো। এটাই মোশরেকদের সাথে যুদ্ধাবস্থা পুনরারম্ভ ও মক্কা বিজয়ের কারণ হয়ে দেখা দিলো। মক্কা বিজয় মোশরেকদের শক্তি খর্ব ও দর্প চূর্ণ করলো বটে। কিন্তু এরপরও তারা মুসলমানদের সাথে যেখানেই পারতো, যুদ্ধ করতো। পরবর্তীতে তাদের সাথে অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হলো যে, তারা দুর্বল বা সবল যে অবস্থায়ই থাক না কেন, তাদের কোনো প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্য নেই এবং তাদের কোনো চুক্তিই তাদের হাতে অলংঘনীয় ও নিরাপদ নয়। এই সূরার ৭নং থেকে ১২ নং আয়াতে এ বিষয়টা তুলে ধরা হয়েছে। ১২ নং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'কুফরী ব্যবস্থার বড় বড় হোতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। তাদের শপথের কোনো মূল্য নেই।' অর্থাৎ তারা কোনো চুক্তি মানতে অভ্যস্ত নয়। অর্থাৎ চুক্তির ওপর নির্ভর করে তাদের সাথে মুসলমানদের সহাবস্থানের কোনো সম্ভাবনা নেই। শেরেক এমন একটা মতবাদ, যার মধ্যে মেনে চলার মতো কোনো আইন নেই। এহেন শেরেকের ওপর তারা যতোক্ষণ বহাল আছে, ততোক্ষণ তাদের আগ্রাসন ও শত্রুতার ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা ও বিশ্বাস নেই। কেননা কোনো আইন তাদেরকে চুক্তি মেনে চলতে বাধ্য করে না। বাধ্য করবেই বা কেমন করে? যে আহলে কেতাবের পক্ষ থেকে চুক্তির আনুগত্য করা মোশরেকদের তুলনায় অধিক প্রত্যাশিত, তারাই তো ইতিপূর্বে চুক্তি লংঘন করেছে।'(২)

'সূরা তাওবায় মোশরেকদের সাথে করা সকল মেয়াদবিহিন চুক্তি বাতিলকরণ ও মেয়াদী চুক্তি যারা লংঘন করেনি তাদের ক্ষেত্রে মেয়াদ পূর্ণ করণের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এই হলো তার আইনগত ভিত্তি। যে মহৎ উদ্দেশ্যে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তাহলো আরব উপদ্বীপ থেকে শেরেককে সর্বশক্তি দিয়ে নির্মূল করা ও ওই দেশটাকে সর্বতোভাবে মুসলমানদের জন্যে নির্দিষ্ট

---

(১) যুক্তি দিয়ে পরিতৃপ্ত করার মাধ্যমে আদর্শ প্রচারই ইসলামী আন্দোলনের মূলকথা, এ কথাই যদি তিনি বুঝাতেন, তাহলে কথাটা সঠিক বলে মেনে নেয়া যেতো। কিন্তু তিনি আসলে তা বুঝাতে চান না। তিনি বুঝাতে চান যে, ইসলামে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষা ব্যতীত আর কোনো উদ্দেশ্যে জেহাদ চলবে না এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ছাড়া সর্বাবস্থায় মুসলমানদের শান্তির পথ অনুসরণ করা অপরিহার্য।

(২) এটা বড়ই বিস্ময়কর যে, যে মূল সত্যটার কারণে মোশরেক ও আহলে কেতাবের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে সহাবস্থান মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব নয়, সেই মূল সত্যটাকে 'তাফসীরে আল-মানারের' লেখক বুঝতে পেরেও এরূপ মত পোষণ করেন যে, মুসলমানদের আবাসভূমিতে আক্রমণ ও আগ্রাসন সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক শান্তি চুক্তি ও নিরাপত্তা চুক্তি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। এভাবেই নাকি সব সময় সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব। এর বিপরীত যা হয়, সেটা নাকি ব্যতিক্রম। আর সূরা তাওবার এ বিধানটা নাকি শুধু আরবের মোশরেকদের জন্য নির্দিষ্ট! (শেষের কথাটা আংশিক সত্য। তবে নীতিগতভাবে আরবের সেকালের মোশরেকরা এবং অন্যান্য মোশরেকরা সমান। পরবর্তীতে তাফসীরের সময় বিষয়টা বিশ্লেষণ করবো।)

করা। তবে সূরা বাকারার ১৯০ নং আয়াতে ('যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করো') এবং সূরা আনফালের ৬১ নং আয়াতে ('যদি তারা শান্তির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে তোমরাও তার প্রতি আগ্রহী হও') বর্ণিত মূলনীতি সর্বাবস্থায় যথাসাধ্য মেনে চলতে হবে, যদিও অধিকাংশ ফেকাহবিদ আনফালের এ আয়াত তাওবার আয়াতে যুদ্ধ ঘোষণা ও মোশরেকদের চুক্তি বাতিল সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে বলে মত পোষণ করে থাকেন।' (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)

এই পর্যালোচনা ও মন্তব্য থেকে এবং এরপর তাফসীরে আল মানার-এ সূরা তাওবার যে তাফসীর করা হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মোশরেক ও আহলে কেতাবের পক্ষ থেকে ক্রমাগত চুক্তি লংঘন করতে থাকা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পেছনে যে মূল ও গভীর কারণটা লুকিয়ে আছে, সেটা লেখক অনুধাবন করেছেন। তবে তিনি এই কারণটাকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করেননি, তার ব্যাপকতাকে অনুধাবন করেননি। ইসলামী জীবন বিধান ও ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃতিতে নিহিত বিরাট সত্যকে উপলব্ধি করেননি। আল্লাহর বিধান ও মানব রচিত বিধানের মৌলিক পার্থক্যকে বুঝাতে চেষ্টা করেননি। আর এ দুই বিধানের কোনো কিছুতেই যে মিল নেই এবং উভয় বিধানের অনুসারীদের মধ্যে যে দীর্ঘস্থায়ী সহাবস্থান সম্ভব নয়, সে কথাও তিনি অনুধাবন করেননি।

ওদিকে 'আত্-তাফসীরুল হাদীস' (আধুনিক তাফসীর) নামক তাফসীরের লেখক অধ্যাপক মোহাম্মদ ইযযত দারুযা আলোচ্য সূরার তাফসীরে এই সত্যের উপলব্ধি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন। তিনি সেই আসল ও গভীর কারণটাকে আদৌ অনুধাবন করেননি। কারণ তিনি তাঁর স্বগোত্রীয় অন্যান্য আধুনিক লেখকদের মতো বর্তমানকালের মোশরেক, নাস্তিক ও ইহুদী-খৃষ্টানদের দোর্দন্ড প্রতাপ ও সমকালীন মুসলমানদের শোচনীয় দুরবস্থা দেখে দিশেহারা। এ জন্যে তিনি এই মর্মে সাক্ষ্য দিতে খুবই ব্যস্ত যে, ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। আর এর অর্থ তিনি এটুকুই বোঝেন যে, ইসলামের গন্ডিতে শান্তিতেই বসবাস করতে হবে। যখন আপোষ ও চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হবে, তখন তিনি তা করতেও আগ্রহী। এরচেয়ে বেশী কোনো লক্ষ্য তার নেই।

এ কারণে তার দৃষ্টিতে সূরা তাওবার এই উক্তিগুলোর একমাত্র কারণ ছিলো কিছু সংখ্যক মোশরেক কর্তৃক রসূল (স.)-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি লংঘন। যারা চুক্তি লংঘন করেনি, এ সূরা তাদের সাথে কৃত চুক্তি সংরক্ষণের জন্যে এসেছে, চাই তা নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি হোক। এমনকি যাদের সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে, তাদের সাথে নতুন চুক্তি করা বৈধ হবে। অনুরূপ, চুক্তি লংঘনকারীদের সাথে পুনরায় চুক্তি করা যাবে। ইতিপূর্বে যে সব আয়াত সাময়িক চুক্তির ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, সেগুলোর আলোকেই নাকি এ সূরার আয়াতগুলোর মর্ম উপলব্ধি করতে হবে!

এ জন্যেই ৪ ও ৫ নং আয়াতের ('তবে সেই সব মোশরেকের সাথে মেয়াদের শেষ পর্যন্ত চুক্তি পালন করো, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছো .....' ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন,

'এ দুটো আয়াতে ও এর পূর্বেকার আয়াতে নবী জীবনের মাদানী যুগের শেষের দিককার কিছু দৃশ্য রয়েছে। এ আয়াত দুটো থেকে বুঝা যায় যে, মক্কা বিজয়ের পর মোশরেকদের সাথে মুসলমানদের কিছু শান্তি চুক্তি ছিলো এবং সম্ভবত সেগুলোকে পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে সম্পসারিত করা হয়েছিলো। মোশরেকদের মধ্যে কিছু লোক চুক্তি মেনেও চলতো, আবার কেউ কেউ হয় লংঘন করেছিলো বা করার হাবভাব দেখাচ্ছিলো।'

'আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, আমরা যে আয়াত দুটো নিয়ে আলোচনা করছি, তাফসীরকাররা তার দ্বিতীয়টাকে 'আয়াতুস সায়ফ' নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। তারা মনে করেন যে, এ আয়াত এমন প্রতিটি আয়াতকে রহিত করে, যাতে মোশরেকদের প্রতি নমনীয় ও উদার মনোভাব দেখানোর আদেশ রয়েছে এবং ক্ষমা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে। তাদের মতে এ আয়াতে মোশরেকদের সাথে সর্বাবস্থায় যুদ্ধ করা অপরিহার্য বলা হয়েছে। কেউ কেউ মেয়াদী চুক্তিওয়ালাদেরকে এর ব্যতিক্রম বলে থাকেন এবং মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সময় দেয়ার পক্ষপাতী। আবার অনেকে এই ব্যতিক্রম বলারও পক্ষপাতী নন এবং এ সূরা নাযিল হবার পর তাদের ইসলাম গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই মেনে নেয়া জায়েয মনে করেন না। আমরা সতর্ক করেছি যে, এ অভিমতে বাড়াবাড়ি রয়েছে এবং কোরআনের সেই সব আয়াতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া হয়েছে, যাতে শান্তিপ্রিয়, মৈত্রীকামী ও অহিংস ধরনের মোশরেকদের সাথে যুদ্ধ না করা, ইনসাফ করা ও সদাচার করার কড়া আদেশ দেয়া হয়েছে।

তাফসীরকাররা এ আয়াত প্রসংগে প্রাচীন তাফসীরকারদের বক্তব্য ও বর্ণনার পুনরুল্লেখ করেছেন। যেমন ইবনে কাসীর ইবনে আব্বাসের এই মত উদ্ধৃত করেছেন যে, এ আয়াতে রসূল (স.)-কে চুক্তিবদ্ধ মোশরেকদের ওপর অস্ত্র ধারণে বিরত থাকতে বলা হয়েছে যতোক্ষণ তারা ইসলামে প্রবেশ না করে এবং চুক্তি লংঘন না করে। তাফসীরকার সোলায়মান ইবনে উয়ায়না থেকে একটা বিস্ময়কর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। ওই বক্তব্যে এ আয়াতগুলো ও অন্যান্য এমন কতকগুলো আয়াতকে একত্রিত করা হয়েছে, যা মোশরেকদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত নয়। তিনি বলেন, রসূল (স.) আলী (রা.)-কে হজ্জের দিন এই আয়াতগুলো জনগণকে পড়ে শোনানোর জন্যে পাঠান। এগুলোর মধ্যে এই আয়াতকে মোশরেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আয়াত, ২৯ নং আয়াতকে আহলে কেতাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আয়াত, ৭৩ নং আয়াতকে মোনাফেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আয়াত এবং সূরা হুজুরাতের ৯ নং আয়াতকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সম্বলিত আয়াত (আয়াতুস্ সায়ফ) নামে আখ্যায়িত করা হয়। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, এ আয়াতে চুক্তিবদ্ধ ও অচুক্তিবদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে তাবারী মত প্রকাশ করেছেন। অথচ তিনি সূরা মুমতাহিনার ৮ নং আয়তের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এটা অকাট্য কথা যে, যে কোনো ধর্মের লোকেরা যদি মুসলমানদের প্রতি শান্তিকামী, সদাচারী ও নিরপেক্ষ হয়, তাহলে তাদের সাথে ইনসাফ ও সদ্ব্যবহার করতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেন না। এ ধরনের লোকেরা চুক্তিবদ্ধ নাও হতে পারে।'

'এ আলোচনা, আয়াতের বক্তব্য ও পূর্বাপর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, ওটা কেবলমাত্র চুক্তিভঙ্গকারী মোশরেকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং এ আয়াত 'আয়াতুস সায়ফ' তথা যুদ্ধ ঘোষণা সম্বলিত আয়াত এবং সকল মোশরেককে এর আওতাধীন মনে করা আয়াতের ভাষা ও পূর্বাপর বক্তব্যের সাথে সংগতিশীল নয়। অনুরূপভাবে এ আয়াত দ্বারা 'ইসলামে বল প্রয়োগ নেই, আল্লাহর পথে হেকমত, সদুপদেশ ও উত্তম পন্থায় বিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াত দান এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে না এমন লোকদের সাথে সদাচার ও ইনসাফ করার উৎসাহ সম্বলিত আয়াতগুলো রহিত হয়ে গেছে মনে করাও সংগত নয়। একটু পরে একটা আয়াত আসছে, যাতে সুস্পষ্টভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, চুক্তিবদ্ধ মোশরেকরা যতোক্ষণ চুক্তির অনুগত থাকবে, ততোক্ষণ মুসলমানদেরকেও সে চুক্তি মেনে চলতে হবে। এ আয়াতে আমার অভিমতের সপক্ষে বলিষ্ঠ প্রমাণ রয়েছে।

'এ দুটো আয়াতে বর্ণিত বিধান প্রসংগে দুটো প্রশ্ন জাগে। প্রথমত প্রথম আয়াতটাতে যে ব্যতিক্রমের উল্লেখ রয়েছে, সেটা তো চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। তাহলে এই মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই কি চুক্তিবদ্ধ মোশরেকদের সাথে আল্লাহ ও রসূলের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজেব হয়ে যাবে? তাফসীরকারদের বক্তব্য থেকে মনে হয়, এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে ইতিবাচক। এ ব্যাপারে আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে রসূল (স.)-এর কোনো নির্দেশনা পাইনি। আমার মনে হয়, তাফসীরকারদের অভিমত যদি চুক্তিবদ্ধ ও অচুক্তিবদ্ধ নির্বিশেষে সকলের জন্যে হয়, তাহলে এ মত সঠিক কিনা ভেবে দেখা দরকার এবং বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ চুক্তিবদ্ধ মোশরেকদের চুক্তির আগের অবস্থা দু'রকমের হতে পারে। হয় তারা মুসলমানদের শত্রু ছিলো, তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে এবং তারপর তাদের সাথে মুসলমানদের শান্তি চুক্তি হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কোরায়শ ও রসূল (স.)-এর সাথে তাদের হোদায়বিয়ার সন্ধির উল্লেখ করা যেতে পারে। অথবা তারা মুসলমানদের সাথে শান্তি ও সন্ধি কামনা করতো এবং তাদের মধ্যে কোনো যুদ্ধ বা শত্রুতা বাধেনি। সূরা নিসার ৯০ আয়াতে এ ধরনের অবস্থার একটা বাস্তব চিত্র রয়েছে বলে আমার ধারণা।

সীরাতের গ্রন্থাবলীতে এর কিছু কিছু উদাহরণ রয়েছে। যেমন ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (স.) গোত্রের বনু সাখর শাখার সাথে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন যে, তিনিও তাদের ওপর আগ্রাসন চালাবেন না, তারাও মুসলমানদের ওপর আগ্রাসন চালাবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুকে উস্কে বা লেলিয়ে দেবে না। উভয় পক্ষের মধ্যে এই মর্মে একটা দলীলও লেখা হয়। এ আয়াতে এমন কোনো কথা নেই, যা কোনো পক্ষ আগ্রহী হলে তার সাথে চুক্তি নবায়ন বা চুক্তির মেয়াদ সম্প্রসারণে বাধা দেয়– যখন তাদের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে চুক্তি ভংগ করা হয়নি বা ভংগ করার মনোভাব প্রকাশ পায়নি। এ ধরনের নবায়ন না মেয়াদ সম্প্রসারণকে প্রত্যাখ্যান করার অংগীকারও মুসলমানদের নেই। কেননা মুসলমানদের শুধুমাত্র আক্রমণকারী পক্ষের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, চাই যে ভাবেই আক্রমণ করুক না কেন। পরবর্তী একটি আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাবে মুসলমানদের আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তারা মোশরেকদের সাথে ততোক্ষণ পর্যন্ত চুক্তি বহাল রাখে, যতোক্ষণ তারা তা মেনে চলে। ওই আয়াত দ্বারা আমার বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়।'

দ্বিতীয় প্রশ্নটা দ্বিতীয় আয়াতের শেষাংশে রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, চুক্তি ভংগকারী মোশরেকরা শেরক ত্যাগ করে নামায ও যাকাত কায়েম করা শুরু করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না এবং তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে হবে।

এ প্রশ্নের ব্যাপারে যে বিষয়টা আমার কাছে লক্ষণীয় মনে হয় তা হলো, মোশরেকদের চুক্তি ভংগ করা ও তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হওয়ার পর মোশরেকদের আর নতুন চুক্তির অংগীকার ও বিশ্বস্ততা থাকে না। এ পর্যায়ে মুসলমানরা তাদের ওপর এমন শর্ত আরোপ করার অধিকারী হয়ে যায়, যা তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও গ্যারান্টি দেয়। সেই শর্ত হলো, শেরেক থেকে তাওবা করা, ইসলামে প্রবেশ করা এবং নামায ও যাকাত আদায় করা। এ শর্ত আরোপকে 'ধর্ম গ্রহণে বলপ্রয়োগ' ('ইকরাহ ফিদ্দীন') বলা হবে না। অবশ্য এটা ভিন্ন কথা যে, শেরেক মানবতার অধপতনেরই আরেক নাম। শেরেক মানবতাকে এমন নিকৃষ্ট ধরনের আকীদা বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণার অনুগত করার নাম, যা যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং শেরেক সেই জাহেলী ব্যবস্থার নাম, যা নিপীড়নমূলক রীতিপ্রথা ও ঐতিহ্য, খারাপ আদত অভ্যাস ও চালচলন

এবং ধিক্কারযোগ্য গোষ্ঠী বিদ্বেষের সমষ্টি। পক্ষান্তরে যে ইসলাম তাদের ওপর শর্ত আরোপ করছে তা গ্রহণ করার, তা ওইসব অবাঞ্ছিত জিনিস থেকে মানুষকে মুক্তিদানের নিশ্চয়তা দেয় এবং বুদ্ধি, আকীদা, আমল, চরিত্র ও এবাদাত সব কিছুর দিক দিয়ে মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ মানে উন্নীত করার গ্যারান্টি দেয়। এ সব সত্ত্বেও আয়াতে এমন কোনো নিষেধাজ্ঞা দেখা যায় না, যা চুক্তিভংগকারী মোশরেকদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর নতুন করে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করতে বাধা দেয়, বিশেষত সেটা যদি মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূল হয়। কেননা এই যুদ্ধ অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া ও মোশরেকদেরকে নিরেট শক্তি প্রয়োগ করে বশে আনা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে, ('আত তাফসীরুল হাদীস' থেকে উদ্ধৃতি সমাপ্ত)

উল্লেখিত তাফসীরের উদ্ধৃত এই অংশগুলো এবং ওই তাফসীরের সর্বত্র বিস্তৃত সার্বিক বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, পৃথিবীতে ইসলামের কোনো বিপ্লবী ও অগ্রণী ভূমিকা পালনের অধিকারকে গ্রন্থকার স্বীকার করেন না। যেখানে ইসলামের সাধ্যে কুলায়, সেখানে তার নাগরিকদেরকে আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন ওইাক বা না থাক, মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্তি দেবে এবং তাকে একমাত্র আল্লাহর গোলামে পরিণত করবে ইসলামের এই উন্মুক্ত ও অবাধ অধিকারকে তিনি আমলই দেন না। মূলত এই মতবাদকেই তিনি অবাস্তব মনে করেন। অথচ এই মতবাদের ওপরই ইসলামের জেহাদ নীতির ভিত্তি স্থাপিত। এ মতবাদকে অস্বীকার করার পর আল্লাহর দ্বীনের ও অধিকার আর অবশিষ্ট থাকবে না যে, সে ইসলামী আন্দোলনের পথ থেকে বস্তুগত বাধা দূর করবে। অনুরূপভাবে, সে তার বিভিন্ন পর্যায়ে যথোপযুক্ত উপায় উপকরণ দ্বারা মানব সমাজে বিরাজমান পরিস্থিতির মোকাবেলা করার ব্যাপারে নিজের গুরুত্বও হারিয়ে ফেলবে। কেবল আকীদা ও আদর্শের দাওয়াত দ্বারা বস্তুগত শক্তির মোকাবেলা করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দ্বীনকে বিদ্রূপ করার নামান্তর হবে– যা আল্লাহ তাঁর দ্বীনের জন্যে এই পৃথিবীতে কখনো পছন্দ করেন না(১)

এ উদ্ধৃতি থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, গ্রন্থকার ইসলামের বিপ্লবী মতাদর্শের স্বভাব প্রকৃতির প্রতি মোটেই মনোযোগ দেন না এবং যথোপযুক্ত উপায় উপকরণ দ্বারা সেই মতাদর্শকে গ্রহণ করার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেন না। তাই তিনি জেহাদের চূড়ান্ত বিধানকে পূর্ববর্তী বিধানের সাথে মিলিয়ে একাকার করে ফেলেন। অথচ এ কথা ভেবে দেখেন না যে, পূর্বের আয়াতগুলো যে পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছে, তা ছিলো শেষের আয়াতগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি থেকে একেবারেই ভিন্নতর। তিনি এ সত্যটাও বিবেচনায় আনেন না যে, সর্বশেষ নির্দেশাবলী নাযিল হবার পর পূর্বেকার নির্দেশগুলো রহিত হয়ে যায়নি। বরং একই ধরনের পরিস্থিতি কখনো দেখা দিলে এ সব নির্দেশ তখন প্রযোজ্য হবে। তবে চূড়ান্ত নির্দেশাবলীর উপযোগী পরিস্থিতি দেখা দিলে এবং মুসলমানরা চূড়ান্ত নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে সক্ষম হলে পূর্বেকার নির্দেশাবলী প্রয়োগ করা তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক থাকবে না।

আসলে যে জিনিসটার প্রয়োজন, তা হলো দৃষ্টির প্রশস্ততা ও নমনীয়তা। প্রয়োজন ইসলামী জীবন বিধানের স্বভাব ও মেযাজকে এবং তার বিপ্লবী কর্মধারার স্বভাব প্রকৃতিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা।

এবার আমরা সেই উক্তিগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে চাই, যা দিয়ে পূর্ববর্তী প্যারা শুরু করেছি,

---

(১) নবম পারায় আমরা জেহাদ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি এবং সেখানে ওস্তাদ মওদূদীর 'আল্লাহর পথে জেহাদ' নামক পুস্তক থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি, তা পড়ে দেখার আহ্বান জানাচ্ছি।

'যে ব্যক্তি নবী জীবনের ঘটনাবলী ও তার পটভূমি পর্যালোচনা করবে এবং সেই পটভূমির আলোকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি, তার স্বাভাবিক রূপ, লক্ষ্য ও স্তরসমূহ পর্যালোচনা করবে, সে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে, আরবের সমস্ত মোশরেক ও আহলে কেতাবের সাথে মুসলমানদের এই সম্পর্কচ্ছেদ অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছিলো, এর যথোচিত সময় তখন উপস্থিত হয়েছিলো, গোটা দেশ এবং তার সার্বিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ এর উপযোগী হয়ে গিয়েছিলো এবং এটা সম্পূর্ণরূপে একটা অনিবার্য ও স্বভাবিক পদক্ষেপ ছিলো।'

একের পর এক অর্জিত পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতাগুলো মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র এবং অমুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণকারী চূড়ান্ত ও অনিবার্য আইনের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরেছে। যে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ, একমাত্র প্রভু, একমাত্র অভিভাবক, একমাত্র সার্বভৌম শাসক ও একমাত্র আইন রচয়িতা বলে মেনে নেয়, তার সাথে যে সব জাহেলী সমাজ ও রাষ্ট্র এই সব কিছুকেই আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্যে নিবেদন করে, তাদের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণীত হয় ওই চূড়ান্ত ও অনিবার্য আইন দ্বারা। এই চূড়ান্ত ও অনিবার্য আইন হচ্ছে সূরা হজ্জের ৪০ নং ও সূরা বাকারার ২৫১ আয়াতে বর্ণিত যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন। আয়াত দুটো হলো যথাক্রমে,

'আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে মানুষ দিয়ে প্রতিহত করার ব্যবস্থা যদি গৃহীত না হতো, তাহলে সংসারত্যাগীদের আশ্রম, মন্দির ও মসজিদসমূহ ধ্বংস হয়ে যেতো ....' এবং 'আল্লাহ যদি মানুষকে মানুষ দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবীটা অরাজকতায় ভরে উঠতো।' দুটো সুস্পষ্ট ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এই চূড়ান্ত আইনের ফলাফলগুলো ফুটে উঠেছে,

প্রথম ঘটনাপ্রবাহ হলো ধাপে ধাপে, যুদ্ধের পর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ও পর্যায়ক্রমে পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানের বিস্তার ঘটানো, আল্লাহর বার্তা এক দেশ থেকে আরেক দেশে এবং এক গোত্র থেকে আরেক গোত্রে পৌঁছানোর মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং বিশ্বের সকল মানুষের কাছে পৌঁছানোর পথের সকল বস্তুগত বাধা অপসারণ। এসব কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে এক পর্যায়ে মক্কা বিজিত হয়। আর মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে ইসলামী বিপ্লবের পথের সবচেয়ে বড় বাধা কোরায়শদের প্রতাপ ও পরাক্রম খর্ব হয় এবং কোরায়শদের পরই আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী গোত্র তায়েফের 'সাকীফ' ও 'হাওয়াযেন' আত্মসমর্পণ করে। এভাবে ইসলামের সেই তেজবীর্য ও প্রতাপ পরাক্রম পুনর্বহাল হয়, যা তার শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপে তাকে ইসলামের বিজয় পূর্ণাংগ করার প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম করে, যাতে পরবর্তীতে পরিস্থিতির অনুকূল হওয়া সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে সারা পৃথিবীতে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত করা যায়, কোনো বাধা অবশিষ্ট না থাকে এবং সমস্ত আনুগত্য কেবল আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ঘটনা প্রবাহটা হলো অমুসলিমরা কর্তৃক মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভংগ করা। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সুযোগ পেলেই তারা একের পর এক চুক্তি ভংগ করতো। যখনই তারা সামান্যতম ইংগিত পেতো যে, মুসলমানরা নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে সংকটে আছে, অথবা অন্তত এতোটুকু বুঝতে পারতো যে, চুক্তি ভংগ করলে মুসলমানরা তাদের ওপর কোনো প্রতিশোধ নিতে পারবে না, তখনই চুক্তি ভংগ করতো। আসলে এই চুক্তিগুলো মোশরেক ও ইহুদীরা কখনো আন্তরিকভাবে মুসলমানদের সাথে শান্তিতে একত্রে বসবাস করার উদ্দেশ্যে করেনি, করেছিলো কেবল নিজেদের তাৎক্ষণিক স্বার্থে। তবে দু'একটা ব্যতিক্রমের কথা আলাদা। কেননা জাহেলী

জনগোষ্ঠীগুলোর কাছে দীর্ঘকাল ইসলামকে টিকে থাকতে দেখাই অসহনীয় ছিলো। কারণ ইসলামের অস্তিত্বটাই ছিলো তাদের অস্তিত্বের জন্যে হুমকি স্বরূপ। একে তো ইসলামের প্রতিটি খুঁটিনাটি নিয়মবিধি পর্যন্ত জাহেলী নিয়ম বিধির পরিপন্থী। তদুপরি ইসলাম তাগুতী শক্তির পতন ঘটানো ও সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহর এবাদাত ও আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনাকে নিজের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলো।

এই শেষোক্ত ঘটনা প্রবাহ থেকে অমুসলিমদের যে মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা হলো, তারা মুসলমানদেরকে আদর্শচ্যুত করার ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। সূরা বাকারার ২১৭, ১০৯ ও ১২০ নং আয়াতে আল্লাহ এ কথাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন। যেমন, 'তোমাদের সাথে তারা লড়াই করতেই থাকবে যতোক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে না দিতে পারে,' (২১৭) 'অধিকাংশ আহলে কেতাব নিছক হিংসা বশত তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে পুনরায় কাফের বানাতে চায়। ......' (১০৯)

'তোমার ওপর ইহুদী ও খৃষ্টানরা কখনো খুশী হবে না যতোক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসারী হও।' (১২০) এ সব আয়াতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন যে, ইসলাম ও মুসলমানদের সর্বপ্রকার ক্ষতি ও ধ্বংস সাধন সর্বকালের সকল অমুসলিম গোষ্ঠীর সর্বসম্মত লক্ষ্য।

ইসলামী ও ইসলাম বিরোধী শক্তির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের মূলনীতি ইসলামী ও ইসলাম বিরোধী শক্তির মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়কারী ও নিয়ন্ত্রণকারী ওই অনিবার্য আইনকে না বুঝে ও তা থেকে যুগে যুগে যে রকমারি ফলাফল বেরিয়ে আসে তার বিশ্লেষণ না করে ইসলামের জেহাদ বিধানকে এবং মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কারণগুলোকে বুঝা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে, প্রাচীন যুগের মোজাহেদদের জেহাদী প্রেরণার উৎস, ইসলামী বিজয়াভিযানের রহস্য এবং চৌদ্দশো বছর ব্যাপী ইসলামের বিরুদ্ধে পৌত্তলিক ও খৃষ্টীয় আগ্রাসনের প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব নয়। আজও এ আগ্রাসনের লক্ষ্যবস্তু রয়েছে রাশিয়ায়, চীনে, যুযোশ্লাভিয়ায়, আলবেনিয়ায়, ভারতে, কাশ্মীরে, ইরিত্রিয়ায়, জানজিবারে, সাইপ্রাসে, কেনিয়ায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় ও আমেরিকায় মুসলমান বংশধরেরা। অবশ্য একথা স্বতন্ত্র যে, দুর্ভাগ্যক্রমে এ যুগের এই মুসলিম প্রজন্মগুলো যারা কম্যুনিষ্ট, খৃষ্টান ও পৌত্তলিক শাসনাধীনে বাস করছে ইসলামের প্রকৃত রূপ থেকে বঞ্চিত এবং ইসলামের লেবেল ছাড়া তাদের কাছে কিছুই নেই। এ ছাড়া বিশ্বের যেসব অঞ্চলে ইসলামী পুনর্জাগরণকামী দলগুলো সক্রিয় রয়েছে, তাদের ওপর চলছে পাশবিক অত্যাচার ও নির্মূল অভিযান। আর উল্লিখিত তিনটে অমুসলিম গোষ্ঠীই এ ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা, সাহায্য, পৃষ্ঠপোষকতা, বন্ধুত্ব এবং আর না হোক নীরব সমর্থন অব্যাহত রেখেছে।(১)

ওই আইন ও বিধি মক্কা বিজয়ের পর সূরা তাওবা নাযিল হবার প্রাক্কালে এই দুটো ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। সেটা ছিলো এই যে, আরব উপদ্বীপ থেকে মোশরেক ও আহলে কেতাব নির্বিশেষে সকল অমুসলিম গোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করার চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেয়া অপরিহার্য। সূরার পরবর্তী পর্বে ও তার পরের পর্বে এ বিষয়টার আলোচনা আমরা দেখতে পাবো।

কিন্তু মুসলমানদের নেতাদের কাছে এ বিষয়টা স্পষ্ট হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তা একই মাত্রায় সাধারণ মুসলমানদের কাছেও স্পষ্ট ছিলো। বিশেষত নতুন ও দুর্বল মুসলমানদের কাছে তো নয়ই। আর মোনাফেক ও বর্ণচোরাদের তো প্রশ্নই ওঠে না।

(১) বর্তমান বিশ্বের চারদিকে বিশেষ করে আলজিরিয়া মিশর তুরস্কের ইসলামী আন্দোলনের সাথে এই তিন গোষ্ঠীর আচরণ প্রমাণ করে যে তাফসীরকারকের এই মন্তব্য কতো সত্য, কতো বাস্তব। - সম্পাদক

মুসলিম সমাজে অনেকেই, এমনকি মান্যগণ্য ব্যক্তিরাও সর্বশ্রেণীর মোশরেকদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলো। যারা চুক্তি লংঘন করেছে বা বিশ্বাসঘাতকতা করবে বলে আশংকা করা হয়, তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা এই সব মুসলিম ব্যক্তির কাছে কিছুটা সহনীয় ছিলো। কেননা ইতিপূর্বে সূরা আনফালের ৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'তুমি যদি কোনো গোত্রের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা করো, তাহলে সমভাবে তাদের ওপর চুক্তি ছুঁড়ে মারো।.........' কিন্তু এ ধরনের লোক ছাড়া অন্য সকলের চুক্তি চার মাস পর বা নির্ধারিত মেয়াদের পর বাতিল করা হয়তো তাদের কাছে চুক্তির বরখেলাফ মনে হয়েছে। হয়তো এতে তারা চুক্তিবদ্ধ ও শান্তিপ্রিয় লোকদের প্রতি অন্যায় করা হবে বলে মনে করেছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের পছন্দনীয় কাজটার চেয়েও বড় কিছু চেয়েছিলেন এবং যেখানে গিয়ে চুক্তি শেষ হয়েছে, তার চেয়েও এক কদম সামনে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন।

মুসলিম সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ অনেকেই মনে করতো যে, সমগ্র আরবে ইসলাম বিজয়ী হয়ে যাওয়ার পর সর্ব শ্রেণীর মোশরেকদের সাথে যুদ্ধ করা ও তাদের পেছনে লেগে থাকার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণে চাপ সৃষ্টি করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা মুষ্টিমেয় দুই একটা গোষ্ঠীর ইসলাম গ্রহণ করা বাকী থাকলেও তাদের দ্বারা আর কোনো ক্ষতির আশংকা নেই। বরঞ্চ শান্তি চুক্তি বহাল থাকলে তারা পর্যায়ক্রমে ইসলাম গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়। কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াই যখন তাদের ইসলাম গ্রহণের আশা আছে, তখন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও বিবিধ আর্থ সামাজিক বন্ধনে মুসলমানদের সাথে জড়িত মোশরেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা বাঞ্ছনীয় নয় বলে তারা মনে করতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন ইসলামী সমাজের ভিত্তি শুধুমাত্র ইসলামী আকীদা ও আদর্শের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হোক, সমগ্র আরব উপদ্বীপ শুধুমাত্র ইসলামের জন্যেই নির্দিষ্ট হয়ে যাক এবং শুধুমাত্র ইসলামের নিরাপদ ও বিশ্বস্ত ঘাঁটিতে পরিণত হোক। বিশেষত আল্লাহ তায়ালা জানতেন যে, এ সময়ে সিরিয়ায় রোমকরা ইসলামের বিরুদ্ধে কিভাবে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিলো। সামনে এ বিষয়ে, আলোচনা আসছে।

ইসলামী সমাজের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গসহ অনেকেই আশংকা পোষণ করছিলেন যে, সর্বশ্রেণীর মোশরেকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করলে হজ্জ মওসুমসহ আরবের সর্বত্র অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কে অচলাবস্থা দেখা দেবে এবং সমগ্র অর্থনীতি পংগু হয়ে পড়বে। বিশেষত এ বছরের পর আর কোনো মোশরেক হজ্জ করতে পারবে না এবং কোনো মোশরেক আল্লাহর মসজিদের সেবায়েত থাকতে পারবে না এরূপ ঘোষণা দেয়ার পর অর্থনীতি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশেষ করে তাদের মতে, এ পদক্ষেপের যখন আর প্রয়োজন নেই এবং পর্যায়ক্রমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ কাজ সম্পন্ন করা যখন সম্ভব, তখন আর যুদ্ধের ঝুঁকি না নেয়াই শ্রেয়। কিন্তু আগেই বলেছি যে, আল্লাহ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রকে নির্ভেজাল ইসলামী আকীদা ও আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, মোমেনদের অন্তরের দাঁড়িপাল্লায় ঈমানের মূল্য আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, দুনিয়াবী স্বার্থ ও মোনাফার চেয়ে বেশী হোক। তিনি মোমেনদেরকে শেখাতে চেয়েছিলেন যে, আল্লাহই একমাত্র জীবিকাদাতা এবং জীবিকার বাহ্যিক উপকরণগুলোই একমাত্র উপকরণ নয়। বরং তিনি তাঁর অসীম শক্তি দ্বারা জীবিকার আরো অনেক জীবিকার পথ মোমেনদের করায়ত্ত করে দিতে পারেন।

এ সময়ে মুসলিম সমাজে এমন কিছু দুর্বলচিত্ত, দ্বিধান্বিত, আর্থিক সুবিধালোভী ও মোনাফেক ইত্যাদি লোকও ছিলো, যারা পাইকারি হারে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, কিন্তু তখনো পর্যন্ত

সত্যিকার ইসলামের ছাপ তাদের চরিত্রে পড়েনি। তারা এক যোগে সকল মোশরেকের সাথে লড়াই করতে ভয় পাচ্ছিলো, হজ্জে লোক সমাগম কম হওয়ায় উপার্জন কমে যাবে, ব্যবসায়ে ও পরিবহনে নিরাপত্তার অভাব দেখা দেবে এবং সম্পর্ক ও বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে বলে আশংকা করছিলো। তা ছাড়া জেহাদ করলে জানমালের যে ক্ষয়ক্ষতি হবে, তাতেও ঘাবড়ে যাচ্ছিলো। এতো সব ঝুঁকি কাঁধে নিতে তারা মোটেই উৎসাহ বোধ করছিলো না। কেননা তারা তো বিজয়ী ইসলামে প্রবেশ করেছে, যেখানে কেবল লাভই লাভ তারা দেখেছে এবং মুনাফাই মুনাফা হবে এবং কোনো কষ্টই পোহাতে হবে না বলে তাদের আশা ছিলো। এখন তাদেরকে দিয়ে যে উদ্দেশ্য সাধন করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং যে দায় দায়িত্ব তাদের ওপর চাপানোর কথা ভাবা হচ্ছে, সেটা তাদের মতো নতুন মুসলমানদের ক্ষেত্রে কিভাবে সহনীয় হয়? কিন্তু আল্লাহ তায়ালা খাঁটি ও ভন্ড মুসলমানদেরকে ছাঁটাই বাছাই করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা কি ভেবেছো, তোমরা এমনিতেই বেহেশ্তে চলে যাবে? অথচ তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মোমেনদেরকে ছাড়া আর কাউকে অন্তরংগ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেনি, সেটা আল্লাহ এখনো জেনে নিলেন না!' (তাওবা, আয়াত ১৭)

বিজয়োত্তর জগা খিচুড়ি মুসলিম সমাজে এই সব পরস্পর বিরোধী উপাদানের উপস্থিতিই এই অংশটির এতো দীর্ঘায়িত হওয়া ও এতে এতো বিস্তারিত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ। এই সব রকমারি চরিত্রের লোকদের মনমানসিকতার সাথে সংগতি রেখেই এতে হরেক ধরনের ভাষা ও বর্ণনাভংগি প্রয়োগ করা হয়েছে। মুসলমানদের কাতারে এতো বিভেদ এবং এমনকি কোনো কোনো আন্তরিকতা সম্পন্ন মুসলমানের মনের সন্দেহ সংশয় ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করার উদ্দেশ্যেই সূরার এ অংশটি এতো দীর্ঘ ও বিচিত্র।

আর এ কারণেই সূরার সূচনা হয়েছে এই সর্বজনীন ঘোষণা দ্বারা যে, মোশরেকদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো। আর একটা আয়াতের পরেই একই তেজস্বিতা ও বলিষ্ঠতা নিয়ে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, যাতে কোনো মুসলমানের এরূপ আশা অবশিষ্ট না থাকে যে, যাদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন, তাদের সাথে সে সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে। বলা হয়েছে,

'আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে বৃহত্তম হজ্জের দিনে এই ঘোষণা দেয়া হলো যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল মোশরেকদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখেন না।' (আয়াত ১)

আর এই বলে মোমেনদেরকে সান্ত্বনা ও মোশরেকদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। আর যারা আল্লাহর কথা অমান্য করবে, তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং তাঁর আযাব থেকেও রেহাই পাবে না।

'অতএব তোমরা চার মাস দেশে ঘুরে ফিরে বেড়াও ....' (আয়াত ২)

'যদি তোমরা তাওবা করো, তবে সেটা তোমাদের জন্যে ভালো। আর যদি অমান্য করো, তবে জেনে রাখো যে, তোমরা........... (আয়াত ৩)

আর এসব কারণেই সবিস্ময়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, যারা চুক্তি মেনে চলে, তারা ছাড়া অন্যান্য মোশরেকদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কোনো চুক্তি ও সম্পর্ক কিভাবে থাকে? সেই সাথে মোমেনদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মোশরেকরা একবার তাদের ওপর ক্ষমতা পেলেই কোনো চুক্তির ধার ধারে না এবং কোনো জঘন্যতম কাজও করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এই সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা থাকার কারণে তারা কখনো কখনো তোমাদের প্রতি প্রীতি ও ভালোবাসা প্রকাশ করে থাকে।

'কিভাবে মোশরেকদের জন্যে আল্লাহর কাছে কোনো চুক্তি বহাল থাকতে পারে .... (আয়াত ৭, ৮, ৯ ও ১০)

মুসলমানদের মনে অতীতের তিক্ত স্মৃতি এবং তাদের শত্রু, আল্লাহর শত্রু ও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে তুলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্দীপিত ও তাদের মনকে শান্ত করা হয়েছে।

'তোমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে .... (আয়াত ১৩, ১৪ ও ১৫)

আকীদা ও আদর্শের ভিত্তিতে মুসলমানরা ও কাফেররা যে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা জাতি এবং তাদের সাথে কোনো আত্মীয়তা ও স্বার্থের আবেগকে যে প্রশ্রয় দেয়ার অবকাশ নেই, সে কথাও জোরের সাথে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ সব আত্মীয়তা ও স্বার্থের ওপর আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর পথে জেহাদকে অগ্রাধিকার না দিলে কঠোর আযাবের হুমকি দেয়া হয়েছে।

'হে মোমেনরা, তোমাদের পিতা ও ভাইকে আত্মীয় হিসাবে গ্রহণ করো না– যদি তারা ঈমানের চেয়ে কুফরীকে বেশী ভালোবাসে ....' (আয়াত ২৩ ও ২৪)

এরপর আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে হুনায়সহ বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে যে সাহায্য করেছেন, সে ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। (আয়াত ২৫ ও ২৬)

সবার শেষে তাদেরকে জীবিকার ব্যাপারে আশ্বস্ত করা হয়েছে, যা তারা ব্যবসায়ে অচলাবস্থা ও হজ্জে লোক সমাগম না হওয়ার কারণে আশংকা করছিলো। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, জীবিকা আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল– দৃশ্যমান উপায় উপকরণের ওপর নয়। (আয়াত ২৮ দ্রষ্টব্য)

এ সমস্ত শিক্ষা, ঘোষণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনাজনিত বক্তব্য এবং এ দীর্ঘ বিচিত্র আলোচনা থেকে বিজয়োত্তর মুসলিম সমাজের প্রকৃত অবস্থা এবং তাতে খাঁটি ইসলামী চরিত্র গঠিত হয়নি এমন লোকদের দলে দলে প্রবেশ জনিত সমস্যা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আমরা একাধিকবার বলেছি যে, মদীনার ইসলামী সমাজ যদি দীর্ঘ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থিতি, দৃঢ়তা, পরিপক্কতা ও নিষ্ঠার একটা নির্ভরযোগ্য স্তরে না পৌঁছতো, তাহলে এসব উপসর্গ তার জন্যে মারাত্মক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতো।

মোশরেকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা

সূরার প্রথম পর্বটি নিয়ে সাধারণ আলোচনা এখানেই শেষ করছি। এরপর একে একে আয়াতগুলোর তাফসীরে মনোনিবেশ করছি।

'আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো সেই সব মোশরেকের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছ ....' (আয়াত ১-৬)

এ আয়াতগুলো ও এর পরবর্তী ২৮ নং পর্যন্ত আয়াতগুলো মদীনায় ও আরব উপদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজের সাথে আরব উপদ্বীপের সেই সব মোশরেকের চূড়ান্ত সম্পর্ক নির্ণয় করে, যারা এখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি। তাদের মধ্যে রসূল (স)-এর সাথে চুক্তি সম্পাদন ও পরে লংঘন করেছে এমন মোশরেকরাও ছিলো। এই শ্রেণীর মোশরেকরা চুক্তি লংঘন করেছিলো তখন, যখন মুসলমানরা তাবুকে রোমক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলো। তারা ভেবেছিলো যে, এই যুদ্ধে মুসলমানরা ও তাদের ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে, অথবা কমের পক্ষে তাদের শক্তি ও তেজবীর্য কিছুটা খর্ব হবে। এদের মধ্যে সেই মোশরেকরাও রয়েছে, যাদের সাথে মুসলমানদের

কোনো চুক্তিও ছিলো না এবং তারা মুসলমানদের ইতিপূর্বে কোনো ক্ষতিও করেনি। এদের মধ্যে সেই মোশরেকরাও অন্তর্ভুক্ত, যাদের সাথে মুসলমানদের নির্দিষ্ট মেয়াদের বা অনির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি ছিলো, তারা চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করেনি এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুকে উস্কে বা লেলিয়েও দেয়নি। এই সব শ্রেণীর মোশরেকদের সাথে মুসলমানদের চূড়ান্ত সম্পর্ক কেমন হবে, সেটা স্থির করে দেয়ার জন্যেই এ আয়াতগুলো ও এর পরবর্তী আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। এ বিষয়ে আমি সূরার ভূমিকায় ও সূরার এই অংশের ভূমিকায় কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এ আয়াতগুলোর ভাষা ও বর্ণনাভংগি সর্বজনীন ঘোষণার রূপ ধারণ করেছে। কোরআনের সাধারণ বর্ণনাভংগির সাথে তখনকার এই বিষয়ের বর্ণনাভংগির পূর্ণ সমন্বয় রয়েছে।

এ ঘোষণা কী পরিস্থিতিতে জারী করা হয়েছিলো, কী পদ্ধতিতে তা প্রচার করা হয়েছিলো এবং কে প্রচার করেছিলো, সে সম্পর্কে একাধিক রেওয়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে নির্ভুল ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত হলো ইবনে জারীরের রেওয়ায়াত। তিনি সবগুলো রেওয়ায়াতেরই পর্যালোচনা করেছেন। আমি এখানে তাঁর উদ্ধৃত রেওয়ায়াতটা ও তার পর্যালোচনার যে অংশটা অধিকতর বাস্তবানুগ মনে করি, তা তুলে ধরছি।

মোজাহেদ থেকে বর্ণিত রেওয়াতে তিনি বলেন,

'আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে চুক্তিধারী মোশরেকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো।

'মোজাহেদ বলেন, চুক্তিধারীরা হলো মুদাল্লাজ ও আরব, যাদের সাথে তিনি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং যাদের সাথে তার আগে থেকেই চুক্তি ছিলো। তিনি বলেন, রসূল (স.) তাবুক অভিযান সেরে ফেরার পথে হজ্জ করার ইচ্ছা করলেন। পরক্ষণেই বললেন, কাবা শরীফে মোশরেকরা উলংগ হয়ে তওয়াফ করতে আসবে। এটা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমি হজ্জ করা পছন্দ করি না। তিনি আবু বকর ও আলী (রা.)-কে পাঠালেন। তারা যিলমাজাযে ও অন্য যে সব জায়গায় লোকেরা কেনাবেচা করে, সেখান দিয়ে ও গোটা হজ্জ মওসুম জুড়ে ঘুরে ঘুরে চুক্তিবদ্ধ মোশরেকদের সম্বোধন করে ঘোষণা করলেন যে, পরবর্তী চার মাস অর্থাৎ যিলহজ্জের শেষ বিশ দিন, মুহাররম, সফর, রবিউল আউয়াল সম্পূর্ণ ও রবিউস সানীর দশ তারিখ পর্যন্ত তারা নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবে। এরপর তাদের সাথে কোনো চুক্তি থাকবে না। এরপর ঈমান না আনলে তাদের সাথে যুদ্ধ হবে। এরপর তৎক্ষণাত সবাই ঈমান আনলো। কেউ আর ঘোরাফেরা করলো না।'

সব কটা রেওয়ায়াত পর্যালোচনা করার পর তিনি মেয়াদ সম্পর্কে বলেন,

'চার মাস পৃথিবীতে ঘুরেফিরে বেড়াও।' এই কথাটা বলে আল্লাহ চুক্তিবদ্ধ মোশরেকদের যে অবকাশ দিয়েছেন এবং নিরাপদে ঘোরাফেরা করার অনুমতি দিয়েছেন, সেটা শুধুমাত্র সেই সব চুক্তিবদ্ধ মোশরেকের জন্যে, যারা রসূল (স.)-এর ওপর বাড়াবাড়ি করেছে এবং চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তা লংঘন করেছে। কিন্তু যারা চুক্তি লংঘন করেনি এবং তাঁর ওপর কোনো বাড়াবাড়িও করেনি, তাদের সাথে আল্লাহ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত বহাল রাখতে রসূল (স.)-কে আদেশ দিয়েছেন। এ কথাটা সূরা তাওবার ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

'কিন্তু যে সকল মোশরেকের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে........।'

কেউ কেউ মনে করে যে, সূরা তাওবার ৫ নং আয়াত

'নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর মোশরেকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করো ....' আমাদের বক্তব্যের পরিপন্থী। কেননা এতে নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর প্রত্যেক মোশরেককেই হত্যা করতে মোমেনদের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কেননা পরবর্তী আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করা হয়েছে এবং এই ধারণাকে খন্ডন করা হয়েছে যে, নিষিদ্ধ মাসগুলোর পর চুক্তিবদ্ধ ও অচুক্তিবদ্ধ নির্বিশেষে সকল মোশরেককে হত্যা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যে আয়াত আমাদের বক্তব্য সমর্থন করে ও উক্ত ধারণাকে খন্ডন করে তাহলো,

'আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে মোশরেকদের চুক্তি কিভাবে বহাল থাকে? তবে মাসজিদুল হারামে যাদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছ, তারা যতোক্ষণ চুক্তির ওপর স্থির থাকবে, তোমরাও ততোক্ষণ স্থির থাকো .... ' (আয়াত-৭)

স্পষ্টতই এখানে আল্লাহ তায়ালা মোশরেকদের সাথে কৃত চুক্তিকে বহাল রাখতে আদেশ দিয়েছেন, যতোক্ষণ তারা তা বহাল রাখে, চুক্তি লংঘন না করে এবং কোনো শত্রুকে মুসলমানদের ওপর লেলিয়ে বা উস্কে না দেয়।

'এ ছাড়া রসূল (স.)-এর কাছ থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি যখন আলী (রা.)-কে আল্লাহ তাঁর রসূলের সাথে চুক্তিবদ্ধ মোশরেকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা জানাতে পাঠালেন, তখন তাকে এভাবে ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন, 'যার সাথে রসূল (স.)-এর কোনো চুক্তি আছে, সে চুক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চালু থাকবে।' এ দ্বারা আমাদের বক্তব্য সঠিক বুঝা যায়। আমাদের বক্তব্য হলো, যাদের সাথে রসূল (স.) কোনো মেয়াদী চুক্তি সম্পাদন করেছেন এবং তারা সেই চুক্তির বরখেলাফ কিছু না করে চুক্তি বহাল রেখেছে, তাদের সাথে কৃত সেই চুক্তি বাতিল করতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে আদেশ দেননি। আল্লাহ তায়ালা চার মাসের চরমপত্র দিয়েছেন শুধু তাদেরকে, যারা চরমপত্র দেয়ার আগে চুক্তি লংঘন করেছে, অথবা যাদের সাথে অনির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি ছিলো। যাদের সাথে সুনির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি ছিলো এবং তারা তা লংঘন করেনি, তাদের সাথে রসূল (স.)-কে পুরো মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি মেনে চলার আদেশ দিয়েছেন। এই আদেশ প্রচার করার জন্যেই রসূল (স.) হজ্জের মওসুমে ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন।'

চুক্তিগুলো সংক্রান্ত বিভিন্ন বর্ণনার পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাবারী অন্যত্র বলেন,

'এ সব বর্ণনা ও এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্যান্য বর্ণনা আমাদের বক্তব্যের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে। চার মাসের চরমপত্র কাদের জন্যে ছিলো, সেটা আমি ইতিপূর্বে বলে এসেছি। কিন্তু যাদের সাথে সুনির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি ছিলো, তাদের সেই চুক্তি বাতিল করার কোনো অনুমতি আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে দেননি। রসূল (স.) কার্যতও এ ধরনের চুক্তি তার মেয়াদ সমাপ্তি পর্যন্ত বহাল রেখেছেন। এটাই ছিলো তাঁর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ এবং এটাই কোরআনের সুস্পষ্ট বিধান। রসূল (স.)-এর কাছ থেকে বর্ণিত সমস্ত হাদীসের সার কথাও তাই।'

দুর্বল হাদীসগুলো এবং শীয়া সুন্নী ও উমাইয়া রাজনৈতিক মতভেদের কারণে পরিত্যক্ত হাদীসগুলোকে যখন আমরা পরিত্যাগ করেছি, তখন আমরা এ কথা বলতে পারি যে, রসূল (স.) উলংগ হয়ে তওয়াফকারী মোশরেকদের সাথে হজ্জ করা অপছন্দ করার পর হযরত আবু বকরকে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করে পাঠালেন। এরপর সূরা তাওবার এই কটা প্রাথমিক আয়াত নাযিল হলো। তখন রসূল (স.) হযরত আলীকে হযরত আবু বকরের পিছু পিছু পাঠালেন। তিনি মানুষকে এ আয়াতগুলো পড়ে শোনালেন। এতে সমস্ত চূড়ান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং এ বছরের পর কোনো মোশরেক কাবার তওয়াফ করতে পারবে না এ নির্দেশও ছিলো।

তিরমিযী শরীফের কিতাবুত তাফসীরে বর্ণিত হাদীসে হযরত আলী বলেন,

'সূরা তাওবা নাযিল হবার পর রসূল (স.) আমাকে চারটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ঘোষণা দিতে পাঠালেন। প্রথমত কাবা শরীফে কেউ নগ্ন হয়ে তওয়াফ করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত এ বছরের পর কোনো মোশরেক মাসজিদুল হারামের ধারে-কাছেও আসতে পারবে না। তৃতীয়ত যাদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চুক্তি ছিলো, তাদের সে চুক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চলবে। চতুর্থত ইসলাম গ্রহণ ছাড়া কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না।

এ হাদীসটাই এতদসংক্রান্ত হাদীসগুলোর মধ্যে বিশুদ্ধতম। তাই এ হাদীসটা উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত থাকছি।

'আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ....' (আয়াত-১)

এই সর্বজনীন গুরুগম্ভীর ঘোষণায় তৎকালীন সমগ্র আরব উপদ্বীপে বসবাসকারী মুসলমান ও মোশরেকদের সম্পর্কের সাধারণ মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে। কেননা এখানে যে সমস্ত চুক্তির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো তৎকালীন আরবের মোশরেকদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। মোশরেকদের সাথে আল্লাহ ও রসূলের সম্পর্কচ্ছেদ প্রত্যেক মুসলমানের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেয় এবং প্রত্যেক মুসলমানের ওপর এমন প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে যে, এরপর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও আপোষের অবকাশ রাখে না।

এরপর এই ঘোষণার ব্যাখ্যা নিয়ে আসছে পরবর্তী আয়াত,

'অতএব তোমরা দেশে চার মাস ঘুরেফিরে নাও ......' (আয়াত-২)

এখানে মোশরেকদেরকে আল্লাহ যে অবকাশটুকু দিয়েছেন, তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই অবকাশ হলো চার মাস। এর মধ্যে তারা যেখানে সেখানে যাওয়া ও সফর করা দরকার করবে, ব্যবসা বাণিজ্য করবে, হিসাব নিকাশ চুকাবে, নিজেদের অবস্থায় যা কিছু পরিবর্তন আনতে চায় আনবে, সবই নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে করতে পারবে। এ সময়ের ভেতরে তাদের ওপর কোনো অতর্কিত আদেশ বা শাস্তি আসবে না। এ সুবিধা তারাও ভোগ করবে যারা প্রথম প্রথম এই ভেবে চুক্তির বরখেলাফ কিছু কিছু কাজ করে ফেলেছিলো যে, রসূল তাবুক থেকে আর দেশে ফিরবেন না এবং রোমকরা তাঁদেরকে বন্দী করে নিয়ে যাবে! যেমনটি মদীনায় বসে থাকা মোনাফেক ও গুজব রটনাকারীরা আশা করেছিলো। এটা কখন সংঘটিত হয়েছিলো? চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার অনেক পরে সংঘটিত হয়েছিলো, যখন তা প্রায় তামাদি হয়ে গিয়েছিলো। ইতিমধ্যে মোশরেকদের সাথে যা কিছু অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিলো, তা থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যে, মুসলমানদের আবার পৌত্তলিকতায় ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত তারা লড়াই চালিয়েই যেতে থাকবে। এ অবকাশ ইতিহাসের এমন এক পর্যায়ে দেয়া হয়েছিলো, যখন মানবজাতি জংগলের আইন ছাড়া আর কোনো আইন চিনতো না। বিভিন্ন সমাজের মধ্যে শুধু এই পার্থক্যই দৃষ্টিগোচর হতো যে, কেউ অন্যের ওপর আক্রমণ চালাতে সক্ষম আর কেউ অক্ষম। আর যে সক্ষম সে আক্রমণ চালাতে কোনো পূর্ব হুশিয়ারী দেয়ারও তোয়াক্কা করতো না এবং কোনো চুক্তি বা ওয়াদারও ধার ধারতো না। সুযোগ হলেই আক্রমণ চালাতো। কিন্তু ইসলাম সব সময় নিজের স্বতন্ত্র নীতি অনুসরণ করে চলেছে এবং তা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত একই রকম ছিলো ও আছে। কেননা এটা হচ্ছে আল্লাহর বিধান। তাই এর মূলনীতির সাথে কালের কোনো সম্পর্ক নেই। যুগ বা কাল ইসলামের কোনো পরিবর্তন বা বিকাশ সাধন করে না, বরং ইসলামই যুগে যুগে মানব জাতিকে উন্নত ও বিকশিত করে এবং নিজের প্রভাববলয়ের অভ্যন্তরে ও চার পাশে যা কিছু থাকে তাকে পরিশুদ্ধ করে। ইসলাম নিজের প্রভাব দ্বারা মানব জাতির পরিবর্তনশীল অবস্থাকে প্রভাবিত করে এবং তার উন্নতি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করে।

মোশরেকদেরকে চরমপত্র দিয়ে যে শেষ অবকাশ দেয়া হয়েছে, তা দ্বারা কোরআন তাদের মনকে প্রকৃত সত্যের মুখোমুখি করেছে ও আলোড়িত করেছে। এ দ্বারা তাদের চোখ খুলে সত্যের দিকে তাকাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। সে বলেছে যে, সারা পৃথিবীতে যতোই ঘুরে বেড়াক, আল্লাহকে তারা অক্ষম করে দিতে পারবে না এবং তার পাকড়াও থেকে পালিয়েও কোথাও যেতে পারবে না। আল্লাহর লাঞ্ছনা গঞ্জনা তাদের জন্যে অবধারিত। তা থেকে পালিয়ে তারা যেতে পারবে না।

'জেনে রাখো যে, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ তাদেরকে অপমানিত করবেনই।'

তারা পালিয়ে যাবেই বা কোথায় এবং কিভাবেই বা তাদেরকে হাযির করা থেকে আল্লাহকে ফেরাবে? অথচ তারা তো আল্লাহরই মুঠোর মধ্যে! সমগ্র পৃথিবী ও বিশ্বজগতই তো তাঁর মুঠোর মধ্যে! তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তাঁর অবাধ্যদেরকে তিনি অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেনই। তাঁর সিদ্ধান্তকে ঠেকানোর সাধ্য কারো নেই।

এরপর সেই সময়টার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যখন এই সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া হবে ও মোশরেকদেরকে তা জানানো হবে।

'আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে বড় হজ্জের দিন মানুষকে জানানো হলো যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল মোশরেকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন ....' (আয়াত ৩)

বড় হজ্জের দিন কি আরাফার দিন, না কোরবানীর দিন, তা নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। কোরবানীর দিন হওয়াই বিশুদ্ধতম। ঘোষণাটা হজ্জের সময়ই দেয়া হয়েছিলো। নীতিগতভাবে সকল মোশরেকের সাথেই সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে ব্যতিক্রম হিসাবে মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত বহাল রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে সকল মোশরেকের সাথে নীতিগতভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করার যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট। কেননা ওটা সম্পর্কের সর্বশেষ স্বাভাবিক অবস্থাটা ব্যক্ত করে। ব্যতিক্রম কেবলমাত্র নির্দিষ্ট মেয়াদী চুক্তির ক্ষেত্রে, যা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে। আয়াতটাকে এভাবে বুঝলে তা মুসলিম ও অমুসলিম সমাজের মধ্যকার চূড়ান্ত স্বাভাবিক সম্পর্কের প্রতি ব্যাপকতর ও প্রশস্ততর দৃষ্টি দিতে প্রেরণা যোগায়। এ সূরার এবং এ পর্বের ভূমিকায় আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, যে সমাজ মানুষকে একমাত্র আল্লাহর বান্দা মনে করে এবং যে সমাজ মানুষকে বহু সংখ্যক প্রভুর গোলামে পরিণত করে, সেই দুই সমাজের মধ্যে চূড়ান্ত সম্পর্ক মূলত এ রকমই হয়ে থাকে, যা সূরা তাওবায় বর্ণনা করা হয়েছে।

চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদের অব্যবহিত পর সৎ পথ অবলম্বনে উৎসাহ দান ও অসৎ পথ অবলম্বন থেকে সাবধান করা হয়েছে,

'এরপর যদি তোমরা তাওবা করো, তবে সেটা তোমাদের জন্যে উত্তম, আর যদি পেছনে ফিরে যাও, তাহলে জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে পারবে না ....'

যে আয়াতে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা রয়েছে, সেই আয়াতেই হেদায়াতের উৎসাহ ও গোমরাহী থেকে হুশিয়ারী দান ইসলামী বিধানের আসল স্বভাব প্রকৃতি কি রকম, সে সম্পর্কে আভাস দেয়। ইসলামের আসল ও স্বাভাবিক রূপ হলো অন্য সব কিছুর আগে সে হেদায়াতের বিধান করে। সে মোশরেকদের যে চার মাসের সময় দিয়েছে সেটা শুধু এ জন্যে নয় যে, সে তাদের ওপর অতর্কিতে আঘাত হানতে চায় না, যেমনটি অনৈসলামী জগতের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চালু ছিলো এবং আছে। ইসলাম তাদেরকে এ সময়টা দেয় চিন্তা ভাবনা করা ও নির্ভুল পথ অবলম্বনের

কথা বিচার বিবেচনা করার অবকাশ হিসাবে। সে তাদেরকে শেরেক থেকে তাওবা ও আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে উৎসাহ দেয়, পেছন ফিরে চলে যাওয়া থেকে সাবধান করে, তাতে কোনো লাভ নেই বলে তাকে জানায়। দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও অবমাননা ছাড়াও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়ার হুমকি দেয়, তাদের মনে কম্পন সৃষ্টি করে, যাতে তাদের স্বভাবে যে মরিচা ধরেছে, তা দূর হয়ে যায় এবং তারা হেদায়াতের বাণী শুনতে ও গ্রহণ করতে পারে।

এই সাথে এতে মুসলমানদের জন্যেও সান্ত্বনার বাণী রয়েছে। তাদের মনে যে ভয়ভীতি ও দ্বিধা সংকোচ ছিলো, তা দূর করা হয়েছে। কেননা পুরো ব্যাপারটা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্থির করা হয়েছে ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তাদের চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে, তা তাদের সূচনারও আগে স্থির করা হয়েছে।

যে সব মোশরেকদের সাথে চুক্তির মেয়াদ পূরণ করা অপরিহার্য্য

মোশরেকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের সাধারণ মূলনীতি ঘোষণার পর বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির জন্যে ব্যতিক্রমী নীতি ঘোষণা করা হচ্ছে পরবর্তী আয়াতে,

'তবে যে সমস্ত মোশরেকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছো, কিন্তু তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করেনি এবং কাউকে তোমাদের ওপর উস্কে বা লেলিয়ে দেয়নি, তাদের সাথে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করো ....' (আয়াত ৪)

এ ব্যতিক্রমটা কাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, সে সম্পর্কে বিশুদ্ধতম মত এই হলো বনু বকরের একটি শাখা বনু খোযায়মা ইবনে আমের সম্পর্কে এটা নাযিল হয়েছে। হোদায়বিয়াতে কোরায়শদের সাথে তাদের যে চুক্তি ছিলো, সেটা তারা ভংগ করো না এবং খোযায়া গোত্রের ওপর আক্রমণ চালানোর সময় তারা বনু বকরের সাথে যোগ দেয়নি। এই আক্রমণে বনু বকরকে কোরায়শ সাহায্য করেছিলো। এর ফলে হোদায়বিয়ার চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। হোদায়বিয়ার দু' বছর পর মক্কা বিজয় হয়। অথচ হোদায়বিয়ার চুক্তির মেয়াদ ছিলো দশ বছর। বনু বকরের এ শাখাটা চুক্তিতে অবিচল থাকে। তবে শেরেকেও স্থির থাকে। রসূল (স.)তাদের সাথে তাদের মেয়াদ পূর্ণ করার আদেশ দেন। আমাদের এই অভিমতের পক্ষে যুক্তি এই যে, সুদ্দী বলেছেন, 'এরা হচ্ছে বনু কেনানার দুটো শাখা বনু মাদলাজ ও বনু যামরা।' মোজাহেদ বলেন, বনু মাদলাজ ও খোযায়া গোত্রদ্বয়ের মধ্যে চুক্তি ছিলো এবং আল্লাহ তায়ালা সেই প্রসঙ্গেই বলেছেন যে, 'তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত তা বজায় রাখো।' তবে এখানে বিবেচ্য বিষয় এই যে, খোযায়া গোত্রটা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। অথচ এ আয়াতটা শেরেকের ওপর বহাল থাকা মোশরেকদের সাথে সংশ্লিষ্ট। ৭ম আয়াতে 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে মোশরেকদের চুক্তি কিভাবে থাকে ....' যে কথা বলা হয়েছে, তাও আমাদের এই যুক্তির পক্ষে। বনু কেনানার এই শাখা দুটো হোদায়বিয়ার চুক্তির সময় মাসজিদুল হারামের কাছে বসে চুক্তি সম্পাদন করেছিলো এবং পরে সেই চুক্তি আর ভংগ করেনি এবং মুসলমানদের ওপর আক্রমণে কাউকে প্ররোচনাও দেয়নি। তাই প্রাচীন মোফাসসেররা এই ব্যতিক্রম দ্বারা তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে বলে মনে করেন। অধ্যাপক রশীদ রেযাও এই মত সমর্থন করেন। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইযযত দরুযা বলেন যে, মাসজিদুল হারামের কাছে চুক্তি সম্পাদনকারী বলে যাদেরকে বুঝানো হয়েছে, তারা প্রথম ব্যতিক্রমে উল্লেখিতদের কেউ নয়। তাঁর এ মত পোষণের কারণ এই যে, তিনি স্থায়ীভাবে মুসলমান ও মোশরেকদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন বৈধ বলে মনে করেন। তিনি কোরআনের এই কথাটার ওপর তার মতামতের ভিত্তি রাখেন যে, যতোক্ষণ তারা স্থির থাকবে,

ততোক্ষণ তোমরাও স্থির থাকবে।' এ দ্বারা তিনি চুক্তি সম্পাদনের চিরস্থায়ী বৈধতা প্রমাণ করতে চান। কিন্তু আসলে এটা ইসলামের স্বাভাবিক মূলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এটা ইসলামের স্বাভাবিক বিধির বিপরীত। বিষয়টা আমরা ইতিপূর্বে বারবার উল্লেখ করেছি।

যারা নিজেদের চুক্তি মেনে চলেছে, ইসলামও তাদের সাথে নিজের চুক্তি মেনে চলেছে। তাদেরকে ইসলাম চার মাসের চরমপত্র দেয়নি। যেমনটি অন্যদেরকে চরমপত্র দিয়েছে। এ ধরনের লোকদের সাথে ইসলাম চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করেছে। (হোদায়বিয়ার চুক্তির মেয়াদ ছিলো দশ বছর) কেননা তারা মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির কোনো কিছুই অপূর্ণ রাখেনি। তারা মুসলমানদের ওপর তাদের কোনো শত্রুকেও লেলিয়ে দেয়নি। তাই তাদের সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত চুক্তি মেনে চলা অপরিহার্য ছিলো এবং তা তাদের প্রাপ্যও ছিলো। অথচ ওই সময়ে মুসলমানদের জন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো গোটা আরব উপদ্বীপকে শেরেক থেকে মুক্ত করার। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের ওপারে তার শত্রুরা ইসলামকে তাদের অস্তিত্বের পক্ষে হুমকি মনে করে তার বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করা শুরু করেছিলো। তাবুক যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনায় এ বিষয়টা তুলে ধরা হবে। ইতিপূর্বে মুতার যুদ্ধে রোমকরা এ ধরনের প্ররোচনা দেয়া শুরু করেছিলো। এ ছাড়া দক্ষিণ দিকে ইয়ামানে পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে রোমকরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিলো।

এ পর্যায়ে আল্লামা ইবনুল কাইয়েম যেটা উল্লেখ করেছেন, তাও ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিলো। তিনি লিখেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে ব্যতিক্রমীরূপে উল্লেখ করেছেন এবং যাদের সাথে তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছেন, তারা তাদের মেয়াদ শেষ হবার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। এমনকি অন্য যারা চুক্তি ভংগ করতো এবং যাদেরকে চার মাস ঘুরে-ফিরে বেড়ানোর অনুমতি দেয়া হয়েছিলো, তাদের অনেকেই আর ঘোরাফেরা না করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।

যে আল্লাহ স্বহস্তে ইসলামী আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন, তিনি জানতেন যে, চূড়ান্ত আঘাত হানার সময় এসে গেছে এবং দেশ ও পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে এর উপযুক্ত হয়ে গেছে। বস্তুত কুফরের ওপর এরূপ চূড়ান্ত আঘাত যথা সময়েই এসে থাকে, আল্লাহ সে জন্যে উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করে থাকেন এবং পরিস্থিতি ও পরিবেশের আনুকূল্য দ্বারাই তা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

এভাবেই এ ঘটনাও সংঘটিত হয়েছিলো।

আয়াতের শেষাংশে চুক্তি পূরণকারীদের সাথে চুক্তি পূরণের আদেশ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যে মন্তব্য করেছেন, তা লক্ষণীয়,

'তাদের সাথে তাদের মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূরণ কর। নিশ্চয় আল্লাহকে যারা তাকে ভয় পায়, তাদেরকে ভালোবাসেন।'

এখানে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা ও চুক্তি পূরণকে খোদাভীরুতার সাথে এবং খোদাভীরুদের প্রতি তার ভালোবাসার সাথে যুক্ত করেছেন। অর্থাৎ তিনি ওয়াদাপূরণকে এবাদাত ও তাকওয়া রূপে গণ্য করেছেন এবং এটা তিনি ভালোবাসেন। ইসলামে তাকওয়া হচ্ছে চরিত্র ও নৈতিকতার ভিত্তি। স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদের ভিত্তি নয় এবং পরিভাষা ও প্রচলিত রীতিপ্রথার ভিত্তি নয়। কেননা ওগুলো তো হরহামেশা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। কিন্তু এটা কখনো পরিবর্তিত হয় না। অপরদিকে, আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহর এবাদাত ও তাকওয়ার ভিত্তি। একজন মুসলমান নিজের চরিত্রকে এমনভাবে গড়ে তোলে, যাতে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন ও

তার ওপর সন্তুষ্ট হন। সে তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর সন্তোষ কামনা করে। এ কারণেই ইসলামে নৈতিকতা ও সচ্চরিত্র এতো বড় শক্তি। নৈতিকতা ও সচ্চরিত্র ইসলামের আসল আবেগ উদ্দীপনারও উৎস। এটা মানব সমাজের যাবতীয় কল্যাণ ও মংগল নিশ্চিত করে এবং এমন একটা সমাজ গড়ে তোলে, যাতে কথা ও কাজের বিরোধ সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করে এবং মানুষকে তা আল্লাহর নিকটতর করে দেয়।

চরমপত্রে নির্ধারিত মেয়াদ চার মাস অতিক্রান্ত হলে মুসলমানদের করণীয় কী হবে, পরবর্তী আয়াতে তার উল্লেখ করা হচ্ছে,

'অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিক্রান্ত হবে............' (আয়াত ৫)

এখানে 'নিষিদ্ধ মাসগুলো' কথাটা দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে, তা নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। কারো মতে এটা প্রচলিত নিষিদ্ধ চার মাস– তথা যিলকদ, যিলহজ্জ, মোহাররম ও রজব। এ মত মেনে নিলে প্রকৃত পক্ষে সময় দাঁড়ায় যিলহজ্জের বাকী ২০ দিন ও মোহররম, একুনে ৫০ দিন।

অপর মতানুসারে এ দ্বারা এমন চার মাস বুঝানো হয়, যার শুরু কোরবানীর দিন ১০ই যিলহজ্জ থেকে এবং যাতে বর্তমান ঘোষণা বলে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হয়েছে। এ মেয়াদ সমাপ্ত হয় ২০ রবিউসসানীতে। তৃতীয় একটা মত এই যে, যারা চুক্তি ভংগ করেছে তাদের মেয়াদ প্রথমোক্ত মতানুসারে ৫০ দিন, আর যাদের সাথে কোনো মেয়াদী চুক্তি ছিলো না অথবা আদৌ কোনো চুক্তিই ছিলো না, তাদের মেয়াদ দ্বিতীয় মতানুসারে পূর্ণ চার মাস।

আমার মতে বিশুদ্ধ মত এই যে, এখানে যে নিষিদ্ধ মাসের উল্লেখ করা হয়েছে, তা প্রচলিত পরিভাষার নিষিদ্ধ মাস নয়। এ মাসগুলো নিষিদ্ধ বলার কারণ শুধু এই যে, এই চার মাসে মোশরেকদের আরবের যেখানে ইচ্ছা নিরাপদে ভ্রমণ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। একমাত্র মেয়াদী চুক্তিধারি মোশরেকরা ছাড়া আর সকল মোশরেকের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য এবং

'অতএব তোমরা দেশে চার মাস ভ্রমণ করে নাও' এই ঘোষণা নাযিল হবার দিন থেকেই তার শুরু। ঘোষণার প্রকৃতির সাথে এই মতটাই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই চার মাস উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর সকল মোশরেককে হত্যা করা, বন্দী করা ও নিরাপদ স্থানে লুকালে অবরোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং ওৎ পেতে থেকে তাকে পাহারা দিয়ে কোথাও পালাতে বা চলে যেতে না দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, চাই তাকে যেখানেই পাওয়া যাক না কেন। তার সাথে আর কোনো পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা তাদেরকে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এখন যদি তাদেরকে হত্যা করা হয়, তবে সেটা অতর্কিত হত্যা করা হবে না এবং প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে হত্যা করা হবে না। তাদের চুক্তিগুলো বাতিল করা হয়েছে এবং তাদের জন্যে কী পরিণাম অপেক্ষা করছে, তা তারা আগে থেকেই জানে। তবে মেয়াদী চুক্তিধারীদের কথা ভিন্ন। তাদের সাথে তাদের চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

ইসলামী উদারতার নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত

আয়াতটার শেষাংশ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এটা কোনো প্রতিশোধ অভিযানও নয়, নির্মূলাভিযানও নয়। নচেত একথা বলা হতো না যে,

'যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদেরকে অব্যাহতি দাও। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

ইতিপূর্বে তাদেরকে ২২ বছর ধরে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এতোকাল ধরে তারা দাওয়াতে কর্ণপাত তো দূরের কথা, মোমেনদের উপর ক্রমাগত নির্যাতন করে এসেছে, তাদের ইসলাম থেকে ফেরানোর ষড়যন্ত্র চালিয়ে এসেছে, মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে এসেছে, আর ইসলাম কেবলই তাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করে এসেছে। সে ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। এ সব সত্তেও ইসলাম তাদের প্রতি দু'বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে। হত্যা, নির্যাতন, নিপীড়ন, নির্বাসন, আক্রমণ সব কিছুর পরও মোশরেকেরা তাওবা করলে, ইসলাম গ্রহণ করলে ও ইসলামের বিধানগুলো মেনে চলার মাধ্যমে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিলে আল্লাহ তায়ালা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে মুসলমানদের নিষেধ করছেন। কেননা কোনো তাওবাকারীকে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করেন না। চাই সে যতো গুনাহই করুক না কেন।

'আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।'

তাফসীর ও ফেকাহর বিভিন্ন গ্রন্থে 'যদি তারা তাওবা করে .....' এই উক্তি নিয়ে যে দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছে, আমি সেই বিতর্কে নিজেকে জড়াতে চাই না। এখানে যে তাওবা, নামায ও যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো না করলেই যে কোনো ব্যক্তিকে কাফের গণ্য করা হবে কিনা, কখন কাফের গণ্য করা হবে, ইসলামের অন্য সব করণীয় কাজ না করে কেবল এই তিনটে করলেই তা তাওবার জন্যে যথেষ্ট হবে কিনা, এসব বিতর্কে আমি জড়িত হতে চাই না।

আমার মতে এ আয়াত এসব প্রশ্নের জবাব দিতে আসেনি। এ আয়াত তৎকালীন আরবের মোশরেকদের একটা বাস্তব অবস্থা তুলে ধরেছে। সেদিন কোনো মোশরেক তাওবা, নামায ও যাকাত এ তিনটে কাজ করলেই বুঝা যেতো, সে পুরো ইসলামকে গ্রহণ করেছে এবং পুরোপুরিভাবে ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আয়াতে কেবল তাওবা, নামায ও যাকাতের উল্লেখ এজন্যেই করা হয়েছে যে, সেদিন কোনো মোশরেক পূর্ণাংগ ইসলামকে তার সমস্ত শর্ত ও তাৎপর্য সহকারে গ্রহণ করার উদ্দেশ্য ছাড়া এ কাজগুলো করতো না। তাওবার শুরুতেই ছিলো আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই ও মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসূল— এই সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যের অংগীকার করা।

সুতরাং কোনো ফেকাহশাস্ত্রীয় বিধি বর্ণনা করা এ আয়াতের আসল লক্ষ্য নয়। এ আয়াতের আসল লক্ষ্য একটা নির্দিষ্ট বাস্তবানুগ পদক্ষেপ, যার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র প্রকৃতি রয়েছে।

চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর মোশরেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সত্তেও ইসলামের উদারতা, মহানুভবতা ও বাস্তবানুগতা কিছুমাত্র পরিত্যাগ করেনি। আগেই বলেছি যে, এটা সকল মোশরেকের বিরুদ্ধে নির্মূল অভিযান হিসাবে পরিচালিত হয়নি। এটা আসলে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে একটা হেদায়াতী অভিযান। যে সব মোশরেক জাহেলী সমাজের অনুগত লোক হিসাবে নয়, বরং ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্রের ও সমাজের কাছে আশ্রয় চায়, তবে ইসলাম তাকে ইসলামী রাষ্ট্রে পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে আদেশ দেন যে, তাকে ততোক্ষণ পর্যন্ত আশ্রয় দাও, যতোক্ষণ সে আল্লাহর কালাম ও ইসলামী দাওয়াতের সার কথাটা না শোনে। অতপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পাহারা দিয়ে পৌঁছিয়ে দাও। মোশরেক হওয়া সত্তেও তার সাথে এরূপ আচরণ করতে বলা হয়েছে!

'যদি কোনো মোশরেক তোমার কাছে আশ্রয় চায় ......' (আয়াত ৬)

বস্তুত ইসলাম চায়, প্রত্যেক মানুষের মনে হেদায়াতের আলো প্রবেশ করুক ও সে তাওবা করুক। যে সকল মোশরেক ইসলামী রাষ্ট্রে আশ্রয় ও নিরাপত্তা চায়, তাদেরকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা

দেয়া জরুরী। কেননা এ অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র মোশরেকদের হামলা ও ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ। কাজেই তাদেরকে কোরআন শোনা ও ইসলামের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দেয়াতে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। এতে তাদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা সৃষ্টি হতে পারে। যদি গ্রহণ নাও করে, তবু আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন তাদেরকে এমন কোনো জায়গায় নিরাপদে পৌঁছে দেয়, যেখানে তারা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে।

ইসলামী রাষ্ট্রে মোশরেকদেরকে এরূপ নিরাপদ আশ্রয় দান নিসন্দেহে অত্যন্ত উচুঁ মানের উদারতা ও মহানুভবতা। কিন্তু ইসলামের মহানুভবতার এখানেই শেষ নয়। তার চেয়ে উর্ধের মহানুভবতার একটা নমুনা এই যে, তাকে পাহারা দিয়ে তারই মনোনীত নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু এবং দুই দশক ধরে মুসলমানদের ওপর সীমাহীন নির্যাতন পরিচালনাকারীকে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার বাইরেও পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যতোক্ষণ সে তার নিরাপদ স্থানে না পৌঁছে! এই মহানুভবতার আর কোনো নযীর কোথাও আছে কি?

বস্তুত ইসলাম হচ্ছে হেদায়াতের বিধান, নির্মূল করার বিধান নয়। এভাবে ইসলাম নিজেই নিজের নিরাপদ ভিত্তি তৈরী করে।

যারা ইসলামের জেহাদ নীতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলে যে, এই জেহাদ হলো মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার হাতিয়ার। তাদেরকে ইসলামের মহানুভবতার এই উন্নত নমুনা পর্যবেক্ষণ করার অনুরোধ করি, যা একজন আশ্রয় প্রার্থী মোশরেকের ব্যাপারে দেখানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা ইসলামের জেহাদ নীতি সম্পর্কে ওই ভ্রান্ত ব্যাখ্যা শুনে ভয় পেয়ে যায়, আর সাথে সাথে আত্মরক্ষার ভূমিকায় নেমে গিয়ে বলতে আরম্ভ করে যে, ইসলাম তার দেশের অভ্যন্তরে বসে শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্যে লড়াই করে, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়, তাদেরও এ আয়াত নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা দরকার। এখানে যা বলা হয়েছে, তা এই যে, ইসলাম অজ্ঞ লোকদের জ্ঞান দানের এবং আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দানের বিধান। এমনকি তার সেই সব শত্রুকেও সে জ্ঞান ও আশ্রয় দিতে প্রস্তুত, যারা তার বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করেছে ও অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ চালিয়েছে। তবে ইসলাম সশস্ত্র সংগ্রাম তথা জেহাদ করে শুধু একটা উদ্দেশ্যে। যে সব বস্তুগত ও রাজনৈতিক বাধা মানুষকে আল্লাহর কালাম শুনতে, আল্লাহর নাযিল করা বাণী ও বিধানের জ্ঞান অর্জন করতে, হেদায়াতের দাওয়াত শুনতে, আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করতে এবং আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের আনুগত্য থেকে কার্যকরভাবে ঠেকিয়ে রাখে, সেই সব বাধা গুঁড়িয়ে দেয়া ও দূর করার উদ্দেশ্যে। এ বাধা দূর করার কাজ যখন সম্পন্ন হবে, তখন মানুষ আকীদা বিশ্বাস গ্রহণে ও বর্জনে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইসলাম তখন তাকে শিক্ষা দেবে, ভয় দেখাবে না। তাকে আশ্রয় দেবে, হত্যা করবে না। অতপর তার নিরাপদ জায়গায় নিরাপদে পৌঁছে দেবে। আল্লাহকে অস্বীকার ও অমান্য করা সত্তেও তারা এ রকম ব্যবহার পাবে। এই হচ্ছে ইসলামের জেহাদ। এই হচ্ছে ইসলামের উদারতা।

আজকের পৃথিবীতে এমন হাজারো মানব রচিত মতবাদ ও মতাদর্শ রয়েছে, যার বিরোধিতাকারীদের জীবনের সহায় সম্পদের ও মান সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা নেই। এমনকি কোনো মানবাধিকার পর্যন্ত স্বীকার করা হয় না। এ অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও অনেকের হীনমন্যতা দূর হয় না। ইসলামের বিরুদ্ধে যখনই কেউ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অমনি শুরু হয়ে যায় তাদের তোতলামি এবং আমতা আমতা করে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রাণান্তকর চেষ্টা। যারা অপবাদ আরোপ করে, তাদের হাতে তরবারি ও ট্যাংক আছে বলেই অপবাদ প্রক্ষালণের এই হাস্যকর প্রচেষ্টা।

মোশরেকদের সাথে মুসলমানদের স্থায়ী সন্ধি অসম্ভব

এবার পরবর্তী ৬টা আয়াত নিয়ে আলোচনা করছি।

'আল্লাহ ও তার রসূলের কাছে মোশরেকদের কোনো চুক্তি কিভাবে থাকতে পারে? তবে মাসজিদুল হারামের কাছে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ, তাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা যতোক্ষণ তোমাদের জন্যে অবিচল থাকে, তোমরাও ততোক্ষণ তাদের জন্যে অবিচল থাক. ......' (আয়াত ৭-১২)

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে আরব উপদ্বীপের মুসলমানদের সাথে অবশিষ্ট মোশরেকদের সম্পর্কের ব্যাপারে চূড়ান্ত নির্দেশাবলী দেয়া হয়েছে। তাদের সকলের সাথে সব রকমের সম্পর্কের অবসান ঘটানোই এসব নির্দেশের সারকথা। চাই সে সম্পর্ক চুক্তি সম্পাদনজনিত হোক অথবা চুক্তি বহির্ভূত সাধারণ নমনীয় ও সৌজন্যেমূলক সম্পর্ক হোক। যাদের সাথে চুক্তি ছিলো না, তাদের চার মাস পর এবং যাদের সাথে চুক্তি ছিলো তাদের সাথে চুক্তিতে উল্লেখিত মেয়াদের পর সম্পর্কচ্ছেদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব নির্দেশের পর দুটো অবস্থার উদ্ভব হবে। মোশরেকদেরকে হয় শেরেক থেকে তাওবা করতে হবে, নামায কায়েম করতে হবে ও যাকাত দিতে হবে, অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামের সমস্ত ফরয কাজগুলো পালন করতে হবে। নচেত হত্যা, অবরোধ, বন্দীত্ব ও সার্বক্ষণিক তদারকীর শিকার হতে হবে।

এভাবে চুক্তি ভিত্তিক সম্পর্কের অবসান ঘটানোর নির্দেশ দেয়ার পর আলোচ্য আয়াতগুলোতে প্রশ্নের মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে মোশরেকদের কোনো চুক্তি থাকুক এটা সমীচীনও নয়, বৈধও নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। 'কিভাবে থাকতে পারে ....' এরূপ প্রশ্ন তুলে বলার মাধ্যমে বিষয়টাকে নীতিগতভাবেই এবং মৌলিকভাবেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।'

যেহেতু সূরার দ্বিতীয় অংশে চুক্তির প্রতি এই প্রত্যাখ্যান বিদ্যমান থাকায় এরূপ ধারণা হতে পারে যে, প্রথমাংশে চুক্তির প্রতি অনুগত ও অলংঘনকারী চুক্তিবদ্ধ মোশরেকদের চুক্তি মেয়াদ পর্যন্ত বহাল রাখার যে অনুমতি দেয়া হয়েছে তা হয়তো বা রহিত হয়ে গেছে, তাই এই বিধিটার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এভাবে, 'কিন্তু যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল হারামের কাছে বসে চুক্তি সম্পাদন করেছো, তারা যতোক্ষণ চুক্তির ওপর অবিচল থাকবে, ততোক্ষণ তোমরাও অবিচল থাকো .....' নতুন করে এই বিধিটার উল্লেখ দ্বারা বিষয়টাকে আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। কেননা ইতিপূর্বে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাতে শুধু অতীতে যারা চুক্তি লংঘন করেনি, তাদেরকে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত চুক্তি মেনে চলার জন্যে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে আদেশটা এমনভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে চুক্তি পালনকে মোশরেকদের শুধু অতীতের নয়, বরং ভবিষ্যতেরও চুক্তি পালনের ওপর নির্ভরশীল করে দেয়া হয়েছে। এভাবে অমুসলমানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক রক্ষার বিধি বর্ণনা করার জন্যে দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে।

সূরার ভূমিকায় এবং বর্তমান পর্বের ভূমিকায় আমরা বলে এসেছি যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে এই চরম পদক্ষেপের ব্যাপারে মুসলমানদের মনে নানা রকমের দ্বিধা সংকোচ ও ভীতি বিরাজ করছিলো। সেই দ্বিধা সংকোচ ও ভীতি দূর করার জন্যে এ পর্বের শেষের দিকে আলোচনা করা হয়েছে মুসলমানদের প্রতি মোশরেকরা কতো নিষ্ঠুর ও নির্মম। বলা হয়েছে যে, মোশরেকরা যখন সুযোগ পায়, তখন তোমাদের ব্যাপারে আর কোনো চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির তোয়াক্কা করে না। কোনো দ্বিধা-সংকোচ বোধ করে না এবং ক্ষমতা হাতে পেলে বাড়াবাড়ি করতে মোটেই কসুর করে

না। তাই মুসলমানরা যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারাও তা গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাদের প্রতি যথার্থ আস্থা, বিশ্বাস ও নমনীয়তা পোষণ করার কোনো উপায় নেই।

এবার বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আসা যাক।

'আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে মোশরেকদের কোনো চুক্তি কিভাবে থাকতে পারে?'

মোশরেকরা এককভাবে ও নিরংকুশভাবে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করে না এবং তাঁর রসূলের রেসালাতকেও স্বীকার করে না। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে তাদের চুক্তির মর্যাদা কিভাবে সুরক্ষিত থাকবে? তারা তো তাদের মতো কোনো বান্দাকে বা কোনো বান্দার রচিত বিধানকে প্রত্যাখ্যান করছে না। তারা প্রত্যাখ্যান করছে খোদ তাদের সৃষ্টিকর্তা ও জীবিকাদাতাকে। প্রথম থেকেই তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কঠিন বিরোধিতা করে আসছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রসূল কিভাবে তাদের চুক্তিকে রক্ষা করবেন?

এভাবে প্রশ্নের মাধ্যমেই বিষয়টা তুলে ধরা হয়েছে। বিষয়টা কোনো চুক্তির কোনো বিশেষ অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং নীতিগতভাবে তাদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদৌ কোনো চুক্তি থাকতে পারে কিনা এটাই প্রশ্নের আকারে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ নীতিগত ভাবেই কোনো চুক্তি থাকতে পারে না এবং থাকা সমীচীন নয়।

এখানে কিছু প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। প্রশ্ন জাগতে পারে যে, অতীতে তো তাদের সাথে বাস্তবিক পক্ষেই চুক্তি ছিলো। এ সমস্ত চুক্তির মধ্যে কোনো কোনোটা এমনও ছিলো যে, স্বয়ং আল্লাহ তা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মোশরেক ও ইহুদীদের সাথে একাধিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। স্বয়ং হোদায়বিয়ার চুক্তি তো ৬ষ্ঠ হিজরীতে সম্পাদিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরাসমূহে এসব চুক্তিকে অনুমোদনও করা হয়েছে। এমতাবস্থায় সূরার এই অংশটিতে যদি মোশরেকদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের নীতিটাকেই মৌলিকভাবে অবাঞ্ছিত গণ্য করা হয়, তাহলে ওই সব চুক্তি অনুমোদন করা হলো ও তা টিকে থাকলো কিভাবে? ওগুলো ছিলো বলেই তো সর্বশেষে চুক্তি সম্পাদনের নীতিকে অবাঞ্ছিত গণ্য করা হলো।

আমরা সূরা তাওবা ও সূরা আনফালের ভূমিকায় ইসলামী আন্দোলন ও বিপ্লবের মূলতত্ত্ব নিয়ে যে আলোচনা করেছি, সেই আলোচনার আলোকে এই মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করলে এ প্রশ্নটা ওঠে না। কেননা ওই চুক্তিগুলো ছিলো উপযুক্ত উপায় উপকরণ দ্বারা বাস্তব সমস্যাবলীর তাৎক্ষণিক সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত সাময়িক পদক্ষেপ মাত্র। নচেত চূড়ান্ত নীতিগত, আদর্শগত ফায়সালা হলো, মোশরেকদের সাথে কোনো চুক্তি আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যই হলো, আল্লাহর যমীন থেকে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করার ধারণাকে সমূলে উৎখাত করা ও এক আল্লাহর সর্বাত্মক ও পরিপূর্ণ আনুগত্য ও দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আন্দোলনের এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার দীর্ঘ যাত্রা পথে কিছু কিছু সাময়িক ও অস্থায়ী বিধি মেনে চলার প্রয়োজন হয়ে থাকে। আর সেই প্রয়োজন পূরণের জন্যেই ওইসব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ইসলাম প্রথম দিন থেকেই তার মূল লক্ষ্য ঘোষণা করেছে এবং এ ব্যাপারে কাউকে কখনো প্রতারিত করেনি। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কখনো কখনো দাবী জানিয়েছে যে, আক্রমণাত্মক ও আগ্রাসী মোশরেকদের প্রতিহত করার জন্যে শান্তিকামী ও আপোষকামী মোশরেকদের সাথে সংঘর্ষ পরিহার করা হোক। যারা কোনো এক পর্যায়ে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদে, মুসলমানদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চায় এবং চুক্তিভিত্তিক নিরাপত্তা বিনিময় করতে চায়, তাদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করা ও চুক্তি সম্পাদন করা হোক। এতদসত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলন কখনো তার চূড়ান্ত

লক্ষ্যকে ভোলেনি। সে এটাও ভোলেনি যে, এই সব চুক্তি খোদ মোশরেকরাও নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যেই সম্পাদন করেছে। সুতরাং তারা যে একদিন না একদিন ইসলামের ওপর আক্রমণ চালাবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কারণ তারা নিজেরাও ইসলামের দিক থেকে চিরদিনের জন্যে নিরাপত্তা পায়নি। কেননা ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য কী, তা তারা জানে। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে শুরু থেকেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'তারা (মোশরেকেরা) অনবরতই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে থাকবে, যতোক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত, যদি সম্ভব হয়।' বস্তুত এটা একটা চিরন্তন সত্য, কোনো নির্দিষ্ট সময়, কাল, পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সর্বকালে ও সর্বত্রই এই অবস্থা চলতে থাকবে।

তাই নীতিগতভাবে মূল বিষয়টা অর্থাৎ মোশরেকদের সাথে চুক্তি সম্পাদনকে অপছন্দ করা সত্তেও আল্লাহ তায়ালা সেই সব মোশরেকের সাথে মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত চুক্তি মেনে চলতে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন, যারা মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করেনি এবং কোনো উস্কানি বা উত্তেজনা সৃষ্টি করেনি। মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই চুক্তিপালন মোশরেকদের পক্ষ থেকে চুক্তি পালনের শর্তে সর্বদাই আবদ্ধ থাকবে।

'তবে যাদের সাথে তোমরা মাসজিদুল হারামের কাছে বসে চুক্তি সম্পাদন করেছ, তাদের কথা আলাদা ....'

এখানে মাসজিদুল হারামের কাছে চুক্তি সম্পাদনকারী যে গোষ্ঠীটার উল্লেখ করা হয়েছে, তারাও অবিকল সেই একই গোষ্ঠী, যাদের কথা ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তবে তোমরা যে সব মোশরেকের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছ, অতপর তারা তোমাদের ক্ষতিও করেনি, তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে লেলিয়েও দেয়নি। তাদের সাথে তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত চুক্তি পালন কর।'

অবশ্য কিছু কিছু মোফাসসের মনে করেছেন, এরা দুটো আলাদা গোষ্ঠী। আসলে এ দুটো আয়াতে একই গোষ্ঠীর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমবারে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপকতা ও সর্বজনীনতার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং এই ব্যাপকতা থেকে এই গোষ্ঠীর ব্যতিক্রম ঘটানোর জন্যে। দ্বিতীয় বার উল্লেখ করা হয়েছে মোশরেকদের সাথে আদৌ কোনো চুক্তিই নীতিগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এই ধারণা দানের উদ্দেশ্যে। এখানে এই চুক্তিবদ্ধ মোশরেকদের ব্যতিক্রমের উল্লেখ করতে হয়েছে, যাতে এমন ধারণা না জন্মে যে, ইতিপূর্বে তাদের চুক্তি বহাল রাখার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তা রহিত হয়ে গেছে। উভয় জায়গায় 'আল্লাহ মোত্তাকীদেরকে ভালোবাসেন', এ কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে বুঝা যায় যে, উভয় জায়গার আলোচ্য বিষয় এক ও অভিন্ন। তা ছাড়া শেষোক্ত উক্তি (৭ নং আয়াতের শেষাংশ) প্রথমোক্ত উক্তির (৪ নং আয়াত) পরিপূরক। প্রথমটায় অতীতে তাদের চুক্তির ওপর অবিচলতা এবং দ্বিতীয়টায় ভবিষ্যতে চুক্তির ওপর অবিচলতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি যে, এখানে খুবই সূক্ষ্ম, দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। কেবলমাত্র উভয় উক্তিকে একই বিষয়ের ওপর যুক্তভাবে বিবেচনা করলেই যে এর সূক্ষ্মতা লক্ষ্য করা যায়, তা সুস্পষ্ট।

মোশরেকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে নিষেধাজ্ঞার কারণ

পরবর্তী ক'টা আয়াতে পুনরায় মোশরেকদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের নীতির প্রতি অপছন্দ ও অপ্রীতি প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সাথে বর্ণনা করা হয়েছে এই অপ্রীতির আদর্শিক, বিশ্বাসগত, বাস্তব ও ঐতিহাসিক কারণগুলোও। এ কারণগুলো ৮, ৯ ও ১০ নং আয়াতে লক্ষণীয়।

'কিভাবে? (তাদের সাথে চুক্তি পছন্দনীয় হতে পারে?) অথচ তারা তোমাদের ওপর জয়ী হলে তোমাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তা ও অংগীকারের মর্যাদা দেয় না। ....'

এ তিনটে আয়াতের বক্তব্য এরূপ,

মোশরেকদের জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে কোনো চুক্তি কিভাবে গ্রহণযোগ্য ও বাঞ্ছিত হতে পারে? অথচ তারা তোমাদের ওপর বিজয় লাভে অক্ষম হওয়া ছাড়া কখনো তোমাদের সাথে চুক্তি করে না। আর যদি তোমাদের ওপর বিজয়ী হয়, তাহলে তোমাদের সাথে আগে থেকে বিদ্যমান কোনো চুক্তি বা দায় দায়িত্বের তোয়াক্কা না করেই যা ইচ্ছে তাই করে। তোমাদের সাথে কোনো খারাপ আচরণ করতে তারা কিছুমাত্র সংকোচ ও কুণ্ঠাবোধ করে না। কোনো প্রতিশ্রুতিরও ধার ধারে না। তোমাদের ওপর যুলুম নির্যাতন চালাতে গিয়ে তারা কোনো সীমার ভেতরেও থাকে না। এমনকি চলমান পরিবেশে যে সব সীমা মেনে চলা হয় এবং যা লংঘন করা হলে তারা নিজেরাও তার নিন্দা করে, তাও তারা তোমাদের ক্ষেত্রে মানে না। তোমাদের প্রতি তারা এত বিদ্বেষ পোষণ করে যে, তোমাদের ওপর ক্ষমতা ও আধিপত্য পেয়ে গেলে তোমাদেরকে যুলুম নির্যাতন করতে গিয়ে সকল সীমা লংঘন করে– তা তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে যতো চুক্তিই থাক না কেন। তোমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি থাকলেই তারা তোমাদের সাথে কোনো খারাপ আচরণ থেকে বিরত থাকে না। বিরত থাকে শুধু তখনই, যখন তোমাদের ওপর ক্ষমতা, আধিপত্য ও বিজয় লাভে অসমর্থ হয়। আজ তোমরা শক্তিশালী বিধায় ওরা নানা রকম মিষ্টি কথা বলে ও চুক্তি মেনে চলার প্রদর্শনী করে তোমাদেরকে খুশী করে বটে। কিন্তু আসলে তাদের মন তোমাদের প্রতি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ এবং কোনো চুক্তি মেনে চলতে চায় না। কারণ তোমাদের প্রতি তাদের না আছে কোনো ভালোবাসা, না আছে কোনো অংগীকার পালনের ইচ্ছা।

'তাদের অধিকাংশ পাপাচারী। তারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে স্বল্প মূল্যে বেচে দেয়। এভাবে তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। তারা যা করে তা বড়ই নিকৃষ্ট।'

বস্তুত এটাই তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের লুকানো বিদ্বেষ, তোমাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি পালন না করার গোপন ইচ্ছা এবং সাধ্যে কুলালে কোনো কুণ্ঠাবোধ ও সংকোচবোধ ছাড়াই তোমাদেরকে অপছন্দ করার ইচ্ছা পোষণের আসল কারণ। এর কারণটা হলো, আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে তাদের ঘোরতর বিদ্রোহ, অবাধ্যতা ও পাপপ্রবণতা এবং তাঁর হেদায়াত থেকে পালানো। আল্লাহর যে সব আয়াত তাদের কাছে এসেছিলো, তার ওপর তারা দুনিয়ার তুচ্ছ স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতো। এগুলোকে আঁকড়ে ধরতো এবং এগুলোকে হারানোর ভয়ে ভীত থাকতো। তারা শংকিত থাকতো যে, ইসলাম তাদের কিছু স্বার্থ নষ্ট করে দিতে পারে অথবা তার জন্যে কিছু সম্পদ ব্যয় করতে বাধ্য করতে পারে। এ জন্যেই তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফেরাতো। কেননা তারা আল্লাহর আয়াতগুলোর পরিবর্তে ওই সব তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থ খরিদ করতো। ইসলাম থেকে তারা নিজেদেরকেও ফেরাতো, অন্যদেরকেও ফেরাতো।

(পরবর্তী এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা কুফরের নেতা।) তাদের এ কাজ আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত জঘন্য। 'তারা যা করে, তা খুবই নিকৃষ্ট।'

তারা শুধু তোমাদের জন্যে এ বিদ্বেষ পোষণ করে না এবং শুধু তোমাদের সাথে ওই ঘৃণ্য আচরণ করে না, বরং প্রত্যেক মোমেনের প্রতি তারা বিদ্বেষ পোষণ করে এবং প্রত্যেক মুসলমানের সাথে অসদাচরণ করে।

তাদের বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা তোমাদের ঈমানের বিরুদ্ধে, সর্বকালের নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরই তারা কট্টর দুশমন। ফেরাউন যখন ঈমান আনয়নকারী জাদুকরদেরকে কঠোরতম শাস্তি ও নির্যাতনের হুমকি দিয়েছিলো, তখন তারা বলেছিলো, 'তুমি আমাদের প্রতি ক্ষিপ্ত শুধু এজন্যে যে,

আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতগুলোর প্রতি ঈমান এনেছি।' অনুরূপভাবে, রসূল (স.) আহলে কেতাবকে আল্লাহর নির্দেশক্রমে বলেছিলেন,' হে আহলে কেতাব, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি- এ ছাড়া আমাদের ওপর তোমাদের ক্ষিপ্ত হবার আর কোনো কারণ আছে কি?' পরিখা খনন করে যারা মোমেনদেরকে পুড়িয়ে মেরেছিলো, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা মোমেনদের প্রতি কেবল এ কারণেই রুষ্ট ছিলো যে, তারা মহা পরাক্রান্ত পরম প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিলো।' বস্তুত ঈমানই আল্লাহদ্রোহীদের রোষ ও অসন্তোষের কারণ। এ জন্যে তারা প্রত্যেক মোমেনের ওপরই বিদ্বেষ পোষণ করে, তার সাথে সম্পাদিত কোনো চুক্তির পরোয়া করে না এবং তাদের সাথে কোনো খারাপ আচরণকে নিন্দনীয় মনে করে না।

'কোনো মোমেনের ব্যাপারে তারা কোনো অংগীকার বা আত্মীয়তার পরোয়া করে না। তারাই সীমা অতিক্রমকারী।'

বস্তুত সীমা লংঘনই হলো তাদের আসল বৈশিষ্ট্য। ঈমানকে ঘৃণা করা ও তা থেকে দূরে সরে থাকা থেকে এর শুরু। আর তার প্রতিরোধ করা, মোমেনদের ওপর নিপীড়ন চালানো এবং তাদের সাথে বিদ্যমান কোনো চুক্তি বা সম্পর্কের পরোয়া না করার মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি। অবশ্য তারা যখন মুসলমানদের ওপর বিজয়ী হয় এবং তাদের শক্তি ও প্রতাপ থেকে নিরাপদ হয়, তখনই তাদের মধ্যে নির্যাতনের স্পর্ধা জন্মে, তখনই তারা তাদের সাথে যা ইচ্ছে তাই করে। তারা কোনো চুক্তি বা সম্পর্কের পরোয়া করে না এবং কোনো অপকর্মেই তারা সংকোচ বোধ করে না।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেন কিভাবে তিনি মোশরেকদের এই অবস্থার প্রতিকার করেন।

'এরপর যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। ....' (আয়াত ১১ ও ১২)

মুসলমানরা চরম অহিতাকাংখী শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ সব শত্রু মুসলমানদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালানো থেকে বিরত থাকে কেবল তা করতে যখন অক্ষম হয় তখন। কোনো চুক্তি, কোনো দায়িত্ববোধ, কোনো আত্মীয়তা এবং কোনো নিন্দা সমালোচনার ভয় তাদেরকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। এই বিবরণের বাইরেও বাস্তব পরিস্থিতির রয়েছে লম্বা ইতিহাস। সে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মোশরেকদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তাদের আসল চরিত্র। এর ব্যতিক্রম কখনো হলে তা হয়ে থাকে ক্ষণস্থায়ী। পরে তারা আবার আসল চরিত্রে ফিরে যায়।

কাফেরদের এই বাস্তব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তার এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের সাথে আল্লাহর রচিত বিধান ও জাহেলী বিধানের মাঝে অনিবার্য সংঘাতের বিষয়টা মিলিয়ে দেখলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি নযরে পড়ে, ইসলাম সেই পরিস্থিতিকে আল্লাহর নির্দেশে কিভাবে মোকাবেলা করে, সেটাই বলা হয়েছে, ১১, ১২ নং আয়াতে। যদি তারা তাওবা করে .....'

অর্থাৎ মুসলমানরা যে আদর্শকে মনে প্রাণে-গ্রহণ করেছে, তা যদি তারাও মনে-প্রাণে গ্রহণ করে এবং অতীতের শেরেক ও আগ্রাসী নীতি থেকে তাওবা করে, তাহলেই ইসলাম ও মুসলমানরা তাদের অতীতের সমস্ত যুলুম নিপীড়ন ক্ষমা করে দেবে, নিরেট আকীদা ও আদর্শের ভিত্তিতে মুসলমানদের সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠবে, নতুন মুসলমানরা পুরানো মুসলমানদের ভাই হয়ে যাবে এবং তাদের অতীতের সমস্ত অপকর্ম বাস্তবেও বিলুপ্ত হয়ে যাবে, মুসলমানদের অন্তর থেকেও তার তিক্ত স্মৃতি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে।

'যারা জ্ঞানী তাদের জন্যে আমি আয়াতগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করি।'

কেননা এসব বিধান, তার তাৎপর্য ও উপকারিতা কেবলমাত্র জ্ঞানীরাই উপলব্ধি করতে পারে। আর জ্ঞানীরা বলতে মোমেনদেরকেই বুঝায়।

পক্ষান্তরে তারা যদি শপথযুক্ত অংগীকার করেও ভংগ করে এবং মুসলমানদের ধর্মের ওপর আঘাত হানে, তাহলে তারা কুফরের নেতা হিসাবে চিহ্নিত হবে। তখন তাদের কোনো অংগীকার ও শপথ বিশ্বাসযোগ্য হবে না। তখন মোমেন ও মোশরেকদের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। এতে হয়তো তারা হেদায়াতের দিকে ধাবিত হবে। আমরা আগেই বলেছি যে, মুসলমানদের শক্তি ও জেহাদে তাদের বিজয় অনেক কাফেরের মনকে হেদায়াতের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে থাকে এবং তাকে বিজয়ী সত্যকে উপলব্ধি করতে ও স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। তারা তখন বুঝতে পারে যে, ইসলাম সত্য বলেই বিজয়ী হয়েছে, তার পেছনে আল্লাহর শক্তি সক্রিয় রয়েছে এবং রসূল (স.)-এর এ উক্তি অকাট্য সত্য যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেন। এই বুঝ অর্জিত হওয়ার কারণে অনেকেই তাওবা ও হেদায়াতের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে, বাধ্যবাধকতা ও জোরজবরদস্তির কারণে নয়। কেননা সত্যকে সুস্পষ্টভাবে বিজয়ী হতে দেখে মনটাই উদ্বুদ্ধ হয়ে গিয়ে থাকে এবং হয়েছিলো।

মোশরেকদের হাতে মুসলিম নিধনের নিষ্ঠুর ইতিহাস

এবার আসুন, আমরা বিবেচনা করি, এই আয়াতগুলোর কার্যকারিতার পরিবেশগত ও ঐতিহাসিক সীমা কী? এটা কি শুধু সেই আমলের আরবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, না স্থান-কাল নির্বিশেষে সর্বক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে?

একথা সত্য যে, এসব আয়াত তৎকালীন আরবের মুসলমান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে যে বাস্তব অবস্থা বিরাজ করছিলো, তা নিয়েই আলোচনা করেছে। এসব আয়াতে যে বিধিমালা সন্নিবেশিত হয়েছে, তার লক্ষ্যও এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করা এবং আরবের মোশরেকরাই এর মূল প্রতিপাদ্য। নিসন্দেহে এ কথা সত্য। কিন্তু তাই বলে এসব আয়াতের চূড়ান্ত প্রয়োগ ক্ষেত্র কি এটাই এবং এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদেরকে মোশরেকদের নীতি ও ভূমিকা পর্যালোচনা করতে হবে। দেখতে হবে সমগ্র ইতিহাস জুড়ে মোমেনদের সাথে তার কেমন আচরণ ও ভূমিকা ছিলো। তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এ আয়াতগুলোর প্রকৃত প্রয়োগক্ষেত্র কতোদূর বিস্তৃত। দেখতে পাবো গোটা ইতিহাস জুড়ে তাদের পরিপূর্ণ ভূমিকা ও নীতি।

আরব উপদ্বীপে মোশরেকদের নীতি ও ভূমিকা কী ছিলো, সেটা সীরাত বিষয়ক গ্রন্থাবলী থেকে জানা যাবে। তাছাড়া ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে মক্কায় দাওয়াতের সূচনা থেকে এই সূরা নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত মোশরেকদের আচরণ কেমন ছিলো, বোধ করি তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের এই খন্ডই তা জানার জন্যে যথেষ্ট।

একথা যদিও সত্য যে, ইসলামের সাথে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সংঘাত যতো দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিলো, মোশরেকদের সাথে ততোটা হয়নি, তথাপি এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুসলমানদের সাথে মোশরেকদের আচরণ চিরদিনই ৮, ৯ ও ১০নং আয়াতে যা বলা হয়েছে সে রকমই ছিলো। অর্থাৎ

'তারা যখন তোমাদের ওপর বিজয়ী হয় তখন তোমাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তা ও চুক্তির পরোয়া করে না ....'

মোশরেক ও আহলে কেতাব উভয়েরই আচরণ মুসলমানদের সাথে চিরদিন এ রকম ছিলো। আহলে কেতাবের ব্যাপারটা আমরা এ সূরার দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করবো। কিন্তু মোশরেকদের এটাই ছিলো মুসলমানদের সাথে চিরস্থায়ী আচরণ।

আমরা যখন এ সত্যটা বিবেচনায় আনি যে ইসলাম মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাত দিয়ে শুরু হয়নি বরং তাঁর রেসালাত দিয়ে ইসলামের সমাপ্তি ও পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটেছে। মোশরেকেরা পূর্ববর্তী প্রত্যেক রসূলের সাথে যে আচরণ করতো, সেটাই সার্বিকভাবে আল্লাহর দ্বীনের সাথে শেরকের চিরন্তন আচরণ। সংঘাত ও সংঘর্ষের প্রেক্ষাপট, ক্ষেত্র ও পরিধি স্থান কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে, কিন্তু মূলত ও নীতিগতভাবে তা সর্বকালে ও সর্বক্ষেত্রে একই রকম। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে এটাই প্রতিভাত হয়েছে।

মোশরেকেরা হযরত নূহ, হুদ, সালেহ, ইবরাহীম, শোয়ায়ব, মূসা ও ঈসা (আ.) তৎকালীন মোমেনদের সাথে কেমন আচরণ করেছে! তারপর মোহাম্মদ (স.) ও তৎকালীন মোমেনদের সাথেই বা কি আচরণ করেছে? তারা যখন যতো দূর পেরেছে বেপরোয়াভাবে কেবল অত্যাচার ও দমন নিপীড়নই চালিয়েছে।

তাতারদের হাতে শেরেকের দ্বিতীয় আগ্রাসনের সময় মোশরেকেরা মুসলমানদের সাথে কেমন আচরণ করেছে? আর আজ চৌদ্দশত বছর পর পৃথিবীর সর্বত্র কী আচরণ করছে? কোরআনের এ অকাট্য সত্য বাণীই সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে সর্বত্র। তারা সকল চুক্তি, সৌজন্যে, মানবতাবোধ ইত্যাদিকে বুড়ো আংগুল দেখিয়ে বেপরোয়াভাবে অত্যাচার নিপীড়ন চালাচ্ছে।

তাতারী পৌত্তলিকেরা যখন বাগদাদে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালায়, তখন যে গণহত্যা সংঘটিত হয়, তার বিবরণ বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমরা এখানে শুধু আবুল ফিদা ইবনুল কাছীরের রচিত 'আল বিদায় ওয়ান্ নিহায়া' গ্রন্থের বিবরণ থেকে কিছু কিছু উদ্বৃত তুলে ধরছি। হিজরী ৬৫৬ সনে সংঘটিত এই মর্মাবিদারী ঘটনা সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেন।

'তাতাররা শহরের দিকে ধাবিত হলো এবং নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করতে লাগলো। বহু লোক পুকুরে, আস্তাকুঁড়ে ও গর্তে আত্মগোপন করলো এবং দীর্ঘদিন সেখানে লুকিয়ে থাকলো। লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে বড় বড় দোকানে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতো। কিন্তু তাতাররা ভেংগে অথবা আগুনে পুড়িয়ে দরজা খুলতো এবং ভেতরে ঢুকতো। লোকেরা তখন ছাদে উঠে গেলে তারাও ছাদে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করতো। ফলে ছাদ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে রাজপথ ভেসে যেতো। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।) অনুরূপ হত্যাকান্ড চালাতো মসজিদে মসজিদে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এবং সরাইখানায়ও। কেবল ইহুদী, খৃষ্টান(১) এবং তাদের কাছে আশ্রয়প্রার্থীরা এবং রাফেযী উযীর ইবনুল আলকানীর কাছে আশ্রয় গ্রহণকারীরা ছাড়া কেউ রেহাই পায়নি। কিছু কিছু ব্যবসায়ীও বিপুল অর্থ দিয়ে জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলো। এই গণহত্যার পর পৃথিবীর সর্বাধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাগদাদনগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। খুব অল্প সংখ্যক ক্ষুধার্ত, ভীত সন্ত্রস্ত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, আহত ও আধামৃত মানুষ অবশিষ্ট ছিলো।'

'এই গণহত্যায় নিহত মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সব বর্ণনায় ন্যূনতম ৮ লাখ ও সর্বোচ্চ ২০ লাখ নিহত হয়েছিলো বলে জানা যায়।....... মোহররম মাসের শেষ ভাগে তারা বাগদাদে প্রবেশ করে এবং চল্লিশ দিন ধরে পাইকারি হত্যাকান্ড চলতে

(১) যে ইহুদী ও খৃষ্টান সংখ্যালঘু নাগরিকদেরকে সর্বপ্রকারের সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা দিয়ে বাগদাদ লালন-পালন করে আসছিল, তারাই বাগদাদে আক্রমণ ও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য তাতারদেরকে ডেকে এনেছিল। তারাই শহরের গোপনীয় স্থানগুলো দেখিয়ে দিয়েছিল। এই গণহত্যা ও লুটপাটে কার্যকরভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলো এবং তারাই তাতারদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো।

থাকে। ১৪ই সফর বুধবার খলীফা মোতাসাম বিল্লাহ ৪৬ বছর ৪ মাস বয়সে মারা যান। তখন তার খেলাফতের বয়স হয়েছিলো ১৫ বছর ৮ মাস। তাঁর সাথে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল আব্বাস আহমদ ১৫ বছর বয়সে ও মধ্যম পুত্র আবুল ফযল আবদুর রহমান ১৩ বছর বয়সে নিহত হয়। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মুবারক ও তিন বোন ফাতেমা, খাদীজা ও মরিয়ম বন্দী হয়।

রাজধানীর ওসতাদ বলে পরিচিত আশ শায়খ মহিউদ্দীন ইউসুফ ইবনুশ শায়খ আবিল ফারাজ ইবনুল জাওযী ও এই হত্যাকান্ডের শিকার হন। তিনি ছিলেন উযীরের শত্রু। তার তিন ছেলে আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান ও আবদুল করমী এবং রাষ্ট্রের বড় বড় নেতা একে একে নিহত হন। তাদের মধ্যে দুয়াইদার আস্‌সগীর মোজাহিদুদ্দীন আইবেক, শিহাবুদ্দীন সুলায়মান শাহ এবং আরো বহু বড় বড় ব্যক্তিত্ব নিহত হন। খলীফার পরিবারের এক এক ব্যক্তিকে ডেকে আনা হতো। সে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে বেরিয়ে আসতো। তাকে কবরস্তানের কাছে নিয়ে গিয়ে ছাগলের মতো যবাহ করা হতো। আর তার মেয়ে ও দাসীদের মধ্য থেকে যাকে পছন্দ করা হতো বন্দী করা হতো। স্বয়ং খলীফার শিক্ষক সদরুদ্দীন আলী ইবনুল নাইয়ারকেও হত্যা করা হয়। মসজিদের খতীব, ইমাম ও কোরআনের হাফেযদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়। বাগদাদের মসজিদগুলোতে বহু মাস যাবত জামায়াত ও জুময়ার নামায বন্ধ এবং মাসজিদ তালাবদ্ধ থাকে।

এই নিষ্ঠুর গণহত্যার ৪০ দিন কেটে গেলে বাগদাদ শহর বিরান হয়ে গেলো। মুষ্টিমেয় সংখ্যক জীবিত মানুষ অবশিষ্ট রইলো। আর পথে পথে অসংখ্য লাশ পড়ে রইলো। বৃষ্টি হলে এই সব লাশের চেহারা বিকৃত হয়ে গেলো। লাশের পচা গন্ধে আবহাওয়া দূষিত হয়ে যে রোগ মহামারী দেখা দিলো, তা সিরিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো এবং এতেও বিপুল সংখ্যক লোক মারা গেলো। যারা বেঁচে রইলো তারা ক্ষুধা, দারিদ্র ও রোগ-ব্যাধি নিয়ে কোনো মতে বেঁচে রইলো।

যখন শান্তি ফিরে এসেছে বলে ঘোষণা দেয়া হলো, তখন মাটির নীচের গর্ত থেকে বহু লোক বেরিয়ে এলো। তাদের অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিলো যে, একে অপরকে চিনতো না। এমনকি পিতা পুত্র ও ভাই ভাই পর্যন্ত পরস্পরকে চিনতো না। তারাও কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে একে একে মারা গেছে ......'

এ হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক ঘটনার নমুনা। এ ঘটনায়ও প্রমাণিত হয়েছে যে, মোশরেকেরা যখনই মুসলমানদের ওপর বিজয়ী হয়েছে, তখন তারা কোনো নৈতিক সীমারেখা মানেনি এবং কোনো কিছুর তোয়াক্কা করেনি। আর এটা তাতারদেরও একক বৈশিষ্ট্য নয়।

এমনকি আধুনিক যুগের ঘটনাবলীও এই ঘটনা থেকে পৃথক কিছু নয়। পাকিস্তান সৃষ্টির সময় ভারতে হিন্দুরা যা করেছে, তাও তাতারদের ঘটনার চেয়ে কম পাশবিক ও অমানুষিক নয়। ভারত থেকে ৮০ লক্ষ মুসলমান মোহাজের হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠের অত্যাচারের ভয়ে পাকিস্তানে হিজরত করেছিলো। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে মাত্র ৩০ লক্ষ পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে। বাদবাকী ৫০ লাখকে পথেই মেরে ফেলা হয়। দলে দলে হিন্দু সন্ত্রাসীরা তাদেরকে রাস্তায় ধরে ধরে পশুর মতো যবাহ করে এবং তাদের লাশ পশুপাখীর খোরাক হয়। এমনকি তাদের লাশ বিকৃতও করা হয় ব্যাপকভাবে। নিষ্ঠুরতার দিক দিয়ে এ গণহত্যা তাতারী গণহত্যার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলো না। সবচেয়ে লোমহর্ষক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় মুসলিম সরকারী কর্মচারীদেরকে পাকিস্তানে বহনকারী ট্রেনে। কেননা এ ধরনের বদলীর ব্যাপারে উভয় দেশ একমত হয়েছিলো। এই ট্রেনটাতে ৫০ হাজার সরকারী কর্মচারী আরোহণ করে। ট্রেনটা পাক ভারত সীমান্তের একটি সুড়ংগের ভেতর প্রবেশ করলো। কিন্তু যখন তা অপর পাশ দিয়ে বেরুলো, তখন ওই ট্রেনে কিছু সংখ্যক খন্ডিত লাশ ছাড়া আর কোনো জীবিত মানুষ অবশিষ্ট ছিলো না।

ট্রেনিংপ্রাপ্ত খুনীরা ট্রেনটাকে সুড়ংগের ভেতরে আটকে রাখে এবং সবাইকে হত্যা না করা পর্যন্ত ট্রেন ছাড়েনি। বস্তুত আল্লাহর এ উক্তিটা কত অকাট্য সত্য যে, 'তারা যখন তোমাদের ওপর ক্ষমতা লাভ করে, তখন তোমাদের ব্যাপারে কোনো নিয়ম নীতি, চুক্তি সৌজন্যেবোধের পরোয়া করে না।'

এ ধরনের গণহত্যা আজও বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে অব্যাহত রয়েছে।

তাতারদের উত্তরাধিকারীরা কম্যুনিষ্ট চীনে ও কম্যুনিষ্ট রাশিয়ায় মুসলমানদের প্রতি কী আচরণ করেছে, তাও লক্ষ্য করুন। মাত্র পঁচিশ বছরে তারা ২ কোটি ৬০ লাখ মুসলমানকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। অর্থাৎ প্রতি বছরে প্রায় দশ লাখ করে। এই নির্মূল অভিযান এখনো অব্যাহত রয়েছে। এই অভিযান যে লোমহর্ষক পন্থায় পরিচালিত হয়েছে, তা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সম্প্রতি মুসলিম তুর্কিস্তানের চীনা অংশে যে ঘটনা ঘটে, তা বর্বরতায় তাতারদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে। জনৈক মুসলিম নেতাকে ধরে আনার পর প্রকাশ্য রাজপথে তার জন্যে একটা গর্ত খোড়া হয়। সাধারণ মুসলমানদেরকে কঠোর নির্যাতন ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের মলমূত্র ও অন্যান্য মানবীয় বর্জ্য নিয়ে আসতে এবং তা ওই গর্তে নিক্ষিপ্ত মুসলিম নেতার দেহের ওপর স্তূপ করতে বাধ্য করা হয়। (এ সব মলমূত্র ও বর্জ্য সরকার জনগণের কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে কিনে সার তৈরীর কাজে ব্যবহার করে থাকে।) তিন দিন পর্যন্ত এভাবে বর্জ্য নিক্ষেপ চলতে থাকে এবং মানুষটি এর নীচে চাপা পড়ে এক সময় মারা যায়।

কম্যুনিস্ট যুগোশ্লাভিয়াও মুসলমানদের সাথে এরূপ আচরণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এ পর্যন্ত সেখানে দশ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে। পাশবিক নির্যাতন ও হত্যার এই ধারা সেখানে এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং একটা নৃশংস পদ্ধতি হলো জ্যান্ত নারী ও পুরুষদের গোশত মিনচিং কারখানায় ফেলে দেয়া, যাতে অপরদিক থেকে তাদের হাড়, গোশত ও রক্তের মন্ড বেরিয়ে আসে।

যুগোশ্লাভিয়ার মতো লোমহর্ষক নির্যাতন সকল কম্যুনিষ্ট দেশে ও পৌত্তলিক দেশে নির্বিবাদে সংঘটিত হয়ে থাকে।(১) এভাবে আল্লাহর এই উক্তির সত্যতাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, তারা যখন ক্ষমতা হাতে পায়, তখন মুসলমানদের ওপর নিষ্ঠুরতম নির্যাতন চালাতে কিছু মাত্র নৈতিকতা বা অংগীকারের ধার ধারে না।

কী আরবে, কী বাগদাদে কোথাও মুসলিম নির্যাতন বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা নয়। এটা শাশ্বত, চিরন্তন, স্বাভাবিক ও অনিবার্য ব্যাপার। যেখানেই মুসলমানরা এবং মোশরেক বা নাস্তিকরা থাকবে, সেখানে এ ধরনের ঘটনা ঘটতেই থাকবে তা স্থান ও কালের যতো পার্থক্যই থাক না কেন।

সুতরাং এই আয়াতগুলো আরবের একটা বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়ে থাকলেও এবং এতে আরবের মোশরেকদের সাথে আচরণের বিধি বর্ণনা করা হলেও তা স্থান, কাল ও জাতি নির্বিশেষে সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেননা এটা অনুরূপ অবস্থার প্রতিকারের জন্যেই নাযিল হয়েছে। এ বিধির প্রয়োগের আদেশ তখনই দেয়া যাবে, যখন আরবের যে পরিস্থিতিতে এর প্রয়োগ

(১) উল্লেখ্য যে, লেখক ১৯৬৬ সালে শাহাদাত বরণ করেন। সুতরাং সাম্প্রতিককালে বসনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া, কসবো ও আলবেনিয়ায় যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, তার বিবরণ স্বভাবতই তিনি দিতে পারেননি। বসনিয়ার মুসলিম নিধন সম্পর্কে জানার জন্যে এই তাফসীরের সম্পাদক হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ-এর রচিত 'রক্তস্নাত বসনিয়া' বইটি আপনার কাজে লাগবে।

হয়েছিলো তদ্রূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে এবং সেই পরিস্থিতিতে প্রয়োগকারীর হাতে এ বিধি প্রয়োগের পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকবে। মূল বিধি ও মূল প্রয়োগ ক্ষেত্রের মধ্যে একে সীমাবদ্ধ রাখা হবে না, যা সময়ের আবর্তনে পরিবর্তিত হয় না।

মোশরেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ

এবার ১৩ নং থেকে ১৬ নং আয়াত লক্ষ্য করুন, 'তোমরা কি তাদের সাথে লড়বে না, যারা শপথ ভঙ্গ করেছে, রসূলকে বিতাড়িত করার উদ্যোগ নিয়েছে ………।'

ইতিপূর্বে যে আয়াত সমষ্টিতে নীতিগতভাবে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের কাছে মোশরেকদের কোনো চুক্তি কিভাবে থাকতে পারে বলে অপছন্দ প্রকাশ করে প্রশ্ন তোলা হয়েছিলো, মোশরেকদেরকে হয় ইসলাম গ্রহণ করা নচেত যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হওয়া এই দুয়ের যে কোনো একটাকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিতে আদেশ দেয়া হয়েছিলো এবং এই অপছন্দের এই কারণ বর্ণনা করা হয়েছিলো যে, তারা মুসলমানদের ওপর ক্ষমতা লাভ করলে তাদের প্রতি কোনো রেয়াত দেয় না এবং কোনো অংগীকার বা আত্মীয়তার পরোয়া করে না, বর্তমান আয়াত সমষ্টি তারই ধারাবাহিকতা।

এ আয়াত সমষ্টি মুসলমানদের মনের সেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিতে নাযিল হয়েছে, যার জন্যে এতো বড় চরম পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে তারা দোদুল্যমান ছিলো। তাদের মধ্যে কিছু কিছু আগ্রহ ও আশা জেগেছিলো যে, এমন সর্বাত্মক যুদ্ধ ছাড়াও হয়তো বাদ বাকী মোশরেকরা একদিন ইসলাম গ্রহণ করবে। তাছাড়া এতে তারা কিছু লোক ক্ষয় ও স্বার্থহানির আশংকাও বোধ করছিলো এবং আরো সহজ পদক্ষেপের প্রতি তারা ঝোঁক অনুভব করছিলো।

এ আয়াত ক'টা মুসলমানদের এই মানসিকতা, ভয় ভীতি ও আশা-আকাংখা দূর করে কাছে ও দূর অতীতের ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের মনে জেহাদী উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলছে। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, মোশরেকরা তাদের সাথে করা প্রতিটা ওয়াদা ও শপথ ভংগ করেছিলো, হিজরতের আগে রসূল (স.)-কে মক্কা থেকে বহিষ্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলো এবং মদীনায় যাওয়ার পরও তাদের পিছু ছাড়েনি, বরং তারাই প্রথম তাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালিয়েছে। অতপর তাদের মধ্যে লজ্জা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলছে এই বলে যে, তারা মোশরেকদের সাথে লড়াই করতে ভয় পাচ্ছে। অথচ তারা মোমেন হয়ে থাকলে তাদের তো ভয় পাওয়ার কথা আল্লাহকে। অতপর তাদেরকে এই বলে মোশরেকদের সাথে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করছে যে, তোমাদের হাত দিয়েই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন। তারাই হবে আল্লাহ ও তাদের শত্রুদের শাস্তি দেয়া লাঞ্ছিত করা এবং নির্যাতিত মোমেনদের মনকে প্রবোধ দেয়ার মাধ্যম। মুসলমানদের মনের এই দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও দোদুল্যমানতা এই বলে দূর করছে যে, মোশরেকদের ইসলাম গ্রহণের প্রকৃত আশা তাদের পরাজয় ও মুসলমানদের বিজয়ের মাধ্যমে সফল হওয়াই উত্তম। তখন হয়তো তাদের এমন কেউ কেউ বিজয়ী ইসলামে প্রবেশ করবে, যাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাওবার সৌভাগ্য বরাদ্দ করেছেন। সবার শেষে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে মোমেনদেরকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা আল্লাহর চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় নীতি।

১৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি তাদের সাথে লড়বে না যারা তাদের শপথ ভংগ করেছে এবং রসূলকে বহিষ্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে …….'

মুসলমানদের সাথে মোশরেকদের আচরণের গোটা ইতিহাসই শপথ ভংগ ও অংগীকার ভংগ করার ইতিহাস। এ ক্ষেত্রে নিকটতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে রসূল (স.)-এর সাথে সম্পাদিত তাদের

হোদায়বিয়ার চুক্তি। আল্লাহর নির্দেশে রসূল (স.) এই চুক্তিতে এমন কিছু ধারাও সংযোজন করেছিলেন, যাকে তাঁর কতিপয় শীর্ষস্থানীয় সাহাবী মুসলমানদের জন্যে অপমানজনক মনে করেছিলেন। এতদসত্তেও তিনি এই চুক্তির প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান দেখিয়েছেন এবং অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেছেন। অথচ তারা তার প্রতি অনুগত থাকলো না এবং প্রথম সুযোগেই মাত্র দু' বছর পরই চুক্তি ভংগ করলো। তা ছাড়া ইতিপূর্বে হিজরতের আগে তারা যে রসূল (স.)-কে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলো এবং সর্বশেষে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলো, তাও কারো অজানা নয়। অথচ এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছিলো আল্লাহর সেই পবিত্র গৃহের চত্বরে বসে, যেখানে একজন খুনীরও জান মাল নিরাপদ ছিলো। এমনকি কারো বাপ বা ভাইয়ের খুনীর সাথে এখানে দেখা হলে তাকেও তারা কিছুই বলতো না। কেবল ঈমান ও এক আল্লাহর এবাদাতের দাওয়াত প্রদানকারী রসূল (স.)-এর বেলায় তারা এই সর্বস্বীকৃত রীতি অমান্য করলো। তারা প্রথমে তাঁকে বহিষ্কার এবং তারপর তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র এই পবিত্র গৃহের চত্বরে বসেই করলো। যাদের কাছে খুনের বদলা প্রাপ্য, তাদের ক্ষেত্রেও তারা যে ছাড় দেয়, রসূল (স.)-কে সেই ছাড়টুকুও দিলো না এবং এ জন্যে তাদের মধ্যে কিছুমাত্র সংকোচ ও দ্বিধাবোধ পর্যন্ত রইলো না। এমনকি মদীনায় চলে যাওয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধেও তারাই প্রথম আগ্রাসনের উদ্যোগ নিলো। যে কাফেলাকে উদ্ধার করার জন্যে তারা মক্কা থেকে বেরিয়েছিলো, সে কাফেলা নিরাপদে চলে যাওয়া সত্তেও আবু জাহলের নেতৃত্বে তারা মরিয়া হয়ে উঠলো মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে। বদরের পর ওহুদে, খন্দকে ও হোনায়নেও তারাই সর্ব প্রথম আক্রমণের উদ্যোগ নিলো। এ সবই নিকট অতীতের ঘটনা। এ সবই সংঘটিত হয়েছিলো একে তো তাদের এই হঠকারী মানসিকতার জন্যে যে, মুসলমানদেরকে যেভাবেই হোক ইসলাম থেকে ফেরাতে হবে, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, সাধ্যে কুলালে তারা তোমাদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত তোমাদের সাথে লড়াই চালিয়েই যেতে থাকবে। আর দ্বিতীয়ত এ জন্যে যে, এক আল্লাহর এবাদাতকারী ও বহু উপাস্যের উপাসনাকারীদের মধ্যে এ ধরনের সম্পর্কই স্বাভাবিক। উভয়ের মধ্যে স্থায়ী শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ও সহাবস্থান কখনো সম্ভব নয় ও স্বাভাবিক নয়।

এভাবে সংক্ষেপে ও মর্মস্পর্শী ভাষায় অতীতের ঘটনাবলীর এই দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা করার পর আল্লাহ মুসলমানদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন,

'তোমরা কি তাদেরকে (মোশরেকদেরকে) ভয় পাও?'

আসলে মোশরেকদের সাথে লড়াই থেকে মুসলমানদের নিবৃত্ত থাকার কারণ ভয়ভীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তারা এই ভয়কে যাতে জয় করতে পারে এবং লড়াইয়ে আরো উৎসাহিত হয়, সে জন্যে বলা হয়েছে,

'তোমরা যদি মোমেন হয়ে থাকো, তবে আল্লাহকেই তোমাদের আরো বেশী ভয় করা উচিত।'

মোমেনদের তো আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে আদৌ ভয় করারই কথা নয়। কিন্তু তারা যখন মোশরেকদের ভয় পাচ্ছে, তখন মনে রাখতে হবে যে, ভয় করার ব্যাপারে আল্লাহকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনিই বেশী অধিকার রাখেন যে, তাকে ভয় করা হোক। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে মোমেনের মনে আল্লাহ ছাড়া আর কারো স্থান থাকাই সমীচীন নয়।

মক্কার অতীত জীবনের যুলুম-নিপীড়ন ও ষড়যন্ত্রের সেই বিভীষিকাময় ইতিহাস স্মরণ করলে মোমেনদের আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠবে, রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ার

ঘটনা স্মরণ করলে তাদের পরবর্তী প্রতিটি বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনার কারণ বুঝে আসবে এবং অতীতে তারা যে মোমেনদের ওপর সব সময়ই প্রথম আক্রমণ চালিয়েছে, তা মনে করলে তাদের পরবর্তীকালের প্রতিটি অতর্কিত আক্রমণ ও আগ্রাসনকে প্রতিহত করার জন্যে মোমেনদের মন প্রস্তুত হবে এটা সুনিশ্চিত। এ জন্যেই তাদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে,

'তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তোমাদের হাত দিয়ে শাস্তি দেবেন ....' (আয়াত ১৪)

অর্থাৎ তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তাঁর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যম ও তাঁর ইচ্ছা পূরণের হাতিয়ার বানাবেন। তোমাদের হাত দিয়ে তাদের শাস্তি দেবেন। তারা শক্তির গর্বে মাতোয়ারা হওয়া সত্ত্বেও তাদের পরাজিত ও লাঞ্ছিত করবেন। তাদের ওপর তোমাদের বিজয়ী করবেন এবং মোমেনদের যে দলটা মোশরেকদের অত্যাচার নির্যাতন ভোগ করেছে ও বাড়ীঘর থেকে উৎখাত হয়েছে, তাদের মনের চাপা ক্রোধ ও ক্ষোভকে তিনি সত্যের জয়, বাতিলের পরাজয় ও বাতিলপন্থীদের বিতাড়নের মাধ্যমে নিরাময় করবেন। শুধু তাই নয়, তাদের জন্যে আরো একটা পুরস্কার অপেক্ষা করছে। সেটা হলো,

'এবং আল্লাহ যাকে চাইবেন, ক্ষমা করবেন।'

বস্তুত, মুসলমানদের বিজয় মোশরেকদের অনেককে ঈমানের পথে ফিরিয়ে আনতে পারে। তারা যখন দেখবে ও অনুভব করবে যে, মুসলমানরা এমন এক শক্তির সাহায্য পাচ্ছে, যা মানবীয় শক্তির উর্ধে এবং মোমেনদের নীতিতে ও আচার ব্যবহারে ঈমানের আলামত দেখতে পাবে, তখন তাদের অন্তরচক্ষু খুলে যাবে। মুসলিম মোজাহেদরাও তখন তাদের জেহাদের পুরস্কার হাতে হাতে পেয়ে যাবে, বিপথগামীদের স্বহস্তে শাস্তি দিয়ে সুপথে চালিত করার পুরস্কার পেয়ে যাবে এবং এই সব তাওবাকারী হেদায়াতপ্রাপ্তদের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

'আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।'

অর্থাৎ ঘটনাবলীর আড়ালে কী ফলাফল লুকিয়ে আছে, সে সম্পর্কে তিনি মহাজ্ঞানী, আর বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলাফল পরিকল্পনায় তিনি বিজ্ঞানময়।

বস্তুত, যারা ইসলামকে দুর্বল দেখে অথবা ইসলামের শক্তি ও প্রতাপ জানতে না পেরে তা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো, বিজয় ও প্রতিষ্ঠা লাভের মাধ্যমে তার শক্তি প্রকাশিত হলে তারা অবশ্যই ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হবে। আর ইসলামের অনুসারীরা সুস্পষ্টভাবে বিজয়ী ও প্রতাপশালী হলেই ইসলামের দাওয়াতের অর্ধেক সফলতা অর্জন করে থাকে।

মুসলমানরা যখন মক্কায় নিতান্ত ক্ষুদ্র একটা দল হিসাবে অবস্থান করছিলো এবং তাকে খুবই দুর্বল মনে করে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিলো, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কোরআনের অতুলনীয় জীবন বিধানে প্রশিক্ষিত করে তুলছিলেন। এই প্রশিক্ষণকালে তাদেরকে তিনি কেবল একটা জিনিসেরই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন। সে জিনিসটা হলো জান্নাত। আর তাদের তিনি একটা আদেশই বারবার দিচ্ছিলেন। সেটা হলো, ধৈর্যধারণ করো। অতপর তারা যখন ধৈর্যধারণ করলো এবং বিজয় নয়, বরং শুধু জান্নাতেরই প্রত্যাশী হয়ে রইলো, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের বিজয় দান করলেন, তার জন্যে তাদের উৎসাহিত করতে লাগলেন এবং তা দ্বারা তাদের মনের ক্ষোভ, দুঃখ ও হতাশা দূর করে দিলেন। কেননা এ সময় বিজয় মুসলমানদের জন্যে নয়, বরং তার দ্বীনের জন্যে এসেছিলো। মুসলমানরা ছিলো আল্লাহর শক্তির প্রতীক।

আরো একটা বিজয় মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন ছিলো। তাদেরকে সকল মোশরেকের বিরুদ্ধে জেহাদ করা এবং সকল মোশরেকের চুক্তি ও অংগীকার বাতিল করে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সর্বাত্মক ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিলো। এর প্রয়োজন ছিলো এ জন্যে

যে, যাদের মনে ইসলামের ওপর পরিপূর্ণ দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা জন্মেনি, যারা এখনো নানা বাহানা ও ছলছুতোয় অর্থোপার্জনের জন্যে মোশরেকদের সাথে লেনদেন চালিয়ে যেতে চায় এবং স্বার্থ বা আত্মীয়তার টানে তাদের সাথে প্রীতি ও মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়, তাদের মুখোশ খুলে দেয়া জরুরী হয়ে পড়েছিলো- যাতে আল্লাহ, আল্লাহর রসূল ও মুসলমানরা ছাড়া মুসলমানদের আর কোনো আশ্রয়-স্থল না থাকে, আর কাউকে তারা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে এবং মুসলমান ও অমুসলমানদের মাঝে কোনো গোপন সম্পর্ক কেউ রাখতে না পারে। এজন্যে ১৬নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

'তোমরা কি মনে করেছো যে জান্নাতে চলে যাবে ......'

বস্তুত অতীতের মতো আজও মুসলমানদের মধ্যে এমন লোক পাওয়া যায়, যারা মুসলমানদের সামগ্রিক স্বার্থের ক্ষতি সাধন করে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে নানা রকম ছলছুতো ও ওযর বাহানার মাধ্যমে ইসলামের শত্রু মোশরেকদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। মুসলমান ও অমুসলমানদের মাঝে সুস্পষ্টভাবে সম্পর্কচ্ছেদ না ঘটলে এ ধরনের লোকেরা এভাবে সম্পর্ক রক্ষার সুযোগ পায়। কিন্তু সম্পর্কচ্ছেদ ঘটানো হলে এ সুযোগ থাকে না। বস্তুত এটাই মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূল ও কল্যাণজনক যে, অমুসলিমদের সাথে গোপন সম্পর্ক রাখার সকল পথ ও ফাঁক ফোকর বন্ধ থাকা উচিত। তখন জনগণ জানতে পারবে কারা মুসলমান হয়ে অমুসলিমদের সাথে দহরম মহরম রেখে চলছে, আর কারা তা রাখছে না। আল্লাহ তায়ালা অবশ্য সবার খবরই জানেন।

'তোমরা যা করো তা আল্লাহ জানেন।'

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে শাস্তি দেন না, শাস্তি দেন মানুষের প্রকাশ্য কাজ-কর্মের ভিত্তিতে। এ জন্যে তিনি এমন পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন, যাতে কেউ কিছু গোপন করতে পারে না, সবার আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়। আর এই পরীক্ষার সর্বোত্তম উপায় হলো বিপদ মুসীবত দেয়া ও জেহাদের নির্দেশ দান।

আল্লাহর ঘর কারা আবাদ করবে

'মোশরেকদের অধিকার নেই আল্লাহর মসজিদগুলোকে আবাদ করার ....' (আয়াত ১৭-২২)

সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা জারী হবার পর মোশরেকদের সাথে যুদ্ধ না করার পক্ষে কোনো মুসলমানের কাছে কোনো গ্রহণযোগ্য ওযর আপত্তি অবশিষ্ট থাকলো না। মোশরেকদেরকে কা'বা শরীফের সেবা ও যিয়ারতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করায়ও কারো কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবকাশ রইলো না। জাহেলী যুগে যদিও মোশরেকরা কা'বা শরীফের মুতাওয়াল্লী ছিলো এবং তার তওয়াফ যিয়ারতও তারা করতো। কিন্তু এখানে এই আয়াতগুলো দ্ব্যর্থহীনভাবে তাদের সেই অধিকার প্রত্যাখ্যান করছে। এটা সেই মুসলমানদের একক অধিকার, যারা আল্লাহর নির্দেশসমূহ যথাযথভাবে মান্য করে। এ আয়াতগুলো দ্বারা সেই অধিকার মুসলমানদেরকে দেয়া হয়েছে এবং যে সব মুসলমান ইসলামের এই মূলনীতি সম্পর্কে অবহিত ছিলো না, তাদের মনের সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর করা হয়েছে।

'আল্লাহর মসজিদগুলোকে আবাদ করার কোনো অধিকার মোশরেকদের নেই ....'

বস্তুত প্রথম থেকেই এটা ছিলো একটা গর্হিত কাজ। এর কোনো যুক্তি ছিলো না। কেননা এটা স্বাভাবিকতারও পরিপন্থী। আল্লাহর ঘরগুলো আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট। সেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কারো নাম স্মরণ করা হয় না। আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ডাকা হয় না। সুতরাং তাওহীদ যাদের মনকে আবাদ করতে পারেনি, আল্লাহর সাথে যারা শেরেক করে এবং যাদের কুফরী সম্পর্কে তারা নিজেরাও সাক্ষী, তারা কিভাবে কা'বা শরীফের সেবাযত্ন করতে পারে!

'তাদের সকল কাজ বাতিল হয়ে গেছে।'

অর্থাৎ তা মূলতই বাতিল। তাদের এই বাতিল কাজের মধ্যে আল্লাহর ঘরের সেবাও অন্যতম। কেননা এ কাজ তাওহীদে বিশ্বাসী না হয়ে করা যাবে না।

'তারা আগুনের মধ্যে চিরদিন থাকবে।'

কেননা তারা প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত ছিলো।

বস্তুত এবাদাত হলো আকীদা বিশ্বাসেরই ফলশ্রুতি। আকীদা শুদ্ধ না হলে এবাদাতও শুদ্ধ হয় না। মানুষের মনে যতোক্ষণ বিশুদ্ধ আকীদা বিশ্বাস বদ্ধমূল না হয়, তার প্রকাশ্য বাস্তব কর্মকান্ড ঈমানমুখী না হয় এবং আমল ও এবাদাতে সে আল্লাহর জন্যে একনিষ্ঠ না হয়, ততোক্ষণ এবাদাত করা ও মসজিদগুরোকে আবাদ করা বা সেবা করার কোনো অর্থই থাকে না।

'আল্লাহর মসজিদগুলোকে শুধু তারাই আবাদ করবে, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে, আখেরাতের ওপর ঈমান এনেছে এবং আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় করে না ....' (আয়াত ১৮)

আল্লাহর মাসজিদ আবাদ করার জন্যে ঈমান একটা প্রচ্ছন্ন শর্ত এবং নামায ও যাকাত প্রকাশ্য শর্ত। এ দুটো শর্তের পর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় না করার শর্ত উল্লেখ নিরর্থক নয়। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর জন্যে একনিষ্ঠ হওয়া এবং আচরণে ও অনুভূতিতে শেরেকের লেশমুক্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরী। আয়াত এখানে ইচ্ছাকৃতভাবেই ইংগিত দিচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করাও এক ধরনের শেরেক। এ ইংগিত দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, বিশ্বাস ও কাজে যেন ভেজাল না থাকে এবং দুটোই যেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে হয়। এ রকম হলেই মুসলমানরা আল্লাহর মসজিদের সেবা করতে ও আল্লাহর হেদায়াত লাভের আশা করতে পারে।

'তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।'

যে কোনো বিষয়ের প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট ও উদ্যোগী হয় এবং তার অংগ প্রত্যংগ বাস্তব কাজ করে। অতপর আল্লাহ ওই উদ্যোগ ও বাস্তব কাজের প্রতিদান স্বরূপ হেদায়াত ও সাফল্য দান করেন।

আল্লাহর ঘরের সেবা ও আনুষ্ঠানিক এবাদাতের যোগ্যতা নির্ধারণে এ হলো ইসলামের মূলনীতি, আল্লাহ এ মূলনীতি মুসলমান ও মোশরেকদের কাছে বর্ণনা করছেন। এ মূলনীতির আলোকে জাহেলী যুগে কা'বা ও হাজীদের খেদমতকারী ভ্রান্ত আকীদার অধিকারী এবং জেহাদ ও সৎ কাজ বিবর্জিত মোশরেকদের শুধু কা'বা ও হাজীদের সেবার জন্যে বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী ও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে জেহাদকারী মুসলমানদের সমকক্ষ মনে করা যাবে না।

'তোমরা কি হাজীদের পানি খাওয়ানো ও মাসজিদুল হারামের সেবা করাকে আল্লাহর প্রতি ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়ন ও আল্লাহর পথে জেহাদের সমকক্ষ বানিয়ে ফেললে? .... ' (আয়াত ১৯)

আল্লাহর মানদন্ডই আসল মানদন্ড এবং আল্লাহর মূল্যায়নই আসল মূল্যায়ন।

'আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে হেদায়াত করেন না।'

এখানে অত্যাচারীরা অর্থ মোশরেকরা, যারা কা'বা শরীফের সেবা ও হাজীদের পানি খাওয়ানের কৃতিত্ব দেখালেও সত্য ধর্মের অনুসারী নয়, শেরেকমুক্ত আকীদায় বিশ্বাসী নয়।

পরবর্তী তিনটি আয়াতে জেহাদ ও হিজরতকারী মোমেনদের মর্যাদা ও পুরস্কার বর্ণনা করা হয়েছে।

'যারা ঈমান এনেছে, হিজরত ও জান মাল সহকারে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে। .... (২০, ২১ ও ২২)

এখানে মোমেনদের 'শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার অধিকারী' বলার অর্থ এটা বুঝা চাই না যে, মোশরেকরা মোমেনদের চেয়ে কিছুটা কম মর্যাদার অধিকারী। এটা তুলনামূলক অর্থে নয়, বরং

সাধারণ অর্থে 'বিপুল মর্যাদাশালী' বুঝানো হয়েছে। কেননা মোশরেকদের তো যাবতীয় সৎ কাজই বাতিল এবং তারা চিরদিনের জন্যে দোযখবাসী। কাজেই তাদের সাথে মুসলমানদের মর্যাদার তুলনার প্রশ্নই ওঠে না।

ঈমান ছাড়া রক্তের সম্পর্কের কোনো মূল্য নেই

পরবর্তী দুটো আয়াতেও মুসলমানদের আল্লাহ ও ইসলামের জন্যে একনিষ্ঠ হবার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। সকল পার্থিব স্বার্থ, সুখ, আনন্দ ও আত্মীয়তাকে একপাশে এবং আল্লাহ, রসূল ও ইসলামের ভালোবাসাকে এক পাশে রেখে মুসলমানদেরকে এ দুয়ের যে কোনো একটা বেছে নিতে বলা হয়েছে,

হে মোমেনরা, তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ঈমানের ওপর কুফরীকে অগ্রাধিকার দেয়, তবে তাদেরকে আপন জন হিসাবে গ্রহণ করো না ......' (আয়াত ২৩ ও ২৪)

ইসলামী আকীদা বিশ্বাস মনের অভ্যন্তরেও কোনো অংশীদার সহ্য করে না। ইসলামকে হয় একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করতে হবে, নচেত বর্জন করতে হবে। তাই বলে মুসলমানদেরকে তাদের পিতা মাতা, আত্মীয়স্বজন, সহায় সম্পদ ও সুখ আনন্দ ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করতে বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে মোমেনের অন্তরে ইসলামের ভালোবাসা যেন একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ হয়। একমাত্র কার্যকর, প্রভাবশালী ও কর্তৃত্বশীল, একমাত্র এর দ্বারাই যেন সে পরিচালিত ও উদ্বুদ্ধ হয়। এরূপ হলে জীবনের সকল হালাল ও পবিত্র সুখ ও আনন্দ উপভোগ করায় কোনো আপত্তি নেই। তবে পার্থিব সুখ যখন ইসলামের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাকে পুরোপুরিভাবে ছুঁড়ে ফেলার জন্যে প্রস্তুত থাকা চাই।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝা যাবে এভাবে যে, ইসলাম ও বৈষয়িক স্বার্থ– এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা অগ্রাধিকার পাচ্ছে। যদি ইসলাম অগ্রাধিকার পায় এবং কোনো মুসলমান যদি নিশ্চিত হয় যে, ইসলামের প্রতি তার ভালোবাসা ও নিষ্ঠায় কোনো ভেজাল নেই, তাহলে সন্তান সন্ততি, পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, ধন-সম্পদ, বাড়ীঘর ও ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিকে উপভোগ করায় দূষণীয় কিছু নেই। অহংকার ও অপব্যয় অপচয় ছাড়া হালাল পার্থিব সম্পদ ভোগ করায়ও আপত্তি নেই। বরং তখন আল্লাহর নিয়ামত ভেবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার মনোভাব নিয়ে উপভোগ করা আরো পুণ্যের কাজ হবে।

'হে ঈমানদাররা, তোমাদের পিতামাতা ও ভাই বোন যদি ঈমানের ওপর কুফরীকে অগ্রাধিকারে দেয়, তাহলে তাদেরকে প্রিয়জন হিসেবে গ্রহণ করো না।.........'

ইসলামের দৃষ্টিতে মনের সাথে ইসলামের সম্পর্ক যেখানে ছিন্ন হবে, সেখানে রক্ত ও বংশের সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহর সাথে যখন ঘনিষ্ঠতা থাকবে না, তখন পরিবার পরিজনের সাথেও ঘনিষ্ঠতা থাকবে না। আল্লাহর সাথে যে ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা, সেটাই সর্বোচ্চ ও সর্বপ্রথম আত্মীয়তা এবং তাঁর সাথেই সমগ্র মানবজাতি যুক্ত। আল্লাহর সাথে যদি প্রীতির সম্পর্ক না থাকে, তবে আর কারো সাথেই তা থাকতে পাবে না। তখন সকল সংযোগ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

'যারা তাদেরকে প্রিয়জন মনে করবে, তারা যালেম।'

এখানে 'যালেম' শব্দটা দ্বারা মোশরেক বুঝানো হয়েছে এবং যে আত্মীয় কুফরীকে ঈমানের ওপর স্থান দেয়, সে আত্মীয়কে আত্মীয় হিসাবে গ্রহণ করাই শেরেক এবং ঈমানের পরিপন্থী।

এখানে শুধু নীতি ও আদর্শ তাত্ত্বিকভাবে বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকা হয়নি। বরং বিভিন্ন প্রকারের সম্পর্ক সম্পদ, এবং সুখ ও আনন্দের বিবরণ দেয়া হয়েছে। অতপর এগুলোকে এক পাশে এবং ইসলামী আকীদা আদর্শ ও তার দাবী অপর পাশে রাখা হয়েছে। এক পাশে রাখা হয়েছে পিতামাতা, ছেলে মেয়ে, ভাই-বোন, স্ত্রী ও গোত্রকে রক্ত, বংশ, আত্মীয়তা ও দাম্পত্য সম্পর্কের

উপাদান হিসাবে, সহায় সম্পদ ও ব্যবসা বাণিজ্যকে স্বভাবসুলভ মোহ ও লোভের উপাদান হিসাবে এবং আরামদায়ক বাড়ীঘরকে পার্থিব সুখ ও ভোগের উপকরণ হিসাবে, অপর পাশে রাখা হয়েছে আল্লাহ, রসূল ও আল্লাহর পথে জেহাদের প্রতি ভালোবাসাকে। আর জেহাদ বলতে জেহাদের সকল দাবী ও সকল দুঃখ কষ্টকে, সকল ত্যাগ ও বঞ্চনাকে, সকল যখম ও শাহাদতকে এবং সকল যুলুম ও বেদনাকে বুঝানো হয়েছে। এতো সব ত্যাগ ও কষ্টের পরও জেহাদ থেকে যাবে নিরেট 'আল্লাহর পথে জেহাদ' হিসাবে। এর জন্যে কোনো খ্যাতি, সুনাম ও প্রচার আশা করা যাবে না, কোনো গর্ব, অহংকার ও প্রদর্শনী করা যাবে না এবং পৃথিবীর কারো প্রশংসা ও অভিনন্দন আশা করা যাবে না। অন্যথায় এর কোনো সওয়াব ও প্রতিদান পাওয়া যাবে না।

'বলো, যদি তোমাদের পিতামাতা, ছেলে মেয়ে। ....(আয়াত ২৪)

নিসন্দেহে এটা খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু তবু এটা করতেই হবে। আল্লাহর রসূল ও জেহাদকে দিতে হবে সর্বোচ্চে অগ্রাধিকার। নচেত 'আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা করো।' অর্থাৎ ফাসেকদের পরিণতির অপেক্ষা করো। আর ফাসেকদের পরিণতি হলো,

'নিশ্চয় আল্লাহ ফাসেকদের হেদায়াত করেন না।'

এই নিষ্ঠা ও একাগ্রতা শুধু ব্যক্তির কাছ থেকে নয়, বরং সমগ্র মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে চাওয়া হচ্ছে। কোনো সম্পর্ক ও স্বার্থকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আল্লাহর পথে জেহাদের দাবীর উর্ধে তোলা যাবে না।

এই নিষ্ঠা ও একাগ্রতা বাস্তবায়নের জন্যে আল্লাহ মুসলমানদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা একথা জেনেই দিয়েছেন যে, এটা করতে তারা সক্ষম ও সমর্থ। নচেত নির্দেশ দিতেন না। কারণ আল্লাহ কারো সাধ্য বহির্ভূত কাদের আদেশ দেন না। এটা মানুষের ওপর আল্লাহর বিরাট করুণা ও অনুগ্রহ যে, তাদেরকে এতো উচ্চাংগের নিষ্ঠা ও সহনশীলতা দান করেছেন, এই নিষ্ঠাকে তিনি এতো মজাদার বানিয়েছেন যে, পৃথিবীর আর কোনো জিনিস এতো মজাদার নয়। আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার আবেগ ও অনুভূতির মজা, আল্লাহর সন্তোষ লাভের আশা পোষণ করার মজা এবং পার্থিব হীন স্বার্থের মোহ ও নৈতিক অধোপতনের উর্ধে ওঠার মজা, এ সব মজার সাথে দুনিয়ার আর কোনো মজা, স্বাদ, আনন্দ ও তৃপ্তির কোনো তুলনা হয় না।

বিজয়ের আসল চাবি হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য

এরপর মুসলমানরা তৎকালে জনশক্তি ও অস্ত্রশক্তির নিদারুণ ঘাটতি সত্তেও যে সব জেহাদের ময়দানে আল্লাহর সাহায্য পেয়ে জয়লাভ করেছে তার কথা স্মরণ করাচ্ছেন। এগুলো থেকে কিছু ব্যতিক্রমী ছিলো হোনায়নের ঘটনা। মুসলমানদের বিপুল জনশক্তি থাকা সত্তেও এতে তারা প্রথমে পরাজয় বরণ করে এবং তারপর আল্লাহর সাহায্য বলে জয়লাভ করে। সেদিন বিজয়ী বাহিনীর সাথে মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে মাত্র দু' হাজার জন যোগদান করে। সেদিন মুসলমানরা জনবল ও অস্ত্রবলের আধিক্যের কারণে কয়েক মুহূর্তের জন্যে আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলো। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের পরাজয়ের স্বাদ ভোগ করালেন, যাতে মুসলমানরা বুঝতে পারে যে, আল্লাহর জন্যে একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা ও তাঁর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা এমন অস্ত্র, যার সাথে আর কোনো অস্ত্রের তুলনা হয় না। ধনবল, জনবল ও অস্ত্রবলের আধিক্যও যখন পরাজয় ঠেকাতে পারে না, তখন এই অস্ত্র বিজয়ের নিশ্চয়তা দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক রণাংগনে সাহায্য করেছেন, আর হুনায়নের দিনও সাহায্য করেছেন ......।' (আয়াত ২৫, ২৬ ও ২৭)

যে সব রণাঙ্গনে আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করেছিলেন, তার স্মৃতি মুসলমানদের মনে এত স্পষ্ট ছিলো যে, তার দিকে কোনো ইংগিত করাই যথেষ্ট ছিলো। হুনায়নের ঘটনাটা ঘটেছিলো ৮ম হিজরী শওয়াল মাসে মক্কা বিজয়ের পর। রসূল (স.) তখন সবেমাত্র মক্কা বিজয় সম্পন্ন করেছেন,

সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছেন, মক্কার সাধারণ অধিবাসীরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং রসূল (স.) তাদেরকে মুক্ত ও স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছেন। সহসা জানতে পারলেন যে, হাওয়াযেন গোত্র তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ ঘটাচ্ছে এবং তাঁকে হত্যা করার চক্রান্ত আঁটছে। এই বাহিনীর সেনাপতি হয়েছে মালেক ইবনে আওফ আন-নাফরী এবং সমগ্র বনু সাকীফ, বনু যাশাম, বনু সা'দ বিন বকর, বনু হিলালের ক্ষুদ্র একটা অংশ। বনু আমর ইবনে আমের ও বনু আওফ ইবনে আমেরের একটা অংশ এই বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো। নারী, শিশু, গবাদি পশু এবং তাদের যা কিছু ছিলো সব কিছু নিয়ে ময়দানে নেমেছে। মক্কা বিজয়ের জন্যে নিয়ে আসা বাহিনীকে অর্থাৎ মোহাজের, আনসার ও আরব গোত্রসমূহের সদস্যরা মিলে দশ হাজার লোক এবং সেই সাথে মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণকারী আরো দু'হাজার লোককে সাথে নিয়ে রসূল (স.) হুনায়নে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হুনায়ন হলো মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটা জায়গা। দিনের শুরুতে অতি প্রত্যুষে এ যুদ্ধ শুরু হয়। মুসলমানরা যখন হুনায়নে নামলো, তার আগেই হাওয়াযেন গোত্র সেখানে উপস্থিত হয়ে লুকিয়ে ছিলো। তারা একযোগে এমন জোরদার হামলা চালায় যে, মুসলমানরা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু রসূল (স.) অটল থাকেন। তিনি তাঁর খচ্চরে আরোহণ করে শত্রুর দিকে এগিয়ে চললেন। হযরত আব্বাস তার ডান দিকের লাগাম এবং আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেস ইবনু আবদুল মোত্তালেব তার বামদিকের লাগাম ধরে আটকে রাখছিলেন যাতে দ্রুতবেগে না চলে। এ সময় রসূল (স.) নিজের নাম উচ্চারণ করে মুসলমানদের ফিরে আসার জন্যে ডাকছিলেন। বলছিলেন, হে আল্লাহর বান্দারা 'আমার দিকে এস, আমি রসূলুল্লাহর দিকে চলে এসো।' তিনি কখনো বলছিলেন, আমি নবী মিথ্যুক নই, আমি আবদুল মোত্তালেবের বংশধর। তাঁর সাথে প্রায় একশো সাহাবী ময়দানে টিকে ছিলো। কারো কারো মতে ৮০ জন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর, ওমর, আব্বাস, আলী, ফযল বিন আব্বাস, আবু সুফিয়ান বিন আল হারেস, আয়মান ইবনে উম্মে আয়মান ও উসামা ইবনে যায়দ প্রমুখ। এরপর রসূল (স.) উচ্চ কণ্ঠধারী হযরত আব্বাসকে উচ্চস্বরে এই বলে ডাকতে বললেন,

'ওহে বৃক্ষের নীচে বসে অংগীকারকারীরা,

অর্থাৎ বায়য়াতুর রিদওয়ানে যারা অংগীকার করেছিলো যে, রসূল (স.)-কে ছেড়ে কখনো পালাবে না। এভাবে ডাকতে থাকলে সাহাবীরা লাব্বায়ক লাব্বায়ক বলে সাড়া দিতে লাগলেন। অবশেষে সবাই রসূল (স.)-এর দিকে ফিরে আসতে লাগলো। কারো কারো উট ফিরতে না চাইলে সে বর্ম পরে উট থেকে নেমে চলে এসেছে ও উটকে ছেড়ে দিয়েছে। এভাবে যখন কিছু লোক রসূল (স.)-এর কাছে সমবেত হলো, তখন রসূল (স.) পাল্টা আক্রমণ চালাতে আদেশ দিলেন। এবার মোশরেকেরা পরাজিত হলো। মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া করে কাউকে হত্যা ও কাউকে বন্দী করলো। এরপর বাদবাকী পলাতকরা আর ফিরে আসেনি, যতোক্ষণ না রসূল (স.)-এর কাছে বিপুল সংখ্যক বন্দী জমায়েত হয়ে গেছে।

এ যুদ্ধেই সর্বপ্রথম মুসলমানদের ১২ হাজার সৈন্য একত্রিত হয়েছিলো। এই সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা গর্ব বোধ করে এবং বিজয়ের আসল ও প্রধান উপকরণ আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যা। তাই আল্লাহ প্রথমদিকে তাদেরকে পরাজিত করেন এবং পরে রসূল (স.)-এর কাছে টিকে থাকা স্বল্প সংখ্যক মোজাহেদের হাতেই বিজয় দান করেন।

আয়াতে যুদ্ধের বাস্তব দৃশ্য ও তার মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিবরণ এভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

'যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে গর্বিত করে। কিন্তু এরপর আর কোনো জিনিস তোমাদের কাজে আসেনি, সুপরিসর পৃথিবী তোমাদের কাছে সংকীর্ণ মনে হয়েছে, অতপর তোমরা পেছন দিক পালিয়ে গেলে'.......

এখানে এই কয়েকটা বাক্যে অনেকগুলো দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যথা সংখ্যাধিক্যজনিত গর্ববোধ, মানসিক পরাজয়ের কাঁপুনি, এমন শ্বাসরুদ্ধকর সংকীর্ণতাবোধ যেন গোটা পৃথিবী সংকুচিত হয়ে প্রবল জোরে চেপে ধরেছে। অতপর বাস্তব পরাজয়ের ধাক্কা ও ঝাঁকুনি এবং পেছন দিকে পালিয়ে যাওয়া।

'অতপর আল্লাহ তায়ালা প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন মোমেনদের ওপর ......' যেন প্রশান্তি একটা চাদর, যা অবতীর্ণ হয় এবং মনের অস্থিরতা ও উত্তেজনাকে প্রশমিত করে।

'এবং এমন এক বাহিনী নামালেন যাদেরকে তোমরা দেখনি।'

এই সৈন্যবাহিনী কেমন ও কী প্রকৃতির, আমরা জানি না। কোরআন নিজেই বলেছে যে, তোমার প্রভুর সৈন্যসামন্ত সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ কিছুই জানে না।

'এবং কাফেরদের শাস্তি দিলেন।'

হত্যা, গ্রেফতারী, সম্পদহরণ ও পরাজয় দানের মাধ্যমে শাস্তি দিলেন।

'আর ওটাই কাফেরদের কর্মফল। অতপর আল্লাহ ক্ষমা করেন ....' কেননা ক্ষমার দ্বার সব সময় উন্মুক্ত- যে গুনাহ করে ও তাওবা করে তার জন্যে।

এখানে হুনায়নের যুদ্ধের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তা আমাদের সামনে তুলে ধরেছে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ও আল্লাহর শক্তি ছাড়া অন্যান্য শক্তির ওপর নির্ভর করার ফল কী হয়ে থাকে। সেই সাথে প্রত্যেকটা আকীদা ও আদর্শ যে শক্তির ওপর নির্ভরশীল, সেই শক্তির প্রকৃত পরিচয়ও আনুসংগিকভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। নিছক সংখ্যাগত আধিক্য কোনো আদর্শের জন্যেই তেমন লাভজনক নয়। যে আদর্শের অনুসারীরা আদর্শকে জানে ও চেনে এবং তার প্রতি অবিচল আনুগত্য পোষণ করে, সে আদর্শের অনুসারীরা সংখ্যায় অল্প হলেও গুরুত্বপূর্ণ ও লাভজনক শক্তি, অনেক সময় সংখ্যাধিক্যও পরাজয়ের কারণ হয়ে থাকে। কেননা এর অনুসারীদের অনেকেই নিছক ভাবাবেগের বশে তাতে ডুবে থাকতে পারে। কিন্তু আদর্শের প্রকৃতি ও তাৎপর্য হয়তো তার জানা থাকে না। ফলে যে কোনো সংকটকালে তার পদস্খলন ঘটতে পারে। ফলে অনুসারীদের ভেতরে অস্থিরতা ছড়িয়ে পরাজয় অনিবার্য করে তুলতে পারে। উপরন্তু সংখ্যাধিক্য আদর্শের অনুসারীদের ধোকায় ফেলতে পারে। ফলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মযবুত করার আবশ্যকতা সে উপেক্ষা করতে পারে। কেননা এই প্রকাশ্য সংখ্যাধিক্যের কারণে জীবনে সাফল্য ও বিজয়ের প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে সে সচেতন থাকে না, সে ভাবে, সংখ্যাধিক্যই তাকে বিজয় এনে দেবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মযবুত করার দরকার নেই। অথচ আসলে তা নয়। অন্য সব আদর্শের মতো ইসলামের বেলায়ও একথাটা সত্য। প্রত্যেক আদর্শই তার সর্বোত্তম একনিষ্ঠ সেবকদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে- স্রোতে ভাসা ফেনার মতো কিংবা বাতাসে ওড়া খড়কুটোর মতো মেরুদন্ডহীন নামধারী অনুসারীদের দ্বারা নয়।

যারা শেরক করে তারা পবিত্র নয়

এ পর্যায়ে পৌঁছে ইতিহাসের নিকটতম স্মৃতি মুসলমানদের মনে জাগিয়ে তোলার পর পরবর্তী আয়াতে মোশরেকদের সম্পর্কে সর্বশেষ কথা উচ্চারণ করা হয়েছে, যা কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে। বলা হয়েছে,

'হে মোমেনরা! মোশরেকরা অপবিত্র। কাজেই তারা যেন এ বছরের পর আর কখনো মাসজিদুল হারামের কাছে আসতে না পারে ....' (আয়াত ২৮)

এখানে প্রকৃতপক্ষে মোশরেকদের আত্মাকে অপবিত্র আখ্যায়িত করে সেটাকেই তাদের আসল পরিচয় হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। আত্মা অপবিত্র হওয়ার কারণে তারা সর্বতোভাবে অপবিত্র। পবিত্রাত্মাদের কাছে তাদের অপবিত্রতা অনুভূত হয় এবং তা থেকে তারা পবিত্রতা অর্জন করে।

এখানে আসলে দৈহিক নয় বরং আত্মিক অপবিত্রতার কথাই বলা হয়েছে। তাদের শরীর নোংরা, একথা বলা হয়নি। এটা কোরআনের বিশেষ বাচনভংগি।

'অপবিত্র, তাই তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের কাছে না আসতে পারে।'

মাসজিদুল হারামে তাদের উপস্থিতি ও অবস্থানকে নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে এ হচ্ছে চরম পদক্ষেপ। এমনকি মাসজিদুল হারামের ধারে কাছে আসার ওপরও এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য। আর এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, তারা অপবিত্র।

কিন্তু যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক লাভের জন্যে মক্কাবাসী সারা বছর হজ্জের অপেক্ষা করে থাকে, সমস্ত আরবের লোকেরা যার ভিত্তিতে জীবন ধারণ করে এবং শীত ও গ্রীষ্মের যে বাণিজ্যিক সফর তাদের জীবিকার উৎস, সে সবই মোশরেকদের হজ্জ নিষিদ্ধ হওয়ায় ও তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জেহাদ ঘোষণায় নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। তা যাক। এটা আদর্শ, আল্লাহ চান মুসলমানদের মন আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ হোক এবং সর্বান্তকরণে অনুগত হোক।

এরপর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন। প্রচলিত রীতি প্রথার বাইরে থেকেও আল্লাহ জীবিকা সরবরাহ করতে পারেন,

'তোমরা যদি দারিদ্রের আশংকা করো, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে সচ্ছল করবেন।'

আল্লাহ যখন চান, তখন জীবিকার কিছু উপকরণ বিলুপ্ত করে বিকল্প কিছু উপকরণ যোগাড় করে দিতে পারেন। তিনি জীবিকার এক পথ বন্ধ করে অন্য পথ খুলে দিয়ে থাকেন।

'নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ।'

তাই তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে সব বিষয়ের ফায়সালা করেন এবং সূক্ষ্ম হিসাব ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে সব কিছু পরিচালনা করেন।

কোরআনী জীবন বিধান বিজয়োত্তর যে ইসলামী সমাজে কার্যকর ছিলো, সে সমাজের ইসলামী মানে পরবর্তী সময়ে যথাযথ সমন্বয় ও ভারসাম্য অর্জিত হয়নি। আমরা এই পর্বের বিভিন্ন আয়াতে লক্ষ্য করি যে, এই সমাজে কিছু ফাঁক ফোকর অবশিষ্ট ছিলো। এই ফাঁক-ফোকর বন্ধ করার কাজেও যে কোরআনী বিধান সক্রিয় ছিলো, তাও আমরা লক্ষ্য করি। মুসলিম উম্মাহকে কোরআন সুদীর্ঘকালব্যাপী তার অতুলনীয় বিধানের প্রশিক্ষণ দিতে অব্যাহত চেষ্টা সাধনা চালিয়ে আসছে।

কোরআন যে সর্বোচ্চ চূড়ায় মুসলিম উম্মাহকে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলো, সেটা হলো একমাত্র আল্লাহর জন্যে একাগ্র ও একনিষ্ঠ হওয়া এবং তাঁর দ্বীনের জন্যে নিবেদিত ও উৎসর্গিত হওয়া। কোরআন চেয়েছিলো মুসলমানরা ইসলামী আকীদা ও আদর্শের মোকাবেলায় সকল আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে এবং জীবনের সকল স্বাদ ও আনন্দ পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যাক। আর এজন্যে সে আল্লাহর বিধান ও মানব রচিত বিধানের পার্থক্য স্পষ্ট করে দিয়েছিলো। সে দেখিয়ে দিয়েছিলো যে, এই দুটো বিধান সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। তারা কখনো একত্রে থাকতে পারে না ও সহাবস্থান করতে পারে না। কারণ একটার ভিত্তি সকল মানুষ কর্তৃক এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করার ওপর, আর অপরটার ভিত্তি মানুষের একে অপরকে মনিব হিসাবে গ্রহণ করার ওপর।

আল্লাহর বিধানের এই স্বভাব প্রকৃতি ও তাৎপর্য জাহেলী তথা মানব রচিত বিধানের স্বভাব প্রকৃতি ও তাৎপর্য এবং উভয়ের মধ্যকার এই ব্যবধান না বুঝে মানুষ ইসলামী আইন কানুন ও বিধি বিধানের যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারে না। এর মধ্যে সেই সব বিধি বিধানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা মুসলিম ও অমুসলিম সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেন-দেনের পদ্ধতি নির্ণয় করে।

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا
حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ
حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ
اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَٰرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَٰهِهِمْ ۖ
يُضَٰهِـُٔونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَٰتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ
مَرْيَمَ ۖ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ
إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَٰفِرُونَ ﴿٣٢﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ

২৯. যাদের ইতিপূর্বে কেতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে না, পরকালের ওপর ঈমান আনে না, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল যা কিছু হারাম করেছেন তা হারাম বলে স্বীকার করে না, (সর্বোপরি) সত্য দ্বীনকে (নিজেদের) জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও, যে পর্যন্ত না তারা পদানত হয়ে স্বেচ্ছায় জিযিয়া (কর) দিতে শুরু করে।

রুকু ৫

৩০. ইহুদীরা বলে ওযায়র আল্লাহর পুত্র, (আবার) খৃষ্টানরা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র; (আসলে) এ সবই হচ্ছে তাদের মুখের কথা, তাদের আগে যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে, (এসব কথার মাধ্যমে) এরা তাদেরই অনুকরণ করছে মাত্র; আল্লাহ তায়ালা এদের (সবাইকে) ধ্বংস করুন, (তাকিয়ে দেখো) এদের কিভাবে (আজ দ্বারে দ্বারে) ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে! ৩১. এ লোকেরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম, তাদের পীর-দরবেশদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়াম পুত্র মাসীহকেও (কেউ কেউ মাবুদ বানিয়ে রেখেছে), অথচ এদের এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারোই বন্দেগী করতে আদেশ দেয়া হয়নি, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; তারা যাদের আল্লাহর সাথে শরীক করে, তিনি এসব (কথাবার্তা) থেকে অনেক পবিত্র। ৩২. এ (মূর্খ) লোকেরা তাদের মুখের (এক) ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর (দ্বীনের) মশাল নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ আলোর পূর্ণ বিকাশ ছাড়া অন্য কিছুই চান না, যদিও কাফেরদের কাছে এটা খুবই অপ্রীতিকর! ৩৩. তিনিই (মহান আল্লাহ), যিনি (তোমাদের কাছে) সুস্পষ্ট হেদায়াত ও সঠিক জীবনবিধান

وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ
وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

সহকারে তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন, যেন সে এই বিধানকে (দুনিয়ার) সব কয়টি বিধানের ওপর বিজয়ী করে দিতে পারে, মোশরেকরা (এ বিজয়কে) যতো দুঃসহই মনে করুক না কেন! ৩৪. হে ঈমানদার লোকেরা, (আহলে কেতাবদের) বহু পন্ডিত ও ফকির-দরবেশ এমন আছে, যারা অন্যায়ভাবে সাধারণ মানুষের সম্পদ ভোগ করে, এরা (আল্লাহর বান্দাদের) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়েও রাখে; (এদের মাঝে) যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং (কখনো) তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদের কঠিন পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। ৩৫. (এমন একদিন আসবে) যেদিন (পুঞ্জীভূত) সোনা-রূপা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতপর তা দিয়ে (যারা এগুলো জমা করে রেখেছিলো) তাদের কপালে, তাদের পার্শ্বে ও তাদের পিঠে চিহ্ন (এঁকে) দেয়া হবে (এবং তাদের উদ্দেশ করে বলা হবে), এ হচ্ছে তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে, অতএব যা কিছু সেদিন তোমরা জমা করেছিলে (আজ) তার স্বাদ গ্রহণ করো।

তাফসীর
আয়াত ২৯-৩৫

সূরার এই দ্বিতীয় পর্বটাতে মুসলমান ও আহলে কেতাবের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণকারী চূড়ান্ত বিধি বিধান আলোচিত হয়েছে, প্রথম পর্বটায় যেখানে শুধু আরবের মোশরেকদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক নির্ধারণের নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে দ্বিতীয় পর্বে সন্নিবেশিত হয়েছে আরব অনারব নির্বিশেষে সকল আহলে কেতাবের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক নির্ণয়ের বিধান।

এ পর্বে সন্নিবেশিত এ সব চূড়ান্ত বিধিসমূহে মুসলমান ও আহলে কেতাবের মধ্যকার সম্পর্ক নির্দেশকারী পূর্ববর্তী বিধানগুলোতে মৌলিক রদবদল সংঘটিত হয়েছে। বিশেষত খৃষ্টানদের সম্পর্কে। কেননা পুর্বে আরবে ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হলেও খৃষ্টানদের সাথে কিছুই হয়নি।

নতুন বিধিসমূহে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে, তা হলো আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃতকারী আহলে কেতাবদের সাথে ততোক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করা, যতোক্ষণ তারা বশ্যতা স্বীকার পূর্বক

স্বহস্তে জিযিয়া না দেয়। জিযিয়া দেয়া ছাড়া তাদের সাথে কোনো আপোষ চুক্তি বা মৈত্রী চুক্তি গ্রহণ করা হবে না। জিযিয়া দিলে তারা চুক্তিবদ্ধ যিম্মী (ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক যে সব অমুসলিমকে জান ও মালের পূর্ণ নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তার গ্রান্টি প্রাপ্ত অমুসলিম) হিসাবে যাবতীয় অধিকার ও সুযোগ সুবিধা পাবে। তাদের মধ্যে ও মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করবে। আর যখন তারা আকীদা হিসাবে ইসলামকে গ্রহণ করবে, তখন তো তারা মুসলমানই হয়ে যাবে।

আকীদা বিশ্বাসের পর্যায়ে ও ধর্ম হিসাবে ইসলামকে গ্রহণ করতে তাদেরকে বাধ্য ও জোর জবরদস্তি করা যাবে না। ইসলামের অটল ও চিরন্তন মূলনীতি হলো, 'লাইকরাহা ফিদ্দীন' অর্থাৎ 'ইসলামে কোনো জোরজবরদস্তি নেই।' তবে তাদেরকে জিযিয়া না দেয়া পর্যন্ত এবং এর ভিত্তিতে তাদের ও মুসলমানের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দেশ ও জাতির নিরাপত্তা ও শৃংখলার স্বার্থে তাদেরকে নিজ ধর্মে বহাল থাকার অনুমতিও দেয়া হয় না।

মুসলমানদের ও আহলে কেতাবের মধ্যকার সম্পর্ক ও লেন-দেনের পন্থা নির্দেশকারী নীতিমালায় এই যে সর্বশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা বুঝতে হলে একদিকে যেমন আল্লাহর বিধান ও জাহেলী বিধানগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে বুঝা চাই, অপরদিকে তেমনি বুঝা দরকার ইসলামী বিধানের প্রকৃতি, তার বিভিন্ন স্তর ও ধাপ এবং মানব জাতির পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইসলামী উপায় উপকরণগুলোকেও।

আল্লাহর বিধান ও মানব রচিত বিধানের মধ্যকার সম্পর্কের স্বভাব ও প্রকৃতি এই যে, বিশেষ অবস্থায় ও বিশেষ শর্তাধীনে ছাড়া উভয়ের সহাবস্থান অসম্ভব। এর মূলনীতি এই যে, এক আল্লাহর দাসত্ব করা এবং মানুষ কর্তৃক মানুষের দাসত্বের নীতি পরিহার করার উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রচারিত সর্বজনীন ঘোষণার বিরুদ্ধে সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো বাধা সহ্য করা যাবে না। কারণ আল্লাহর বিধান সব কিছুর ওপর পরাক্রান্ত থাকতে চায়, যাতে সে মানুষকে মানুষের ও অন্যান্য সৃষ্টির গোলামী থেকে মুক্তি দিতে পারে। কেননা এটাই ছিলো ইসলামের সর্বজনীন ঘোষণা। পক্ষান্তরে জাহেলী বিধানগুলো নিজেদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ইসলামী বিধান ও আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চায়।

আর ইসলামী বিধানের স্বভাবই হলো যে, সে মানব জাতির এই বাস্তব অবস্থার মোকাবেলা করার জন্যে এক জোরদার আন্দোলন চালু করে, যা বিভিন্ন পর্যায়ে তার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে এবং পর্যায়ক্রমিক ও চূড়ান্ত বিধি বিধান দিয়ে ইসলামী ও জাহেলী সমাজের সম্পর্কের পন্থা নির্ধারণ করে।

সূরার বর্তমান পর্বের আয়াতগুলো এই সম্পর্কের প্রকৃতি ও পন্থা যাতে স্থির করতে পারে, সে জন্যে আহলে কেতাবের অনুসৃত ধর্ম ও বিধানের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। এই বিধানকে সে সুস্পষ্ট ভাষায় 'শেরেক' 'কুফর' ও 'বাতিল' বলে আখ্যায়িত করে। সেই সাথে এরূপ আখ্যা দানের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্যে আহলে কেতাবের অনুসৃত রীতিনীতি, আকীদা বিশ্বাস, আচার আচরণ ও সমাজ ব্যবস্থার নমুনা তুলে ধরে দেখিয়ে দেয় যে, তা পূর্ববর্তী কাফেরদের আকীদা বিশ্বাস ও আচার আচরণের মতো।

আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে,

প্রথমত, তারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না। দ্বিতীয়ত, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা যা নিষিদ্ধ করেন, সেগুলো তারা নিষিদ্ধ গণ্য করে না। তৃতীয়ত, তারা সত্য দ্বীন ইসলামের

অনুসারী নয়। চতুর্থত, আহলে কেতাবের একটা অংশ অর্থাৎ ইহুদীরা হযরত ওযায়ের (আ.)-কে এবং অপর অংশ খৃষ্টানরা হযরত ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে অভিহিত করেছে। এ দুটো গোষ্ঠী তাদের এই বক্তব্যের মাধ্যমে নিজেদেরকে গ্রীক, রোমান, হিন্দু ও ফেরাউনী পৌত্তলিকতার অনুসারীরূপে প্রমাণ করেছে। (পরবর্তীতে আমরা প্রমাণ করে দেখাবো যে, খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদী ধারণা এবং খৃষ্টান ও ইহুদীদের পক্ষ থেকে আল্লাহর নবীকে আল্লাহর পুত্র আখ্যা দান, প্রাচীন পৌত্তলিকদের কাছ থেকে আমদানীকৃত ধারণা মাত্র। এগুলো খৃষ্টবাদ বা ইহুদীদের মৌলিক চিন্তাধারা নয়।)

পঞ্চমত, তারা হযরত ঈসাকে খোদা মেনে নেয়ার মত তাদের মধ্যকার সুফী দরবেশদেরদেরকেও তথা নেতৃস্থানীয় রব মেনে নিয়েছে। এভাবে তাদেরকে যে তাওহীদের শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো, তা লংঘন করে তারা মোশরেকে পরিণত হয়েছে।

ষষ্ঠত, তারা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। তারা আল্লাহর প্রদীপ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়। তাই তারা 'কাফের'।

সপ্তমত, আহলে কেতাবের মধ্যকার বহু আলেম ও দরবেশ অবৈধভাবে জনগণের সম্পদ আত্মসাত করে ও আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে জোরপূর্বক ফিরিয়ে রাখে। আহলে কেতাবের এ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোকেই তাদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক নির্ধারণের চূড়ান্ত বিধিমালা রচিত হয়েছে।

আহলে কেতাবের অনুসৃত বিধান, আকীদা বিশ্বাস ও আচার আচরণ সম্পর্কে এখানে যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, তা দৃশ্যত কোরআনের পূর্ববর্তী মূল্যায়ন থেকে ভিন্ন ও আকস্মিক বলে মনে হয়। প্রাচ্যবাদীরা, খৃস্টান মিশনারীরা এবং তাদের শিষ্যরাও এরূপ ধারণা করে এবং দাবী করে যে, রসূল (স.) আহলে কেতাব সম্পর্কে তাদের নীতি, বিধি ও বক্তব্য পাল্টে ফেলেছেন। তিনি যখনই অনুভব করেছেন যে, আহলে কেতাবকে হেয় প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছেন, তখনই নিজের মতামত এভাবে রাতারাতি পাল্টে ফেলেছেন।

কিন্তু কোরআনের মক্কী ও মাদানী অংশে আহলে কেতাব সংক্রান্ত আলোচনা ও মূল্যায়নের বাস্তবানুগ পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম প্রথম আবির্ভূত হয়ে আহলে কেতাবের যে আকীদা বিশ্বাস দেখতে পেয়েছে, সে সম্পর্কে ইসলামের মূল দৃষ্টিভংগিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তাদের কাছে আগত আল্লাহর দ্বীনের বিকৃতি সাধন ও মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে আগত আল্লাহর বিশুদ্ধ দ্বীনের প্রতি অস্বীকৃতির ব্যাপারে আহলে কেতাবের ভূমিকা সম্পর্কে কোরআনের মূল্যায়ন আগেও যা ছিলো, পরেও তাই থেকেছে। কোরআনের নীতি ও দৃষ্টিভংগিতে পরিবর্তন যেটুকু হয়েছে, তা তাদের সাথে মুসলমানদের আচরণ, লেনদেন ও সম্পর্ক কেমন হবে, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমরা আগেই বলেছি যে, এ বিষয়টা পরিবর্তনশীল বাস্তব অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আহলে কেতাবের মূল আকীদাগত ও আদর্শিক অবস্থান সম্পর্কে আল্লাহর সিদ্ধান্ত প্রথম দিন থেকে এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিতই রয়েছে।

আহলে কেতাবদের ব্যাপারে কোরআনের দৃষ্টিভংগী

এখানে কোরআনের আহলে কেতাব ও তাঁদের ধর্ম সক্রান্ত মূল্যায়নের কিছু কিছু নমুনা তুলে ধরছি। অতপর ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের সেই ভূমিকা ও পর্যালোচনা করবো, যা তাদের সাথে সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান চরম বিধিসমূহের উদ্ভবের কারণ।

মক্কায় ইহুদী বা খৃষ্টানদের তেমন চোখে পড়ার মতো গোষ্ঠীগত অবস্থান ছিলো না। সেখানে তারা ছিলো ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কতিপয় বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি। কোরআন তাদের সম্পর্কে জানায় যে, তারা ইসলামকে আনন্দের সাথে অভ্যর্থনা ও সমর্থন জানিয়েছিলো। তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং সাক্ষ্য দিয়েছিলো যে, ইসলাম ও তার বাহক রসূল (স.) সত্য ও সত্যবাদী এবং তাদের কেতাবে তাঁর প্রতি সমর্থনসূচক বক্তব্য রয়েছে। এ সমস্ত লোক ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যকার সেই সব লোকই ছিলো, যারা তখনো তাওহীদের ওপর অবিচল ছিলো। কেউ কেউ পূর্ববর্তী অন্যান্য আসমানী কেতাবের অনুসারীও ছিলো। এদের সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে,

'যাদেরকে আমি ইতিপূর্বে কেতাব দিয়েছি, তারা এই দাওয়াতের ওপর ঈমান আনে......... (আল কাসাস ৫২-৫৩)

'..... যাদেরকে ইতিপূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের সামনে এই কেতাব পড়া হলে তারা সেজদায় পড়ে যায়।' (আল ইসরা, ১০৭-১০৯)

'বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, এ কেতাব যদি আল্লাহর কাছ থেকে হয়ে থাকে, তোমরা একে অস্বীকার কর এবং বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অনুরূপ জিনিসের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে ও ঈমান এনেছে, অথচ তোমরা অহংকার করলে, এটা কেমন কাজ হলো? ....' (আল আহকাফ ১০)

'এভাবে আমি তোমার কাছে কেতাব নাযিল করেছি। যাদেরকে কেতাব দিয়েছি, তারা এর ওপর ঈমান আনে। ....' (আল আনকাবুত ৪৭)

'তবে কি আমি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ফায়সালাকারী খুঁজবো! যাদেরকে আমি কেতাব দিয়েছি, তারা জানে যে, এটা তোমার প্রভুর কাছ থেকে নির্ভুলভাবে নাযিল হয়েছে ....' (আল আনয়াম ১১৪)

'আর যাদেরকে আমি কেতাব দিয়েছি, তারা তোমার কাছে নাযিল হওয়া কেতাবের প্রতি আনন্দিত ....' (আর-রাদ ৩৬)

এভাবে ইসলাম গ্রহণে মদীনার কোনো কোনো ব্যক্তিও এগিয়ে এসেছিলো। মাদানী সূরায় এ সম্পর্কে কিছু কিছু বিবরণ রয়েছে। এগুলোতে বলা হয়েছে যে, তারা খৃষ্টান ছিলো। কারণ মক্কায় যে সব ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, মদীনার ইহুদীরা তাদের থেকে ভিন্ন নীতি অবলম্বন করেছিলো। কেননা মদীনায় ইসলামের আগমন সম্পর্কে তারা শংকিত ছিলো।

'আহলে কেতাবের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর প্রতি, তোমাদের প্রতি নাযিল হওয়া কেতাবে প্রতি এবং তাদের প্রতি নাযিল হওয়া কেতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।.....' (আলে ইমরান ১৯৯)

'মোমেনদের প্রতি সবচেয়ে শত্রুভাবাপন্ন দেখবে ইহুদী ও মোশরেকদেরকে, আর সবচেয়ে বন্ধু ভাবাপন্ন দেখবে খৃষ্টানদের............' (আলে মায়েদা ৮২, ৮৫)

কিন্তু এ সব ব্যক্তির ভূমিকার সাথে আরবের আহলে কেতাবের অধিকাংশের ভূমিকার কোনো মিল ছিলো না, বিশেষত ইহুদীদের। ইহুদীরা যে মুহূর্তে অনুভব করেছে যে, মদীনায় ইসলামের আগমন ঘটতে পারে, সেই মুহূর্ত থেকেই ইসলামের ওপর জঘন্য আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। এ আক্রমণে তারা সম্ভাব্য সব রকমের পন্থা অবলম্বন করেছে। ইসলাম গ্রহণ করতে তো অস্বীকার করেছেই, এমনকি তাদের কেতাব তাওরাতে রসূল (স.) সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তাও অস্বীকার করেছে। অথচ তাওহীদবাদী বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরা তা স্বীকার করতো। অনুরূপভাবে কোরআন এই অস্বীকৃতির বিবরণ এবং সত্য দ্বীন থেকে তাদের বিচ্যুতি, বিকৃতি ও

বাতিল ধ্যান ধারণা পোষণের বিবরণ বিভিন্ন মাদানী সূরায় দিয়েছে। অনুরূপভাবে কোরআনের মক্কী অংশেও আহলে কেতাবের ধর্মমতের প্রকৃত পরিচয় দিয়েছে। যেমন,

সূরা আয্ যুখরুফ (আয়াত ৬৩-৬৫), সূরা আশ্ শূরা (আয়াত ১১৪), সূরা আল আরাফ (আয়াত ১৬১-১৬৩), সূরা আল আরাফ (১৬৭), সূরা আল আরাফ (১৬৯)।

পক্ষান্তরে মাদানী অংশেও আহলে কেতাবের ধর্মের অবস্থা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের জঘন্য আক্রমণাত্মক ভূমিকার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এসব বিবরণ সূরা আল বাকারা, আলে ইমরান, আন নিসা ও আল মায়েদায় রয়েছে। সূরা তাওবায় তাদের সম্পর্কে কঠোরতম কথা উচ্চারিত হয়েছে। এখানে আমি কয়েকটা নমুনা তুলে ধরছি। যথা,

'আল বাকারা (৭৫-৭৯), আল বাকারা (৮৭-৯১), আলে ইমরান (৯৮-৯৯), আন নিসা (৫১-৫২), আল মায়েদা (৭১-৭৫)।

কোরআনের মক্কী ও মাদানী উভয় অংশেই এ ধরনের বহু আয়াত রয়েছে। এসব আয়াত পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর সঠিক ও নির্ভুল ধর্ম থেকে আহলে কেতাবের বিচ্যুতির ব্যাপারে কোরআনের দৃষ্টিভংগি সব জায়গায় একই রকম ছিলো। তাদের বিচ্যুতি, বিকৃতি, শেরেক, কুফর ও ফাসেকী সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য শেষ সূরাগুলোতে নতুন ছিলো না। তাদের আকীদা বিশ্বাসে নতুন কিছুর উদ্ভব হয়েছে একথা কোরআনে বলা হয়নি। তবে আহলে কেতাবের মধ্যকার সৎ লোকদের প্রশংসা করতেও কোরআন কসূর করেনি। তাদের সততা ও ন্যায় নিষ্ঠতার ব্যাপারে ইনসাফপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে বলেছে। এর নমুনা হচ্ছে নিম্নের আয়াতগুলো,

আল আরাফ (১৫৯), আলে ইমরান (৭৫), আলে ইমরান (১১২-১১৫)।

পরিবর্তন যেটুকু ঘটেছে, সেটা আহলে কেতাবের সাথে লেনদেন ও আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ পরিবর্তন এসেছে ধাপে ধাপে, পর্যায়ক্রমে এবং বিভিন্ন ঘটনার পরিণতিতে। আহলে কেতাবের অবস্থা, আচরণ ও মুসলমানদের সাথে তাদের ব্যবহারের মোকাবেলায় ইসলামী আন্দোলনের পদ্ধতিগত ও কৌশলগত বিধি অনুসারে এ সব পরিবর্তন এসেছে।

এক সময় মুসলমানদেরকে আহলে কেতাবের সাথে সুন্দরতম আচরণ করতে, যুক্তি সহকারে দাওয়াত দিতে ও তাদের বাড়াবাড়িকে ক্ষমা করতে নির্দেশ দেয়া হতো। যেমন,

আল আনকাবুত (৪৬), আল বাকারা (১৩৬-১৩৭), আলে ইমরান (৬৪), আল বাকারা (১০৯)।

এরপর আল্লাহ নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন এবং মুসলমানদেরকে একমাত্র তার ওপর নির্ভরশীল করলেন, বিভিন্ন ঘটনা ঘটলো, আইন-কানুনের রদবদল হলো এবং ইতিবাচক বিপ্লবী বিধিসমূহ প্রবর্তিত হলো। শেষ পর্যন্ত সূরা তাওবার এ সব চরম বিধি নাযিল হলো, যা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি।

বস্তু ইসলামের দৃষ্টিতে আহলে কেতাবের আকীদা বিশ্বাসে, চরিত্রে ও আচরণে যে বিকৃতি ও বিচ্যুতি, আল্লাহর প্রতি শেরেক ও তার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার যে প্রবণতা ছিলো, তাতে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। পরিবর্তন ঘটেছে শুধু তাদের সাথে আচরণের পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধিতে। এ পরিবর্তন যে মূলনীতিগুলোর আলোকে সংঘটিত হয়েছে, সে সম্পর্কে বর্তমান পর্বের ভূমিকায় আলোচনা করে এসেছি। বিশেষত নিম্নোক্ত প্যারাগুলো পড়ে দেখুন।

'মুসলমানদের ও আহলে কেতাবের মধ্যকার সম্পর্ক ও লেনদেনের পন্থা নির্দেশকারী নীতিমালায় এই যে সর্ব শেষ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা বুঝতে হলে একদিকে যেমন আল্লাহর বিধান ও জাহেলী বিধানগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে বুঝা চাই, অপরদিকে তেমনি বুঝা দরকার ইসলামের বিধানের প্রকৃতি, তার বিভিন্ন স্তর ও ধাপ এবং মানব জাতির পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইসলামী উপায় উপকরণগুলোকেও। ....'

আহলে কেতাবদের ব্যাপারে মুসলমানদের নীতিগত অবস্থান

এবার আমরা আহলে কেতাব ও মুসলমানদের মধ্যকার নীতিগত অবস্থানের প্রকৃতি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করবো, এটা স্থায়ী তাত্ত্বিক দিক হোক, কিংবা হোক ঐতিহাসিক। কেননা এসব মৌলিক উপাদানই চূড়ান্ত বিধিসমূহের উদ্ভবের কারণ ঘটিয়েছে।

আহলে কেতাব ও মুসলমানদের মধ্যকার নীতিগত অবস্থান কী ধরনের ছিলো, সেটা আমাদের খুঁজে দেখতে হবে প্রথমত সে সম্পর্কে কোরআনে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার ভেতরে। এই বর্ণনা যেহেতু আল্লাহ তায়ালা নিজেই দিয়েছেন, তাই এতে ভুলের কোনো অবকাশ নেই। দ্বিতীয়ত সেই সব ঐতিহাসিক বিবরণীতে খুঁজতে হবে, যা কোরআনের বিবরণকে সত্যায়ন করে।

মুসলমানদের প্রতি আহলে কেতাবের নীতি ও ভূমিকা কী ছিলো, সেটা আল্লাহ তায়ালা কোরআনে একাধিক জায়গায় বর্ণনা করেছেন। কোথাও তিনি এ বিষয়টা শুধুমাত্র আহলে কেতাব সম্পর্কেই বর্ণনা করেন, আবার কোথাও তা কাফেরদের সাথে যুক্তভাবে করেন। কেননা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভংগি অভিন্ন। আবার কখনো আহলে কেতাবের বাস্তব ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন, যা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লক্ষ্য ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনগত অবস্থান নির্দেশ করে। এ সম্পর্কে যে আয়াতগুলো রয়েছে, তা আর আমাদের কোনো মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না। কয়েকটা নমুনা তুলে দিচ্ছি,

'আহলে কেতাবের মধ্য যারা কুফরি করেছে তারা ও মোশরেকরা পছন্দ করে না যে, তোমাদের ওপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোনো কল্যাণ অবতীর্ণ হোক।' (আল বাকারা ১০৫)

'আহলে কেতাবের মধ্য থেকেই অনেকে আশা করে যে, আহা যদি তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর আবার কাফের বানিয়ে ফেলতে পারতো। এর কারণ শুধু তাদের হিংসা।' (আল বাকারা ১০৯)

'ইহুদী ও খৃষ্টানরা তোমার ওপর কখনও খুশী হবে না যতোক্ষণ তুমি তাদের ধর্মের অনুসারী না হবে।' (আল বাকারা ১২০)

'আহলে কেতাবের একটা গোষ্ঠী তোমাদেরকে বিপথগামী করতে উদগ্রীব।' (সূরা আলে ইমরান ৬৯)

'আহলে কেতাবের একটা গোষ্ঠী বললো, মোমেনদের কাছে যে কেতাব নাযিল হয়েছে, তার ওপর দিনের শুরুতে ঈমান আনো ও দিনের শেষে কুফরী করো। .....' (আলে ইমরান ৭২-৭৩)

'তোমরা কি তাদেরকে দেখোনি, যারা কেতাবের একাংশ পেয়েছে .....' (আন নিসা ৪৪-৪৫)

'তোমরা কি সেই কেতাবধারীদের দেখনি, যারা মূর্তি ও তাগূতের ওপর ঈমান আনে .... (আন নিসা ৫১)

আহলে কেতাব মুসলমানদের প্রতি কী নীতি ও ভূমিকা অবলম্বন করতো বা বুঝার জন্যে এই ক'টা নমুনাই যথেষ্ট। তারা আকাংখা পোষণ করে যে, মুসলমানরা আবার কাফের হয়ে যাক। শুধু হিংসাবশত এবং সত্য তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়া সত্তেও তারা এরূপ আকাংখা পোষণ করে। মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের চূড়ান্ত নীতি এই যে, তারা ইহুদী অথবা খৃষ্টান হয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের ওপর কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না এবং কিছুতেই আপোষ করবে না। তারা চায়, মুসলমানরা তাদের আকীদা বিশ্বাসকে চূড়ান্তভাবে পরিত্যাগ করুক। আর পৌত্তলিকদেরকে তারা মুসলমানদের চেয়েও সুপথগামী মনে করে। আহলে কেতাবের এই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এ আয়াতগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের ওপর ইহুদী খৃষ্টান ও মোশরেকদের নির্যাতনের ইতিহাস

পক্ষান্তরে আমরা যখন ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে মোশরেকদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাই, তখন আল্লাহর নিম্নের উক্তিগুলো দেখতে পাই।

'সম্ভব হলে তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে।' (আল বাকারা ২১৭)

'কাফেররা আশা করে, তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম সম্পর্কে উদাসীন হলেই তোমাদের ওপর একযোগে হামলা চালাবে।' (সূরা আন নিসা ১০২)

'তোমাদেরকে বাগে পেলেই তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যায়, তোমাদের ওপর হাত ও মুখ দিয়ে আক্রমণ চালায় এবং আশা করে যে, তোমরা কাফের হয়ে যাও।' (সূরা মুমতাহিনা ২)

'তারা তোমাদের ওপর বিজয়ী হলে তোমাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তা বা দায়িত্ব বোধের পরোয়া করে না।' (তাওবা ৮)

'তারা মুসলমানদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তা বা দায়িত্ববোধের পরোয়া করে না।' (সূরা তাওবা ১০)

মোশরেকদের সম্পর্কে আল্লাহর এ উক্তিগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের যা চূড়ান্ত লক্ষ্য, আহলে কেতাবেরও অবিকল তাই। অন্য কথায় বলা যায়, ইসলাম ও মুসলমান ব্যাপারে আহলে কেতাবের ও মোশরেকদের নীতি মূলত একই রকম।

আমরা এও লক্ষ্য করি যে, কোরআনের এই আয়াতগুলোতে মোশরেকদের নীতি ও ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা দ্বারা মোশরেকদের ও আহলে কেতাবের ওই নীতি ও ভূমিকা অস্থায়ী নয় বরং চিরস্থায়ী ও স্বভাবগত বলে বুঝা যায়। যেমন সূরা বাকারার ২১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা লড়াই চালিয়েই যেতে থাকবে............' এবং সূরা বাকারার ১২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'ইহুদী ও খৃষ্টানরা কখনো তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবে না। ....'

আয়াতের কোনো ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী না হয়েই আমরা বুঝতে পারি যে, এতে মুসলমান অমুসলমান সম্পর্কের অস্থায়ী ও সাময়িক নয় বরং চিরস্থায়ী ও মৌলিক রূপই প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা যদি ইতিহাসের দিকে সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিও দেই, তাহলেও দেখতে পাই ইহুদী ও খৃষ্টানরা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি গোটা ইতিহাস জুড়ে যে দৃষ্টিভংগি পোষণ করেছে, তা ছিলো কোরআনের ভাষায় স্থায়ী ও স্বভাব সুলভ– অস্থায়ী ও সাময়িক নয়।

কতিপয় ব্যক্তি ও ছোট ছোট দলের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, কোরআন তাদের ব্যতিক্রমী চরিত্র বর্ণনা করেছে এবং তাদের ঐতিহাসিক বাস্তবতাও অবিকল তাই। এতে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের প্রীতি ও ভালোবাসা, অতপর রসূল (স.) ও ইসলামের সত্যতার উপলব্ধি এবং সর্বশেষে ইসলামে প্রবেশ ও মুসলমানদের দলে অন্তর্ভুক্তি ব্যক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যতিক্রমী অবস্থার কথা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই গুটিকয় ব্যক্তি ও দলের ব্যতিক্রমী অবস্থার কথা বাদ দিলে গোটা ইতিহাস জুড়ে আমরা আহলে কেতাব ও মোশরেকদের পক্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কট্টর শত্রুতা, চিরস্থায়ী যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না।

প্রথমে ইহুদীদের প্রসংগে আসা যাক। কোরআনের একাধিক সূরা তাদের অপতৎপরতা, ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছে। ইতিহাসেও তাদের এই সমস্ত অপতৎপরতার বিবরণ

লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও বন্ধ হয়নি বা হ্রাস পায়নি।

এই দীর্ঘ ইতিহাস এই তাফসীর গ্রন্থে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে সমগ্র ইতিহাস জুড়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীরা যে বহু সংখ্যক যুদ্ধ চালিয়েছে, তার সামান্য কিছুর বর্ণনা দেবো।

ইহুদীরা মদীনায় রসূল (স.) ও ইসলামকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট উপায়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ধর্মের অনুসারী একটা গোষ্ঠী অনুরূপ ওহীর মাধ্যমে আগত সত্য ধর্ম ও ওহীর বার্তাবাহক সত্য রসূলকে জেনেশুনে এতো জঘন্যভাবে অভ্যর্থনা জানাতে পারে, তা ভাবাই যায় না। মদীনার মুসলমানদের মধ্যে তারা সম্ভাব্য যাবতীয় ধরনের মিথ্যা অপবাদ, সন্দেহ সংশয়, বিভ্রান্তি ও প্রবঞ্চনা ছড়িয়ে দিয়েছিলো এবং তা এতো কুটিল পন্থায় ও অপকৌশলের মাধ্যমে ছড়িয়েছিলো যে, সে সব অপকৌশলে ইহুদীদের দক্ষতার কোনো জুড়ি ছিলো না। তারা নিশ্চিত জানতো যে, তিনি আল্লাহর রসূল। তবু সে ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় ছড়াতো। তারা মোনাফেকদের লালন পালন করতো এবং নিজেদের ছড়ানো সন্দেহ সংশয়, অপবাদ ও মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করতো। কেবলা পরিবর্তনের সময়, হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনার সময় এবং প্রতিটি ঘটনার সময় তারা যে কর্মকান্ড চালিয়েছিলো, সে সব এই ঘৃণ্য চক্রান্তেরই নমুনা। এসব কর্মকান্ডের প্রেক্ষাপটেই কোরআন নাযিল হতো। নিম্নের আয়াতগুলো দেখুন,

আল বাকারার ৮৯, ৯০, ১০১, ১৪২, আলে ইমরানের ৭০, ৭১, ৭২, ৭৮, ৯৮, ৯৯, আন নিসার ১৫৩, আত তাওবার ৩২।

অনুরূপভাবে ইতিহাসও ইহুদীদের বারংবার চুক্তি লংঘন ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ লিপিবদ্ধ করেছে। এ সব আচরণই বনু কাইনুকার যুদ্ধ, বনু নযীর যুদ্ধ, বনু কোরায়যার যুদ্ধ ও খয়বর যুদ্ধ সংঘটিত করতে ইন্ধন যুগিয়েছিলো। আর আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ যে ইহুদীরাই মোশরেকদেরকে ডেকে এনে ঘটিয়েছিলো, সেটা সবার জানা।

এরপরও ইহুদীরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। খলীফায়ে রাশেদ হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকান্ড এবং তদ সংশ্লিষ্ট ভয়াবহ গোলযোগ ও হাংগামার পেছনে তারাই ছিলো প্রধান ইন্ধন যোগানদাতা। এর ফলে মুসলমানদের ঐক্যে বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয়। এরপর হযরত আলী (রা.) ও হযরত মোয়াবিয়া (রা.)-এর মাঝে যে গোলযোগ ঘটে, তারও প্রধান সংঘটক ছিলো ইহুদীরাই। হাদীস, তাফসীর ও সীরাত গ্রন্থাবলীতে মিথ্যা, ভিত্তিহীন, আজগুবী ও মনগড়া তথ্য সংযোজনেও প্রধানত তারাই নেতৃত্ব দিয়েছে। বাগদাদে তাতারীদের হামলা ও ইসলামী খেলাফতের ধ্বংসের পেছনেও তাদের হাত সক্রিয় ছিলো।

আধুনিক কালেও মুসলমানদের ওপর আপতিত প্রতিটা দুর্যোগের পেছনে, প্রতেকটা ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসের পেছনে এবং বিশ্বের সর্বত্র ইসলাম বিরোধী প্রত্যেকটা ষড়যন্ত্রের পেছনে তারাই সক্রিয় রয়েছে।

এতো গেল ইহুদীদের কথা। আহলে কেতাবের অপরাংশ খৃষ্টানরাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও শত্রুতায় ইহুদীদের চেয়ে পেছনে নেই।

খৃষ্টবাদী রোম সাম্রাজ্য ও পৌত্তলিক অগ্নিপুজারী পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে শত শত বছর ধরে চলছিলো তুমুল যুদ্ধ। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথেই তাদের যেন টনক নড়লো। খৃষ্টীয়

গীর্জা তাদের হাতে গড়া ও তাদেরই নাম রাখা খৃষ্টবাদের জন্যে ইসলামকে বিপজ্জনক মনে করলো। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পেলাম যে, রোমকরা ও পারসিকরা তাদের সমস্ত প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবাদ, শত্রুতা, প্রতিরোধ ও প্রতিহিংসা ভুলে গিয়ে নবাগত ধর্ম ইসলামের মোকাবেলার প্রস্তুতি নিলো। বলা বাহুল্য যে, খৃষ্টবাদ নামের মনগড়া ধর্মটা প্রাচীন পৌত্তলিক ধ্যান ধারণা, খৃষ্টীয় ভ্রান্ত তত্ত্ব ও হযরত ঈসার অবশিষ্ট উক্তিগুলোর সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছু নয়।

আরবের উত্তরে রোমকরা ও তাদের পদলেহী গাসসানী শাসকরা ইসলামকে খতম করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে লাগলো। রোমকদের তাবেদার বসরার শাসক তার কাছে রসূল (স.) কর্তৃক প্রেরিত দূত হারেস বিন উমাইর আযদীকে হত্যা করার পর এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মুসলমানরা দূতদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেও খৃষ্টানরা বিশ্বাসঘাতকতা করে রসূল (স.)-এর দূতকে হত্যা করে। ফলে রসূল (স.) যায়েদ বিন হারেসা, জাফর ইবনে আবি তালেব ও আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা- এই তিন জাঁদরেল সেনানায়ককে মূতার যুদ্ধে পাঠাতে বাধ্য হলেন। সেখানে রোমকরা দু'লক্ষ সৈন্য ও পক্ষান্তরে মুসলমানরা মাত্র তিন হাজার সৈন্যের সমাবেশ ঘটায়। অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আওয়াল মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মুসলমানরা জয়লাভ করে।

এরপর তাবুক অভিযানও খৃষ্টীয় রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। এই অভিযান সংক্রান্ত আলোচনা সূরা তাওবার বেশীর ভাগ জুড়ে বিস্তৃত। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হবে ইনশাআল্লাহ) এরপর রসূল (স.) ইন্তিকালের পূর্বক্ষণে উসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে যে বাহিনী প্রস্তুত করেন, সে বাহিনীকে প্রথম খলীফা আবু বকর (রা.) সিরীয় সীমান্তে সমবেত রোমক সৈন্যদেরকে প্রতিহত করতে পাঠালেন। কেননা ওই সৈন্যরা ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে সমবেত হয়েছিলো।

এরপর ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় লাভের পর থেকে পুনরায় শুরু হয় খৃষ্টীয় শক্তির প্রতিহিংসা পরায়ণতা। এই বিজয়ের পর ইসলাম সিরিয়া, মিসর, উত্তর আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলোতে রোম সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলোকে স্বাধীন করতে শুরু করে। সর্বশেষে স্পেনে ইসলামের মযবুত ঘাটি তৈরী করে।

ইতিহাসে 'ক্রুশেড যুদ্ধ' নামে যে যুদ্ধগুলো পরিচিত, খৃষ্টানরা শুধু সেগুলোই মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেনি। উপরোল্লিখিত যুদ্ধগুলো ক্রুশেডের বহু আগে সংঘটিত হয়। তাই বলা যায়, ক্রুশেড আসলে অনেক আগে শুরু হয়েছিলো, যখন রোমকরা পারসিকদের সাথে বিদ্যমান সকল দ্বন্দ্ব কলহ ভুলে গিয়েছিলো এবং খৃষ্টীয় শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে পারসিকদেরকে দক্ষিণ আরবে অতপর মূতায় এবং তারপর ইয়ারমুকে সাহায্য করেছিলো। এরপর স্পেনে খৃষ্টীয় প্রতিহিংসা ভয়াবহ পৈশাচিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে ইউরোপের ইসলামের ঘাঁটির বিরুদ্ধে। সেখানে তারা লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা ও নির্যাতন করে যে পাশবিক হিংস্রতার পরিচয় দেয়, মানব জাতির ইতিহাসে ইতিপূর্বে তার কোনো নযীর খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রাচ্যের ক্রুসেড যুদ্ধগুলোতেও তারা একই ধরনের পৈশাচিকতার পরিচয় দিয়েছে এবং কোথাও তারা মুসলমানদের সাথে কোনো চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মান দেখায়নি।

প্রখ্যাত ফরাসী খৃষ্টান লেখক গস্তাভ লুবুন স্বীয় 'আরব সভ্যতা' নামক পুস্তকে লিখেছেন,

'ইংরেজ শাসক রেকাভোস সর্বপ্রথম যে ঘটনাটা ঘটায়, তা এই যে, সে মুসলমানদের শিবিরের সামনে আত্মসমর্পণকারী তিন হাজার বন্দীকে হত্যা করে। এভাবে সে ইতিপূর্বে তাদের

প্রাণের নিরাপত্তা দিয়ে যে অংগীকার করেছিলো তা ভংগ করে। এরপর সে হত্যা ও লুটপাটে সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই অত্যাচারের ফলেই মহানুভব সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর আবির্ভাব ঘটে, যিনি বাইতুল মাকদেসের খৃষ্টানদের ওপর করুণা প্রদর্শন করেছিলেন। তাদেরকে কোনো কষ্ট দেননি। উপরন্তু রোগাক্রান্ত খৃষ্টীয় সেনাপতি ফিলিপকে ওষুধ ও পথ্য দিয়ে সাহায্য করেন।'

অনুরূপভাবে, অপর এক খৃষ্টান লেখক য়ুর্জা বলেন,

'খৃষ্টানরা বাইতুল মাকদেস সফরের সূচনা করেছিলো নৃশংসতম আচরণের মাধ্যমে। তীর্থযাত্রীদের এক একটা দল এক একটা প্রাসাদ দখল করার সময় রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছিলো। নৃশংসতায় তারা সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। এমনকি কেউ কেউ নিরীহ লোকদের পেট চিরে নাড়ি ভুঁড়ির ভেতরে কোথাও মুদ্রা লুকিয়ে আছে কিনা খুঁজে দেখছিলো। কিন্তু সালাহুদ্দীন যখন বাইতুল মাকদেস পুনর্দখল করলেন, তখন খৃষ্টানদেরকে জান মালের পূর্ণ নিরাপত্তা দিলেন। তাদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। মুসলমানরা তাদের শত্রুদের প্রতি শুধু নিরপেক্ষ আচরণই করলো না, বরং সদয় আচরণ করলো। এমনকি সালাহুদ্দীনের ভাই মালিক আদিল এক হাজার যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দিলেন, সমস্ত আর্মেনীয়কে ক্ষমা প্রদর্শন করলেন। বিতরিককে ক্রুশ ও গীর্জার অলংকারাদি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন এবং রাজকন্যা ও রাণীকে নিজ নিজ স্বামীর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন।'

সমগ্র ইতিহাস জুড়ে ক্রুশেড যুদ্ধের যে দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে, তা এই তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শুধু এতোটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের এই যুদ্ধের অবসান এখনো হয়নি। সাম্প্রতিককালে জাঞ্জিবারে যা ঘটেছে প্রসংগত তার উল্লেখ করতে চাই। সেখান থেকে মুসলমানদের সমূলে উৎখাত করা হয়েছে। ১২ হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে এবং বাকী ৪ হাজারকে দ্বীপ থেকে নির্বাসিত করার জন্যে সমুদ্রে তাড়িয়ে দেয়া হয়। সাইপ্রাসের ঘটনাও মর্মান্তিক। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে পানি ও খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো, যাতে তারা ক্ষুধা ও পিপাসায় ছটফট করে মরে যায়। উপরন্তু হত্যা ও দেশান্তরিত করার প্রক্রিয়াতো চালানো হয়েছেই, ইথিওপিয়া সরকার ইরিত্রিয়ায় ও মধ্য ইথিওপিয়ার মুসলমানের সাথে, কেনিয়া সরকার সোমালীয় বংশোদ্ভুত এক লক্ষ মুসলমানের সাথে এবং দক্ষিণ সুদানে খৃষ্টানরা যে নির্যাতন চালাচ্ছে, তার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ইউরোপীয় লেখক জর্জ ব্রাউনের রচিত ও ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া জরুরী মনে হচ্ছে।

'আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে আতংকে ভুগেছি, কিন্তু অভিজ্ঞতার পর সে আতংক অযৌক্তিক প্রমাণিত হয়েছে। আগে আমরা ইহুদীদের ভয়ে ভীত ছিলাম। বাদামী সাম্রাজ্য ও সোভিয়েত বলশেভিক সাম্রাজ্যকেও আমরা ভয় পেতাম। কিন্তু আমাদের কল্পিত এ ভয় কখনো বাস্তবে দেখা দেয়নি। ইহুদীদেরকে আমরা বন্ধু পেয়েছি। তাই তাদের ওপর অত্যাচারকারীরা আমাদের কট্টর দুশমন। এরপর বলশেভিকদেরকেও আমরা মিত্র হিসাবে পেয়েছি। বাদামী সাম্রাজ্যবাদীদেরকে প্রতিহত করার জন্যে বড় বড় গণতান্ত্রিক দেশ রয়েছে। আমাদের জন্যে যথার্থ ও আসল হুমকি হলো ইসলামী ব্যবস্থা, তার বিস্তার লাভ ও বশীভূতকরণের অসাধারণ শক্তি এবং তার জীবনীশক্তি। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের পথে ইসলামই একমাত্র বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

ইসলামের বিরুদ্ধে খৃষ্টবাদের ঘোষিত যুদ্ধের পর্যালোচনায় আমি আর এগুতে চাইছিনা। কিছু কিছু ইতিপূর্বেও এই তাফসীরের বিভিন্ন স্থানে প্রসংগক্রমে আলোচনা করেছি ও করবো। এখানে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্যে অন্যান্য গ্রন্থাবলী পড়ে দেখার পরামর্শ দিচ্ছি।(১)

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে ইতিপূর্বে আমি মানুষকে স্বাধীনতা দান সংক্রান্ত ইসলামের ঘোষণার প্রকৃতি ও ধরন সম্পর্কে যে কথা বলে এসেছি, তা থেকে এবং যে আন্দোলন এই ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সারা বিশ্বে কাজ করছে তাকে ধ্বংস করার জন্যে বিশ্বব্যাপী জাহেলিয়াতের অব্যাহত প্রচেষ্টা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, সূরা তাওবায় বর্ণিত এই সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বিধিসমূহ এই সমস্ত তথ্যের সমাবেশের অনিবার্য দাবী ও স্বাভাবিক ফল। এ বিধিগুলো কোনো বিশেষ যুগ বা পরিস্থিতির মধ্যে সীমিত নয়। আর এই চূড়ান্ত বিধানগুলো পূর্ববর্তী সূরাগুলোতে নাযিল হওয়া অস্থায়ী ও পর্যায়ক্রমিক বিধানগুলোকে রহিত করেনি। তাই যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ওই পূর্ববর্তী বিধানগুলো নাযিল হয়েছিলো, অনুরূপ পরিস্থিতি ও পরিবেশে ওই বিধানগুলো বলবত হওয়ার পথে কোনো বাধা নেই। বিভিন্ন পর্যায়ে নিত্য নতুন উপায় উপকরণ দ্বারা মানব সমাজকে বাস্তবসম্মতভাবে মোকাবেলা করার জন্যে ইসলামের চিরস্থায়ী স্বাভাবিক ও বিপ্লবী বিধান সব সময়ই চালু ও কর্মোপযোগী আছে ও থাকবে।

এ কথা সত্য যে, এই সূরায় বর্ণিত বিধানগুলো আরব উপদ্বীপের একটা সুনির্দিষ্ট অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো। এ কথাও সত্য যে, তবুক অভিযানের যে সামরিক তৎপরতার প্রয়োজন ছিলো, তার জন্যে আইনগত প্রস্তুতি গ্রহণের তাগিদেই এ বিধিগুলো নাযিল হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিলো ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর চরম আঘাত হানার জন্যে আরব উপদ্বীপের সমগ্র সীমান্ত জুড়ে রোমকরা ও তাদের তাবেদাররা যে সৈন্য সমাবেশ ঘটাচ্ছিলো, তার মোকাবেলা করা। বস্তুত সূরা তাওবার কেন্দ্রীয় বিষয়ই হচ্ছে তবুক অভিযান। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি আহলে কেতাবের আচরণ ও দৃষ্টিভংগি কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তর থেকে জন্ম নেয়নি এবং তা কোনো বিশেষ স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধও নয়। এটা একটা চিরন্তন ও শাশ্বত সত্য থেকে জন্ম নিয়েছে। অনুরূপভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আহলে কেতাবের যুদ্ধও কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কালের সৃষ্ট নয়। এ যুদ্ধ তাদের পক্ষ থেকে আজও অব্যাহত রয়েছে ও চিরদিন থাকবে। শুধু মুসলমানরা পুরোপুরিভাবে ইসলাম ত্যাগ করলেই তারা শান্ত হবে। অন্যথায় ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের এ যুদ্ধ ঘোষণা চরম হঠকারিতা, গোয়ার্তুমি ও ধ্বংসাত্মক পন্থায় অব্যাহত থাকবে এবং তা ইতিহাসের যে কোনো যুগে ও যে কোনো পন্থায় চালিয়ে যাবে। কাজেই এ সূরায় যে সব আইনগত বিধি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেগুলো মৌলিক, সর্বাত্মক ও চিরস্থায়ী বিধি। কোনো স্থান ও কালের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে এ সব বিধির বাস্তবায়ন শুধু ইসলামী আন্দোলন ও বিপ্লবের পদ্ধতির আলোকেই হবে। ওই সব বিধি নিয়ে নানা কথাবার্তা হওয়ার আগে এবং পরবর্তীকালের নামধারী মুসলিম বংশধরগুলোর হীনতা ও দীনতার দায় আল্লাহর শাশ্বত ও অক্ষয় দ্বীনের ঘাড়ে চাপানোর আগে ওই আন্দোলন ও বিপ্লবের পদ্ধতিকে উপলব্ধি করা জরুরী।

ইসলামের ফেকাহ শাস্ত্রীয় বিধিগুলো ইসলামী বিধান অনুসারে পরিচালিত আন্দোলনেরই সৃষ্টি। অতীতেও এরূপ ছিলো, ভবিষ্যতেও থাকবে। এই সত্যকে পাশাপাশি বিবেচনা না করে কোরআনের আয়াতগুলোকে বুঝা যাবে না। ইসলামী বিধানের আলোকে পরিচালিত আন্দোলনের সাথে যুক্ত হলে কোরআনের আয়াতগুলোর যে অর্থ হয় আর আন্দোলনশূন্য পরিবেশে যে অর্থ হয়, এই উভয় অর্থের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। তবে এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে, 'আন্দোলন ইসলামী নীতি অনুসারেই' হতে হবে। ইসলামী বিধান বহির্ভূত কোনো আন্দোলন গ্রহণযোগ্য নয়।

---

(১) প্রতিটি সচেতন মানুষ যিনি পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে তার মোটামুটি খবর রাখেন তার জন্যে মনে হয় এ ব্যাপারে নতুন আর কোনো উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই।–সম্পাদক

বিদ্যমান মানবীয় সমাজ ও পরিবেশকে মূল বিষয় ধরে নিয়ে তা যে কোনো ধরনের আন্দোলনের সৃষ্ট হোক না কেন, তাকে গ্রহণ করা হবে তা নয়। বরং সে 'বিদ্যমান মানবীয় সমাজ ও পরিবেশ' অবশ্যই ইসলামী আন্দোলনের সৃষ্টি হতে হবে। তাহলে তা ইসলামী বিধানকে বুঝার ব্যাপারে সহায়ক মৌলিক উপাদানে পরিণত হবে।

এই মূলনীতির আলোকে আহলে কেতাব ও মুসলিম সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণকারী বিধিগুলোকে বিচার বিবেচনা করা সহজ হয়ে যায়। কেননা এমতাবস্থায় এই বিধিগুলো চলমান বাস্তব ইতিবাচক ও সর্বাত্মক আন্দোলনের সাথে সংগতি রেখে সজীব গতিতে বিকাশমান থাকে।

বশ্যতা স্বীকার না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকাই আমরা এই পর্বের আয়াতগুলোর বিশ্লেষণের জন্যে যথেষ্ট মনে করি।

প্রথমেই আসা যাক এ পর্বের প্রথম আয়াত অর্থাৎ ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমরা লড়াই করো সেই সব আহলে কেতাবের সাথে ....'

এ আয়াত ও এর পরবর্তী আয়াতগুলো তাবুক অভিযান এবং রোমকদের সাথে ও তাদের দোসর আরব গাসসানী খৃষ্টানদের সাথে লড়াই করার জন্যে মুসলমানদের প্রস্তুত করছে। এতে এই মর্মে সুপ্ত ইংগিতও রয়েছে যে, এতে যে বৈশিষ্ট্যগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে, তা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে একটা বাস্তবতা হিসাবে। আহলে কেতাবের সাথে লড়াইয়ে জন্যে এগুলো শর্ত নয়। ওই জাতির মধ্যে বাস্তবে এ সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এগুলো তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে ও মুসলমানদেরকে লড়াইয়ে প্রেরণা যোগায়। আরো যাদের মধ্যে আহলে কেতাবের আকীদা বিশ্বাস ও চরিত্র বিদ্যমান থাকবে, তাদের বিরুদ্ধেও এই লড়াইয়ে আদেশ কার্যকর হবে।

আয়াতে যে বৈশিষ্ট্যগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, তা হলো,

প্রথমত, তারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না। দ্বিতীয়ত, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হারামকৃত জিনিসগুলোকে হারাম মানে না। তৃতীয়ত, তারা আল্লাহর সত্য ধর্ম ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করে না।

এরপর পরবর্তী আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাদের মধ্যে ওই তিনটি বৈশিষ্ট্য কিভাবে বিদ্যমান।

প্রথমত, ইহুদীরা উযায়ের (আ.)-কে এবং খৃষ্টানরা ঈসা মসীহ (আ.)-কে আল্লাহর ছেলে বলে আখ্যায়িত করে থাকে। তাদের এই আখ্যাদান পৌত্তলিকদের আকীদা বিশ্বাসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কাজেই এই আকীদার ক্ষেত্রে তারা পৌত্তলিকদের মতোই এবং এ আকীদা অবলম্বনকারীকে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী বলে মনে করা যায় না। (পরবর্তীতে আমি সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করবো কিভাবে এ দ্বারা তাদের আখেরাতে অবিশ্বাস প্রমাণিত হয়।)

দ্বিতীয়ত, তারা তাদের পীর দরবেশ, আলেমদেরকে ও ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর বিকল্প প্রভু হিসাবে মেনে নিয়েছে। এটা সত্য ধর্মের পরিপন্থী- যা আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করার অবকাশ দেয় না। সুতরাং তারা এভাবে মোশরেকে পরিণত হয়েছে, সত্য দ্বীনের অনুসারী থাকেনি।

তৃতীয়ত, তারা আল্লাহর জ্যোতিকে নির্বাপিত অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনকে ধ্বংস করতে উদ্যত। সুতরাং তারা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে ও সত্য দ্বীনের অনুসরণ করে এমন কোনো মানুষই আল্লাহর সত্য দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকতে পারে না।

চতুর্থত, তাদের দরবেশ ও গৃহত্যাগী ফকীররা মানুষের ধন সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ দখল করে থাকে। এ ধরনের কাজ দ্বারা তারা প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহ ও রসূলের হারামকৃত জিনিসগুলোকে হারাম বলে মানে না। (এখানে রসূল দ্বারা মোহাম্মদ (স.) অথবা তাদের রসূল– যাকেই বুঝাক, উভয়ই সমান।)

রোম ও সিরিয়ার খৃষ্টানদের চরিত্রে বাস্তবিক পক্ষেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিরাজ করে। খৃষ্টীয় একাডেমীগুলো হযরত ঈসার আনীত মূল সত্য ধর্মের বিকৃতি সাধনের পর অন্যান্য জায়গার খৃষ্টানদের চরিত্রেও এসব বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে হযরত ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলা ও তিন খোদার মতবাদ অবলম্বন করার পর থেকে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সকল খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিদ্যমান।

সুতরাং এটা একটা সাধারণ ও সর্বাত্মক আদেশ। সেই সব আহলে কেতাবের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে এ আদেশ, যাদের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তৎকালে আরব ও রোমের খৃষ্টানদের মধ্যে এগুলো পাওয়া যেতো। পরবর্তীতে রসূল (স.) কিছু সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি ও শ্রেণীকে এ আদেশের বহির্ভূত বলে ঘোষণা দিয়েছেন– যেমন শিশু, নারী, বৃদ্ধ, যুদ্ধে অক্ষম, উপাসনালয়ে সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থানকারী দরবেশ ও সন্ন্যাসী। কেননা তারা বেসামরিক নাগরিক বা প্রজা। ইসলাম যে কোনো ধর্মের বেসামরিক জনতাকে যুদ্ধের বাইরে রাখে। এ ব্যতিক্রম দ্বারা যুদ্ধের আদেশের ব্যাপকতা ও সার্বিকতা ক্ষুণ্ন হয় না। এই সব ব্যতিক্রমী লোক মুসলমানদের ওপর কখনো আগ্রাসন চালায়নি বলে তাদেরকে যুদ্ধের বাইরে রাখা হয়েছে। এর মূল কারণ এই যে, তারা বর্তমানে কার্যত যুদ্ধে অক্ষম। সুতরাং এ কথা বলার কোনো যুক্তি নেই যে, এ দ্বারা শুধুমাত্র আগ্রাসীদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা যাবে বুঝানো হয়েছে। পরাজিত মানসিকতাধারী লোকেরা ইসলামের ওপর থেকে তথাকথিত অপবাদ প্রক্ষালণের জন্যে এরূপ বলে থাকে। আর যদি ধরেও নেয়া হয় যে, ইসলাম আগ্রাসী ছাড়া আর কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয় না, তবে এখানে আহলে কেতাবের পক্ষ থেকে অনেক আগেই আগ্রাসন চালানো হয়েছে। প্রথমত, আল্লাহর একত্ব ও প্রভুত্বের ওপর আগাসন চালানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাঁর বান্দাদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের গোলামে পরিণত করে তাদের ওপর আগ্রাসন চালানো হয়েছে। তাই ইসলাম যখন আল্লাহর সর্বময় প্রভুত্বকে রক্ষা করতে সক্রিয় হয় এবং পৃথিবীতে মানুষের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে সক্রিয় হয়, তখন জাহেলী শক্তি স্বাভাবিকভাবে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও আগ্রাসন চালাবেই। প্রত্যেক জিনিসের স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য, প্রতিক্রিয়া ও চরিত্রের মুখোমুখি না হয়ে কারোই উপায় থাকে না।

এ আয়াত মুসলমানদেরকে সেই সব আহলে কেতাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে, 'যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না।' যারা হযরত উযায়ের (আ.)-কে কিংবা ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে, তাদেরকে কিছুতেই আল্লাহর প্রতি ঈমান আণয়নকারী বলা যায় না। অনুরূপভাবে যারা বলে, মরিয়মের পুত্র ঈসাই আল্লাহ, কিংবা আল্লাহ তিন খোদার তৃতীয় খোদা, অথবা ঈসা আল্লাহর অবতার এবং অন্য যতো উদ্ভট মনগড়া তাওহীদ বিরোধী ধারণা পোষণ করে, যারা বলে যে, তারা যতো পাপই করুক, দুই চার দিনের বেশী জাহান্নামে যাবে না, কারণ তারা আল্লাহর পুত্র, বন্ধু ও প্রিয় জাতি, যারা বলে যে, খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে সকল পাপ মাফ হয়ে যায়, পবিত্র ডিনার খেলে সব গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং এ ছাড়া গুনাহ মাফ করাবার আর কোনো উপায় নেই– এই সব লোকের কাউকেই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী বলা যায় না।

এ আয়াত আহলে কেতাবের একটা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে যে, তারা আল্লাহর ও রসূলের হারাম করা জিনিসকে হারাম বিবেচনা করে না। এখানে 'রসূল' শব্দ দ্বারা তাদের কাছে প্রেরিত রসূলই বুঝানো হোক অথবা মোহাম্মদ (স.)-কে বুঝানো হোক, উভয়ই সমান এবং বক্তব্য একই থেকে যায়। কেননা পরবর্তী আয়াতে এর ব্যাখ্যা এভাবে বলা হয়েছে যে, তারা মানুষের ধন সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাত করে। মানুষের ধন সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাত করা সকল নবীর শরীয়তেই হারাম। অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাতের নিকটতম নমুনা হলো সুদ ও ঘুষের লেন দেন। অথচ গীর্জার লোকেরা এসব জিনিস 'গুনাহ মাফের' চেক বা সনদের বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকে। এই সব হারাম তথা নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে একটা হলো আল্লাহর দ্বীন থেকে মানুষকে ফেরানো, শক্তি প্রয়োগে তা থেকে বাধা দেয়া এবং মোমেনের ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে ধর্মচ্যুত করা। অনুরূপভাবে, আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গোলামে পরিণত করা, তাদের ওপর মানুষের তৈরী আইন কানুন চাপিয়ে দেয়াও আল্লাহ ও রসূলের নিষিদ্ধ জিনিসের আওতাভুক্ত। ইহুদী খৃষ্টানদের মধ্যে এ স্বভাব আগে যেমন ছিলো, এখনো তেমনি আছে।

আয়াতে আহলে কেতাবের আর একটা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'তারা আল্লাহর সত্য দ্বীনের অনুসরণ করে না।' পূর্বে আমি এ সম্পর্কে খোলাসা করে বলে এসেছি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা সত্য ধর্ম নয়। আল্লাহর কাছ থেকে নেয়ার পরিবর্তে অন্যদের কাছ থেকে আইন কানুন গ্রহণ করা সত্য ধর্ম নয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুম মেনে চলা আল্লাহর সত্য দ্বীনের অনুসরণ নয়। এ বৈশিষ্ট্যটাও আহলে কেতাবের মধ্যে আগেও যেমন ছিলো, আজও তেমনি আছে।

আয়াতে আহলে কেতাবের সাথে লড়াই থেকে বিরত থাকার জন্যে যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, সেটা তাদের ইসলাম গ্রহণ নয়। কেননা ধর্মের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি ইসলামে নেই। যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা হলো বশ্যতা মেনে নিয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়া। এই শর্তের নিগূঢ় উদ্দেশ্য কী? এটাকে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার শর্তে পরিণত করার কারণ কী?

আহলে কেতাব ওই বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী হিসাবে বিশ্বাস ও আচরণ উভয় দিক দিয়েই আল্লাহর দ্বীনের ওপর আগ্রাসী। অনুরূপভাবে তারা মুসলমানদের ওপরও আগ্রাসী। কেননা এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে তাদের যে আকীদা ও আচরণ তুলে ধরা হয়েছে, তার আলোকে তারা পুরোপরি জাহেলিয়াতের প্রবক্তা। তাই জাহেলিয়াত ও ইসলামের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পরিবেশ বিরাজ করে, সে হিসাবে তাদের সাথেও মুসলমানদের যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করে। ঐতিহাসিক বাস্তবতাও তাদের সাথে মুসলমানদের চরম বিরোধ, সাংঘর্ষিকতা ও সহাবস্থানের অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করে। কেননা আহলে কেতাব সক্রিয়ভাবে ইসলামের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এ আয়াত নাযিল হবার আগেও এবং পরেও।

ইসলাম পৃথিবীতে একমাত্র সত্য ধর্ম বিধায় তার সামনের যাবতীয় বস্তুগত বাধা অপসারণ করা তার পক্ষে অপরিহার্য, যাতে মানুষের সত্য ধর্ম ছাড়া অন্যান্য আইন ও ধর্মের আনুগত্য থেকে মুক্তি দেয়া যায়, প্রত্যেক মানুষকে নিজের মনোনীত ধর্ম গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া যায় এবং তার পক্ষ থেকে কিংবা অন্যদের পক্ষ থেকে তার ওপর কোনো বল প্রয়োগের অবকাশ না থাকে।

সুতরাং ইসলাম বিরোধী সকল বস্তুগত বাধা অপসারণ ও ইসলাম গ্রহণের জন্যে বল প্রয়োগের আশংকা দূরীকরণ এই উভয় জিনিসের নিশ্চয়তা বিধানের একমাত্র কার্যকর পন্থা হলো সকল ইসলাম বিরোধী কর্তৃপক্ষের দাপট খতম করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা এবং কার্যকরভাবে জিযিয়া দিয়ে বশ্যতা স্বীকারে প্রস্তুত করা।

কেবল এ পর্যায়েই মানুষকে স্বাধীন করার কাজটা পূর্ণতা লাভ করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই মর্মে স্বাধীনতা দেয়া হয় যে, ভালো লাগলে ইসলাম গ্রহণ করবে, নচেত নিজ ধর্মে ও আকীদায় বহাল থাকবে এবং জিযিয়া দিয়ে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলো পূরণ নিশ্চিত করবে।

প্রথমত, এ দ্বারা তার আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকারের ঘোষণা দেয়া হবে এবং আল্লাহর সত্য দ্বীনের দিকে আহ্বানের কাজকে বস্তুগত শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিরোধ না করার নিশ্চয়তা দেয়া হবে।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম অমুসলিমদের জান, মাল, সম্ভ্রম ও অধিকারের সংরক্ষণে যে অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হয়, জিযিয়া দিয়ে তাতে সহযোগিতা করা হয় এবং মুসলমানদের কাছে পূর্ণ নিরাপদ আশ্রয় লাভ করা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের ভেতর বা বাইরে থেকে যারা অমুসলিমদের ওপর আক্রমণ চালাতে চায়, তাদেরকে মুসলিম মোজাহেদদের দিয়ে প্রতিহত করানো হয়।

তৃতীয়ত, মুসলিম- অমুসলিম নির্বিশেষে উপার্জনে অক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের খোরপোশের যে দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মাল (সরকারী কোষাগার) গ্রহণ করে, সেই দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা।

জিযিয়া কাদের কাছ থেকে নেয়া যাবে, কাদের কাছ থেকে নেয়া যাবে না, কী পরিমাণে নিতে হবে, কী পদ্ধতিতে জিযিয়া নির্ধারণ করতে হবে এবং কোথায় কোথায় নির্ধারণ করতে হবে, সে সম্পর্কে ফেকাহশাস্ত্রীয় মতভেদকে এখানে তুলে ধরতে চাই না। কেননা এ সমস্যাটা বর্তমানে আমাদের কাছে পেশ করাই হয় না। যেমন ফকীহদের যুগে পেশ করা হতো। ফকীহদের কাছে তৎকালে পেশ করার পর তারা ইজতেহাদ করতেন ও ফতোয়ার আকারে মতামত জানাতেন।

এটা এমন একটা বিষয়, যাকে আজ মনে করা হয় 'ইতিহাসের বিষয়', অর্থাৎ এটা বর্তমানের কিছু নয় আজকাল মুসলমানরা জেহাদ করে না। কারণ আজকাল মুসলমানদের অস্তিত্বই নেই। বস্তুত ইসলাম ও মুসলমানদের 'অস্তিত্ব'টাই আজকাল এমন অবস্থায় রয়েছে যে, উভয়ের চিকিৎসা প্রয়োজন।

ইসলামী বিধান যে একটা বাস্তব ও কার্যকর বিধান, তা আমি ইতিপূর্বে একাধিকবার বলেছি। সে শূন্যে ঝুলন্ত সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে চায় না। সে এমন নিরেট ফেকাহ শাস্ত্রীয় বিধিতে পরিণত হতে চায় না, যা বাস্তব জগতে কার্যকর হয় না। কেননা আজকের এই বাস্তব জগতে আল্লাহর আইন দ্বারা শাসিত ও ইসলামী ফেকাহ দ্বারা পরিচালিত কোনো মুসলিম সমাজ নেই। বস্তুত যারা অবাস্তব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়, তাদেরকে ইসলাম ঘৃণা করে। এ ধরনের লোকদেরকে ইসলামে অবাস্তব তাত্ত্বিক বলা হয়, এদের কথা বলার ভংগি এ রকম, 'যদি এমন হয়, তাহলে ইসলামী বিধান অনুসারে কী করতে হবে?'

আজ আমাদেরকে সেই বিন্দু থেকেই কাজ শুরু করতে হবে, যেখান থেকে শুরু করা হয়েছিলো ইসলামের প্রথম অভ্যুদয় কালে। পৃথিবীর কোনো না কোনো ভূখন্ডে এমন একটা সমাজ গড়ে তুলতে হবে, যা ইসলামের অনুগত। তারা আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মোহাম্মদ (স.) তাঁর রসূল এই মর্মে সাক্ষ্য দেবে। তারপর তাকেই আইন প্রণয়নে, সার্বভৌমত্বে ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী বলে মেনে নেবে এবং তা বাস্তব জীবনে কার্যকর করবে। তারপর মানব জাতিকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্যে এই ঘোষণা সারা পৃথিবীতে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেবে। এ কাজটা যেদিন হবে, কেবল সেই দিনই কোরআনের আয়াতগুলো ও ইসলামী বিধি-বিধানগুলোকে মুসলমান অমুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে

বাস্তবায়িত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কেবল সেই দিনই ঐ সব ফেকাহ শাস্ত্রীয় বিধান নিয়ে আলোচনা, তার বাস্তবায়নের চিন্তা ভাবনা এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোকে নতুন আইন ও বিধি প্রণয়ন সংগত হবে। অন্যথায় নিছক তাত্ত্বিক জগতে কাল্পনিক বিধি প্রণয়নে কালক্ষেপণ করা সমীচীন হবে না।

আলোচ্য আয়াতটার তাফসীর আমি মৌলিক ও নীতিগত দিক দিয়ে করাই সংগত মনে করেছি। কেননা এটা আকীদা বিশ্বাস ও আদর্শ সংক্রান্ত বিধির সাথে জড়িত এবং ইসলামী জীবন বিধানের প্রকৃতি ও মেযাজের সাথে সম্পৃক্ত। তাই আমার আলোচনাও এরই মধ্যে সীমিত রেখেছি। ফেকাহ শাস্ত্রীয় খুঁটিনাটি বিধানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইনি। কেননা ইসলামী বিধানের গুরুত্ব ও বাস্তবতার প্রতি আমি সম্মান দেখাতে চাই এবং তাকে হাস্যকর কাল্পনিকতার উর্ধে রাখতে চাই।

আসুন এবার ৩০ নং আয়াতের তাফসীরে মনোনিবেশ করি।

'ইহুদীরা বলে, উযায়ের আল্লাহর পুত্র। আর খৃষ্টানরা বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র। ....

আল্লাহ তায়ালা যখন মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন যে, জিযিয়া না দেয়া পর্যন্ত আহলে কেতাবের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তখন মদীনার মুসলমান সমাজে যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো, তার কথা সূরার ভূমিকায় এবং বর্তমান পর্বের ভূমিকায় সবিস্তারে আলোচনা করেছি। ওই আলোচনায় আমি বিশ্লেষণ করেছি যে, মুসলিম সমাজে বিরাজমান সেই পরিস্থিতি ও পরিবেশ যুদ্ধের এই আদেশকে আরো শক্তিশালী ও জোরদার করার আহ্বান জানাচ্ছিলো, যুদ্ধকে অনিবার্য ও অপরিহার্য করে তোলার কারণ ও উপাদানগুলো স্পষ্টতর করে দিচ্ছিলো এবং সেই সব সন্দেহ সংশয় দূরীভূত করে দিচ্ছিলো, যা অনেকের মনকে যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত করে তুলেছিলো। বিশেষত, এই আদেশ মানলে সিরিয়া সীমান্তে গিয়ে রোমকদের সাথে লড়াই করতে হবে- এ কথা ভেবে অনেকে দ্বিধান্বিত ছিলো। কারণ আরবরা ইসলামের আগে থেকেই রোমকদের ভয়ে জড়সড় ছিলো। কেননা রোমকরা আরবের উত্তরাংশে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিলো দীর্ঘকাল ব্যাপী। তা ছাড়া কোন কোনো আরব গোত্র তাদের তল্পীবাহক এবং গাসসানী শাসকরা তাদের আধিপত্যের কাছে নতজানু ছিলো। এ কথা সত্য যে, তাবুক অভিযান রোমকদের সাথে মুসলমানদের জন্যে প্রথম অভিযান ছিলো না, বরং ইতিপূর্বে রোমক ও মুসলমানদের সর্বশেষ বড় ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো মুতায়। আগে আরবরা রোমক ও পারসিকদের সাথে লড়াইয়ের সাহস তো দূরের কথা, চিন্তাও করতো না এবং তাদের যা কিছু বীরত্ব বাহাদুরীর পরিচয় পাওয়া যেতো, তা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ, হত্যা, ডাকাতি ও লুটতরাজের মধ্য দিয়েই পাওয়া যেতো। ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ তায়ালা তাদের এতটা গৌরবান্বিত ও পরাক্রমশালী করলেন যে, তারা রোমক ও পারসিকদের সাথেও যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে শুরু করলো। কিন্তু এতদসত্তেও রোমকভীতি তাদের মনে কিছু না কিছু অবশিষ্ট ছিলো। বিশেষত যাদের মধ্যে প্রকৃত ইসলামী ভাবধারা ও চরিত্র তেমন মযবুত হয়নি, তাদের ভেতরে রোমকদের সম্পর্কে ভীতি বিরাজ করতো। কিন্তু এই ভীতি মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূল ছিলো না, বিশেষত যখন রোমকদের সৈন্যসংখ্যা আরব খৃষ্টান সমেত দু'লাখে গিয়ে ঠেকেছিলো।

পরিবেশ ও পরিস্থিতির এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও উপাদান, উল্লিখিত যুদ্ধাদেশের কঠোরতাকে তুলে ধরা, মুসলমানদের মন থেকে সন্দেহ-সংশয় ও স্থবিরতা দূর করা এবং উক্ত কঠোরতার কারণ স্পষ্ট করার জন্যে অধিকতর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দাবী জানাচ্ছিলো। পরিবেশ ও পরিস্থিতির এসব বৈশিষ্টের মধ্যে স্বয়ং মুসলমানদের সমাজে ইতিমধ্যে যে বিবর্তন ও সমন্বয় ঘটেছে, তা

যেমন অন্তর্ভুক্ত ছিলো, তেমনি অন্তর্ভুক্ত ছিলো তাদের রোমক ভীতি, অত্যন্ত প্রতিকূল ও বিপদসংকুল পরিবেশে মুসলমানদের রণসজ্জা এবং সর্বোপরি রোমকরা ও তাদের আরবীয় খৃষ্টান দোসররাও আহলে কেতাবের অন্তর্ভুক্ত— এই সন্দেহ পোষণ।

ইহুদী খৃষ্টানদের মাঝে প্রচলিত শেরেকী আকীদা

আলোচ্য আয়াতে এই আহলে কেতাব গোষ্ঠীর গোমরাহী এই বলে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের আকীদা বিশ্বাস আরবের মোশরেক ও প্রাচীন রোমক পৌত্তলিকদের আকীদার মতোই। তাদের কাছে আসমানী কেতাবের মাধ্যমে যে সঠিক আকীদা বিশ্বাস এসেছিলো, তার ওপর তারা বহাল থাকেনি। সুতরাং আল্লাহর কাছ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত আসল আকীদা বিশ্বাসের বিরোধিতা করার পর তাদের আহলে কেতাব নাম ধারণ করার কোনো অর্থ থাকে না। এখানে যে জিনিসটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হলো, ইহুদীদের প্রসংগ উল্লেখ এবং তারা যে হযরত উযায়েরকে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে তার উদ্ধৃতি। অথচ এ আয়াতগুলো রোমক সৈন্য ও তাদের আরবীয় খৃষ্টান দোসরদের মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আমার দৃষ্টিতে এর কারণ দুটো,

এক, আয়াতগুলোর ভাষা যেহেতু ব্যাপক এবং ইহুদী-খৃষ্টান নির্বিশেষে সকলের বেলায়ই প্রযোজ্য, আর আহলে কেতাবের সাথে যুদ্ধের আদেশও ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় গোষ্ঠীর ওপরই প্রযোজ্য, সেহেতু উভয় গোষ্ঠীর সম্মিলিত আকীদাগত বিভ্রান্তি তুলে ধরার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো।

দুই, ইহুদীরা মদীনা থেকে সিরিয়ায় চলে গিয়েছিলো। রসূল (স.) মদীনায় আসার পর থেকেই তারা মুসলমানদের সাথে এক তিক্ত দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতে লিপ্ত হয়। এই সংঘাতের পরিণামেই ইহুদী গোত্র বনু নযীর ও বনু কাইনুকাকে এবং বনু কেরায়যার কতক লোককে সিরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছিলো। তাই সেদিন মুসলিম বাহিনীর সিরিয়া অভিমুখে যাওয়ার পথেই ইহুদীদের অবস্থান ছিলো। এজন্যে যুদ্ধের আদেশ যাতে তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে, সেজন্যে এভাবে ইহুদীদের উল্লেখ করা হয়েছে।

খৃষ্টানদের উক্তি 'মসীহ আল্লাহর পুত্র সুবিদিত। আধুনিক খৃষ্টবাদের আদি গুরু সেন্ট পলস কর্তৃক এই বিকৃত আকীদা প্রচারের পর থেকে নিয়ে আজও পর্যন্ত তাদের আকীদা এটাই রয়েছে। এরপর খৃষ্টীয় একাডেমীগুলো কর্তৃক পুনরায় তাকে আর এক দফা বিকৃত করা হয়। তবে ইহুদীদের এই আকীদার কথা যে, 'উযায়ের আল্লাহর ছেলে' আজকাল তেমন পরিচিত নয়। ইহুদীদের কেতাবে 'আযরা' নামে যে ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনিই উযায়ের। এতে তাকে তাওরাত বিশেষজ্ঞ একজন লেখক এবং আল্লাহর শরীয়তের একজন পারদর্শী ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তবে কোরআনে এ উক্তি উদ্ধৃত করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইহুদীদের একাংশ বিশেষত মদীনার ইহুদীরা এরূপ দাবী করতো এবং তাদের মধ্যে এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিলো। কোরআন ইহুদী ও খৃষ্টানদের বাস্তব বিভ্রান্তিরই সমালোচনা করতো। যে জিনিসের বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তা যদি বলা হতো, তাহলে ইহুদীরা একে রসূল (স.)-এর মিথ্যা প্রচারণা বলে প্রতিবাদের ঝড় তুলতো।

মরহুম শেখ রশীদ রেযা তাফসীর 'আল মানারের' দশম খন্ডের ৩৭৫-৩৭৮ পৃষ্ঠায় ইহুদীদের দৃষ্টিতে আযরার মর্যাদা সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্য বহুল আলোচনা উদ্ধৃত করেছেন এবং

তা নিয়ে নিজেও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। এখানে তার কিছু কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করছি, এর দ্বারা ইহুদীদের প্রকৃত পরিচয় জানা যাবে।

'ইহুদী এনসাইক্লোপেডিয়া (১৯০৩) সংস্করণে) বলা হয়েছে যে, আযরার যুগটা ছিলো ইহুদী জাতির চরম উৎকর্ষের যুগ। হযরত মূসা যদি ইহুদী জাতির শরীয়তী বিধান নিয়ে না আসতেন, তা হলে সম্ভবত আযরাই (উযায়ের) শরীয়ত প্রচলিত করতেন। (তালমুদ ২১) এই শরীয়তকে বনী ইসরাঈল ভুলেই গিয়েছিলো। কিন্তু আযরা এটাকে পুনপ্রচলিত করেন। বনী ইসরাঈল যদি ভুল ক্রটি না করতো, তাহলে তারা অনেক মোজেযা দেখতে পেতো, যেমন হযরত মূসার আমলে দেখেছিলো। .... এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, আযরা আশোরী ভাষায় শরীয়ত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। যে সব শব্দের ওপর তার সন্দেহ হতো, সেগুলোতে তিনি একটা করে চিহ্ন দিতেন। ইহুদী ইতিহাসের সূচনা তার যুগ থেকেই হয়।

ডক্টর জর্জ বোষ্ট তাওরাতের অভিধানে বলেছেন, আযরা একজন ইহুদী ধর্মীয় নেতা এবং প্রখ্যাত লেখক। রাজা 'ইরতাহশিসতা'র আমলে তিনি ব্যাবিলনে বসবাস করতেন। তাঁর রাজত্বের সপ্তম বছরে খৃঃপূঃ ৪৫৭ সালের কাছাকাছি সময়ে তিনি আযরাকে অনুমতি দেন যে, তিনি দেশের জনগণের মধ্য থেকে একটা বিরাট অংশকে জেরুজালেমে নিয়ে যেতে পারেন। (আযরা পৃ. ৭) এই সফরের মেয়াদ ছিলো চার মাস।

'তিনি আরো বলেছেন, ইহুদীদের ঐতিহ্য অনুসারে আযরা হযরত মূসা ও ইলিয়াসের নিকটতম মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বিরাট একটা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন, তাওরাতের পুস্তকগুলোকে একত্রিত করেন, প্রাচীন ইবরানীর পরিবর্তে কিলদানী অক্ষর ব্যবহার করেন এবং তিনি 'কাল' 'আযরা' ও 'নাহমিয়া' নামক পুস্তকগুলো রচনা করেন।'

'তিনি আরো বলেন, 'আযরা' নামক পুস্তকের ভাষা পৃ. ৪ থেকে ৮, ৬ থেকে ১৯, ৭ ও ১-২৭ হচ্ছে কিলদানী। নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পর লোকেরা ইবরানীর চেয়ে কিলদানীই বেশী বুঝতো।'

'আমার মতে, ইতিহাসবেত্তারা তো বটেই, এমন কি আহলে কেতাব ঐতিহাসিকরাও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মত এটাই মনে করেন যে, হযরত মূসা যে তাওরাত লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং বাক্সে স্থাপন করেছিলেন, তা হযরত সোলায়মানের আমলের আগেই হারিয়ে গিয়েছিলো। হযরত সোলায়মান যখন তাঁর শাসনামলে বাক্সটা খুললেন, তখন তাতে দুটো লিপি ছাড়া আর কিছুই পাননি। এর একটাতে দশটা উপদেশ লেখা ছিলো।(১) রাজাদের পুস্তকে এ সংক্রান্ত বিবরণ রয়েছে। এই আযরাই হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি নির্বাসনের পর কিলদানী অক্ষরে তাওরাত ও অন্যান্য পুস্তক লিখেছিলেন। তার লেখার ভাষা ছিলো ইবরানী ও কিলদানী মিশ্রিত। এই ইবরানী ভাষার বেশীর ভাগই ইহুদীরা ভুলে গিয়েছিলো। আহলে কেতাবের বক্তব্য এই যে, আযরা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহী বা ইলহামের সাহায্যে তাওরাতকে অবিকল আগের মতোই লিখেছিলেন। কিন্তু আহলে কেতাব ছাড়া অন্যরা একথা স্বীকার করে না। এ ব্যাপারে বহু আপত্তি রয়েছে। এসব আপত্তি বিভিন্ন পুস্তকে, এমনকি আহলে কেতাবের রচিত পুস্তকাদিতেও উল্লেখিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'ক্যাথলিক জ্ঞানের ভান্ডার' নামক ফরাসী ভাষায় লিখিত পুস্তকটি অন্যতম। এ পুস্তকের একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে আযরা লিখিত পাঁচখানা পুস্তক হযরত মূসার মূল পুস্তকের অনুরূপ নয় বলে আপত্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এর একটা উদ্ধৃতি নিম্নরূপ,

(১) এ ঘটনার বিবরণ সূরা বাকারার ২৪৮ নং আয়াতে দেখুন।

'আযরার পুস্তকে বলা হয়েছে যে, সব ক'টা পবিত্র গ্রন্থ বনুখায নাসারের শাসনামলে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আযরা বলেছেন, তোমার শরীয়তের বিধানকে আগুনে ভস্ম করে ফেলেছে। এখন তুমি কী তৈরী করেছো, তা কারো জানার উপায় নেই।(১) আরো বলা হয়েছে যে, জিবরীলের আনীত ওহীর সাহায্যে আযরা সেই পবিত্র পুস্তকগুলোকে পুনরায় লিপিবদ্ধ করেন, যা আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিলো। এ কাজে তাকে সমকালীন পাঁচজন লেখক সাহায্য করেছিলো। এ জন্যেই 'ছাবছোলিয়ানুছ', সাধু 'তরিয়ানুস', সাধু 'এরানিমোস', সাধু 'ইউহান্না আযযাহাবী' ও সাধু 'বাসিলিওস' প্রমুখ আযরাকে ইহুদীদের প্রখ্যাত ধর্মগ্রন্থসমূহের পুনর্লেখক বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

সবার শেষে আল্লামা রশীদ রেযা বলেন,

'এখানে আমরা এই বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত থাকছি। এ দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য দুটো– প্রথমত, আহলে কেতাব তাদের পবিত্র গ্রন্থাবলী ও তাদের ধর্মের মূল উৎসের ব্যাপারে যে আযরার কাছে ঋণী, তিনি এই ওযায়ের ছাড়া আর কেউ নন। দ্বিতীয়ত, এই উৎস ভুলত্রুটিতে পরিপূর্ণ এবং অনির্ভরযোগ্য। ইউরোপের স্বাধীন(২) পন্ডিতগণ গবেষণার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিকায় তার পুস্তক ও নাহমিয়ার পুস্তকের কথা উল্লেখ করার পর তার জীবনী বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে, পরবর্তী বর্ণনাগুলো থেকে জানা গেছে যে, আযরা শুধু বনী ইসরাঈলের পুড়ে যাওয়া শরীয়তকেই পুনরুজ্জীবিত করেননি, বরং নষ্ট হয়ে যাওয়া ইবরানী ভাষার সমস্ত পুস্তক পুন সংকলন করেন। তিনি আইন বিধান ব্যতীত সত্তরখানা পুস্তক পুন সংকলন করেন। অতপর জীবনী লেখক বলেন, আযরার নামযুক্ত এই পুস্তকখানা যখন ঐতিহাসিকরা মনগড়াভাবেই লিখেছেন এবং এর কোথাও অন্য কোনো পুস্তকের বরাত দেননি, তখন এ যুগের লেখকদের বিশ্বাস যে, আযরার পুস্তকের আগাগোড়াই ঐ সব বর্ণনাকারীর মনগড়া। (পৃ. ১৪, ৯ম খন্ড, চতুর্দশ সংস্করণ ১৯২৯)

'মোট কথা, ইহুদীরা এই ওযায়েরকেই পুণ্যাত্মা মনে করে। এমনকি কেউ কেউ তাকে 'আল্লাহর পুত্র' বলেও আখ্যায়িত করেছে। এই আখ্যাদান কি সম্মান প্রদর্শনের অর্থে করা হয়েছে, যেমন দাউদ ও ইসরাঈল (হযরত ইয়াকুব) প্রমুখকে করা হয়েছিলো, না তাদের দার্শনিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থে করা হয়েছিলো, যার সম্পর্কে শীগগীরই আলোচনা আসছে এবং যা ভারতীয় পৌত্তলিকদের দর্শনের সাথে সংগতিপূর্ণ। বস্তুত এই পৌত্তলিক দর্শনই খৃষ্টানদের মূল আকীদা ও

(১) এ সম্পর্কে কোরআনের এ বক্তব্যই সঠিক যে, এ পুস্তকগুলো অক্ষত ছিলো।

(২) আমি তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন-এ সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করছি যে, শেখ মোহাম্মদ আবদুহুর প্রতিষ্ঠান ও তার ছাত্রদের কাছে এই 'স্বাধীন' শব্দটা কী তাৎপর্য বহন করে, সেটা যেন লক্ষ্য করেন। এই স্কুল সামগ্রিকভাবে এমন সব পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত, যা প্রকৃত ইসলামী চিন্তাধারার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন ও বেমানান। এই প্রভাবের কারণে তারা ইউরোপের গীর্জা বিরোধী লেখকদের প্রতি অনুরক্ত এবং গীর্জা বিরোধী হওয়ার কারণে তাদেরকে স্বাধীন বা নিরপেক্ষ মনে করে। অনুরূপভাবে, তারা গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সংক্রান্ত পাশ্চাত্য ধারণার সমর্থনকারী ইউরোপীয় লেখকদের এবং ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থারও ভক্ত। 'ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থা ও চিন্তাধারার মধ্য থেকে যেটুকু ভালো' তা গ্রহণ করার জন্য তারা ওকালতি করে থাকেন সে প্রভাবের কারণেই। অথচ এটা বিপজ্জনক ও পিচ্ছিল পথ। লর্ড ক্রমারের ন্যায় খৃষ্টান পন্ডিতেরা তাদের এই মনোভাবের প্রতি সহানুভূতিশীল। এই সহানুভূতির রহস্য কোথায় ভেবে দেখা দরকার। বিষয়টা অধিকতর প্রশস্ত ও গভীর দৃষ্টির দাবী রাখে এবং ইসলামী বিধানের ওপর দৃঢ়তা ও তা নিয়ে পরিপূর্ণ তৃপ্তি বোধের আবশ্যকতা রয়েছে।

বিশ্বাস।(১) তাফসীরকাররা এ ব্যাপারে একমত যে, 'হযরত ওযায়ের আল্লাহর পুত্র' এ কথা সকল ইহুদী বলতো না, বলতো তাদের একটা গোষ্ঠী।

'মদীনার ইহুদীদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিলো এ কথার প্রবক্তা। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন, 'ইহুদীরা বলেছে, আল্লাহর হাত শেকলে বাঁধা। আসলে ওদের হাতই শেকলে বাঁধা।.......' অন্যত্র বলেছেন, 'যারা বলেছে যে, আল্লাহ দরিদ্র এবং আমরা ধনী, তারা কুফরী করেছে।' আল্লাহ তায়ালা যখন বলেছিলেন, 'আল্লাহকে কে উত্তম ঋণ দেবে?' তখন তার জবাবে তারা এ কথা বলেছিলো। এ জাতীয় কথাবার্তা মদীনার ইহুদীদের আগেও কেউ বলে থাকতে পারে। তাই সেটা হয়তো আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি।

'ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম, আবুশ খায়খ ও ইবনে মারদাবিয়া ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, সালাম বিন মুশকিম, নোমান বিন আওফা, আবু আনাস, শাস বিন কায়েস ও মালেক বিন সাইফ মদীনার এই ক'জন ইহুদী নেতা রসূল (স.)-এর কাছে এসে একবার বলেছিলো, 'আমরা কেমন করে তোমার অনুসারী হই? তুমি তো আমাদের কেবলাও ছেড়ে দিলে, আর ওযায়ের যে আল্লাহর পুত্র, সে কথাও মানো না।'

'এটা সুবিদিত যে, যে সব খৃষ্টান মসীহকে আল্লাহর পুত্র বলেছিলো, তারা আসলে ইহুদী ছিলো। হযরত ঈসা (আ.)-এর সমসাময়িক ইসকান্দারিয়ার ইহুদী দার্শনিক কিলো বলতেন, আল্লাহ আমাদের পিতা। তিনি নিজের কথা দ্বারাই যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এ হিসাবে মোহাম্মদ (স.)-এর আগমনের পূর্বে কেউ কেউ যে বলেছেন, ওযায়ের এই অর্থেই আল্লাহর পুত্র, সেটা অবাক হবার মতো কোনো কথা নয়।'

এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, ইহুদীদের এ উক্তিকে কোরআনে উদ্ধৃত করার পেছনে কী উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, বিশেষত যে প্রেক্ষাপট এই আয়াতগুলোতে প্রতিফলিত, তার আলোকে। বস্তুত আহলে কেতাবের একটা গোষ্ঠীর আকীদা বিশ্বাস এতোই বিকৃত যে, তার উপস্থিতিতে তারা কিছুতেই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী বলে দাবী করতে পারে না। তাদের এই ভ্রষ্টতা ও বিকৃতি দেখানোই এর উদ্দেশ্য। আর এই ভ্রষ্টতার কারণেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দানের উদ্দেশ্য তাদেরকে মুসলমান হবার জন্যে বলপ্রয়োগ করা নয়। বরং যে শক্তির বলে তারা ইসলামের পথ আগলে রেখেছে, সেই শক্তিকে ধ্বংস করা এবং ইসলামের শক্তির সামনে তাদের বশ্যতা স্বীকার করানো, যাতে সাধারণ জনগণ ইসলাম কিংবা কুফরী কোনো পক্ষ থেকেই কোনো বল প্রয়োগের সম্মুখীন না হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ইসলাম ও কুফরীর মধ্য থেকে যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে।

পক্ষান্তরে খৃষ্টানরা যে হযরত ঈসাকে আল্লাহর পুত্র এবং তিন খোদার একজন বলে অভিহিত করে থাকে, সেটা তাদের সুপ্রসিদ্ধ আকীদা। তাদের সমগ্র জনগোষ্ঠীই এই বিশ্বাসের অনুসারী। খৃষ্টানদের আদি গুরু পল যখন হযরত ঈসার আনীত তাওহীদী আকীদাকে বিকৃত করে, তারপর খৃষ্টীয় একাডেমীগুলো ওই বিকৃতিকে চিরস্থায়ী ও পরিপূর্ণ রূপ দেয় এবং তাওহীদী আকীদাকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করে, তখন থেকে সমগ্র খৃষ্টান জগতের আকীদা বিশ্বাস চলে আসছে এটাই।

(১) বিষয়টাকে এত ঘোরালো করার কোন অবকাশ থাকে বলে আমার মনে হয় না। কোরআন স্পষ্ট করেই বলেছে যে, ইহুদীদের উক্তি 'ওযায়ের আল্লাহর পুত্র' এবং খৃষ্টানদের উক্তি 'মসীহ আল্লাহর পুত্র' উভয়ই পূর্ববর্তী কাফেরদের বক্তব্যের অনুরূপ। কারণ কাউকে আল্লাহর পুত্র বললেই সে আল্লাহর সত্য ধর্ম থেকে খারিজ হয়ে কাফের ও মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

খৃষ্টান জাতির আকীদা বিশ্বাসের সংক্ষিপ্তসার অধ্যাপক শেখ রশীদ রেযা করা 'তাফসীর আল মানার' থেকে নিম্নে তুলে দেয়া যাচ্ছে। এই বিবরণের শিরোনাম হলো ত্রিত্ববাদ বা Trinity,

'খৃষ্টানরা এ শব্দটা দ্বারা একই সাথে তিনজন খোদার উপস্থিতি বুঝায়। এই তিনজন হলো পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এ শিক্ষা ক্যাথলিক গীর্জা, প্রাচ্য গীর্জা ও মান্ডার ব্যতীত সমস্ত প্রাচ্য ও প্রোটেষ্টান্ট খৃষ্টানদের আকীদা বিশ্বাস এটাই। যারা এ আকীদা পোষণ করে, তাদের বিশ্বাস যে, এটা পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থেরই অনুরূপ। ধর্মতত্ত্ববিদরা এ মতবাদের বহু ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা তারা প্রাচীন একাডেমীগুলোর শিক্ষা ও বড় বড় গীর্জা নেতাদের কাছ থেকে পেয়েছেন। এ সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে দ্বিতীয় খোদার জন্মের প্রক্রিয়া ও তৃতীয় খোদার উদ্ভবের প্রক্রিয়া কী ছিলো তা তুলে ধরে। অনুরূপভাবে তিন খোদার পারস্পরিক সংযোগ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য ও উপাধিগুলো নিয়েও আলোচনা করে। যদিও ত্রিত্ববাদ কথাটা পবিত্র গ্রন্থে নেই এবং আদি গ্রন্থের কোনো একটা আয়াতেও তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই, তথাপি প্রাচীন খৃষ্টান লেখকরা বহু সংখ্যক আয়াতের উল্লেখ করে, যা আল্লাহর একটা সামষ্টিক রূপের অস্তিত্বের সন্ধান দেয়। কিন্তু ওই আয়াতগুলো অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীনভাবে এ কথা বলে না, বরং এ সব আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা দেয়ার অবকাশ রয়েছে। তাই ওগুলোকে ত্রিত্ববাদের অকাট্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যাবে না। তা থেকে দুটো আয়াত সমষ্টির উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এ শিক্ষাকে সঠিক প্রমাণ করার জন্যে। এর একটা হলো সেই সব আয়াত, যাতে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে একই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টায় প্রত্যেককে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তাদের বিশেষ ধরনের গুণাবলী ও একটার সাথে অন্যটার সংযুক্তি বর্ণনা করা হয়েছে।

এই একাধিক খোদার অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক পোপদের আমলেই শুরু হয়ে গিয়েছিলো। প্রধানত হেলেনী ও গনোষ্টীয় দার্শনিকদের শিক্ষা থেকে এর উদ্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে আন্তাকিয়ার পাদ্রী সিওফিলোস গ্রীক ভাষায় 'ত্রিয়াস' প্রয়োগ করে। অতপর 'তারতালিয়ালুস' সর্ব প্রথম 'ত্রিনিতাস' শব্দটা ব্যবহার করে, যার অর্থ 'তিন খোদার ধারণা' বা ত্রিত্ব। নেকাভি একাডেমীর আমলে এ শিক্ষা নিয়ে ক্রমাগত বিতর্ক চলতে থাকে, বিশেষত প্রাচ্যে। গীর্জা বহু সংখ্যক মতামতকে বেদয়াত অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য নতুন তত্ত্ব বলে আখ্যায়িত করে। তন্মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য হলো ইবিয়োনীদের মতো, যাতে হযরত ঈসাকে নিছক একজন সাধারণ মানুষ আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর একটা মত 'সাবেলিয়নদের'। তারা বিশ্বাস করতো যে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা আল্লাহরই বিভিন্ন রূপ। এ সব বিভিন্ন রূপে তিনি নিজেকে মানুষের সাথে পরিচিত করেন। অপর মতটা 'আরিয়োসীদের। তাদের মত ছিলো এই যে, পিতার মত পুত্র চিরঞ্জীব সত্ত্বা নয়, বরং জগত সৃষ্টির আগে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই সে পিতার চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন এবং তার অনুগত। আর 'মাকদুনীরা পবিত্র আত্মাকে আদৌ কোনো খোদাই মনে করে না।

পক্ষান্তরে গীর্জার শিক্ষা কী হবে, সে সম্পর্কে নেকাভী একাডেমী ৩২৫ খৃষ্টাব্দে এবং কনষ্টান্টিনোপল একাডেমী ৩৮১ খৃষ্টাব্দে স্থির করে যে, পিতা ও পবিত্র আত্মা ঐশ্বরিক সত্ত্বার অংশ হিসাবে সমান মর্যাদার অধিকারী। পুত্র পিতার ঔরস থেকে অনাদিকালে জন্ম নিয়েছে, আর পবিত্র আত্মা পিতা থেকেই আবির্ভূত। তালাইতালা একাডেমী ৫৮৯ খৃষ্টাব্দে রায় দেয় যে, পবিত্র আত্মা পুত্র থেকেও আবির্ভূত। ল্যাটিন গীর্জা এই সংযোজনকেও পুরোপুরি মেনে নিয়েছে এবং তার ওপর অটল রয়েছে। গ্রীক গীর্জা প্রথম দিকে নীরব থাকলেও পরবর্তীতে আইন পরিবর্তনের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছে। কেননা সে পূর্ববর্তী আইনকে বেদয়াত মনে করে।

'এই পুত্র থেকেও' কথাটা গ্রীক গীর্জা ও ক্যাথোলিক গীর্জার ঐক্যের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর লোসিরী ও সংস্কারকামী গীর্জার পুস্তকগুলো ক্যাথোলিক গীর্জার শিক্ষাকেই কোনো পরিবর্তন ছাড়া বহাল রেখেছে। কিন্তু ১৩শ শতাব্দী থেকে বিপুল সংখ্যক ধর্মতাত্ত্বিক এবং নতুন কিছু দল যেমন সোসনিয়ায়ী, জিরমানী, একত্ববাদী প্রমুখ এর বিরোধিতা করে চলেছে। তারা ওই শিক্ষাকে পবিত্র গ্রন্থ ও বিবেকের পরিপন্থী গণ্য করে। 'সুয়াইদ তিরাগ' ত্রিত্ববাদকে হযরত ঈসার খোদায়ীর আলামত হিসাবে গণ্য করেছে। তবে তিন খোদার একজন হিসাবে নয়, বরং একই খোদা হিসাবে। অর্থাৎ হযরত ঈসার সত্ত্বায় যে জিনিসটা আল্লাহর উপাদান সেটা পিতা, আর আল্লাহর যে উপাদান ঈসার দেহের সাথে বিলীন হয়ে গেছে, সেটা পুত্র এবং তা থেকে আল্লাহর যে উপাদান জন্ম নিয়েছে তা পবিত্র আত্মা। লোসিরী ও সংস্কারকামী গীর্জাসমূহের মধ্যে যুক্তিবাদীদের মতবাদ বিস্তার লাভ করায় কিছু কাল যাবত ত্রিত্ববাদী বিশ্বাসকে জিরমানী ধর্মতাত্ত্বিকদের অনেকের মধ্যে দুর্বল করে দিয়েছে।

'কান্তের মতে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা বলতে আল্লাহর তিনটি মৌলিক গুণকে বুঝানো হয়েছে। শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও ভালোবাসা অথবা সৃজনশীলতা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ। হেজিন ও শিলিং উভয়ে ত্রিত্ববাদের শিক্ষার জন্যে একটা কাল্পনিক ভিত্তি গড়ার চেষ্টা করেছেন সাম্প্রতিক কালের জিরমানী ধর্মতাত্ত্বিকরা হেজিং ও শিলিং এর অনুসরণ করেছেন এবং ত্রিত্ববাদকে কাল্পনিক ও ঐশ্বরিক ভিত্তিতে শিক্ষা দেয়ার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন। আর যে সমস্ত ধর্মতাত্ত্বিক ওহীর ওপর নির্ভর করেন, তারা গীর্জার মত সূক্ষ্মভাবে মতের স্থিরতা শিক্ষা দিতে একাগ্রতা প্রদর্শন করেন না। তবে নেকিয়া ও কনষ্টান্টিনোপল একাডেমীর বেলায় এটা সুনির্দিষ্ট। সাম্প্রতিককালে বিশেষভাবে স্বেলীয়দের মতামতকে গ্রহণের পক্ষে অনেকেই ওকালতি করেছেন।'

উপরোক্ত সংক্ষিপ্তসার থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খৃষ্টীয় দল-উপদলগুলোর মধ্যে কোনোটাই সত্য ধর্মের আসল নীতিমালা অনুসরণ করে না। তারা কেউই তাওহীদের অনুগত নয়।

'আরোসীয়রা প্রায়ই নিজেদেরকে 'তাওহীদপন্থী' বলে থাকে, কিন্তু এটা বিভ্রান্তিকর। আল্লাহর সত্য দ্বীন থেকে তাওহীদের যে তাৎপর্য জানা যায়, সে অনুসারে তারা তাওহীদপন্থী নয়। তারা তাওহীদ ও শেরেকের মিশ্রণ ঘটায়। একদিকে তারা বলে, হযরত ঈসা আল্লাহর মতো চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী নন অপরদিকে একই সাথে তারা বলে যে, তিনি পুত্র, জগত সৃষ্টির আগে পিতা কর্তৃক সৃষ্ট। এটা প্রকৃত তাওহীদের সাথে মোটেই মানানসই নয়।

হযরত ঈসাকে যারা স্বয়ং আল্লাহ, অথবা আল্লাহর পুত্র বলে, অথবা যারা বলে, আল্লাহ তিন জনের মধ্যে তৃতীয় জন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুস্পষ্ট রায় দিয়েছেন যে, তারা মোশরেক কাফের। একই আকীদা বিশ্বাসে ও একই মন মগযে ঈমান ও কুফরী একই সাথে একত্রিত হতে পারে না। কেননা এ দুটো জিনিস পরস্পর বিরোধী।

ইহুদীদের হযরত ওযায়েরকে আল্লাহর পুত্র বলা এবং খৃস্টানদের হযরত ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলা সম্পর্কে কোরআন যে মন্তব্য করেছে, তা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তাদের এ সব উক্তি ইতিপূর্বে পৌত্তলিকদের কথিত উক্তি ও লালিত ধারণা বিশ্বাসেরই অনুরূপ। একথা কোরআন বলছে,

'ওটা ওদের মুখের কথা। ওরা ইতিপূর্বে যারা কুফরী করেছে তাদের মতোই কথা বলে।'

কোরআনের এ কথাটা প্রমাণ করে যে, তাদের ওই উক্তি তাদের মুখেরই উচ্চারিত কথা মাত্র, তাদের কাছ থেকে উদ্ধৃত নয়। এ জন্যে 'তাদের মুখের কথা' বলা হয়েছে নিছক বাস্তব অনুভূত

সত্যের অভিব্যক্তি ঘটানোর জন্যে। এভাবেই কোরআন সত্যকে চিত্রিত করে। কেননা এখানে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের একথা তাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় এবং মুখেই থেকে যায়। বস্তুত কথা মুখ দিয়েই উচ্চারিত হয়ে থাকে। তবু 'মুখের কথা' বলা তাৎপর্যপূর্ণ। এই বাড়তি শব্দ আল্লাহ নিরর্থক প্রয়োগ করেননি। আল্লাহ তায়ালা কখনো নিষ্প্রয়োজন কথা বলেন না। এটা আসলে কোরআনের শৈল্পিক প্রকাশভংগি। কথার একটা 'ছবি' যেন এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যেন তা শ্রুত ও দর্শিত। সেই সাথে এ দ্বারা এ কথাও বুঝানো হচ্ছে যে, ওই কথার কোনো অস্তিত্ব বাস্তবে নেই। ওটা শুধু মুখেরই কথা। মুখের বাইরে আর কোথাও তাকে পাওয়া যায় না।

এরপর এর অন্য একটা দিকও লক্ষণীয়, যা কোরআনের অলৌকিকত্ব প্রকাশ করে এবং তার উৎস যে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়, তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। সেটা হচ্ছে আল্লাহর এ উক্তি,

'তারা ইতিপূর্বে যারা কুফরী করেছে তাদের মতোই কথা বলে।'

তাফসীরকাররা এর ব্যাখ্যা করেন এভাবে যে, 'ইতিপূর্বে আরবের পৌত্তলিকরা যেমন ফেরেশতাদের আল্লাহর সন্তান বলতো ইহুদী ও খৃষ্টানদের এ কথাও তদ্রূপ।' এ ব্যাখ্যা নিসন্দেহে সঠিক। তবে এ উক্তির তাৎপর্য আরো ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। এই সুদূর প্রসারী তাৎপর্য ভারত, প্রাচীন মিসর ও গ্রীসের পৌত্তলিকদের পর্যালোচনার পর সাম্প্রতিককালেই প্রকাশ পেয়েছে। এ পর্যালোচনা আহলে কেতাবের বিশেষত খৃষ্টানদের বিকৃত আকীদা বিশ্বাসের মুখোশ খুলে দিয়েছে এবং দেখিয়ে দিয়েছে যে, প্রথমে পল কর্তৃক ও পরে খৃষ্টীয় একাডেমীর শিক্ষাগুলো আসলে পৌত্তলিকদের কাছ থেকে পাচার হয়ে আসা শিক্ষারই নতুন রূপ।

ওজোরেস, এজেস ও হোরেস– এই তিন দেবতার সমন্বয়ে গঠিত মিসরীয় ত্রিত্ববাদ হলো ফেরাউনী পৌত্তলিকতার মূল ভিত্তি। এই ত্রিত্ববাদে এজোরেস পিতা ও হোরেস পুত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

আর ইস্কান্দারীয় ধর্মতত্ত্ব, যার চর্চা হযরত ঈসার বহু বছর আগে করা হতো, তার আলোকে কালেমা বা বাণী হলো 'দ্বিতীয় খোদা'। এর আর এক নাম 'আল্লাহর কুমার পুত্র'।

আর হিন্দুরা তিন খোদা বা খোদার তিনটি অবস্থায় বিশ্বাস করে। যথা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। ব্রহ্মাকে স্রষ্টা বা সৃষ্টির অবস্থা, বিষ্ণুকে রক্ষক বা রক্ষা করার অবস্থা এবং শিবকে ধ্বংস ও সংহারকারী বা সংহার করার অবস্থা বলে বিশ্বাস করে। এই মতবাদে এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে, ব্রহ্মা ঈশ্বরত্ব পুত্রে রূপান্তরিত হয়ে বিষ্ণুর রূপ ধারণ করেছে।

আশোরীয়রা বাণীতে বিশ্বাস করতো এবং একে 'মারদুক' নামে আখ্যায়িত করতো। এই মারদুক আল্লাহর চির কুমার পুত্র বলে তারা বিশ্বাস করতো।

গ্রীকরাও তিন সত্ত্বায় বিভক্ত খোদায় বিশ্বাস করতো। তাদের পুরোহিতরা যখন পশু বলি দিতো, তখন বলির বেদিতে তিনবার পবিত্র পানি ছিটাতো, সুগন্ধি ছড়ানোর পাত্র থেকে তিন আংগুল দিয়ে সুগন্ধিদ্রব্য নিতো এবং বলির বেদির পাশে সমবেত লোকদের ওপর তিনবার পবিত্র পানি ছিটাতো। এ সবের মাধ্যমে তারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসের ইংগিত দিতো। গীর্জা এই সব ধর্মীয় রীতি প্রথাই গ্রহণ করেছে। কেননা এগুলোর পেছনে রয়েছে পৌত্তলিক ধারণা বিশ্বাস এবং কাফের মোশরেকদের সাথে সাদৃশ্য রক্ষার খাতিরে তারা ওই সব ধারণা বিশ্বাস ও রীতি প্রথাকে গ্রহণ করেছে।

কোরআনের 'তারা পূর্বেকার কাফেরদের কথার মতোই কথা বলে'– এই উক্তির সাথে কোরআন নাযিল হওয়ার সময় অপরিচিত প্রাচীন পৌত্তলিকতাবাদীদের ধারণা বিশ্বাসের পর্যালোচনা করলে একদিকে যেমন জানা যায় যে, আহলে কেতাব আল্লাহর শাশ্বত সত্য ধর্মের

অনুগতও নয়, আল্লাহর ওপথ যথোচিতভাবে ঈমানও আনে না, তেমনি কোরআনের অলৌকিকত্বও প্রমাণিত হয় এবং কোরআনের আসল উৎস যে মহাজ্ঞানী আল্লাহ স্বয়ং, তাও স্পষ্ট হয়ে যায়।

এ বিস্তারিত বিবরণের পর আহলে কেতাবের কুফর ও শেরেকের অকাট্য প্রমাণ প্রদানকারী আয়াতটির সমাপ্তি টানা হয়েছে এভাবে,

'আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন! এরা কোন উল্টো পথে চলেছে?'

হাঁ, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংসই করুন। কিভাবে স্পষ্ট ও সহজ সরল সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা এমন অস্পষ্ট ও জটিল পৌত্তলিকতাকে গ্রহণ করে। যা বুদ্ধি ও বিবেকের সাথে মোটেই সংগতিপূর্ণ নয়।

মানুষ যেভাবে মানুষকে প্রভু বানিয়ে নেয়

এরপর কোরআন আহলে কেতাবের বিকৃতি ও বিভ্রান্তির আরেকটা দিক তুলে ধরছে, যা শুধু কথায় ও বিশ্বাসে সীমিত নেই, বরং বিকৃত আকীদা-বিশ্বাসের অনুরূপ বিকৃত কর্ম ও চরিত্রকেও স্পষ্ট করে দিচ্ছে। ৩১ নং আয়াতটা লক্ষ্য করুন,

তারা তাদের পন্ডিত ও দরবেশদেরকে এবং মরিয়মের পুত্র মসীহকে আল্লাহর বিকল্প প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে ....'

সূরার এই অংশটার প্রথম আয়াতে সৃষ্ট সন্দেহের অপনোদনে যে সব বক্তব্য দেয়া হয়েছে, এ আয়াতে তারই ধারাবাহিকতা চলছে। সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিলো যে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা যখন আল্লাহর কেতাবেরই অধিকারী, তখন তারা তো আল্লাহর সত্য ধর্মের অনুসারী। এই সন্দেহের জবাবে এ আয়াতটায় বলা হয়েছে যে, তারা তাদের আকীদা বিশ্বাস ও বাস্তব চরিত্র দ্বারাই প্রমাণ করেছে যে, তারা আল্লাহর সত্য দ্বীনের অনুসারী নয়। তাদেরকে এক আল্লাহর এবাদাতের আদেশ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তারা তাদের আলেম দরবেশদের ও মরিয়মের পুত্র ঈসাকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছে। এভাবেই তারা আল্লাহর সাথে শেরেক করেছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের শেরেক মেনে নিতে পারেন না। সুতরাং আকীদা বিশ্বাসে, কর্মে ও চরিত্রে– কোনো বিষয়েই তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী নয়।

আলেম ও দরবেশদেরকে তারা কিভাবে বিকল্প প্রভু হিসাবে গ্রহণ করলো, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়ার আগে আমরা এমন কয়েকটা হাদীস উদ্ধৃত করতে চাই, যাতে এ আয়াত সম্পর্কে রসূল (স.)-এর তাফসীর ও জানা যায়। সেই তাফসীরের আর কোনো তাফসীরেরই অবকাশ থাকে না।

আহবারঃ 'হাবরুন' বা 'হিবরুনের' বহুবচন। হাবরুন বা হিবরুন অর্থ আহলে কেতাবের ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ বা আলেম। তবে ইহুদী আলেমের ওপরই এর প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত বেশী। রুহবান, 'রাহেব' এর বহুবচন। খৃষ্টানদের কাছে 'রাহেব' সেই ব্যক্তি, যে এবাদাতের জন্যে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনবাসী হয়। এ ধরনের ব্যক্তিরা স্বাধারণত বিয়ে, আয়-রোযগার ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় না।

দুররে মনসূরে তিরমিযী থেকে উদ্ধৃত হাদীসে বলা হয়েছে যে, আদী ইবনে হাতেম বলেন, আমি রসূল (স.)-এর কাছে এসে দেখলাম, তিনি সূরা তাওবার এই আয়াতটা পড়ছেন, 'তারা তাদের আলেম ও দরবেশদের এবং মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর বিকল্প প্রভু রূপে গ্রহণ করেছে ......' অতপর রসূল (স.) বললেন, 'তোমরা শোনো, তারা তাদের আলেম দরবেশদের পূজা উপাসনা করতো না। কিন্তু তারা যখন মনগড়াভাবে কোনো জিনিসকে হালাল বলে ঘোষণা করতো, তখন তারা সেই জিনিসকে হালাল বলে গ্রহণ করতো, আর যখন কোনো জিনিসকে হারাম বলে ঘোষণা করতো, তখন তারাও তাকে হারাম রূপে গ্রহণ করতো।'

তাফসীরে ইবনে কাসীরে ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে জারীর হযরত আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত এই হাদীসটা উদ্ধৃত করেছেন, আদী ইবনে হাতেমের কাছে যখন রসূল (স.)-এর দাওয়াত পৌঁছলো, তখন আদী সিরিয়ায় পালিয়ে গেলেন। আদী জাহেলী যুগে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পালিয়ে যাওয়ার পর তার বোন ও গোত্রের কিছু লোককে গ্রেফতার করা হয়। অতপর রসূল (স.) তার বোনকে মুক্তি ও কিছু উপঢৌকন দেন। অতপর তার বোন তার ভাইয়ের কাছে চলে গেলো এবং তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে ও মদীনায় রসূল (স.)-এর কাছে আসতে উদ্বুদ্ধ করলেন। আদী মদীনায় এলেন। তিনি ছিলেন তাঈ গোত্রের অন্যতম নেতা। তাঁর পিতা ছিলেন খ্যাতনামা দানবীর হাতেম তাঈ। আদীর আগমনের খবর নিয়ে লোকজনের মধ্যে গুঞ্জন চলতে লাগলো। আদী রসূল (স.)-এর কাছে যখন এলেন, তখন তার গলায় একটা রূপার ক্রুশ ঝুলানো ছিলো। রসূল (স.) তখন এ আয়াতটি পড়ছিলেন,

'তারা তাদের আলেম, দরবেশ ও মরিয়মের পুত্র মুসীহকে আল্লাহর বিকল্প প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছিলো................' আদী বলেন, আমি রসূল (স.)-কে বললাম, 'আহলে কেতাব আলেম দরবেশদের পূজা উপাসনা করতো না।' রসূল (স.) বললেন, 'সে কথা সত্য। তারা পূজা-উপাসনা করতো না। তারা যা কিছু হালাল বা হারাম করতো, তাকে তারা নির্বিচারে হালাল ও হারাম হিসাবে মেনে নিতো এবং সেই অনুসারে কাজ করতো। এটাই তাদের পূজা উপাসনা।'

সুদ্দী বলেছেন, ইহুদী ও খৃষ্টানরা মানুষের উপদেশ মেনে চলতো, অথচ আল্লাহর কেতাবকে খুলে দেখতো না। এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'তাদেরকে এক আল্লাহর ছাড়া আর কারো এবাদাত করতে আদেশ দেয়া হয়নি।' অর্থাৎ আল্লাহই একমাত্র সত্ত্বা, যিনি কোনো জিনিসকে হালাল করলে তা হালাল হয় এবং হারাম করলে হারাম হয়। তিনি যে আইন জারী করেন, তাই কার্যকর হয় এবং যে যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, সেটাই বাস্তবায়িত হয়।'

ইমাম আলুসী বলেছেন,

অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন, 'প্রভু' শব্দ দ্বারা একথা বুঝানো হয়নি যে, তারা ওইসব আলেম দরবেশকে বিশ্বজগতের খোদা মনে করতো, বরং তাদের আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য করতো।

কোরআনের এই দ্ব্যর্থহীন উক্তি থেকে, রসূল (স.)-এর তাফসীর থেকে, যার উর্ধে আর কোনো তাফসীরের অবকাশ নেই এবং প্রাচীন ও আধুনিক সকল তাফসীরকারের তাফসীর থেকে ইসলামী আকীদা ও বিধান সম্পর্কে আমরা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারি। বিষয়গুলো নিম্নরূপ,

এবাদাত বলতে বুঝায় কোরআনের আয়াতের সহজ সরল অর্থ এবং রসূল (স.)-এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আলোকে ইসলামী শরীয়তের অনুকরণ ও অনুসরণ। ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের আলেম ও দরবেশদেরকে যে আল্লাহর বিকল্প প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছিলো, সেটা তাদের খোদা বলে বিশ্বাস করা ও তাদের সামনে আনুষ্ঠানিক পূজা-উপাসনা করার অর্থে নয়। তবু আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে তাদের মোশরেক এবং পরবর্তী আয়াতে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর কারণ শুধু এই যে, তারা তাদের কাছ থেকে আইন ও বিধান গ্রহণ করেছে ও তার অনুসরণ করেছে। আলেম ও দরবেশদেরকে রব হিসাবে আকীদা বিশ্বাস পোষণ ও আনুষ্ঠানিক পূজা উপাসনা করা ছাড়াই শুধুমাত্র তাদের আদেশ নিষেধ ও আইন বিধানের অনুকরণ ও অনুসরণই আহলে কেতাবকে মোশরেকে পরিণত করার জন্যে যথেষ্ট। আর মোশরেক হওয়ার অর্থই হলো মুসলমান

না থাকা ও কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া। যে সমস্ত ইহুদী তাদের আলেম ও দরবেশদের কাছ থেকে আইন ও বিধান গ্রহণ, অনুকরণ ও অনুসরণ করে এবং যে সমস্ত খৃষ্টান হযরত ঈসাকে আকীদাগতভাবে খোদা রূপে গ্রহণ ও তার সামনে আনুষ্ঠানিক পূজা উপাসনা করে, তাদের সবাইকে কোরআনের এ আয়াত সমভাবে মোশরেক ও আল্লাহর বিকল্প প্রভু গ্রহণকারী বলে ঘোষণা করেছে। ওই উভয় ধরনের কাজই কর্তাকে আল্লাহর সাথে শেরেকে লিপ্ত, মুসলমানদের দল থেকে বহিষ্কৃত ও কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে সমান ক্ষমতাশীল।

আল্লাহর যে কোনো বান্দা ও যে কোনো সৃষ্টিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও অধিকার দেয়াই আল্লাহর সাথে শেরকে লিপ্ত হওয়ার তথা মোশরেক রূপে গণ্য হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। এমনকি যদি আকীদা বিশ্বাসে তাকে খোদা বা দেবতা মনে না করা হয় এবং তার উদ্দেশ্যে কোনো আনুষ্ঠানিক পূজা উপাসনা না করা হয় তবুও। এ বক্তব্যটা পূর্ববর্তী প্যারা থেকেও পরিষ্কার ছিলো, কিন্তু একে অধিকতর স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এখানে কথাটা বললাম। আয়াতে এ সমস্ত তথ্য দ্বারা প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিলো তৎকালীন মুসলিম সমাজে রোমকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিরাজমান অন্তরায়গুলো তথা ভয়ভীতি ও দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর করা এবং আহলে কেতাব হওয়ার কারণে তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী জাতি এই ধারণা মুসলমানদের মন থেকে দূর করা। কিন্তু সেই সাথে আমাদের মনে ইসলামের ব্যাপারে সঠিক ধারণা বদ্ধমূল করাও এ সব তথ্যের লক্ষ্য।

ইসলামই হচ্ছে আল্লাহর সেই একমাত্র শাশ্বত সত্য ধর্ম, যা ছাড়া তিনি সমগ্র মানব জাতির কাছ থেকে আর কোনো ধর্মকে গ্রহণ করেন না। আর আকীদায় ও বিশ্বাসে আল্লাহকে সর্বময় ক্ষমতার মালিক একমাত্র ইলাহ, উপাস্য ও প্রভু হিসাবে মেনে নেয়া, যাবতীয় আনুষ্ঠানিক এবাদাত ও উপাসনা একমাত্র তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট করা এবং সর্বশেষে একমাত্র তাঁর আইন বিধানকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করাই ইসলামের ভিত্তি ও মূল কথা। এছাড়া ইসলামের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। কোনো ব্যক্তি বা জাতি যখন আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কারো আইন মেনে চলে, তখন তাদের ক্ষেত্রেও সেই কথাটাই সত্য হয়ে দেখা দেয়, যা ইহুদী ও খৃষ্টানদের ক্ষেত্রে সত্য হয়েছিলো। অর্থাৎ তারা নিজেদের যতোই মোমেন, মুসলমান ও তাওহীদপন্থী বলে দাবী করুক না কেন, আসলে তারা মোশরেক, কাফের ও অমুসলিম। কেননা যে মুহূর্তে তারা আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কারো আইনের অনুসরণ ও আনুগত্য করে এবং এটা করতে তারা এমন কোনো অসন্তোষ বা অসম্মতি প্রকাশ করে না, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা শুধুমাত্র চাপে পড়ে আনুগত্য করছে, ওই চাপ প্রতিহত করার ক্ষমতা তাদের নেই এবং তারা আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে অন্য আইনকে কখনো স্বেচ্ছায় মেনে নেয়নি, সেই মুহূর্তেই সে কাফের ও মোশরেক হয়ে যায়।

'ধর্ম বা 'দ্বীন' পরিভাষাটা আজকাল মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। এটাকে তারা মন মগযে বিশেষ আকীদা বিশ্বাস পোষণ ও বিশেষ আনুষ্ঠানিক উপাসনা ও বন্দনা করার সমার্থক মনে করে। ইহুদীদের অবস্থা এ রকমই ছিলো। এ জন্যে তাদেরকে এ আয়াতে ও এ আয়াতের রসূল প্রদত্ত ব্যাখ্যায় আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী, আল্লাহর সাথে শেরেকে লিপ্ত এক আল্লাহর এবাদাত করার আদেশ অমান্যকারী এবং নিজেদের আলেম ও দরবেশদেরকে বিকল্প প্রভু রূপে গ্রহণকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

দ্বীন (যার বাংলা প্রতিশব্দ জীবন ব্যবস্থা শব্দের প্রাথমিক অর্থ আনুগত্য, অনুসরণ ও আত্মসমর্পণ। এই আনুগত্য, অনুসরণ ও আত্মসমর্পণ আনুষ্ঠানিক উপাসনার মাধ্যমে যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি আইন, আদেশ নিষেধ ও বিধি বিধান মেনে চলার মধ্য দিয়েও তার প্রতিফলন ঘটে।

বিষয়টা অত্যন্ত গুরুতর, কঠোর ও আপোষহীন। এতে বিন্দুমাত্রও নমনীয়তার অবকাশ নেই। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আইন নির্বিবাদে মেনে নেয় এবং এমন কোনো বাদ প্রতিবাদ, অসন্তোষ ও অসম্মতি প্রকাশ না করেই তার আনুগত্য করতে থাকে, যা দ্বারা আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার প্রতি এই আনুগত্যহীনতা যে তারা সেচ্ছায় নয়, বরং সম্পূর্ণ অনিচ্ছাবশত ও চাপ প্রতিহত করতে না পেরে করেছে, তা প্রমাণিত হয়, তাদেরকে মোমেন ও মুসলমান বলে গ্রহণ করার কোনোই অবকাশ নেই। শুধুমাত্র আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস করা ও আনুষ্ঠানিক এবাদাত উপাসনা শুধু আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করা দ্বারা এ সব লোক মোমেন ও মুসলমান বলে স্বীকৃতি পেতে পারে না। এ ক্ষেত্রে নমনীয়তা ও আপোষকামিতাই ইসলামের জন্যে এ যুগের সবচেয়ে কঠিন ও কষ্টকর সমস্যা। এটা এ যুগের সবচেয়ে ভয়ংকর অস্ত্র, যা দিয়ে ইসলামের দুশমনরা ইসলামের বিরুদ্ধে লড়ছে। যে সব প্রতিষ্ঠান ও যে সব ব্যক্তির অনুরূপ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আল্লাহ মোশরেক, ইসলাম বিরোধী ও আল্লাহর বিকল্প প্রভু গ্রহণকারী রূপে আখ্যায়িত করেছেন, সেই সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর ইসলামের ওই শত্রুরা ইসলামের লেবেল এঁটে দিতে উদগ্রীব। এসব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির ওপর যখন ইসলামের শত্রুরা 'ইসলাম'-এর লেবেল এঁটে দিতে উদগ্রীব, তখন ইসলামের রক্ষকদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এই সব প্রতারণামূলক লেবেল কেড়ে নেয়া এবং এর আড়ালে যে শেরেক, কুফর ও আল্লাহদ্রোহিতা সক্রিয় রয়েছে, তার মুখোশ খুলে দেয়া। কেননা তাদেরকে তো একমাত্র আল্লাহর এবাদাত করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তাদের শেরেক থেকে আল্লাহ পবিত্র।'

কাফেরদের ষড়যন্ত্র ও দ্বীনুল হকের প্রতি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি

অতপর কোরআন মোমেনদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে আরো একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আয়াত নং ৩২ ও ৩৩ এর মধ্যে এই পদক্ষেপটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'তারা আল্লাহর প্রদীপকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফেলতে চায়।............'

অর্থাৎ এ সব আহলে কেতাব শুধুমাত্র সত্য ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে, আল্লাহর বিকল্প প্রভুদের কাছ থেকে আইন ও বিধান গ্রহণ করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর যথোচিতভাবে ঈমান না এনেই ক্ষান্ত থাকতে চায় না, বরঞ্চ তারা আল্লাহর সত্য দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করে, এই দ্বীনের মধ্য দিয়ে আল্লাহর যে প্রদীপ আলো বিকিরণ করছে তাকে নিভিয়েও ফেলতে চায় এবং বিশ্বময় আল্লাহর আইন চালু করার দাওয়াতের মধ্য দিয়ে মানুষের ঘরে ঘরে আলো জ্বালানোর যে প্রচেষ্টা চলছে, সেই মহত প্রচেষ্টাকে তারা স্তব্ধ ও নস্যাত করে দিতে চায়।

'তারা আল্লাহর আলোকে নিভিয়ে ফেলতে চায়। ....'

অর্থাৎ তারা আল্লাহর আলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ও আগ্রাসনরত। এই যুদ্ধ ও আগ্রাসন তারা চালায় কখনো অপপ্রচার, মিথ্যা অপবাদ ও কুৎসা রটনার মাধ্যমে। কখনো প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মাধ্যমে। কখনো এমন যুলুম নির্যাতন চালানোর মাধ্যমে, যাতে মুসলমানরা নিজেদের ঈমান, চরিত্র ও সততা, অথবা জীবন ও সহায় সম্পদ অথবা সব কিছুই হারাতে বাধ্য হয়। কখনো তাদের বশংবদদের ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ চালানোর জন্যে উস্কে ও লেলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। কখনো তাদেরকে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্ররোচিত করার মাধ্যমে। কোরআন নাযিল হবার সময়ে ও তার পরবর্তীকালে সমগ্র ইতিহাস জুড়ে এরূপ পরিস্থিতিই বিরাজ করছিলো এবং উল্লিখিত সব ক'টা পন্থাই পর্যায়ক্রমে অবলম্বন করা হয়েছিলো।

এ বিবরণ দ্বারা এক দিকে যেমন কাংখিত ছিলো তৎকালীন মুসলমানদের মনে জাগরণ ও উদ্দিপনা সৃষ্টি করা, অপরদিকে তেমনি আল্লাহর সত্য ধর্মের বিরুদ্ধে আহলে কেতাবের চিরন্তন শত্রুসুলভ ভূমিকার মুখোশ খুলে দেয়াও এর উদ্দেশ্য ছিলো।

'কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত না করে কিছুতেই ক্ষান্ত হবেন না। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।'

এ হচ্ছে আল্লাহর শাশ্বত, অকাট্য ও নির্ভুল প্রতিশ্রুতি। এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহর এ অপরিবর্তনীয় নীতির প্রতীক যে, তিনি কাফেরদের কাছে ঘোরতর অপ্রীতিকর হওয়া সত্তেও তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করে তাঁর আলোকে ছড়িয়ে দেবেন ও পূর্ণতা দান করবেন।

এই প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করেই মোমেনদের মন প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত ও দুশ্চিন্তামুক্ত থাকে, অতপর তা তাদেরকে পথের যাবতীয় বাধাবিপত্তি, বক্রতা ও বিড়ম্বনা এবং কাফেরদের (অর্থাৎ এখানে আহলে কেতাবের) সমস্ত ভ্রূকুটি ও কুটিল চক্রান্তকে উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। আনুষংগিকভাবে এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে এই সব আল্লাহদ্রোহী ও তাদের তল্পিবাহকদের জন্যে কঠোর হুমকি ও সতর্কবাণীও রয়েছে, যা যুগযুগান্তর বলবত থাকবে।

মোমেনদের প্রতি ওই প্রতিশ্রুতি এবং ইসলামের শত্রুদের প্রতি এই হুমকিকে আরো ধারালো, শানিত ও জোরদার করা হয়েছে ৩৩ নং আয়াতে,

'তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি স্বীয় রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন........, এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'সত্য ধর্ম' বা 'দ্বীনুল হক' কথাটা দ্বারা ইতিপূর্বে ২৯ নং আয়াতেও আল্লাহর শেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে প্রেরিত ইসলামকেই বুঝানো হয়েছে এবং যারা এই ইসলামকে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আয়াতের ব্যাখ্যা যেভাবেই করা হোক না কেন, এ বক্তব্য সম্পূর্ণ শুদ্ধ। 'দ্বীনুল হক' বা 'সত্য ধর্ম' দ্বারা মোটামুটিভাবে এ কথাই বুঝানো হয় যে, আকীদা বিশ্বাসে, আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় কর্মকান্ডে ও আইন কানুনে একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করা চাই। আল্লাহর সত্য দ্বীন যে যুগে যে নবীর মাধ্যমে ও যে কেতাবের আকারেই আসুক না কেন, তার মূল কথা সব সময় এটাই। সর্বশেষে মোহাম্মদ (স.) যে ধর্ম বা দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তারও এটাই মূল কথা। সুতরাং যে কোনো ব্যক্তি বা জাতি নিজের আকীদা বিশ্বাসে, আনুষ্ঠানিক এবাদাত উপাসনায় ও আইন কানুনে সর্বতোভাবে একমাত্র আল্লাহর বিধান অনুসরণ করবে না, তার বা তাদের ওপর এ বক্তব্যই প্রযোজ্য হবে যে, তারা সত্য ধর্মের অনুসারী নয় এবং ২৯ নং আয়াতে যে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত। তবে আগেও বহুবার বলেছি এবং পুনরায় বলছি যে, এই আদেশের বাস্তবায়নে ইসলামের পর্যায়ক্রমিক আন্দোলন ও বিপ্লবের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তার নিত্যনতুন কর্মপন্থা ও কর্মকৌশলের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

বস্তুত ৩৩নং আয়াতে ইসলামকে অন্য সকল জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করার যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো, তা দ্বারা ৩২ নং আয়াতের 'আল্লাহ তাঁর আলোকে পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত না করে ক্ষান্ত হবেন না' এই প্রতিশ্রুতিকেই অধিকতর শানিত ও জোরদার করা হয়েছে। তবে সেটা করা হয়েছে অপেক্ষাকৃত নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট আকারে। পূর্বোক্ত আয়াতে 'আল্লাহর আলোকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করা' কথাটা অস্পষ্ট ছিলো। এ আয়াতে তাকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর সেই আলো হচ্ছে ইসলাম, যা শেষ নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। আর তাকে অন্য সকল জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করেই পূর্ণরূপে বিকশিত করা হবে।

আগেই বলেছি যে, সত্য ধর্ম বা দ্বীনুল হক হচ্ছে আকীদা বিশ্বাসে, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে এবং আইন কানুনে সর্বত্র আল্লাহর সর্বাত্মক ও পরিপূর্ণ আনুগত্যের নাম। সর্বকালের সকল নবীর মাধ্যমে আগত ঐশী ধর্মেই আল্লাহর এই সর্বাত্মক আনুগত্যের নির্দেশ ছিলো। আজকের ইহুদী

খৃষ্টানদের অনুসৃত বিকৃত ও পৌত্তলিকতা মিশ্রিত আকীদা বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ধর্ম এবং ইসলামের লেবেল আঁটা সেই সব মানব রচিত মতবাদ, মতাদর্শ, আইন, বিধান ও রকমারি বিধি ব্যবস্থা স্বভাবতই ইসলামের আওতাভুক্ত নয়, যা পৃথিবীতে আল্লাহর দাসত্ব ও আল্লাহর আইনের আনুগত্যের পরিবর্তে মানুষের দাসত্ব ও মানুষের রচিত আইন ও বিধানের আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর 'দ্বীন' কে বিজয়ী করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাতে 'দ্বীন' শব্দের সেই সর্বব্যাপী ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য আমাদের বুঝতে হবে, যা আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপকতা ও পরিধি যাতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি সে জন্যেই এর প্রয়োজন।

শাব্দিক অর্থে 'দ্বীন'-অর্থ আনুগত্য। কাজেই মানুষের অনুকরণ, অনুসরণ ও আনুগত্য করে, এমন প্রত্যেক ধর্ম, মত বা বিধান 'দ্বীন' এর আওতাভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যে কোনো 'দ্বীন' কে বিজয়ী করার প্রতিশ্রুতি দেননি, বরং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দ্বীনুল হক বা 'সত্য দ্বীন'কে বিজয়ী করার, যাকে তার নবীর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন।

এতে করে সমস্ত আনুগত্য শুধু আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে, আর যে বিধান একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যকে প্রতিফলিত করে, সেই বিধানেরই বিজয় হবে।

এই বিজয় একবার বাস্তবায়িত হয়েছে রসূল (স.), তাঁর খলীফারা ও তাঁদের পরবর্তী মুসলিম শাসকদের মাধ্যমে, যারা দীর্ঘকাল যাবত আল্লাহর বিধান অনুসারে শাসন পরিচালনা করেছেন। সত্য ধর্ম ইসলামই ছিলো তখন বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। যে সব বিধানে আল্লাহর আনুগত্যের ব্যবস্থা ছিলো না, সেগুলো ভীত সন্ত্রস্ত ও কম্পমান থাকতো। এরপর সত্য ধর্মের অনুসারীরা ক্রমান্বয়ে পিছু হটতে ও সত্য ধর্মের অনুসরণ থেকে দূরে সরতে লাগলো। এর জন্যে অনেকগুলো কার্যকারণ দায়ী ছিলো। একদিকে দায়ী ছিলো মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা, অপরদিকে তাদের শত্রু পৌত্তলিক ও আহলে কেতাবের পক্ষ থেকে পরিচালিত দীর্ঘ ও বহুমুখী যুদ্ধ।

কিন্তু তাদের ওই পতন ও বিচ্যুতিই শেষ কথা নয়। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এখনো বলবৎ রয়েছে এবং এমন একটা মুসলিম দলের অপেক্ষায় রয়েছে, যারা ইসলামের পতাকা বহন করে এগিয়ে যাবে, যারা আবার রসূল (স.) যেখান থেকে কাজ শুরু করেছিলেন সেখান থেকে শুরু করবে এবং আল্লাহর সত্য দ্বীনকে বাস্তবায়িত করতে আল্লাহর আলো জ্বালিয়ে পথ চলবে।

ধর্ম ব্যাবসায়ীদের মুখোশ উম্মোচন

এরপর আমরা সূরার বর্তমান পর্বের শেষ দুটো আয়াত নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। পর্বের শুরুতে বলা হয়েছে যে, আহলে কেতাবের স্বভাব হলো, তারা আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে হারাম করে না। তারপর বলা হয়েছে যে, তারা তাদের আলেম ও দরবেশদেরকে আল্লাহর বিকল্প প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছে। এর ব্যাখ্যা প্রসংগে রসূল (স.) বলেছেন যে, ওই আলেম ও দরবেশরা তাদের জন্যে হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করেছে এবং তারা তাদের অনুসরণ করেছে।' এভাবে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, তারা আল্লাহ ও রসূলের নির্ধারিত হালাল হারাম মানে না, মানে তাদের আলেম ও দরবেশদের নির্ধারিত হালাল হারাম।

সর্বশেষে মোমেনদেরকে এই বিষয়টা আরো স্পষ্ট করে জানানোর জন্যে এবং আহলে কেতাবের চরিত্র আরো উদঘাটনের জন্যে তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

'হে মোমেনরা! নিশ্চয়ই আলেম ও দরবেশদের অনেকে মানুষের ধন সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাত করে থাকে ....' (আয়াত ৩৪ ও ৩৫)

প্রথম আয়াতে সেই সব আলেম ও দরবেশদের চরিত্র ও কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে, যাদেরকে আহলে কেতাব আল্লাহর বিকল্প প্রভুরূপে মেনে নিয়েছে। ফলে তারা এবাদাত ও পারস্পরিক আচরণ সম্পর্কে যে সব নির্দেশ দেয়, তাই তারা অম্লান বদনে মেনে নেয়। এভাবে তারা জনগণের বিকল্প প্রভুতে পরিণত হয়। আর এরূপ আইন ও বিধান জারী করতে গিয়ে তারা জনগণের অর্থ সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাত করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে।

জনগণের ধন সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাত করার বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করা হতো এবং আজও হয়ে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পন্থাগুলো হলো, কাউকে অবৈধ সম্পদ বা ক্ষমতার অধিকারী করার জন্যে তার কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে তার পক্ষে ফতোয়া দেয়া এবং ফতোয়ার মাধ্যমে হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম ঘোষণা করা। পুরোহিত ও ধর্মীয় নেতাকে আল্লাহ পাপ প্রক্ষালণ ও গুনাহ মাফের ক্ষমতা দিয়েছেন এই মর্মে মিথ্যা ও কল্পিত ধারণা ছড়িয়ে গুনাহ মাফের উদ্দেশ্যে জনগণের কাছ থেকে ফি বা উৎকোচ গ্রহণ এবং সমাজে সুদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মেনে নেয় ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেরাও সুদী ব্যবস্থা পরিচালনা করে এই সুদই সবচেয়ে ব্যাপক ও সবচেয়ে জঘন্য পন্থা। এ ছাড়া আরো বহু পন্থা ছিলো। অনুরূপভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে যে চাঁদা আদায় করা হতো তাও এর আওতাভুক্ত। ক্রুশেড যুদ্ধে ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মীয় নেতারা কোটি কোটি টাকা চাঁদা আদায় করে দিতো। আজও ইসলামের গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে তথাকথিত ওরিয়েন্টালিষ্ট ও মিশনারীদের পেছনে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়।

'বহু সংখ্যক আলেম ও দরবেশ ...., এই কথাটার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যে সূক্ষ্ম ন্যায়বিচার করেছেন, সেটাও লক্ষ্য করার মতো। কেননা যে স্বল্প সংখ্যক আলেম ও দরবেশ এই পাপে জড়িত ছিলো না, তাদের সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করতে চাননি। প্রত্যেক শ্রেণী বা দলের মধ্যে কিছু ভালো লোক থাকেই। তাদেরকে উপেক্ষা করা যুলুমের শামিল, যা আর যেই করুক, আল্লাহ তায়ালা করতে পারেন না।

এভাবে অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ বহু ইহুদী আলেম ও দরবেশ পুঁজি করে রাখতো। এ জাতীয় লোকদের কেউ কেউ রাজা মহারাজাদের চেয়েও বেশী ধনী হয়ে যেতো এবং তাদের সম্পদ সংশ্লিষ্ট উপাসনালয়ে জমা হতো এমন বহু নযীর ইতিহাসে রয়েছে।

আয়াতে তাদের ও অন্য সকলের এরূপ অর্থ সম্পদ সঞ্চিত করা এবং আল্লাহর পথে ব্যয় না করার ভয়াবহ শাস্তির বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

'আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঁজি করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না ...' (আয়াত ৩৪-৩৫)

এখানে ইচ্ছাকৃতভাবেই অর্থ পুঁজি করার শাস্তির দীর্ঘ বিবরণ দিয়ে শাস্তির দৃশ্যকে চেতনায় ও অনুভূতিতে দীর্ঘস্থায়ী করতে চাওয়া হয়েছে। প্রথমে সংক্ষেপে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির উল্লেখ করে তারপর একে একে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে,

'যেদিন ওগুলোকে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে।'......

শ্রোতা গরম করার প্রক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকে। অতপর এই যে, সোনা-রূপাগুলো গরম হয়ে লাল হয়ে গেছে। ..... এখন তা যন্ত্রণাদায়ক সেকা দেয়ার শাস্তি শুরু করার জন্যে প্রস্তুত .... এই যে কপালে সেকা দেয়া হলো ..... তারপর পার্শ্বে ..... তারপর পিঠে ..... এভাবে শাস্তি দেয়া শেষ হলে পুনরায় অপমান ও ধমক দেয়া হচ্ছে,

'এই নাও, তোমাদের পুঁজি করা সম্পদ'।

অর্থাৎ নিজেদের ভোগ বিলাসিতার উপকরণ হিসেবে তোমরা যা কিছু জমা করে রেখেছিলে, আজ সেগুলোই কঠিন ও বেদনাদায়ক শাস্তির রূপ ধারণ করেছে।

'যা পুঁজি করেছিলে, তা ভোগ করো।'

এই শাস্তিই আজ তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। আজ তোমাদের সেই সযত্নে সঞ্চিত সম্পদ স্বর্ণ ও রৌপ্য আগুনে পুড়িয়ে তোমাদের পার্শ্ব, পিঠ ও কপালে দাগ দেয়া হবে। এই ভয়ংকর ও বীভৎস দৃশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দীর্ঘ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমেই বর্ণনা করা হয়েছে বেশ কিছুসংখ্যক পাদ্রী পুরোহিতের করুণ পরিণতির কথা। তারপর বর্ণনা করা হয়েছে সে সব লোকদের পরিণতির কথা, যারা স্বর্ণ রৌপ্য কুক্ষিগত রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না।

ইহুদী খৃষ্টানদের ধর্ম বিশ্বাস, চরিত্র ও আচার আচরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে আলোচ্য আয়াতসহ পূর্বের আলোচিত আয়াতগুলোর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করতে হবে। কারণ, এসব আয়াতে মহান আল্লাহ ওদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা হতে পারে যে, ওরা কিছুটা হলেও আল্লাহর নির্দেশিত ধর্মের অনুসারী। কিন্তু এ ধারণা আদৌ সঠিক নয়। আর সে কারণেই মোশরেকদের তুলনায় ওদের আসল পরিচয়টি তুলে ধরা খুবই জরুরী ও আবশ্যক। কারণ, মোশরেকদের আকীদা-বিশ্বাস ও খোলা-মেলা কথাবার্তার দ্বারাই প্রমাণিত হয় তারা কাফের, এরা মুখোশধারী নয়। কাজেই তাদেরকে চিনতে এবং তাদের মুখোমুখি হতে মুসলমানদের জন্য কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু ইহুদী খৃষ্টান বা তাদেরই অনুরূপ আজকের মুসলমান নামধারী কিছু লোকের অবস্থা মোশরেক কাফেরদের মতো স্পষ্ট নয়। কাজেই এদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। মোশরেকদের অবস্থা ও পরিচয় সুস্পষ্ট থাকা সত্তেও কিছু কিছু সন্দেহের কারণে এই সূরার একাধিক আয়াতে বিভিন্ন বর্ণনা ও পরিচয় তুলে ধরে মুসলমানদেরকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, (আয়াত ৬-১০, ১৩-১৫, ১৭ ও ২৩)

ইসলামের সাইনবোর্ড লাগিয়ে ইসলাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্র

মোশরেকদের অবস্থা ও পরিচয় সুস্পষ্ট থাকা সত্তেও তৎকালীন আরব দেশের সামাজিক কাঠামোজনিত কিছু কিছু সন্দেহের কারণে এতো সব বর্ণনা ও বিবরণের প্রয়োজন মনে করা হয়েছে এবং তাদের মোকাবেলা করার জন্য মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তাহলে যারা মুখোশধারী, যারা বর্ণচোরা, তাদের জন্য কেমন ভাব ও ভাষা ব্যবহার করা দরকার? তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে কি ভাবে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন? নিশ্চয়ই সে ভাষা হওয়া উচিত আর কঠোর, বর্ণনা হওয়া উচিত আর তীক্ষ্ম ও ক্ষুরধার। এর মাধ্যমে প্রথমেই ইহুদী খৃষ্টানদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে। তাদের সঠিক ও আসল পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। সে পরিচয়ই তারা এতোদিন মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলো। ফলে তারা যে প্রকৃতপক্ষেই কাফের ও মোশরেকদের মতো আল্লাহর শত্রু, আল্লাহর দ্বীনের শত্রু, অন্যায়ভাবে মানুষের ধন সম্পদ আত্মসাতকারী এবং আল্লাহর পথে বাধাদানকারী-এ কথা সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয়ে গেছে। যেমন বলা হয়েছে, (আয়াত ২৯-৩৪)

এ ছাড়াও মক্কী ও মাদানী উৎস প্রকারের সূরাগুলোতে ইহুদী খৃষ্টানদের শেরেক ও কুফরী মতাদর্শের ব্যাপারে অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ও চরম ভাষায় বলা হয়েছে যে, ওরা ওদের নবীদের প্রচারিত

ধর্মমত থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এমনকি শেষ নবীর দাওয়াতও তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। আর এর দ্বারাই চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তারা কাফের, মোমেন নয়।

ইতিপূর্বে ইহুদী-খৃষ্টানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর দ্বীনের সাথে ওদের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। নিচের আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে,

'সূরা আল মায়েদার ৬৮ নং আয়াত

আবার কোনো কোনো আয়াতে তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে। এমনকি ইহুদী খৃষ্টান অথবা 'আহলে কেতাব' নাম দিয়ে তাদেরকে মোশরেকদের দলভুক্তও করা হয়েছে। যেমন, সূরা আল মায়েদা আয়াত ৬৪, ৭২, ৭৩ ও সূরা আল বায়্যিনার আয়াত ১)

এছাড়াও পবিত্র কোরআনের আরও অনেক আয়াতে এ জাতীয় বক্তব্য এসেছে। এ সম্পর্কে পূর্বেও কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

এ কথা ঠিক যে, কোরআনী বিধানে আহলে কেতাব বা ইহুদী খৃষ্টানদের মোশরেকদের তুলনায় কিছুটা স্বতন্ত্র সুযোগ সবিধা দেয়া হয়েছে। যেমন তাদের যবাহ্ করা পশু মুসলমানদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তদ্রূপ তাদের সতী নারীদেরকে বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয বলা হয়েছে। কিন্তু এর ওপর ভিত্তি করে এ কথা বলা যাবে না যে, তারা আল্লাহর দ্বীনের ওপর কায়েম আছে। তাদের বৈশিষ্ট্য শুধু এতোটুকুই যে, ঐশী গ্রন্থ ও খোদায়ী ধর্মের সাথে তাদের কিছুটা যোগসূত্র আছে। যদিও তারা সে অনুযায়ী চলছে না বা সার্বিকভাবে তা অনুসরণ করছে না। এদিক থেকে বিচার করলে পূর্তিপূজারী মোশরেকদের সাথে তাদের একটা পার্থক্য অবশ্যই লক্ষ্য করা যায়। কারণ মোশরেকদের কাছে কোনো ঐশী গ্রন্থ নেই, ধর্মীয় কোনো ভিত্তি নেই, যার ওপর নির্ভর করে কোনো বিচার বিবেচনা করা যায়। এসব সত্তেও আহলে কেতাব বা ইহুদী খৃষ্টানদের আকীদা বিশ্বাস ও ধর্মীয় মতাদর্শের প্রকৃত রূপটি আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, প্রকৃত ও সত্য ধর্মের সাথে এদের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ তারা আসল ধর্মগ্রন্থ ত্যাগ করে তাদের পাদ্রী পুরোহিত ও গীর্জা পরিষদের মনগড়া বাণী ও উপদেশকে ধর্মীয় গ্রন্থের নামে চালিয়ে দিচ্ছে। কাজেই তাদের প্রকৃত পরিচয় পবিত্র কোরআনে চূড়ান্তভাবে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টিই এখন খোলাসা করে বলা হচ্ছে।

এই যে বিভ্রান্তিকর ধর্মীয় 'সাইনবোর্ড', যার আড়ালে সত্য বলতে কিছুই নেই, এর কারণে মুসলমানরা 'জাহেলিয়াত'-এর বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারছে না। কাজেই এই 'সাইনবোর্ড'টি আগে দূর করতে হবে। এর অন্তরালে আসল যে চেহারা লুকিয়ে আছে, তা প্রকাশ করতে হবে এবং আসল ঘটনা সকলের গোচরে আনতে হবে। তৎকালীন মুসলমান সমাজের পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটও আমাদের বিচেনায় থাকতে হবে, যার প্রসংগে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপট হচ্ছে তখনকার যুগের সামাজিক গঠন প্রণালী সম্পর্কিত, প্রচন্ড গরম ও অভাব অনটনের মুহূর্তে যুদ্ধ পরিচালনার পরিবেশ সম্পর্কিত এবং রোমানদের ব্যাপারে আরবদের মনে ইসলাম পূর্ব যুগে যে ভীতি বিরাজ করতো সে সম্পর্কিত এই ভীতির কারণেই তাদের মুখোমুখি হতে মুসলমানরা দ্বিধা দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলো। কিন্তু ইহুদী খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে মুসলমানদের মাঝে যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তা ছিলো আরও গভীর, আরও মারাত্মক। কারণ, মুসমানরা তাদেরকে 'ঐশী গ্রন্থের ধারক' বা 'আহলে কেতাব' রূপে জানতো এবং সেভাবেই তাদেরকে সমীহ করে চলতো।

ইসলামের শত্রুরা সব সময়ই ইসলামের উত্থান ও নবজাগরণের ওপর দৃষ্টি রাখছে, মানবীয় স্বভাব ও প্রকৃতির ব্যাপারে এবং ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের ব্যাপারে তাদের যে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা তার ওপর ভিত্তি করেই এরা এই বংশধরের মাঝে ইসলামী জাগরণের প্রভাবের ওপরও নযর রাখছে। আর সে কারণেই তারা 'ইলামের সাইনবোর্ড' টাংগাতে বাধ্য হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য তারা যে সব আন্দোলন, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ আদর্শ ও চিন্তা চেতনার জন্ম দিচ্ছে, সৃষ্টি করছে, সেগুলোর সামনেই এই 'ইসলামী সাইনবোর্ড' তারা টাংগিয়ে দিচ্ছে যেন এই মিথ্যা আচরণে বিভ্রান্ত হয়ে মুসলমানরা তাদেরকে প্রতিহত করতে না পারে এবং তাদের 'নব্য জাহেলিয়াত'-এর স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে না পারে।

এ সকল মতাদর্শ ও আন্দোলনের স্বরূপ উদ্ঘাটনে এবং ইসলামের জন্য ক্ষতিকর এই নব্য জাহেলিয়াতের মুখোশ উন্মোচন করতে মুসলমানরা বার বার ব্যর্থ হয়েছে, ভুল করেছে। এর অতি সাম্প্রতিক কালের দৃষ্টান্ত হচ্ছে তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের ইসলাম বিরোধী ও নাস্তিক্যবাদী আন্দোলনের পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো ইসলামী আদর্শের ওপর গড়ে উঠা ইসলামী ঐক্যের প্রতীক 'খেলাফত' ব্যবস্থার সর্বশেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলা। এটা যদিও প্রকৃত' খেলাফত ব্যবস্থা' ছিলো না, ছিলো নিছক একটা প্রতীকী ব্যবস্থা, তা সত্তেও সেটা ছিলো এমন একটি বন্ধন যার ছিন্ন হওয়ার কথা পবিত্র হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী রূপে এসেছে। যেমন হযরত মোহাম্মদ (স.) বলেছেন, 'এই দ্বীনের এক একটি বন্ধন ছিন্ন করা হবে, প্রথমে ছিন্ন করা হবে শাসন ব্যবস্থা এবং সর্বশেষে ছিন্ন করা হবে নামাযের বন্ধন।'

ইসলামের সচেতন ও সাবধানী শত্রুরা তথা ইহুদী খৃষ্টান নাস্তিকরা যারা কেবল ইসলামের বিরুদ্ধে সব সময়ই একতাবদ্ধ থাকে, তারা কামাল আতাতুর্কের তথাকথিত সংস্কার আন্দোলনের আসল রূপটি পারতপক্ষে প্রকাশ করে না। কিন্তু তারাই ওই ধর্মদ্রোহী আন্দোলটিকে ইসলামের আবরণে ঢেকে রাখতে সদা সচেষ্ট থাকে। এরা ওই আন্দোলনের চেয়েও ইসলামের জন্য বেশী ক্ষতিকর। কারণ, তারা মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য ওই আন্দোলনের প্রকৃত রূপটি ইসলামের আবরণে ঢেকে রাখার জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আদর্শিক সব ধরনের সাহায্য করে থাকে। এর জন্য তাদের আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম, গোয়েন্দা বিভাগসহ সব ধরনের মাধ্যম ও ব্যবস্থাদি কাজে লাগায়। এর জন্য অজস্র টাকা পয়সাও খরচ করে। যাতে করে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অসমাপ্ত ক্রুশেড যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে পারে, সে ক্রুশেড এককালে ইসলামের প্রকাশ্য শত্রুদের সাথে প্রকাশ্যে সংগঠিত হয়েছিলো।

কিছু নির্বোধ লোক, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে, তারা এই 'সাইনবোর্ড' দেখে ধোকায় পড়ে যায়। এদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোকও আছে, যারা ইসলামের দাওয়াতী কাজের সাথে জড়িত। তারা ঐ সকল ইসলাম বিরোধী আন্দোলনের মাঝে লুকায়িত 'জাহেলিয়াত'-কে উপলব্ধি করতে পারে না। ইসলামী আবরণের অন্তরালে লুক্কায়িত প্রকাশ্য শেরেক ও কুফরীকে তার আসল পরিচয় তুলে ধরতে তারা দ্বিধাবোধ করে। যারা এই শেরেক ও কুফরীর সমর্থক ও প্রচারক তাদেরকে তাদের উপযুক্ত বিশেষণে কাফের-মোশরেক আখ্যায়িত করতেও তারা সংকোচ বোধ করে। আর এ সবের কারণেই ওই নব্য জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। এটা নিসন্দেহে ইসলামী নব জাগরণের পথে এক বড় অন্তরায়। তদ্রূপ বিংশ শতাব্দীর নব্য জাহেলিয়াত যা ইসলামের অবশিষ্ট অংশটুকুও মুছে ফেলার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে সত্যিকার আন্দোলনের পথেও অন্তরায়। (১)

(১) আমার রচিত 'বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত' নামক বইটি দেখুন।

আমার দৃষ্টিতে এ সকল নির্বোধ মোবাল্লেগরাই ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের জন্য ইসলামের প্রকৃত শত্রুদের চেয়েও মারাত্মক ক্ষতিকর। অথচ ইসলামের ওই শত্রুরা ইসলাম ধর্মকে নির্মূল করার জন্য তাদেরই তৈরী করা মতবাদ, আন্দোলন, চিন্তা চেতনা এবং আদর্শ ও মূল্যবোধের গায়ে ইসলামের লেবেল সেঁটে দেয়।

এই দ্বীন কেবল তখনই বিজয়ী হয়েছে, যখন এর অনুসারীদের মাঝে সচেতনতার উন্মেষ ঘটেছে এবং তারা সকল যুগের ও সকল স্থানের জাহেলিয়াতের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এই ধর্মের জন্য আসল বিপদ এই নয় যে, এর শত্রুরা শক্তিশালী, সচেতন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। বরং আসল বিপদ স্বয়ং এর নির্বোধ ও সরলপ্রাণ বন্ধুরা, যারা প্রকৃত শত্রুদেরকে চিনতে ভুল করে, তাদের সঠিক পরিচয় তুলে ধরতে অহেতুক দ্বিধাবোধ করে এবং তাদেরকে ইসলামের মুখোশের আড়ালে দেখতেই ভালবাসে। অথচ এই মুখোশের আড়ালে থেকে তারা ইসলামের গোড়া কর্তন করে চলেছে।

পৃথিবীর বুকে যারা ইসলামী দাওয়াতের ঝান্ডা বহন করে চলেছেন, তাঁদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে সকল প্রকার জাহেলিয়াতের সামনে টাঙানো মিথ্যে ইসলামী সাইনবোর্ড নামিয়ে ফেলা। কারণ, এই সাইনবোর্ডের আড়ালে থেকেই তারা গোটা বিশ্ব থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলার জন্য তৎপরতা চালিয়ে যায়। অথচ ওই ইসলামী সাইনবোর্ডই তাদের সেই অপতৎপরতাকে রক্ষা করে চলেছে। তাই যে কোনো ইসলামী আন্দোলনের প্রথম কাজটিই হচ্ছে জাহেলিয়াতের মুখোশ উন্মোচন করা এবং এর শেরেক ও কুফরী চেহারাটা তুলে ধরা এবং এর সাথে জড়িত লোকগুলোকে তাদের প্রকৃত পরিচয়েই তুলে ধরা। এর ফলে ইসলামী আন্দোলন পরিপূর্ণভাবে এদের মুখোমুখি হতে পারবে। বরং এর দ্বারা তারা নিজেরাই নিজেদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সজাগ হতে পারবে। কারণ, পবিত্র কোরআনের বক্তব্য অনুসারে তাদের অবস্থা তো ইহুদী খৃষ্টানদের পর্যায় গিয়েই পৌঁছেছে। আর এই সজাগ হওয়ার ফলে হয়তো তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে আল্লাহর আযাব ও শাস্তির হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

অহেতুক দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং বাহ্যিক চেহারা ও আবরণের দ্বারা প্রতারিত হওয়াটাই হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী যে কোনো ইসলামী আন্দোলনের সূচনার জন্য বাধা স্বরূপ। অধিকন্তু তা ইসলামের শত্রুদেরকে নিজ চক্রান্ত বাস্তবায়নে সহায়তা দানেরও নামান্তর। যে চক্রান্ত তারা বর্তমান যুগে কামাল আতাতুর্কের সংস্কার আন্দোলন নামক দুরভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর থেকে ইসলামী লেবেলের অন্তরালে চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ তুরস্কের মাটি থেকে আদর্শের ওপর গড়ে ওঠা ইসলামী ঐক্যের সর্বশেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলার পাপে ওই আন্দোলন আর এক কদমও অগ্রসর হতে পারেনি। তাই এই দুরভিসন্ধি এমন নগ্ন ভাবে ফাঁস হয়ে যাওয়ার কারণে 'উইলফোর্ড ক্যান্টল স্মিথ' নামক জনৈক ভন্ড ও শঠ খৃষ্টান লেখক তার রচিত বই 'Islam in Modern History' তে পুনরায় কামাল আতাতুর্কের ওই ইসলাম বিরোধী আন্দোলনকে ইসলামের আবরণে ঢাকতে চেষ্টা করেছে এবং এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত নাস্তিকতার অপবাদও অস্বীকার করছে। শুধু তাই নয়, বরং এটাকে বর্তমান যুগের একটি বিশুদ্ধতম 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন' হিসেবেও আখ্যায়িত করেছে!'

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৬. আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ তায়ালার বিধানে মাসের সংখ্যা বারোটি, এ (বারোটি)-র মধ্যে চারটি হচ্ছে (যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে) নিষিদ্ধ মাস; এটা (আল্লাহর প্রণীত) নির্ভুল ব্যবস্থা, অতএব তার ভেতরে (হানাহানি করে) তোমরা নিজেদের ওপর যুলুম করো না, তোমরা (যখন) মোশরেকদের সাথে যুদ্ধ করবে, (তখন সবাই) এক সাথে মিলিত হয়ে (তাদের) মোকাবেলা করবে, যেমনিভাবে তারাও এক সাথে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে; জেনে রেখো, যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের সাথে রয়েছেন। ৩৭. নিষিদ্ধ মাসকে হীন স্বার্থে মুলতবি করা কিংবা তা আগ পাছ করা তো কুফরীর মাত্রাই বৃদ্ধি করে, এর ফলে কাফেরদের (আরো বেশী) গোমরাহীতে নিমজ্জিত করে দেয়া হয়, এ লোকেরা এক বছর কোনো মাসকে (প্রয়োজনে) হালাল করে নেয়, আবার (পরবর্তী) কোনো বছরে সে মাসকেই তারা হারাম বানিয়ে নেয়, যেন এভাবে আল্লাহ তায়ালা যে মাসগুলো হারাম করেছেন তার সংখ্যাও পূরণ হয়ে যায়, আবার আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন তাও (মাঝে মাঝে) হালাল হয়ে যায়; (বস্তুত) তাদের অন্যায় কাজগুলো (এভাবেই) তাদের কাছে শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে; আর আল্লাহ তায়ালা কখনো কাফের সম্প্রদায়কে সঠিক পথের দিশা দেন না।

তাফসীর

আয়াত ৩৬-৩৭

যে দিন আল্লাহ তায়ালা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সে দিন থেকেই তাঁর হিসাবে বছরের মাস বারটি নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে চারটি হচ্ছে সম্মানিত মাস.........এবং আল্লাহ তায়ালা কাফের জাতিকে হেদায়াত করেন না। (আয়াত ৩৬-৩৭)

আলোচ্য এ অধ্যায়টিতে আরবের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী রোমান বাহিনী ও তাদের অন্যান্য খৃষ্টান মিত্রদের সাথে যুদ্ধাভিযানের পথে আসা বিভিন্ন বাধা বিপত্তি দূর করার বিষয়ের আলোচনা এসেছে। হারাম মাসসমূহের অন্যতম রজব মাসে তবুক অভিমুখে এ অভিযান চালানো হয়। এ জন্যেই এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিতর্কের বিরাট ঝড় তোলা হয়। আর তর্কের কারণ হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে এ বছর রজব মাসটি সেই সঠিক সময়ে আসেনি যে সময়ে আসা

বিধিসম্মত ছিলো। এ মাসটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম মাসের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়েছিলো। এ বিষয়ে দ্বিতীয় আয়াতে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যার ওপর আমরা শীঘ্রই আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। এটা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, তবুক অভিযানের এ বছরটাতে যিলহজ্জ মাসের গণনা সঠিক সময়ে করা হয়নি। যিলহজ্জ মাস যখন গোনা হচ্ছিলো, তখন প্রকৃতপক্ষে ছিলো যিলকা'দ মাস। একইভাবে জমাদিউল উখ্রাকে রজব মাস হিসাব করা হচ্ছিলো। আর অন্ধ অনুকরণের কারণেই এ গরমিল অবস্থাটা চলে আসছিলো। বাহ্যিক বা আনুষ্ঠানিকভাবেই এ হারাম মাসগুলোর গণনা করা হতো। মাসগুলোকে সত্যিকারে মর্যাদা দেয়া হতো না। এ কারণেই দেখা যায় জাহেলী যুগে মানুষ নানা প্রকার ব্যাখ্যা দিয়ে মাসগুলোকে কখনো আগে নিয়ে আসতো, আবার কখনো পিছিয়ে দিতো।

এ বিষয়ের ওপর সঠিক কথা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা বছরে ৪টি মাসকে হারাম মাস বলে ঘোষণা করেছেন। তিনটি মাস পরপর-যুলকাদা, যুলহজ্জ এবং মুহাররম এবং চতুর্থ মাসটি একটু বিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ ৭ম মাস রজব (এমাসগুলোতে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ঘোষিত ছিলো এবং জাহেলী যুগেও অধিকাংশ লোক এ মাসগুলোতে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ রাখতো).........আর এটা পরিষ্কার যে, ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর আমল থেকেই ফরয হজ্জের সাথে এ নির্দিষ্ট মাসগুলোকে সম্মানিত মাস মনে করা হতো। পরবর্তীতে ইবরাহীম (আ.)-এর আনীত 'দ্বীন'-এর মধ্যে বহু পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং ইসলাম-পূর্ব জাহেলী যুগে এ পবিত্র দ্বীনের মধ্যে বিস্তর রদ বদল করা সত্তেও আরবগণ হজ্জের মওসুম হওয়ার কারণে বরাবরই এ মাসগুলোকে মর্যাদা দিয়ে এসেছে, যেহেতু হজ্জ ও হাজীদের নিরাপত্তার ওপরই হেজাযবাসীদের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করতো। বিশেষ করে মক্কাবাসীদের জীবন পুরোপুরিই এ নিরাপত্তার ওপর নির্ভরশীল। কেননা মক্কায় হজ্জ করতে ও হাজীদের জন্যে ব্যবসায়ীদের নানা প্রকার বস্তুসম্ভার আমদানী করার জন্যে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা ছিলো অবশ্যম্ভাবী।

এরপর কিছু সংখ্যক আরব কাবীলার কিছু স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে তারা এ মাসগুলোকে হারাম বা সম্মানিত মাস মেনে নেয়ার ব্যাপারে আপত্তি তোলে এবং এসব বিধি তারা নিজেদের ইচ্ছামতো নানা রকম পরিবর্তন করতে শুরু করে দেয়। কোনো কোনো সময়ে কোনো একটি হারাম মাসকে পিছিয়ে এনে বা এগিয়ে নিয়ে হালাল (যুদ্ধ বিগ্রহ বৈধ) বানিয়ে নিতো। এভাবে চারটি নিষিদ্ধ মাস পূর্ণ করতো। কিন্তু এ মাসগুলোর সময় তারা বিভিন্ন সময়ে নির্ধারণ করতে থাকে যাতে করে তারা ধ্বংস করে দিতে পারে সেই সব মাসের মর্যাদাকে যা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন। এভাবে তারা আল্লাহর হারাম করা বস্তুগুলোকে হালাল করে নেয়। ...... অতপর পরবর্তীকালে প্রতিটি নবম বছরে এ কৃত্রিম রজব বাদ দিয়ে আসল রজব মাস আসে, আসে আসল যিলহজ্জ মাস, নকল যুল হজ্জ মাসের স্থানে! এর আগে জমাদিউল উখরাতেই রজব ছিলো। আর যিলহজ্জ ছিলো যিলকা'দ মাসে। আর এভাবে কার্যত জমাদিউল উখরাতেই যুদ্ধাভিযান হতো। কিন্তু এ ভ্রান্তির কারণে রজব মাসের নামটি মুহাররম মাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং এ সব ভ্রান্তি দূর করার জন্যেই এ সব আয়াতের অবতারণা। আল্লাহর দ্বীনের সাথেই প্রথমত এ বিরোধ বাধে, যেহেতু হালাল হারামের বিধান দেয়া ও মানব জীবনের জন্যে আইন রচনার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো আইন কানুন তৈরী করা বা কোনো বিধান নিজেদের ইচ্ছামতো পরিবর্তন করা নির্জলা কুফর বরং এটা কুফর থেকেও বড়। আর এভাবে রজব মাসকে হালাল মনে করার কারণে কারো কারো মনে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিলো,

তা দূর হয়ে গেলো। বর্তমান আলোচনার মাধ্যমে মূল ইসলামী আকীদা মূলনীতিও স্থির হয়ে গেলো। আর এ মূলনীতি হচ্ছে, শরীয়তের কোনো বিধান রচনা করা বা আল্লাহর। বিধানে কোনো কিছু কম বেশী করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর আর এ সত্য বিশ্ব প্রকৃতির সব কিছুর জন্যে একইভাবে প্রযোজ্য। যে দিন আল্লাহ তায়ালা আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন, সে দিন থেকেই সকল কিছুর ওপর তাঁর কর্তৃত্ব পুরোপুরি চালু রয়েছে। অতএব, মানুষ বিশ্ব প্রকৃতির একটি অংশ হওয়ার কারণে তার ওপরও আল্লাহর বিধান চালু রয়েছে। এর ব্যতিক্রম কেউ করতে চাইলে তা হবে সৃষ্টির নিয়মের খেলাফ পদক্ষেপ। এতে গোটা সৃষ্টির নিয়ম বিগড়ে যাবে, নেমে আসবে বিশৃংখলা ও অশান্তি। আর এ জন্যে মানব জীবনের জন্যে দেয়া নিয়মের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনাকে বলা হয়েছে, কুফরী থেকে বাড়া কাজ। এর দ্বারা কাফেররা ভুল পথের দিকেই এগিয়ে চলেছে।(১)

আলোচ্য আয়াতগুলোতে আর একটি সত্য বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সাথে সরাসরি জড়িত। মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করার কাজে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়ায় আহলে কেতাবদেরকেও মোশরেক বলে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও তারা মূর্তিপূজা করে না। একথা আল কোরআনের বর্ণনাতে যেমন জানা যায়, তেমনি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এসকল দলীল-প্রমাণ দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এ সম্প্রদায়ের লোকেরা সমানভাবে ভূমিকা রেখেছে এবং তাদের লক্ষ্যও এক ও অভিন্ন। ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তাতে দেখা গেছে, কাফের-মোশরেক ও আহলে কেতাবরা একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এসময়ে তারা নিজেদের মধ্যে বিরাজমান সকল বিবাদ বিসংবাদের কথা ভুলে গেছে, ভুলে গেছে তারা তাদের পারস্পরিক পার্থক্য ও নানা প্রকার মতভেদের কথা। তাদের আকীদা বিশ্বাসের মধ্যেও যে পর্বতসম পার্থক্য বর্তমান রয়েছে, মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া কালে তারা সে সব কথা ভুলে গিয়ে এক সারিতে একত্রিত হয়ে গেছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়ার প্রশ্নে তাদেরকে অন্য কোনো জিনিস এভাবে কখনও এগিয়ে দেয়নি। ইসলামকে উৎখাত করার প্রশ্নে তারা একই প্রকার চিন্তা করে বলেই তাদের মধ্যে এ বিষয়ে এই ঐক্য।

আর শেষের যে বিশেষ কথাটা 'ইসলামকে উৎখাত করা'– এ ব্যাপারে আহলে কেতাবরা মোশরেকদেরই মতো। আর এ দল ওই দল, যারাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকেও পুরোপুরি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এখানে প্রথম যে সত্যটি তুলে ধরা হয়েছে, আল্লাহর বিধানকে ভুলে গিয়ে নিজ ইচ্ছামতো নিয়ম কানুন ও জীবন বিধান বানানো শুধু কুফরই নয়, বরং কুফরী থেকেও বাড়া। কারণ এর দ্বারা আল্লাহর বিধানে হস্তক্ষেপ করা হয়, যার কোনো এখতিয়ার মানুষকে আল্লাহ তায়ালা দেননি। কাজটাই হচ্ছে কুফর (আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করার শামিল)। এ বাস্তব এ অস্বীকৃতিই তাদের চিন্তা চেতনায় আল্লাহর ভারত্ব ও গুরুত্ব কমিয়ে দেয় এবং তাঁর কাজের মধ্যে অন্যের হস্তক্ষেপকে বৈধ বানিয়ে দেয় এবং এ সব বাস্তব কাজের দ্বারা তাদের কুফরী জোরদারভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এ সত্যটিই ওপরে বর্ণিত আয়াত-দুটিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এবং সংশ্লিষ্ট আলোচনাতেও এ কথাটাকেই বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আর এ কারণেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে সাধারণ ডাক দেয়া হয়েছে এবং মোশরেক ও আহলে কেতাবদের সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবেলায় গোটা ইসলামী শক্তিকে সর্বপ্রকার প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

---

(১) দেখুন, 'মায়ালেম ফিত্ তারীক' কেতাবের 'শরীয়াতু কাউনিয়্যাহ' (বিশ্ব-প্রকৃতির বিধান) অধ্যায়।

বারো মাসে বছর নির্ধারণ ও চার মাসকে হারাম ঘোষণা

'নিশ্চয়ই, সে দিন থেকে আল্লাহর হিসাবে 'বারোটি মাস'-এর সংখ্যাটি নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, যে দিনে তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর মধ্যে চারটি হচ্ছে মর্যাদাপূর্ণ (হারাম মাস)। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।'

নিশ্চয়ই মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বর্ণিত ওপরের আয়াতটি সময়ের মাপকাঠিকে তুলে ধরেছে এবং যে নিয়মে বিশ্ব প্রকৃতিকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন সেই একই নিয়মে বিশ্বের আবর্তনের নিয়মও তিনি স্থির করে দিয়েছেন। এ আয়াতটির মাধ্যমে সৃষ্টির মূল নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে, বর্ণনা করা হয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে এবং একথার দিকেও ইংগিত করা হয়েছে যে, সময়ের আবর্তনের এক নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী ধারা আছে এবং সময়ের হিসাব রাখার জন্যে বারো মাসে বছর বানানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, বারো মাসেই একটি বছর হয়। এখন বুঝা গেলো সময়ের এ আবর্তন সদা সর্বদা একই নিয়মে চলে এসেছে। কাজেই এ সময়সূচীর মধ্যে বৃদ্ধি বা হ্রাস কোনো দিন হয়নি। আর একথাটি আল্লাহর কেতাবেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যে নিয়মে গোটা সৃষ্টি জগত পরিচালনা করছেন তা কোনো খামখেয়ালী রাজার এলোমেলো ব্যবস্থা নয়, বরং তিনি সমগ্র জাহানকে এক বিশেষ নিয়মের অধীনে করে দিয়েছেন এবং সব কিছুই সেই একই নিয়মের ওপরেই টিকে আছে। এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই এবং এ নিয়মের কারণেই কোনো মাসের সময় বেড়ে যাবে বা কমে যাবে এমন কখনও হয়নি। যেহেতু স্থায়ী একই আইন অনুসারে এসব কিছু চলছে এবং এ হচ্ছে সেই অপরিবর্তনীয় আইন, যা সৃষ্টিলগ্ন থেকে চলে এসেছে।

হারাম বা মর্যাদাপূর্ণ মাসগুলোকে চিহ্নিত করে সে মাসগুলোর মর্যাদা টিকিয়ে রাখার জন্যেই স্থায়ী আইন বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যার কারণে এটা বলা যায় যে, এ সীমা ঠিক করে দেয়া এবং ওই মাসগুলোর মর্যাদা বর্ণনা করা আল্লাহর বিধানসমূহের মধ্যে একটি, যা ইচ্ছামতো পরিবর্তন করা যায় না বা কোনো মাস এগিয়ে আনা বা পিছিয়ে দেয়াও জায়েয নয়। কেননা এ পরিবর্তন আনার তুলনা করা যায় মহাকালের প্রবাহের মধ্যে পরিবর্তন আনার সাথে, যা কারো পক্ষে সম্ভব নয়– যেহেতু তার আবর্তনের ধারা এমন আইন অনুযায়ী পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, যার কোনো রদবদল কোনো দিন হয় না। তাই বলা হয়েছে–

'ওইটিই প্রতিষ্ঠিত বিধান।'

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে এই মহান জীবন ব্যবস্থা রচিত হয়েছে প্রকৃতির সেই নিয়মের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রেখে, যার ওপর সৃষ্টিলগ্ন থেকে চলছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী।

এভাবে আলোচ্য এ ছোট্ট আয়াতটি, গোটা বিশ্ব জগতের সব কিছুর মধ্যে পারস্পরিক যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, তার চমৎকার এক ধারা বিবরণী পেশ করেছে। জানাচ্ছে যে, এসব কিছুর একটি অপরের নিরন্তর অনুসরণ করে চলেছে এবং প্রত্যেকের সুষ্ঠুভাবে চলার লক্ষ্যে তারা পরস্পরের জন্যে পথ রচনা করে দিচ্ছে, একটি আর একটির জন্যে শক্তি যোগাচ্ছে এবং সব কিছুই বিশ্বের সেই সব নিয়ম কানুন জানতে আমাদেরকে সাহায্য করছে যা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ ও বাস্তবতার নিরিখে বুঝার চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিশ্ব জগতের সৃষ্টির মধ্যে যে স্বাভাবিক নিয়ম বিরাজ করছে এবং দ্বীন ইসলামের মূলনীতি ও বাধ্যতামূলক যেসব কাজ রয়েছে সে সব কিছুর সাথে পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা ঘোষণা করছে, যাতে মানুষের চিন্তা ও বিবেকের মধ্যে এসব কিছু সৃষ্টিকর্তার কথা গভীরভাবে শেকড় গাড়তে পারে। এর মূলনীতিগুলো

স্থির হয়ে যায় এবং এর ভিতগুলো মযবুত হয়ে যায়। আর এ কথাগুলোকে আলোচ্য আয়াতের একুশটি শব্দের মধ্যে ভরে দেয়া হয়েছে, যা সৃষ্টির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রহস্যরাজির খবরের প্রতি সুস্পষ্টভাবে ইংগিত দিয়ে যাচ্ছে। তাই বলা হচ্ছে,

'হাঁ ওইটিই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। অতএব এগুলোর মধ্যে কোনো পরিবর্তন এনে তোমরা নিজেদের ওপর যুলুম করো না।'

আসমান ও যমীনের মধ্যে বিরাজমান নিয়ম কানুনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে হারাম (মর্যাদাপূর্ণ) মাসগুলোকে নির্ধারিত করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে মনগড়া কোনো পরিবর্তন এনে তোমরা নিজেদের ওপর যুলুম করো না।

এ বিধানের মধ্যে যে কথাটা সুস্পষ্ট তা হচ্ছে মানব জীবনের জন্যে বিধানদাতা যেমন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তেমনি প্রাকৃতিক জগতের সব কিছুর মধ্যে যে নিয়ম কানুন দেখা যায়, সেগুলোর নিয়ন্তাও একমাত্র তিনি।.......যুদ্ধ বিগ্রহের জন্যে নিষিদ্ধ মাসগুলোকে হালাল মাসে রূপান্তরিত করে তোমরা নিজেদের ওপর খবরদার যুলুম করো না। এ মাসগুলোকে মর্যাদাপূর্ণ ঘোষণা দিয়ে এ সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা চান স্বার্থ সম্মান ও কর্তৃত্ব হাসিলের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরিণতিতে যুদ্ধের যে প্রবণতা মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আছে, তা নিয়ন্ত্রিত হোক এবং সারা বছরের মধ্যে কয়েকটি মাস এমন হোক যখন মানুষ পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করতে পারে এবং নিশ্চিন্ত মনে ও শান্তির সাথে দেশ বিদেশে সফর করে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা ও ব্যবসায়ের প্রসার ঘটাতে পারে।

এভাবে মানব সভ্যতা পশুত্বের স্তর থেকে উন্নীত হবে এবং ধীরে ধীরে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সামগ্রিক ভাবে মানুষের কল্যাণ হবে। কিন্তু অর্বাচীন মানুষ (স্বার্থের কারণে) আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধী কাজ করলো এবং এ বিরোধিতা করতে গিয়ে আসলে তারা নিজেদের ওপরই যুলুম করলো, যার পরিণতিতে তাদের প্রতি (আখেরাতে) আল্লাহর শাস্তি হয়ে গেলো অবধারিত এবং দুনিয়াতে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলল ভয় ও অস্থিরতা। আর পরবর্তীতে যুদ্ধের দাবানল জ্বলে ওঠায় নিশ্চিন্ততা ও শান্তি অন্তর্হিত হলো। অতপর গোটা মানব সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে এ বিদ্রোহী মোশরেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'লড়াই করো মোশরেকদের বিরুদ্ধে পুরোপুরিভাবে যেমন করে ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে সার্বিক ভাবে যুদ্ধংদেহী হয়ে রয়েছে।'

যুদ্ধের এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে মুসলমানদের অবশ্যই হারাম মাসগুলোর বাইরে অন্য মাসে যুদ্ধ করতে হবে। যতোক্ষণ পর্যন্ত মোশরেকরা যুদ্ধ শুরু না করে, অর্থাৎ এসব হারাম মাসে মোশরেকরা যদি হামলা করে, তাহলে আত্মরক্ষার জন্যে অবশ্যই মুসলমানদেরও হাতিয়ার তুলে নিতে হবে। কারণ কোনো এক পক্ষ হাতিয়ার রেখে দিলে অবশ্যই তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পায় ও অপরপক্ষ সাহসী হয়ে ওঠে ও মারাত্মক ক্ষতি করে– এ সুযোগ আগ্রাসীদের কিছুতেই দেয়া যাবে না। কারণ এর দ্বারা কল্যাণের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে ও অশান্তির পথ খুলে যাবে। পৃথিবীতে সামগ্রিকভাবে অশান্তি ও বিশৃংখলার পথ খুলে যাবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহর বিধান। সুতরাং এমতাবস্থায় আগ্রাসন থামিয়ে দেয়ার জন্যে হারাম মাসগুলোর হেফাযত হয়ে যাবে। অতপর সীমালংঘনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে এবং হীনতা ও অপমানজনক অবস্থার অবসান ঘটবে। এজন্যেই নির্দেশ আসছে,

'যুদ্ধ করো মোশরেকদের বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে যেমন করে ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে পুরোপুরিভাবে যুদ্ধ করছে।'

আর তাদের সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। এ যুদ্ধে, যেহেতু তারা তোমাদের কোনো ব্যক্তি বা কোনো দলকে তাদের আক্রমণ থেকে রেহাই দেয় না, এজন্যে তোমাদেরও কর্তব্য হচ্ছে সামগ্রিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। কোনো ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠী, যারাই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী হবে, তাদের কাউকে বাদ দিয়ো না। আসলে এ যুদ্ধ ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা বা স্বার্থের কারণে নয়, বরং এ যুদ্ধ হচ্ছে একমাত্র আদর্শের পার্থক্যের কারণে। শেরক ও তাওহীদের মধ্যে এ সংঘর্ষ, কুফর ও ঈমানের মধ্যে এ যুদ্ধ। এ বিরোধ হেদায়াত ও গোমরাহীর মধ্যে। এ যুদ্ধ এমন দুই যোদ্ধাদলের মধ্যে, যাদের মধ্যে কোনোভাবে এবং কোনো কালেই স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হতে পারে না বা কোনো সময়ে তাদের মধ্যে পূর্ণ একতাও আসা সম্ভব নয়। তাদের মধ্যকার বিরোধ কোনো সাময়িক ব্যাপার বা বিশেষ কোনো এক বিষয় নিয়ে নয়। তাদের বিরোধ এমন নয় যে, তারা কখনও মিটিয়ে ফেলতে পারবে বা আপোষ করতে পারবে বা এতো ছোট বিরোধও নয়, যা তারা মুছে ফেলতে পারে। কিন্তু আজকের জগতের মুসলিম জাতি তাদের ও মোশরেকদের মধ্যে বিরোধের মূল বিষয়টা নির্ণয় না করতে পেরেই বারবার ধোকা খাচ্ছে। একইভাবে তাদেরও মূর্তিপূজারী এবং আহলে কেতাবের বিরোধের মূল কারণ বুঝতে না পেরেও তারা ধোকা খাচ্ছে। তারা বুঝেছে বা তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, নিছক অর্থনৈতিক বা জাতিগত পার্থক্যের কারণে এসব বিরোধ বা মত-পার্থক্য অথবা বিভিন্ন দেশের বা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের কারণে এ বিরোধ। না, মুসলমানদের সাথে অন্যদের বিরোধের মূল কারণ এর কোনোটিই নয়, বরং একমাত্র আকীদা বিশ্বাসের কারণেই গড়ে উঠেছে এসব বিরোধ। এ ইসলামী আকীদার কারণে মানুষের জন্যে জীবন পদ্ধতি, অর্থাৎ পূর্ণাংগ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা রচিত (১) হয়েছে, আর এ কারণেই তাদের বিরোধীদের সাথে বা পারস্পরিক বিরোধ মিটিয়ে ফেলাটা কোনো দিন সম্ভব হয়নি। গড়ে তোলা যায়নি কোনো কালে ঐকমত্য অথবা সামরিক দিক দিয়ে সহাবস্থান বা পারস্পরিক সহযোগিতা। এ বিরোধ নিষ্পত্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে জেহাদ ও যুদ্ধ। সর্বাত্মক জেহাদ ও পূর্ণাংগ সংঘর্ষ .... এটাই আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি, কোনোভাবেই যার ব্যতিক্রম হবার নয়। মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে পার্থক্যের এ বিন্ধাচল- এ মহারোগের একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে জেহাদ- সর্বাত্মক সংগ্রাম। এ বিরোধ চিরদিন থাকবেই থাকবে, যেহেতু অমুসলমানরা আল্লাহর সেই বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত নয়, যার অধীনে চলছে দুনিয়া জাহান, যমীন ও আসমান। এ কথাটাকেই সকল বিশ্বাস ও জীবনের যাবতীয় নিয়মের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ ব্যবস্থাকেই মেনে নেয় সুস্থ বিবেক ও জাগ্রত অন্তর। আর এ কথাটিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির সূচনালগ্নে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'আর জেনে নাও যে, আল্লাহ তায়ালা মোত্তাকীদের সাথে আছেন।'

'সুতরাং বুঝা গেলো যে, সেই মোত্তাকীদের জন্যে আল্লাহর নির্ধারিত সাহায্য রয়েছে, যারা আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত বস্তু বা ব্যবহারগুলো থেকে সদা সর্বদা পরহেয করে চলে এবং যে সব জিনিস আল্লাহ তায়ালা হারাম করে দিয়েছেন, কখনই সেগুলোকে হালাল মনে করে না এবং বদলায় না

(১) দেখুন, 'মায়ালেম ফিত্ তারীক' কেতাবের 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-ই জীবন পদ্ধতি' অধ্যায়।

তারা আল্লাহর আইন কানুনকে। সুতরাং মুসলমানগণ যেন মোশরেকদের সাথে সামগ্রিকভাবে জেহাদে জড়িয়ে পড়তে কখনই পিছপা না হয় এবং জেহাদ করার ব্যাপারে কোনো ভয় ভীতি যেন কখনোই তাদেরকে পেয়ে না বসে। তবে এ জেহাদ আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম-শৃংখলা অনুযায়ী হতে হবে। তাই সকল যামানাতেই দেখা যায় মুসলমানরা আল্লাহর নির্ধারিত কঠোর নিয়ম শৃংখলার মধ্য দিয়ে চলেছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত যুদ্ধের যাবতীয় নিয়ম কানুন মেনে নিয়েছে। ব্যক্তিগত লোভ লালসা অথবা নিজ প্রাধান্য দেখানোর প্রবণতা থেকে তারা বরাবর মুক্ত থেকেছে। তারা প্রকাশ্য ও গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে চেষ্টিত থেকেছে। এহেন ইসলামী ফৌজের ওপরই রয়েছে আল্লাহর সাহায্য, কারণ আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে আছেন। আর আল্লাহ তায়ালা যাদের সাথে আছেন, তাদের কোনো চিন্তা নেই। অবশ্যই এবং নিসন্দেহে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আল্লাহর বিধানকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যাওয়া (শুধু কুফরই নয়), কুফর থেকেও বাড়া (এক মহা অপরাধি...... এবং কাফের জাতিকে (যারা জেনে বুঝে আল্লাহকে ও তাঁর বিধানকে অস্বীকার ও অগ্রহণযোগ্য মনে করে এবং অস্বীকার করে) হেদায়াত করেন না।'

মোজাহেদ (র.) বলেন, বনী কেনানা গোত্রের এক ব্যক্তি ছিলো, যে প্রত্যেক মওসুমেই তার গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে আগমন করতো এবং জনগণকে সম্বোধন করে বলতো, হে মানুষেরা, আমি কাউকে দোষ দেই না এবং নিজেকেও আমি ব্যর্থ মনে করি না, আর যা বলি নিজে তার খেলাফ কখনও করি না। অবশ্যই আমরা মোহাররম মাসকে হারাম (মর্যাদাপূর্ণ) মাস হিসাবে জেনেছি এবং সফর মাসকে বিলম্বিত করেছি। তারপর পরবর্তী বছরে এসে তিনি এ কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করতেন আর বলতেন, অবশ্যই আমরা সফর মাসকে হারাম বানিয়েছি এবং মোহাররম মাসকে বিলম্বিত করেছি। সুতরাং এ কথাটাই এসেছে আল্লাহর বাণীতে,

'আল্লাহ তায়ালা যে সময়টাকে মর্যাদাপূর্ণ (হারাম) করেছেন, সেগুলোকে তারা ধ্বংস করে দিতে চায়।' তিনি বলতেন, হারাম সে মাসগুলো হচ্ছে ৪টি (মাস)– এভাবে এ হারাম মাসটিকে বিলম্বিত করার মাধ্যমে তারা হালাল করে নিতো।

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ বলেন, উপরোল্লেখিত ব্যক্তি হচ্ছেন বনী কেনানা গোত্রের, যাকে আল কুলমুস নামে ডাকা হতো। এ লোকটি নিজে এবং তার এলাকার অন্যরাও জাহেলী যামানায় হারাম মাসে কেউ কারো বিরুদ্ধে উত্থান করতো না এবং কেউ কাউকে আক্রমণও করতো না। এমনকি, এমনও হয়েছে, এ গোত্রের কোনো ব্যক্তি এ হারাম মাসে নিজের বাপের হত্যাকারীকে দেখেছে, কিন্তু তার দিকে হাত বাড়ায়নি। দুঃখ সামলাতে না পেরে কখনও বলে উঠেছে, 'আমাদেরকে এখান থেকে বের করে দাও।' কিন্তু লোকেরা যখন বলেছে, 'দ্যাখো এটা মোহাররম মাস, তখন সে আবেগের চোটে বলে উঠেছে, আচ্ছা, আচ্ছা, এবারে আমরা হারাম মাসকে একটু ভুলে যাই। এবারের বছরে আমরা দুটো সফর মাস বানিয়ে নিই। সামনের বছরে কাযা করে দুটো মোহাররম মাস বানিয়ে নেব। আল কুলমুস বলেন, এভাবে নিজ ইচ্ছামত সে এটা করে নিয়েছে, সামনের বছর যখন এসেছে, তখন সে বলেছে, সফর মাসে কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ করো না। তারা মোহররাম মাসের সাথে যোগ দিয়ে দুটো মাসকেই মোহাররম মাস বানিয়ে নিয়েছে।

ওপরে বর্ণিত আয়াত সম্পর্কে এই দুটি কথা জানা যায় এবং মাসগুলোকে আগে পাছে করার দুটি অবস্থা বুঝা যায়। প্রথম অবস্থা, মোহাররম মাসের পরিবর্তে সফর মাসকে মোহাররম বানিয়ে নিয়ে গুনতিতে তারা ৪টি মোহাররম মাস (হারাম মাস) বানিয়ে নিতো। কিন্তু এটা তো ছিলো

তাদের মনগড়া প্রথা। এভাবে মোহাররম মাসকে হালাল বানানোর জন্যে বদলা বদলি করার বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা তো কেতাবে লিখিত কোনো অনুমতি দেননি। দ্বিতীয় অবস্থা জানা যায়, এক বছর তারা তিন মাসকে হারাম বানাতো এবং পরবর্তী বছরে পাঁচটি মাসকে হারাম বানিয়ে নিয়ে দুই বছরে গড়ে ৪ মাস হারাম মাস হিসাবে ব্যবহার করতো এবং এ সময় যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ রাখতো। এর ফলে আল্লাহর বিধান মতে এক বছরে একটি হারাম (মোহাররম) মাস হালাল হয়ে যেতো এবং সেই সময়ে তারা হত্যা করা বা যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকে জায়েয বানিয়ে নিতো। দ্বিতীয় বছরে সফর মাসেও যুদ্ধ করার জন্যে হালাল বানাতো।

এভাবেই আল্লাহ তায়ালা যেগুলোকে হারাম বানিয়েছেন, সেগুলোকে হালাল বানিয়ে নিয়ে আল্লাহর আইন ভংগ করতো এবং বাস্তবে আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করতো। এরশাদ হচ্ছে,

'(এটা ছিলো) কুফর থেকেও বড় কাজ।'

এটাই ছিলো কুফরী ধারণা বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে তাদের মধ্যে আল্লাহর আইন পরিবর্তন করার প্রবণতাজনিত কুফরী কাজ, যার বর্ণনা ইতিপূর্বে এসেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'এভাবে তারা কাফেররা পথহারা হয়ে যায়'। অর্থাৎ তারা এভাবে জুয়া খেলায় ডুবে থাকার কারণে, আসমানী কেতাবের শব্দ ও বাক্য পরিবর্তন করে নিজ খুশী মতো অন্য কথা সেখানে বসিয়ে দেয়ার কারণে এবং অনেক সময় নানা প্রকার মনগড়া ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আল্লাহর ইচ্ছা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে তারা ধোকার মধ্যে পড়ে থাকতো।

' তাদের কাছে তাদের অন্যায় কাজগুলোকে সুন্দর করে তোলা হয়েছে।'

এর ফলে তাদের কাছে তাদের অন্যায় কাজগুলো সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে এবং কেতাব পরিবর্তনের কাজটা তাদের নজরে সুন্দরই লাগতো। এসব কাজের কারণে তাদের মধ্যে কুফরী কাজ (আল্লাহ ও তাঁর ক্ষমতাকে অস্বীকার করার প্রবণতা) মযবুত হয়ে যাচ্ছে এবং তারা সত্য সঠিক ব্যবস্থা থেকে যে বহু দূরে সরে যাচ্ছে তা তারা বুঝতেই পারত না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর আল্লাহ তায়ালা কাফের জাতিকে হেদায়াত করেন না।'

এরাই হচ্ছে সেই সব জাতি, যারা হেদায়াতের আলো থেকে তাদের অন্তরকে ঢেকে ফেলেছে এবং তাদের অন্তরসমূহ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে হেদায়াতের প্রমাণাদি। আর এ অন্ধকার ও গোমরাহীর পথকে ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করার কারণেই তারা নিজেদেরকে আল্লাহ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার যোগ্য বানিয়ে নিয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا
مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٣٨﴾ اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ
عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾ اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ
مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ؕ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٠﴾

রুকু ৬

৩৮. হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছো, এ কি হলো তোমাদের! যখন তোমাদের আল্লাহ তায়ালার পথে (কোনো অভিযানে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা যমীন আঁকড়ে ধরো; তোমরা কি আখেরাতের (সমৃদ্ধির) তুলনায় (এ) দুনিয়ার জীবনকেই বেশী ভালোবাসো, (অথচ) পরকালে (হিসেবের মানদন্ডে) দুনিয়ার জীবনের এ ভোগের উপকরণ নিতান্তই কম। ৩৯. তোমরা যদি (কোনো অভিযানে) বের না হও, তাহলে (এ অবাধ্যতার জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দেবেন, তোমরা কিন্তু তাঁর কোনোই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, (কারণ) তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। ৪০. (হে মোমেনরা,) তোমরা যদি তাঁকে (এ কাজে) সাহায্য না করো তাহলে (আল্লাহ তায়ালাই তাকে সাহায্য করবেন) আল্লাহ তায়ালা তখনো তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাকে তার ভিটে-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলো- (বিশেষ করে) যখন সে (নবী) ছিলো মাত্র দু'জনের মধ্যে একজন, (তাও আবার) তারা দু'জন ছিলো (অন্ধকার এক) গুহার মধ্যে, সে (নবী) যখন তার সাথীকে বলছিলো, কোনো দুশ্চিন্তা করো না, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথেই আছেন, অতপর আল্লাহ তায়ালা তার ওপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল (করে তাকে সাহায্য) করলেন এবং এমন এক বাহিনী দ্বারা তাকে শক্তি যোগালেন যাদের তোমরা (সেদিন) দেখতে পাওনি এবং যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অমান্য করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের (ধৃষ্টতামূলক) বক্তব্য নীচু করে দিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার কথাই ওপরে (থাকলো); আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়ো– কম হোক কিংবা বেশী (রণসম্ভারে) হোক এবং জেহাদ করো আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেদের জান দিয়ে মাল দিয়ে; এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, (কতো ভালো হতো) যদি তোমরা বুঝতে পারতে!

তাফসীর

আয়াত ৩৮-৪১

'হে ঈমানদাররা, তোমাদের কি হলো, যখন তোমাদেরকে বলা হলো, দলে দলে বেরিয়ে পড় আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্যে, তখন তোমরা ভারী হয়ে গেলে যমীনের দিকে ...... না, না, না, হালকা সাজে হোক বা ভারী সাজে হোক দলে দলে বেরিয়ে পড়ো তোমরা জলদি করে এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার জন্যে এগিয়ে যাও, যদি প্রকৃতপক্ষে তোমরা তোমাদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে থাকো।' *(আয়াত ৩৮-৪১)*

যুদ্ধের ডাক আসলে আর আলসেমী নয়

সূরাটির এ অংশে বর্ণিত আলোচনার ধারাতে বুঝা যাচ্ছে যে, তবুক যুদ্ধের অভিযানে রওয়ানা হওয়ার জন্যে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তারপরই ওপরের আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিলো। এসময় রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে খবর এলো যে, আরবের সিরিয়া সীমান্তে রোম তার সৈন্য সমাবেশ করেছে এবং রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস তার বাহিনীকে পুরো এক বছরের আগাম বেতন দিয়ে দিয়েছে। উপরন্তু আরবের লাখাম, জুষাম, আমেলা ও গাসসান কবীলাগুলোকেও তাদের সাহায্য করার জন্যে একত্রিত করেছে এবং বালকা নামক স্থানে সিরিয়ার গভর্নরদের কাছে তাদের অগ্রণী বাহিনী পৌঁছে গেছে। রসূলুল্লাহ (স.)-এর নিয়ম ছিলো, যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোথায়, কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, এসব কিছুই কাউকে জানাতেন না। কিন্তু এ মহা অভিযান কালে, প্রচন্ড গরম, পথের দূরত্ব এবং কঠিন সফর হওয়ার কারণে, কোথায় কার বিরুদ্ধে লড়তে হবে সবই বিস্তারিতভাবে সবাইকে তিনি আগে ভাগে জানিয়ে দিলেন। এছিলো এমন একটি সময়, যখন দীর্ঘ ও তীব্র গরমের পর আবহাওয়া একটু ঠান্ডা হয়ে এসেছিলো এবং প্রচন্ড অভাবের পর বছরের একমাত্র ফসল খেজুরে পাক ধরেছিলো। এসময়ে সবাই সে বছরের খাদ্য সংগ্রহের জন্যে মনে প্রাণে বাড়ীতে থাকাটাই পছন্দ করছিলো। ঠিক এ সময়ে যখন মুসলমানদের নিকট যুদ্ধের ময়দানে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে এ সাধারণ ঘোষণা পৌঁছুল, তখন মোনাফেকরা মুসলমানদের মধ্যে ভাংগন ধরানোর জন্যে সুযোগ নিতে চাইলো। তারা বললো, এ প্রচন্ড গরমে কিছুতেই তোমরা এ কঠিন অভিযানে বেরিয়ো না। তারা পথের দূরত্ব ও কঠিন সফরের কথা বলে মুসলমানদেরকে ভীত করতে চাইলো এবং রোম সম্রাটের শক্তি ও বিশাল বাহিনীর কথা বলে তাদেরকে সাহসহারা করে দিতে চাইলো। মোনাফেকদের দূরভিসন্ধি ও অপচেষ্টা অবশ্যই মুসলমানদের অনেককে ভাবিয়ে তুললো, তাদের পাগুলো ভারী হয়ে গেলো এবং শরীর যেন তাদের কাছে এতো ভারী মনে হতে লাগলো, যেন তারা মাটিতে দেবে যেতে লাগলো। এ কথাগুলোই আলোচ্য আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে।

'হে ঈমানদাররা, কী হলো তোমাদের, ...এটাই হবে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা সঠিক অবস্থাটা বুঝতে পারো এবং নিজেদের জ্ঞানকে কাজে লাগাও।'

এখানে পিছিয়ে থাকা মানুষদের প্রতি তিরস্কার শুরু হয়েছে, আর আল্লাহর পথে বের হতে গিয়ে যারা হালকা বোধ করেনি, বরং শরীর ও মন ভয় ভীতির কারণে ভারী বোধ করেছে, তাদেরকে কঠিন পরিণতির কথা জানিয়ে ধমকি দেয়া হয়েছে। আর রসূল (স.)-এর জন্যে

আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সাহায্যের আশ্বাস রয়েছে, তা স্মরণ করানো হচ্ছে। জানানো হচ্ছে যে, একজনও যদি আল্লাহর রসূলের সাথে না থাকে, তবু তিনি তাঁর রসূলকে সাহায্য করবেন এবং এক্ষমতা তাঁর পুরোপুরিই রয়েছে। পূর্বে যেমন তিনি তাঁর রসূলকে অন্য কারো সাহায্য ছাড়াই সাহায্য করেছেন, তেমনি ভবিষ্যতেও কারো সাহায্য ছাড়াই তিনি তাঁর রসূলকে সাহায্য করবেন। আর সেদিন তাদের পিছিয়ে থাকার অপরাধে তাদেরকে ক্রটি ও বিরাট গুনাহের ভাগী হতে হবে। আবারও খেয়াল করুন আল্লাহর আহ্বানের দিকে–

'হে ঈমানদাররা, কী হলো, কী হলো তোমাদের, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে দলে দলে বেরিয়ে পড়তে বলা হলো, তখন তোমরা যমীনের দিকে ভারী হয়ে ঝুঁকে পড়লে?'

যমীনের বুকে এ ভারী হওয়ার অর্থ হচ্ছে, ভয় ভীতির কারণে শরীর ভারী হয়ে যাওয়া, পৃথিবীর লোভনীয় বস্তুগুলো ছেড়ে কঠিন সমর ক্ষেত্রে যেতে হবে, তার কারণে শরীর ভারী হয়ে যাওয়া, পৃথিবীর এ সুন্দর জীবন শেষ হয়ে যাবে এ চিন্তায় মন ভারী হওয়া..........মৃত্যু যেন এগিয়ে আসছে, ধনদৌলত সব শত্রুর কবলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে বলে মন ও শরীর ভারী হয়ে যাওয়া, জীবনের স্বাদ ফুরিয়ে যাবে, ফসল পাড়তে ও সংরক্ষণ করতে না পারলে সারা বছর কি খাওয়া হবে এ চিন্তাতেও মন ভারী হয়ে যাওয়া .... জীবনের শান্তি শৃংখলা ও আরাম নষ্ট হওয়ার কারণে ফসল সংগ্রহের সময় সীমাবদ্ধ হওয়ায় এবং লভ্য বস্তু নিকটবর্তী এসে যাওয়ায় .... শরীরের মাংস রক্ত ও মাটি ভারী হওয়া...... এ শব্দগুলোর ব্যাখ্যায় 'ফী যিলালিল কোরআন' একটি শব্দ তুলে ধরছে, 'আস্‌সাকালতুম'– এ শব্দের মধ্যেই ঝংকৃত হচ্ছে সেই অবস্থা ও পরিবেশ, যা তখন সৃষ্টি হয়েছিলো। একে তো চলছিলো ভীষণ অনটন, কঠিন গরম পড়ছিলো, বছরের একমাত্র ফসল পেকে উঠেছিলো। এসব ফসল সময় মতো সংগ্রহ করতে না পারলে সারা বছর কি খাওয়া হবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। তারপর যেতে হবে বহু দূরের দুর্গম পথ পেরিয়ে সুদূর রোম সীমান্তে, আর মোকাবেলা পৃথিবীর বৃহত্তম শত্রুর সাথে। এসব কিছুই যেন ঝংকৃত হয়ে উঠেছে ওই একটি মাত্র শব্দ 'আসসাকালতুম'-এর মধ্যে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, উপস্থিত পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে মনে কোনো উৎসাহ নেই, শরীর ও পাগুলো এমন ভারী মনে হচ্ছে যে, যমীন থেকে পা তোলা সম্ভব হচ্ছে না এবং ক্রমান্বয়ে যেন মাটির দিকে গোটা দেহ দেবে যাচ্ছে। এমনি চলাফেরা করতে গেলেও গতি শ্লথ হয়ে যাচ্ছে। কষ্ট করে পা তুললেও ভারের চোটে আবার ধপ করে পা মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। এসব অর্থেই যমীনের বুকে ভারী(১) হয়ে যাওয়ার অবস্থাটা সত্যে পরিণত হচ্ছে, যুদ্ধে যাওয়ার মতো কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা না থাকায় মনের মধ্যে অনিচ্ছাটা এতোদূর দানা বেঁধে উঠেছে যে, সমস্ত শরীর ও মনে কম্পন বিরাজ করছে।

আল্লাহর পথে জেহাদ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার অর্থ হচ্ছে, পৃথিবীর সকল লোভনীয় বস্তু থেকে দেহ মনকে গুছিয়ে নিয়ে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যে এগিয়ে যাওয়া এবং এভাবেই আল্লাহর নিকট মর্যাদা হাসিল করা। দুনিয়া প্রাপ্তির সকল আগ্রহকে অন্তরের মধ্যে দাবিয়ে এবং সব কিছুর আকর্ষণ ও প্রয়োজনের দাবীকে ছিন্ন করে অগ্রসর হওয়া। অনুভব করা অন্তরের মধ্যে চিরস্থায়ী বাসস্থানের স্বাদ এবং সীমাবদ্ধ ও নশ্বর এ দুনিয়া থেকে মুক্তি। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরা কি আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? যদি তাই হয়ে থাকো, তাহলে জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবনের সুখ-সম্ভোগের বস্তুনিচয় (আখেরাতের তুলনায়) খুবই নগণ্য।'

আল্লাহর পথে জেহাদ করায় যারা বিশ্বাসী, তারা ডাক এলে কিছুতেই পিছিয়ে থাকে না। তবে এ বিশ্বাসে কিছু ফাটল ধরলে অথবা কিছু ঈমানী দুর্বলতা আসলে ভিন্ন কথা। এজন্যে রসূলুল্লাহ

(১) এ প্রসংগে হাফস (র.)–এর কেরায়াতে 'তাসাকালতুম' উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্য এই কেরায়াতে ঐ অবস্থার চিত্রটা আরো উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠে।

(স.) বলছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলো, কিন্তু রসূল (স.)-এর সাথে থেকে যুদ্ধ করলো না বা যুদ্ধ করার কথা চিন্তাও করলো না, সে নেফাকের ওপর মৃত্যু বরণ করলো।' আর নেফাকের অর্থ বিশ্বাসের মধ্যে ভাংগন বা সন্দেহ, যা তাকে সত্য সঠিক ও পূর্ণত্ব লাভ করার পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সে একাই শুধু ভুল পথে চলে তা নয়, বরং যে আল্লাহর পথে জেহাদ করতে চায় ও তার জেহাদী মনোভাবকে টিকিয়ে রাখতে চায়, তাকে মৃত্যু ভয় ও দৈন্যের আশংকার কথা বলে ভয় দেখায়। তার জানা দরকার যে, সব কিছুর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই সময় নির্দিষ্ট করা রয়েছে এবং জীবন সামগ্রী সবই আল্লাহর কাছ থেকে আসে। আর এটাও ধ্রুব সত্য কথা যে, দুনিয়ার জীবন আখেরাতের তুলনায় অবশ্যই কম।

এ পর্যায়ে এসে ওই দুর্বলতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে ধমকের সাথে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে,

'যদি দলে দলে তোমরা বেরিয়ে না পড়, তাহলে তোমাদেরকে তিনি বেদনাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে এমন এক জাতিকে ক্ষমতায় বসাবেন যাদেরকে তোমরা কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম।'

এখানে বিশেষ এক কাজের জন্যে বিশেষ এক জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে বটে, কিন্তু সম্বোধনের লক্ষ্য সেই সব সাধারণ মানুষ যাদের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আছে। আর যে আযাব তাদেরকে ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে দেবে তা শুধু আখেরাতের আযাবই নয়, বরং দুনিয়াতেও তাদের অশেষ নির্যাতন ও হীনতা দীনতা ভোগ করতে হবে যা নির্ধারিত রয়েছে সে ব্যক্তিদের জন্যে, যারা জেহাদে যাওয়া ও যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে ও নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকবে। তারা এগিয়ে যাবে সেই বহুগুণে বর্ধিত হীনতা দীনতা ও অপমানের বধ্যভূমির দিকে, যা তাদেরকে গ্রাস করার জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। দুশমনও তাদের ওপর বিজয়ী হয়ে যাবে, নিষিদ্ধ হয়ে যাবে তাদের জন্যে কল্যাণসমূহ এবং রুদ্ধ হয়ে যাবে তাদের জন্যে অর্থ সম্পদের ভান্ডারগুলো। আর এসব কিছু থেকে বাড়তি যে জিনিসটি তাদেরকে ঘিরে ফেলবে তা হচ্ছে, তাদের জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতি এবং তারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে জেহাদ ও যুদ্ধের ময়দানে। তারা এগিয়ে যাবে হীনতা দীনতার বধ্যভূমির দিকে। অথচ তারা যদি আল্লাহর পথে নিবেদিত হতো, তাহলে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো দুনিয়া ও আখেরাতের মান-সম্ভ্রম। আর দুনিয়ায় যে জাতিই জেহাদ পরিত্যাগ করেছে, তাদের ওপর নেমে এসেছে আল্লাহর কাছ থেকে অপমান ও সর্বপ্রকার ক্ষয়ক্ষতি। তাদের আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন হীনতাপূর্ণ অনিচ্ছা, যার কারণে তারা দুশমনের নযরে বহুগুণে ছোট হয়ে গেছে এবং চরম পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করেছে।.....

'আর তিনি তোমাদের যায়গায় অন্য এক জাতিকে এনে বসিয়ে দেবেন।'

অর্থাৎ তারা তাদের আকীদার ওপর অবিচলিতভাবে টিকে থাকবে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সম্মানের মর্যাদা দান করবেন এবং আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে ব্যস্ততার সাথে তারা তৎপরতা চালাবে।

'তোমরা তার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।'

তোমাদের কোনো ওযন বা ভারত্বই থাকবে না এবং তোমাদের হিসাব সময়ের আগে বা পরে নেয়া হবে না, বরং ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই নেয়া হবে।

'এবং আল্লাহ তায়ালা সব কিছু করতে সক্ষম।'

আল্লাহর পথে থাকলে সাহায্য আসবেই

তোমাদেরকে তোমাদের মর্যাদার আসন থেকে সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তাঁকে কেউই অক্ষম করতে পারবে না, আর তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোনো জাতিকে এনে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবেন এবং তোমাদের নিজেদের ভাগ্যে কি হবে ও কিভাবে তোমাদের হিসাব গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে তোমাদের বে-খেয়াল করে দেবেন!

মানুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সাধারণভাবে দুভাবে হয়ে থাকে। পৃথিবীর মানুষের ওপর কর্তৃত্ব ও নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমে। এভাবে সম্মানিত মানুষকে দুনিয়ায় মর্যাদার আসনে টিকিয়ে রাখা হয়। এটাই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত মর্যাদা বাড়ানোর জন্যে উপযুক্ত উপায়। অপরদিকে সাহসহারা হয়ে যমীনের বুকে ভারী হয়ে যাওয়া, কদম উঠতে না চাওয়া এবং ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করার অর্থ হচ্ছে সম্মানিত মানুষের বিলুপ্তি। এভাবে আল্লাহর মাপযন্ত্রের মধ্যে নিজেদের বিপর্যস্ত করা এবং মানুষের কাছে একটি স্বতন্ত্র ও সম্মানিত জাতি হওয়া থেকে নেমে যাওয়া।

এদের উদাহরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা এমন ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করছেন, যা তারা জানে। আল্লাহ তায়ালা চাইলেই তাদের কোনো সাহায্য বা সহযোগিতা ছাড়াই তাদেরকে সাহায্য করে থাকেন, আর অবশ্যই এটা সত্য কথা যে, যাবতীয় সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে এ সাহায্য দিয়ে থাকেন।

'যদি তোমরা তাকে সাহায্য না করো, তাহলেও এটা অবশ্যই সত্য যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সেই সময়ে সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাঁকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছিলো ...... এবং আল্লাহ তায়ালা মহা শক্তিমান মহা-বিজ্ঞানময়।

এ হচ্ছে ওই সময়ের ঘটনা, যখন মোহাম্মদ (স.)-এর জীবনকে কোরায়শরা চরমভাবে সংকটপূর্ণ করে দিয়েছিলো, যেমন করে চিরদিন অন্যায় অপশক্তি সত্যকে সংকটপূর্ণ করে থাকে। এতো কঠিনভাবে সত্যের আহ্বানকে তারা প্রতিহত করে যে, তার মোকাবেলা করা যায় না এবং সে অবস্থায় সবর করাও সম্ভব থাকে না। সে সময় কোরায়শরা গোপন বৈঠকে সমবেত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলো যে, তাদেরকে মোহাম্মদ থেকে মুক্তি পেতে হবে (এবং এজন্যে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে)। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের এ ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন এবং ওহী প্রেরণের মাধ্যমে তাঁকে হিজরত করার নির্দেশ দিয়ে দিলেন। তখন তিনি তাঁর একজন মাত্র সাথী আবু বকর সিদ্দীককে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁদের সাথে না ছিলো কোনো লোক লশকর, আর না ছিলো কোনো সাজ সরঞ্জাম। তাঁদের দুশমনরা সংখ্যায় ছিলো বহু এবং তাদের কাছে ছিলো প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, যার দ্বারা এ দু' ব্যক্তিকে ধরা ও মারা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার ছিলো। এ সময়ের যে দৃশ্যটি সামনে আসে, তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন,

'স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের অবস্থা যখন তারা মাত্র দু'জন ব্যক্তি গুহার মধ্যে ছিলো।

'এ সময়ে গোটা কোরায়শ জাতি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদেরকে ধরার জন্যে পশ্চাদ্ধাবন করছিলো। সিদ্দীকে আকবর ভীত হয়ে উঠলেন। নিজের জন্যে নয়, তাঁর প্রিয়তম সাথীর জন্যে। যদি ওরা তাঁদেরকে দেখে ফেলে, তাহলে উপায় নেই। তাই তিনি প্রিয় হাবীব (স.)-এর কাছে আরয করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, ওরা যদি কেউ পায়ের দিকে তাকায়, তাহলেই তো আমাদেরকে দেখে ফেলবে। এসময় আল্লাহ রব্বুল আলামীন রসূলুল্লাহ (স.)-এর অন্তরে প্রশান্তি দান করলেন। তাঁর অন্তর থেকে ভয় ভীতি দূর করে দিলেন এবং তাঁর অন্তর পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলো। তিনি আবু বকর (রা.)-কে বললেন, আবু বকর! এমন দুজন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয়জন আল্লাহ তায়ালা?'

তারপর দেখুন, পরিণতি কি হলো! একদিকে বস্তুগত সকল শক্তি একত্রিত হয়ে তাদেরকে ধরার জন্যে চেষ্টারত, অপরদিকে মাত্র দু'জন নিরস্ত্র ব্যক্তি– মোহাম্মদ (স.) ও তার সংগী! এ অবস্থায় নেমে আসছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি সাহায্য, আসছে এমন বাহিনী, যা তোমরা দেখোনি। অবশেষে যারা কুফরী করেছিলো, তাদের জন্যেই নেমে এল পরাজয়ের গ্লানি, ব্যর্থতা ও অপমান। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তিনি বানিয়ে দিলেন কাফেরদের ষড়যন্ত্রকে পর্যুদস্ত ও পরাভূত করে দিলেন।'

আর আল্লাহর তদ্‌বীর সমুন্নত হলো, মহা শক্তিশালী সাহায্য নেমে এলো এবং বিজয়ী হলো সত্য।

'আল্লাহর কথা ও কাজই হচ্ছে চির সমুন্নত।'

ওপরের আয়াতাংশকে আর একভাবেও পড়া হয়েছে, কালিমাতাল্লাহি– বানালেন আল্লাহর কথাকে সমুন্নত।'

কিন্তু 'কালিমাতুল্লারহ' অর্থাৎ 'তু'-পেশ দিয়ে পড়াতে যে অর্থ আসে সেটাই বেশী শক্তিশালী। কারণ এর দ্বারা অবস্থার বিবরণী রিপোর্ট আকারে এসেছে বলে বুঝা যায়। আর মূলত এবং বস্তুত অবশ্যই এ কথা সত্য যে, আল্লাহর তদ্‌বীর কাজ ও কথাই হচ্ছে চির সমুন্নত। একথা প্রকাশের জন্যে কোনো বিশেষ ঘটনা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। আর আল্লাহ তায়ালা 'মহাশক্তিমান'। তিনি তাঁর পছন্দনীয় ব্যক্তি বন্ধুদের অপমানিত করেন না বা অপমানিত হতে দেন না। তিনি 'মহা-বিজ্ঞানময়', যার যখন প্রয়োজন এবং যাকে যখনই তিনি সাহায্য করতে চান, সাহায্য করেন।

এ হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাহায্যের প্রকৃতি ও উদাহরণ। আর ইচ্ছা করলে আবারও তিনি অপর যে কোনো জিনিস দ্বারা এ সাহায্য নিতে পারেন, যার কিছুমাত্র মূল্য বা ভারত্ব অন্য কারো কাছে নাও থাকতে পারে বা অন্যদের কাছে এটা অতি তুচ্ছ জিনিসও হতে পারে। পরবর্তীকালের লোকদের জন্যে আল্লাহর সাহায্য ও ক্ষমতা প্রদর্শনের এটা একটা বাস্তব ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা এ আয়াতাংশে ফুটে উঠেছে।

সর্বাত্মক যুদ্ধের নির্দেশ

এ বাস্তব প্রভাবপূর্ণ ও চমৎকার উদাহরণটির আলোকে আল্লাহ তায়ালা তবুক যুদ্ধের অভিযাত্রীদেরকে উদ্বুদ্ধ করছেন এবং যুদ্ধাভিযানে অবিলম্বে বেরিয়ে পড়ার জন্যে সাধারণ ঘোষণা দিচ্ছেন। জানাচ্ছেন যেন কোনো সংকট বা সংকটপূর্ণ অবস্থা তাদের রওয়ানা হওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করে অথবা তারা কিছুতেই যেন মনভাংগা না হয়– যদি প্রকৃতপক্ষেই তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের জন্যে কল্যাণকামী হয়ে থাকে। এরশাদ হচ্ছে,

'বেরিয়ে পড় হালকা সাজ সরঞ্জামে বা ভারী আয়োজনে এবং প্রাণপণ সংগ্রাম করো আল্লাহর পথে তোমাদের মাল ও জান দ্বারা। এটাই হবে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর পদক্ষেপ (বুঝবে) যদি তোমাদের জ্ঞানকে তোমরা কাজে লাগাও।'

অর্থাৎ (মনের অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতি যাই হোক না কেন) সর্বাবস্থায় তোমরা বেরিয়ে পড়ো এবং জান মাল দ্বারা জেহাদে অংশ নাও। এ সাধারণ ঘোষণার পর কারো কোনো ওযর আপত্তি পেশ করার কোনো সুযোগ নেই। কোনো প্রকার সংকট, ওযর ওজুহাত কোনো কিছু যেন তোমাদেরকে বিলম্বিত না করে এবং তোমরা সংকট সমস্যার কাছে নতি স্বীকার না করো।

'এটাই হবে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, বুঝবে যদি তোমাদের জ্ঞানকে তোমরা কাজে লাগাও।'

এসময়ে অবশ্যই মোখলেস মোমেনরা সঠিকভাবে একথাগুলো বুঝেছিলো এবং অবস্থার নাযুকতার সঠিক মূল্যায়ন করে তারা কল্যাণের দিকটি হৃদয়ংগম করতে সক্ষম হয়েছিলো, যার কারণে চলার পথে শত বাধা-বিঘ্ন থাকা সত্তেও তারা রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলো। ওযর দিতে চাইলে বহু ওযর তাদেরও ছিলো, কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের মনকে সত্যের জন্যে উন্মুক্ত করে

দিলেন এবং বহু এলাকায় তাদেরকে বিনা যুদ্ধে বিজয়ী করে দিলেন। সমুন্নত করলেন তাদের দ্বারা আল্লাহর কথা এবং তাদেরও আল্লাহর কথা ও আয়াত দ্বারা সম্মানিত করলেন। সত্যে পরিণত করলেন তাদের হাত দ্বারা সেই মহান সত্যকে, যা যুদ্ধ বিজয়ের যে কোনো ইতিহাসে এক অলৌকিক ও অবিস্মরণীয় ঘটনা হয়ে রয়ে গেছে।

হযরত আবু তালহা (রা.) একসময় সূরায়ে তাওবা পড়ছিলেন। তিনি পড়তে পড়তে যখন এ আয়াতটি পর্যন্ত এলেন, তখন বলে উঠলেন, 'আমি দেখছি, আমাদের রব আমাদের যুবক বৃদ্ধ সবাইকে যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার জন্যে ডাক দিচ্ছেন। হে আমার সন্তানেরা, আমাকে যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে দাও এবং যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত করে দাও। তার ছেলেরা বললো, আব্বা, আপনাকে আল্লাহ পাক রহম করুন, আপনি তো রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে থেকে যুদ্ধ করেছেন, তাঁর ইন্তেকালের পর পর্যায়ক্রমে আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.)-এর সাথে থেকেও ততোদিন যুদ্ধ করেছেন, যতোদিন তারা বেঁচে ছিলেন। এখন আপনার পক্ষ থেকে আমরাই যুদ্ধ করবো।' তিনি বললেন, না, তা হতে পারে না, আমাকে অবশ্যই যুদ্ধে যেতে হবে। এরপর তিনি সামুদ্রিক যুদ্ধে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁকে দাফন করার মতো কোনো দ্বীপ পাওয়া গেলো না। অবশেষে নয় দিন পর এক দ্বীপে নোংগর করে তাকে দাফন করা হলো। কিন্তু তখনও তার লাশ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় ছিলো।

ইবনে জারীর থেকে আর একটি রেওয়ায়াত পাওয়া যায় যা তিনি হযরত আবু রাশেদ হাররানী থেকে বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর অশ্বারোহী মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ-এর সাথে এক তাঁবুতে বসে ছিলাম। তিনি রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে বহু যুদ্ধে যোগদান করায় খুব সম্মানিত ব্যক্তি বলে বিবেচিত হতেন। আমি তাঁকে বললাম,

'আল্লাহ তায়ালা আপনার ওযর কবুল করেছেন। তখন তিনি বললেন, 'আমাদের কাছে সূরায়ে 'আলবাউস' নাযিল হলো, যার মধ্যে ছিলো,

'হালকা অবস্থা অথবা ভারী অবস্থা যাই হোক না কেন, উভয় অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়ো।'

অনুরূপ সনদের আর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে হায়্যান ইবনে যায়দ আশশাবঈ বলেন, আমরা সাফওয়ান ইবনে আমরের সাথে যুদ্ধে রওয়ানা হলাম। তিনি হেমসের গভর্নর ছিলেন। এ শহরটি ছিলো জেরাজম অঞ্চলের দিকে যাওয়ার পথে ইফসোস অভিমুখী এক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। তখন আমি দেখলাম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এক বৃদ্ধকে, তার ভুরুদ্বয় চোখের ওপর ঝুলে রয়েছে। লোকটি দামেশক থেকে আগত আগ্রাসী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আমি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মাফ করুন (আপনার ওযর কবুল করুন)। বর্ণনাকরী বলেন, তখন তিনি তার ভুরু উঁচু করে বললেন, হে ভাতিজা, আল্লাহ তায়ালা হালকা এবং ভারী উভয় অবস্থাতেই যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার হুকুম দিয়ে ছিলেন। শোনো, যাকে আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন, তাকেই বিপদ আপদে ফেলে পরীক্ষা করেন। তারপর তাকে ওই পরীক্ষা থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং তাকে টিকিয়ে রাখেন। আবার তিনি তাঁর বান্দাদের কিছু লোককে পরীক্ষা করে দেখতে চান, তারা শোকর করে কিনা, বিপদে সবর এখতিয়ার করে কিনা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে কিনা। তিনি আরো দেখতে চান যে, একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া সে আর কারো দাসত্ব করে কিনা।

এভাবে বহু কঠিন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইসলামের বাণী বহনকারীরা ইসলামের দাওয়াত দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, যার ফলে ইসলাম প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয়েছে। মানুষ মানুষের বন্দেগী থেকে মুক্তি পেয়ে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আর এসব কঠিন ও অত্যাশ্চর্য কাজ সম্ভব হয়েছে মুক্তিকামী মোজাহেদদের উপর্যুপরি বিজয়ের মাধ্যমে।

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَّبَعُوكَ وَلٰكِنۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ
الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿٤٢﴾ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى
يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ ﴿٤٣﴾ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يُّجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ
وَاللّٰهُ عَلِيمٌۢ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَوْ
أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ
وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقٰعِدِينَ ﴿٤٦﴾

৪২. (হে নবী, এতে) যদি আশু কোনো লাভ থাকতো, হতো যদি (তাদের এ) সফর সহজ সুগম, তাহলে তারা অবশ্যই (এ অভিযানে) তোমার পেছনে পেছনে যেতো, কিন্তু তাদের জন্যে এ যাত্রাপথ অনেক দীর্ঘ (ও দুর্গম) ঠেকেছে; তারা অচিরেই আল্লাহর নামে (তোমার কাছে) কসম করে বলবে, আমরা যদি সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই তোমার সাথে (অভিযানে) বের হতাম, (মিথ্যা অজুহাতে) তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছে, আল্লাহ তায়ালা জানেন, এরা হচ্ছে মিথ্যাবাদী।

রুকু ৭

৪৩. (হে নবী,) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মাফ করুন, (ঈমানের দাবীতে) কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী– এ বিষয়টা তোমার কাছে স্পষ্ট হওয়ার আগে কেন তুমি তাদের (যুদ্ধে যাওয়া থেকে) অব্যাহতি দিলে? ৪৪. যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছে, তারা নিজেদের মাল ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদে অবতীর্ণ না হওয়ার জন্যে তোমার কাছ থেকে অব্যাহতি চাইতে আসবে না; আল্লাহ তায়ালা (অবশ্যই) সেসব লোককে জানেন যারা (তাঁকে) ভয় করে। ৪৫. (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য) তোমার কাছে অব্যাহতি চাইতে তো আসবে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর (কোনো রকম) ঈমান রাখে না, তাদের মন সংশয়যুক্ত, আর তারা নিজেরাও সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। ৪৬. যদি (সত্যি) এরা (তোমার সাথে) বের হতে চাইতো, তাহলে তারা সে জন্যে (কিছু না কিছু) প্রস্তুতি তো নিতো! কিন্তু ওদের যাত্রা করাটা আল্লাহ তায়ালার মনোপূত হয়নি; তাই তিনি তাদের (এ থেকে) বিরত রাখলেন, (তাদের যেন) বলে দেয়া হলো, যারা পেছনে বসে আছে তোমরাও তাদের সাথে বসে থাকো।

لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ
الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾ لَقَدِ ابْتَغَوُا
الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ
وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي
الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٤٩﴾ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ
تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ
وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ
مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا
إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ

৪৭. ওরা তোমাদের মাঝে বের হলে তোমাদের মাঝে বিভ্রান্তিই শুধু বাড়িয়ে দিতো এবং তোমাদের সমাজে নানা রকম অশান্তি সৃষ্টির জন্যে (এদিক-সেদিক) ছুটাছুটি করতো, (তা ছাড়া) তোমাদের মধ্যেও তো তাদের কথা আগ্রহের সাথে শোনার মতো (গুপ্তচর কিংবা দুর্বল ঈমানের) লোক আছে, আল্লাহ তায়ালা (এসব) যালেমদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন। ৪৮. এরা এর আগেও (তোমাদের মাঝে) বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো এবং তোমার পরিকল্পনাগুলো পালটে দেয়ার চক্রান্ত করেছিলো, শেষ পর্যন্ত ন্যায় (ও ইনসাফ তাদের কাছে) এসে হাযির হলো এবং আল্লাহ তায়ালার ফয়সালাই (চূড়ান্তভাবে) বিজয়ী হলো, যদিও তারা (হচ্ছে এ বিজয়ের) অপছন্দকারী! ৪৯. তাদের ভেতর এমন কিছু মানুষও আছে, যারা বলে, (হে নবী, এ যুদ্ধে যাওয়া থেকে তুমি) আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে তুমি (কোনো লোভনীয় বস্তুর) মসিবতে ফেলো না; তোমরা জেনে রেখো, এরা তো (আগে থেকেই নানা) মসিবতে পড়ে আছে; আর জাহান্নাম তো কাফেরদের (চারদিকে বড়ো মসিবতের মতোই) ঘিরে রেখেছে। ৫০. তোমাকে যদি কখনো কোনো কল্যাণ স্পর্শ করে তাহলে (এতে) তাদের দুঃখ হয়, আবার তোমার কোনো বিপদ ঘটলে তারা বলে, (হাঁ, আমরা এটা জানতাম, তাই) আমরা আগেই ভিন্ন পথ অবলম্বন করে নিয়েছিলাম, অতপর তারা উৎফুল্ল চিত্তে তোমার কাছ থেকে সরে পড়ে। ৫১. তুমি (তাদের) বলো, আসলে (কল্যাণ অকল্যাণের) কিছুই আমাদের (ওপর নাযিল) হবে না– হবে শুধু তাই যা আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, আর যারা মোমেন তাদের তো (ভালো মন্দ সব ব্যাপারে) শুধু আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা করা উচিত। ৫২. আমাদের (ব্যাপারে) তোমরা কি (বিজয় ও শাহাদাত এ) দুটো কল্যাণের যে কোনো একটির অপেক্ষা করছো? কিন্তু তোমাদের জন্যে আমরা যা কিছুর প্রতীক্ষা করছি তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা নিজে থেকে তোমাদের

مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾ قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا
اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۖ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٣﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ
تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ
اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٥٤﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ
وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ۖ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ۖ وَمَا
هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ
مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ۚ

আযাব দেবেন, কিংবা আমাদের হাত দিয়ে (তোমাদের তিনি শাস্তি পৌঁছাবেন), অতএব তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। ৫৩. (হে নবী,) তুমি বলো, ধন-সম্পদ আগ্রহ সহকারে খরচ করো কিংবা অনিচ্ছায় খরচ করো, কোনো অবস্থায়ই তোমাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না; কেননা তোমরা হচ্ছো একটি নাফরমান জাতি। ৫৪. তাদের এ অর্থ-সম্পদ কবুল না হওয়াকে এ ছাড়া আর কোনো কিছুই বাধা দেয়নি যে, তারা (স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা) আল্লাহ তায়ালাকে ও তাঁর (পাঠানো) রসূলকে অমান্য করেছে, তারা নামাযের জন্যে আসে ঠিকই, কিন্তু তারা থাকে একান্ত অলস, আর তারা আল্লাহ তায়ালার পথে অর্থ ব্যয় করে বটে, তবে তা করে (একান্ত) অনিচ্ছার সাথে। ৫৫. সুতরাং (হে নবী), ওদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে কখনো আশ্চর্যান্বিত না করে, আল্লাহ তায়ালা (মূলত) এসব কিছু দিয়ে তাদের এ দুনিয়ার জীবনে (এক ধরনের) আযাবেই ফেলে রাখতে চান; আর যখন তাদের (দেহ থেকে) জান বের হয়ে যাবে তখন তারা কাফের অবস্থায়ই থাকবে। ৫৬. এরা আল্লাহ তায়ালার নামে কসম করে বলে, এরা তোমাদের দলের লোক (অথচ আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলছেন); এরা কখনোই তোমাদের (দলের) লোক নয়, এরা হচ্ছে (মূলত) একটি ভীত-সন্ত্রস্ত জাতি। ৫৭. (এতো ভীত যে,) তারা যদি এতোটুকু আশ্রয়স্থল (কোথাও) পেয়ে যায় কিংবা পায় (যদি মাথা লুকোবার মতো) কোনো গিরিগুহা– অথবা (যমীনের ভেতর) ঢুকে পালাবার কোনো জায়গা, তাহলে অবশ্যই তারা (তোমাদের ভয়ে) এসব জায়গার দিকে দ্রুত পালিয়ে (হলেও) বাঁচার চেষ্টা করতো। ৫৮. এদের মাঝে এমন লোকও আছে, যারা (বিশেষ কিছু) অনুদানের (ভাগ-বন্টনের) ব্যাপারেও তোমার ওপর

فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ
أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ
مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾
وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ۚ وَالَّذِينَ
يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ

দোষারোপ করে, (কিন্তু) সে অংশ থেকে যদি তাদের দেয়া হয় তাহলে তারা খুবই সন্তুষ্ট হয়, আবার তাদের যদি তা থেকে দেয়া না হয় তাহলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ৫৯. যদি তারা এর ওপর সন্তুষ্ট হতো যা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল তাদের দিয়েছেন (তাহলে তা কতোই না ভালো হতো), সে অবস্থায় তারা বলতো, আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনন্ত ভান্ডার থেকে আমাদের অনেক দেবেন এবং তাঁর রসূলও আমাদের অনেক দান করবেন, আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকেই তাকিয়ে আছি।

রুকু ৮

৬০. (এসব) 'সাদাকা' (যাকাত) হচ্ছে ফকীর-মেসকীনদের জন্যে, এর (ব্যবস্থাপনায় কর্মরত) কর্মচারীদের জন্যে, যাদের অন্তকরণ (দ্বীনের প্রতি) অনুরাগী করা প্রয়োজন তাদের জন্যে, (কোনো ব্যক্তিকে) গোলামীর (বন্ধন) থেকে আযাদ করার জন্যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের (ঋণমুক্তির) জন্যে, আল্লাহ তায়ালার পথে (সংগ্রামী) ও মোসাফেরদের জন্যে (এ সাদাকার অর্থ ব্যয় করা যাবে); এটা আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত ফরয; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন এবং তিনিই হচ্ছেন বিজ্ঞ, কুশলী। ৬১. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা আল্লাহর নবীকে কষ্ট দেয়; তারা বলে, এ ব্যক্তি কান (-কথায় বিশ্বাস করে, হে নবী), তুমি (তাদের) বলো, তার কান (তাই শোনে যা) তোমাদের জন্যে কল্যাণকর; সে আল্লাহ তায়ালাতে বিশ্বাস করে, মোমেনদের ওপর বিশ্বাস রাখে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে সে তাদের জন্যেও আল্লাহ তায়ালার রহমত; যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। ৬২. এরা তোমাদের খুশী করার জন্যে আল্লাহ তায়ালার নামে শপথ করে, অথচ এরা যদি

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿৬২﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ
مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ط ذٰلِكَ الْخِزْيُ
الْعَظِيْمُ ﴿৬৩﴾ يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ
قُلُوْبِهِمْ ط قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ج اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿৬৪﴾ وَلَئِنْ
سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ط قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ
كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿৬৫﴾ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ط اِنْ نَّعْفُ عَنْ
طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿৬৬﴾ ع اَلْمُنٰفِقُوْنَ
وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ

(সত্যিকার অর্থে) মোমেন হতো তাহলে (এরা বুঝতো), তাদের খুশী করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের অধিকার হচ্ছে (সবচাইতে) বেশী। ৬৩. এ (মূর্খ) লোকেরা কি একথা জানে না, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিদ্রোহ করে তবে তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে; আর তা (হবে তার জন্যে) চরম লাঞ্ছনা। ৬৪. (এ) মোনাফেকরা আশংকা করে, তোমাদের ওপর এমন কোনো সূরা নাযিল হয়ে পড়ে কিনা, যা তাদের মনের (ভেতরে লুকিয়ে থাকা) সব কিছু ফাস করে দেবে; (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, হাঁ (যদ্দূর পারো তোমরা) বিদ্রূপ করে নাও, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (এমন কিছু নাযিল করবেন, যাতে তিনি সে) সব কিছু ফাস করে দেবেন, যার তোমরা আশংকা করছো। ৬৫. তুমি যদি তাদের (কিছু) জিজ্ঞেস করো তারা বলবে, (না,) আমরা তো একটু অযথা কথাবার্তা ও হাসি কৌতুক করছিলাম মাত্র, তুমি (তাদের) বলো, তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রসূলকে বিদ্রূপ করছিলে? ৬৬. (হে কাফেররা,) তোমরা দোষ ছাড়ানোর চেষ্টা করো না, একবার ঈমান আনার পর তোমরাই পুনরায় কাফের হয়ে গিয়েছিলে; আমি যদি তোমাদের একদলকে (তাদের ঈমানের কারণে) ক্ষমা করে দিতে পারি, তাহলে আরেক দলকে (পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাবার জন্যে) ভয়াবহ শাস্তিও দিতে পারি, কারণ এ (শেষের দলের) লোকেরা ছিলো জঘন্য অপরাধী।

রুকু ৯

৬৭. মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী, এরা (স্বভাব-চরিত্রে) একে অপরের মতোই। তারা (উভয়েই মানুষদের) অসৎ কাজের আদেশ দেয় ও সৎকাজ থেকে বিরত রাখে এবং (আল্লাহ তায়ালার পথে খরচ করা থেকে) উভয়েই নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে; তারা (যেমনি এ দুনিয়ায়) আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গেছে, আল্লাহ তায়ালাও (তেমনি

وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾
وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ
حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ
فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَاقِهِمْ
وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ
وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن
كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ

আখেরাতে) তাদের ভুলে যাবেন; নিসন্দেহে মোনাফেকরা সবাই পাপিষ্ঠ। ৬৮. আল্লাহ তায়ালা (এ) মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী এবং কাফেরদের জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেখানে তারা চিরকাল (ধরে জ্বলতে) থাকবে; (জাহান্নামের) এ (আগুনই) হবে তাদের জন্যে যথেষ্ট, তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার গযব (নাযিল হোক), ওদের জন্যে রয়েছে এক চিরস্থায়ী আযাব। ৬৯. (তোমরা) ঠিক তাদেরই মতো, যারা তোমাদের আগে এখানে (প্রতিষ্ঠিত) ছিলো, তারা শক্তিতে ছিলো তোমাদের চাইতে প্রবল, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি তাদের তোমাদের চাইতে ছিলো বেশী; দুনিয়ার যে ভোগ-বিলাস তাদের ভাগে ছিলো তা তারা ভোগ করে গেছে, অতপর তোমাদের ভাগে যা আছে তোমরাও তা ভোগ করে (একদিন) চলে যাবে, যেমনি করে তোমাদের আগের লোকেরা তাদের যে পরিমাণ ভোগ করার ছিলো তা শেষ করে (চলে) গেছে, তারা যেমন অনর্থক কাজকর্মে ডুবে থাকতো, তোমরাও তেমনি অর্থহীন কথাবার্তায় ডুবে আছো; এরা হচ্ছে সেসব লোক, দুনিয়া-আখেরাতে যাদের কর্মফল বিনষ্ট হয়ে গেছে, আর (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ৭০. এদের কাছে কি আগের লোকদের খবর পৌঁছেনি? নূহের জাতির, আদ জাতির, সামূদ জাতির (কীর্তিকলাপ?) ইবরাহীম, মাদইয়ানবাসী (নবী) ও সে বিধ্বংস জনবসতির কথা (কি এদের কাছে কেউ বলেনি)? এ সব (কয়টি জাতির) মানুষের কাছে তাদের রসূলরা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট আয়াত নিয়ে এসেছিলো, (নবী না পাঠিয়ে কাউকে আযাব দেবেন, এমন) অবিচার তো আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর কখনো করতে পারেন না, বস্তুত তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে। ৭১. (অপরদিকে) মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীরা হচ্ছে একে

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ
أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ جَٰهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَٰفِقِينَ
وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا
قَالُوا ۚ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ
يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوٓا إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُوا
يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ فِي الدُّنْيَا

অপরের বন্ধু। এরা (মানুষদের) ন্যায় কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (জীবনের সব কাজে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের (বিধানের) অনুসরণ করে, এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ; যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অচিরেই দয়া করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, কুশলী। ৭২. (এ ধরনের) মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের আল্লাহ তায়ালা এমন এক সুরম্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার তলদেশ নিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে, (চিরস্থায়ী) জান্নাতে তাদের জন্যে সুন্দর সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকবে; (সেদিনের) সবচাইতে বড়ো (নেয়ামত) হবে (বান্দার প্রতি) আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি; এটাই হবে (সেদিনের) সবচেয়ে বড়ো সাফল্য।

রুকু ১০

৭৩. হে নবী, কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হও– ওদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করো, (কেননা) এদের (চূড়ান্ত) আবাসস্থল হবে জাহান্নাম; এটি বড়োই নিকৃষ্ট স্থান। ৭৪. এরা আল্লাহর নামে কসম করে বলে, (কুফরী শব্দ) এরা বলেনি; (আসলে) এরা কুফরী শব্দ বলেছে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের পরই তারা তা অস্বীকার করেছে, এরা এমন এক কাজের সংকল্প করেছিলো যা তারা করতে পারেনি, (এরপরও) তাদের প্রতিশোধ নেয়ার এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তাদের ধনশালী করে দিয়েছিলেন, এখনও যদি এ লোকেরা আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওবা করে, তাহলে এটা তাদের জন্যেই ভালো হবে, আর যদি তারা (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া-আখেরাত উভয়

وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٧٤﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ
اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ
اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ
قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا
يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ
الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾ اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ
وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۭ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۡ
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۭ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

স্থানেই তাদের কঠিন আযাব দেবেন এবং (উপরন্তু এ) যমীনে তাদের কোনো বন্ধু কিংবা সাহায্যকারী থাকবে না। ৭৫. ওদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলো, যদি আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে আমাদের সম্পদ দান করেন তাহলে আমরা অবশ্যই (তার একাংশ আল্লাহর পথে) দান করবো এবং অবশ্যই আমরা নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। ৭৬. অতপর যখন আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহ (-এর ভান্ডার) থেকে তাদের ধন-সম্পদ দান করলেন, তখন তারা (দানের বদলে) কার্পণ্য (করতে শুরু) করলো এবং (আল্লাহ তায়ালাকে দেয়া ওয়াদা থেকে) তারা (গোঁড়ামির সাথেই) ফিরে এলো। ৭৭. অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে মোনাফেকী বদ্ধমূল করে দিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাত করবে। এটা এ কারণে, এরা আল্লাহ তায়ালার কাছে যে ওয়াদা করেছিলো তা ভংগ করেছে এবং এরা মিথ্যা আচরণ করেছে। ৭৮. এ লোকেরা কি একথা জানতো না, তাদের সব গোপন কথা ও সব সলাপরামর্শ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানেন এবং অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা গায়ব সম্পর্কেও বিশেষভাবে অবহিত, ৭৯. (আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারেও সম্যক অবগত আছেন) যারা সেসব ঈমানদার ব্যক্তিদের দোষারোপ করে, যারা আন্তরিক নিষ্ঠা ও আগ্রহের সাথে আল্লাহ তায়ালার পথে দান করে (এবং যারা দান করার মতো) নিজেদের পরিশ্রম (-লব্ধ সামান্য কিছু সম্পদ) ছাড়া কিছুই পায় না, এসব মোমেনের সাথে মোনাফেকদের এ (দলের) লোকেরা হাসি-ঠাট্টা করে; এ (বিদ্রূপকারী)-দের স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও বিদ্রূপ করতে থাকেন, (পরকালে) তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব। ৮০. (হে নবী,) এমন লোকদের জন্যে তুমি (আল্লাহ তায়ালার কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো আর না করো (দুটোই সমান); তুমি যদি সত্তর বারও

سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ

رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ ط قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ط لَوْ كَانُوْا

يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ج جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ

تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا ط اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ

اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ

তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না; কেননা, এরা (জেনে-বুঝে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা কখনো না-ফরমান লোকদের হেদায়াত করেন না।

রুকু ১১

৮১. (যুদ্ধের বদলে) যাদের পেছনে ফেলে রাখা হলো, তারা (এভাবে) রসূলের (ইচ্ছার) বিরুদ্ধে নিজেদের ঘরে বসে থাকতে পেরে খুব খুশী হয়ে গেলো, (মূলত) তারা তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করাটা পছন্দ করলো না, (বরং) বললো, (এ ভীষণ) গরমে তোমরা বাইরে যেও না; (হে নবী,) তুমি তাদের বলো, জাহান্নামের আগুন তো এর চাইতেও বেশী গরম; (কতো ভাল হতো) লোকগুলো যদি (একথাটা) বুঝতে পারতো! ৮২. অতএব (এ দুনিয়ায়) তাদের কম হাসা উচিত, (অন্যথায় কেয়ামতের দিন) তাদের বেশী কাঁদতে হবে, তারা যা (গুনাহ এখানে) অর্জন করেছে তাই হবে তাদের (সেদিনের) যথার্থ বিনিময়। ৮৩. যদি আল্লাহ তায়ালা (এ অভিযানের পর) তোমাকে এদের কোনো একটি দলের কাছে ফেরত নিয়ে আসেন এবং তারা যদি তোমার কাছে (পুনরায় কোনো যুদ্ধে যাবার) অনুমতি চায়, (তাহলে) তুমি বলো (না-) কখনো তোমরা আমার সাথে (আর কোনো অভিযানে) বের হবে না, তোমরা আমার সাথী হয়ে আর কখনো শত্রুর সাথে লড়বে না; কেননা তোমরা আগের বার (যুদ্ধের বদলে) পেছনে বসে থাকা পছন্দ করেছিলে, (আজ যাও,) যারা পেছনে থেকে গেছে তাদের সাথে তোমরাও (পেছনে) বসে থাকো। ৮৪. ওদের মধ্যে কোনো লোকের মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার (জানাযার) নামায পড়ো না, কখনো তার কবরের পাশে তুমি দাঁড়িয়ো না; কেননা এ ব্যক্তিরা নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা

أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ
فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن
يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا
أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو
الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٨٦﴾ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ
الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾ لَٰكِنِ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ
الْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ

ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, এরা না-ফরমান অবস্থায় মরেছে। ৮৫. ওদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের কখনো বিমুগ্ধ করতে না পারে; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা এসব কিছু দিয়ে তাদের দুনিয়ার জীবনে (নানা ধরনের) শাস্তি দিতে চান এবং তাদের প্রাণ (বায়ু একদিন এমন এক অবস্থায়) বের হবে, যখন তারা (পুরোপুরিই) কাফের থাকবে। ৮৬. যখনি এমন ধরনের কোনো সূরা নাযিল হয়, (যাতে বলা হয়) তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনো এবং তাঁর রসূলের সাথে মিলে (কাফেরদের বিরুদ্ধে) জেহাদ করো, তখনি তাদের বিত্তশালী ব্যক্তিরা তোমার কাছে এসে (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্যে) অব্যাহতি চায় এবং তারা বলে (হে নবী), আমাদের ছেড়ে দাও, যারা ঘরে বসে আছে আমরাও তাদের সাথে থাকি। ৮৭. তারা (মূলত) ঘরে বসে থাকা লোকদের সাথে অবস্থান করাই পছন্দ করে নিয়েছে, তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা কিছুই বুঝতে পারে না। ৮৮. কিন্তু (আল্লাহর) রসূল এবং যারা তাঁর সাথে আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে, তারা (সবাই) নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে; (অতএব) এদের জন্যেই যাবতীয় কল্যাণ (নির্দিষ্ট হয়ে) আছে, আর (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে সফলকাম। ৮৯. (এর বিনিময়ে) আল্লাহ তায়ালা এদের জন্যে এমন এক (সুরম্য) জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; (বস্তুত) এ হচ্ছে সর্বোত্তম সাফল্য।

রুকু ১২

৯০. ওযরকামী কিছু সংখ্যক আরব বেদুঈনও (তোমার কাছে) এসে হাযির হয়েছে, যেন

مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ سَيُصِيبُ

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى

الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ

وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩١﴾ وَلَا عَلَى

الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا

وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿٩٢﴾

তাদেরও এ যুদ্ধে যাওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়, এভাবে সে লোকগুলোও ঘরে বসে থাকলো যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো; এদের মধ্যে যারা (আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে) অস্বীকার করে (ঘরে বসে থেকেছে), অচিরেই তারা মর্মান্তিক আযাবে নিমজ্জিত হবে। ৯১. যারা দুর্বল (এ যুদ্ধে শরীক না হওয়ার জন্যে), তাদের ওপর কোনো দোষ নেই, (দোষ নেই তাদেরও) যারা অসুস্থ কিংবা যারা (যুদ্ধে) খরচ করার মতো কোনো সম্বল পায়নি, (অবশ্য) এরা যদি আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দা হয় (তাহলেই তারা এ অব্যাহতির আওতায় পড়বে), সৎকর্মশীল মানুষদের বিরুদ্ধেও কোনো অভিযোগের কারণ নেই; আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, ৯২. (তাদের ব্যাপারেও কোনো অভিযোগ নেই) যারা (যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে) তোমার কাছে (যাত্রার) বাহন সরবরাহ করার জন্যে এসেছিলো এবং তুমি (তাদের) বলেছিলে, তোমাদের জন্যে আমি এমন কিছু পাচ্ছি না, যার ওপর আমি তোমাদের আরোহণ করাতে পারি, (অতপর) তারা ফিরে গেলো, তারা (এমনভাবে) ফিরলো যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু বয়ে যাচ্ছিলো, (যুদ্ধে যাবার) খরচ যোগাড় করতে না পারায় তারা (ভীষণভাবে) দুঃখিত হলো।

তাফসীর
আয়াত ৪২-৯২

'যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং সফলও হতো সহজ ও সংক্ষিপ্ত, তাহলে অবশ্যই ওরা তোমার অনুসরণ করতো, বরং তাদের কাছে দুর্গম পথের দূরত্ব খুব বেশী কঠিন মনে হলো .... ওরা তোমাদের সাথে যুদ্ধাভিযানে যদি বেরিয়ে পড়তো, তাহলে তারা অবশ্যই তোমাদের মধ্যে গন্ডগোল ছড়ানো ছাড়া আর কিছুই করতো না। আর বিশৃংখলা সৃষ্টি করার জন্যে অবশ্যই তারা ছুটাছুটি করতো। ..... আর দুঃখের চোটে তাদের চোখগুলো দরবিগলিত ধারা বর্ষণ করছিলো, কারণ তারা খরচ করার মতো কোনো অর্থ সংগ্রহ করতে পারেনি। (৪২-৯২ আয়াত)

যুদ্ধের ডাক ও মোনাফেকদের মুখোশ

এখান থেকে শুরু হচ্ছে সেই সব দলের বিবরণ, যারা ইসলামী দলের মধ্যে ছিলো বটে। কিন্তু তাদের পার্থিব নানা প্রকার স্বার্থের কারণে তাদের মধ্যে দুর্বলতা এসে গিয়েছিলো, বিশেষ করে

সেই মোনাফেকদের সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা এসেছে, যারা বিজয় ও সাফল্য লাভের পরে ইসলামের নামে মুসলমানদের মধ্যে মিলে মিশে থেকে মুসলমানদের দলের মধ্যে নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের বিষ ছড়াচ্ছিলো। এসকল মোনাফেক প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দুশমনী করতে পারতো না। কারণ তারা দেখছিলো একই সাথে পার্থিব সুযোগ সুবিধা ও শান্তি পেতে হলে মুসলমানদের সাথে না থেকে কোনো গত্যন্তর নেই। কিন্তু মুসলমানদের সাফল্য সহ্য করাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না, এজন্যে মুসলমানদের ভেতর ও বাইর দু'দিক থেকেই তারা মুসলমানদের মধ্যে ভাংগন ধরানোর জন্যে রাত দিন ষড়যন্ত্র করে চলেছিলো।

শীঘ্রই আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে সেই চিত্রটি দেখতে পাবো, যার সম্পর্কে সূরার ভূমিকায় আমরা আলোচনা করেছি এবং আমরা মনে করি ইনশাআল্লাহ আলোচিত ভূমিকার আলোকে বিষয়টি বিশদভাবে বুঝতে পারব। আল্লাহর এরশাদের দিকে আবার দৃষ্টিপাত করুন,

'যদি লাভজনক বস্তু খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে মনে হতো এবং সফরটাও সহজ হতো, তাহলে অবশ্যই ওরা তোমার অনুসরণ করতো। .... ওরা তো ইতিপূর্বে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলোই এবং বহু বিষয়কে পরিবর্তন করে তারা তোমার জন্যে এক জটিল অবস্থা সৃষ্টি করে ফেলেছিলো। অবশেষে সত্য সমাগত হলো এবং আল্লাহর হুকুম বিজয়ী হলো– যদিও ওই মোনাফেকরা কিছুতেই এটা পছন্দ করতে পারেনি।'

অর্থাৎ যদি পার্থিব স্বার্থের বিষয়প্রাপ্তি শীঘ্র এবং সহজ বলে মনে হতো, আর সফরের দূরত্ব কম এবং শুভ পরিণতি লাভ নিরাপদ মনে হতো, তাহলে অবশ্যই ওরা তোমার অনুসরণ করতো। কিন্তু পথের দূরত্ব বেশী এবং সফর খুবই কঠিন ও কষ্টকর মনে হচ্ছিলো ওদের কাছে, যা তাদের দারুণ দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলো এবং ওদের মনোবলকে পুরোপুরিভাবে ভেংগে দিয়েছিলো, বিপদজনক এ সফর ও তার জন্যে যোগাড়যন্ত্র তাদের আত্মাকে দুর্বল করে ফেলেছিলো, তাদের অন্তর চুপসে গিয়েছিলো এবং দিগন্তব্যাপী মরুভূমি পার হয়ে এতো বড় বিশাল শত্রু সৈন্যের মুখোমুখি হওয়ার চিন্তা তাদের সাহসকে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিলো। তখনকার ওই ভীষণ অবস্থার চিত্রটি তুলে ধরে চিরস্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তারকারী এ আয়াতের অংশটি বারবার পাঠকের মনে আঘাত করছে এবং ওই অবস্থাটিকে স্মরণ করে দিয়েছে।

'যদি লাভজনক অবস্থা শীঘ্র আসবে বলে মনে হতো এবং সফর এর দূরত্ব কম ও সহজ মনে হতো, তাহলে অবশ্যই ওরা তোমার অনুসরণ করতো। কিন্তু পথের দূরত্বের চিন্তা তাদের কাছে বড়ই কঠিন মনে হচ্ছিলো।'

এর ফলে, যারা রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলো, তাদের মধ্যে অনেকেই এত দূরের সফরে যাওয়াটাকে মনে মনে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলো না। অনেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো এবং মূল কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পেছনে পড়েছিলো। তাদের মনে হীন চিন্তা জন্ম নিচ্ছিলো এবং সস্তা কোনো উদ্দেশ্য লাভের জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলো। সকল যামানায় এবং সকল দেশে দেখা গেছে এ ধরনের লোকের সংখ্যাই বেশী। তবে সংখ্যায় কম হলেও কিছু মোখলেস লোকও বরাবরই থাকে। এদের দৃষ্টান্তও বারবার আসে। এরা অবশ্যই জীবনের স্পন্দন ও মানব জীবনকে সৌন্দর্য দানকারী হিসাবে সর্বকালেই প্রতিভাত হয়– যদিও তাদের সম্পর্কে চিন্তা করা হয় যে, তারা দুনিয়ার প্রয়োজনীয় অনেক কিছু পেয়েছে এবং তাদের অনেক উদ্দেশ্যও তো হাসিল হয়েছে। আর তারা মূল্যবান বিনিময় দেয়া থেকে বিরত থেকেছে। অল্প মূল্য দিয়ে তো সস্তা ও রদ্দি পণ্য কেনা যায়। এরশাদ হচ্ছে,

'আর শীঘ্রই ওরা আল্লাহর কসম খেয়ে খেয়ে বলবে, 'পারলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম।'

এ হচ্ছে এক মিথ্যা দাবী, যার সাথে সর্বদাই দুর্বলতার মিশাল থাকে। আর অবশ্যই এটা সত্য কথা যে, দুর্বলরাই মিথ্যা বলে। হাঁ, যে কোনো দুর্বল মানুষ মিথ্যা বলে থাকে– যদিও কোনো কোনো অত্যাচারী শক্তিশালী ব্যক্তি থেকেও অনেক সময় মিথ্যা শুরু হয়। এমতাবস্থায় প্রকৃত শক্তিশালী ব্যক্তিরা মিথ্যার মোকাবেলা করে আর দুর্বল ব্যক্তি ঘুরপাক খেতে থাকে। কোনো স্থানে বা কোনো যামানাতেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

'(এসব কথা বলে) তারা আসলে নিজেদেরই ধ্বংস করে।'

এ কসম খেয়ে এবং এভাবে মিথ্যা বলে মিথ্যাবাদী ব্যক্তি মনে করে যে, সে মানুষের কাছে মিথ্যাকেই নাজাতের উপায় হিসাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালাই তো জানেন সত্য পথ কোনটি এবং তিনি মানুষের কাছে সে সত্য পথটি উন্মুক্ত করে দেন। এর ফলে দুনিয়াতে মিথ্যাবাদী তার মিথ্যার কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। আর কেয়ামতের দিন মিথ্যাবাদীরা ধ্বংস হবেই, যে দিন অকৃতজ্ঞ নেমকহারামদের জন্যে কোনো স্থান থাকবে না।

'আর আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, অবশ্যই ওরা মিথ্যাবাদী।'

'আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মাফ করে দিলো যারা সত্য বলেছে বলে দাবী করেছে তাদের সত্যতা তোমার কাছে সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং মিথ্যাবাদীদেরকে জেনে না নেয়া পর্যন্ত কেন তুমি তাদেরকে পেছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দিলে?

অবশ্যই রসূলের প্রতি আল্লাহর বিশেষ মহব্বতের দৃষ্টি রয়েছে। যার কারণে তিনি তাঁকে কোনো তিরস্কার করার পূর্বেই জলদি করে মাফ করে দিলেন। এর ফলেই হয়তো পশ্চাদপসরণকারীরা অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার জন্যে অনুমতি চেয়ে ছুটির আব্দার করে বসলো। এর কারণেই সত্য মিথ্যা যাচাই হওয়ার আগেই তারা ঘরে বসে থাকার অনুমতি পেয়ে গেলো। তাদের অবস্থা তো এ ছিলো যে, অনুমতি না পেলেও তারা রওয়ানা না হয়ে পেছনে পড়ে থাকতো, আর তখনই তাদের প্রকৃত অবস্থা ধরা পড়ে যেতো এবং তাদের নেফাকের পোশাক খুলে যেতো, তাদের প্রকৃতি মানুষের সামনে খুলে যেতো ও তাদের মনের খলতা প্রকাশিত হয়ে পড়তো। আর রসূলুল্লাহ (স.)-এর অনুমতির আড়ালে থেকে তারা নিজেদের কিছুতেই লুকোতে পারতো না।

পূর্বাহ্নে এ অনুমতি না দেয়া হলে আল কোরআন তাদের মুখোশ অবশ্যই উন্মোচন করে দিতো, আর মোনাফেক ও মোমেনদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের কিছু মূলনীতিও স্থির করে দিতো। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যারা আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান রাখে অবশ্যই তারা পেছনে থেকে যেতে চায় না এবং মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করা থেকে দূরে থাকার অনুমতি চায় না। .... ওরা তো তাদের সন্দেহের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে।'

এ হচ্ছে সেই সব মূলনীতি, যার মধ্যে কোনো ভুল নেই। সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং হিসাব দিবসকে বিশ্বাস করে, তাদেরকে জেহাদের ফরয আদায় করা থেকে পেছনে থাকার জন্যে রেহাই দেয়া হোক এ অনুমতি চায় না এবং যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা হওয়ার ডাকে সাড়া দেয়া এবং মাল এবং জান প্রাণ দ্বারা যুদ্ধ করার নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থেকে ঘরে বসে থাকতে চায় না। বরং, তারা তো আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে তা পালন করার মানসে হালকা বা ভারী সর্বাবস্থায় রওয়ানা হওয়ার জন্যে প্রতিযোগিতা করে।

তাদের মনের মধ্যে মহা দয়াময় আল্লাহর সাথে মিলনের যে প্রবল আকাংখা রয়েছে তা পূরণের জন্যে তারা পাগলপারা হয়ে ছুটে যায়। তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, এর প্রতিদান

আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদেরকে দেবেন এবং অবশ্যই তাঁর রেযামন্দি তারা হাসিল করবে। তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহর হুকুম পালন করে। সুতরাং তারা কারো উৎসাহ দানের ধার ধারে না, পেছনে থাকার অনুমতি চাওয়া তো দূরের কথা। পেছনে থাকার অনুমতি তো তারাই চায়, যাদের অন্তর ঈমান ও স্থির বিশ্বাস থেকে খালি হয়ে গেছে। ওরাই পেছনে পড়ে থাকে ও নানা প্রকার ওযর তালাশ করে। ওরা চায় যেন তাদের ও কষ্টের সফরে রওয়ানা হওয়ার মাঝে কোনো বাধা বিপত্তি সৃষ্টি হয়ে যাক। ওরা চায়, যে আকীদার কথা তারা প্রকাশ করে তার বাস্তব প্রয়োগ যেন তাদেরকে করতে না হয়। আসলে তাদের মনের বিশ্বাসের দৃঢ়তা নেই, তারা সন্দেহ ও দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে মজ্জমান রয়েছে।

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে পৌছানোর পথ পরিষ্কার, সুদৃঢ় এবং সরল সোজা। এ পথে চলতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত এবং পিছপা হয় একমাত্র সেই ব্যক্তি, যে এ পথ চেনে না, অথবা স্পষ্টভাবে চিনলেও পথের কষ্টের কথা মনে করে এপথে চলতে চায় না!

যারা পেছনে থেকে গিয়েছিলো তারা অক্ষম ছিলো তা নয়, বরং বেরোনোর শক্তি ক্ষমতা তাদের অবশ্যই ছিলো, সাজসরঞ্জামও তাদের কাছে যথেষ্ট ছিলো এবং অস্ত্রেরও কমতি ছিলো না তাদের কাছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তারা বের হতে চাইলে অবশ্যই তারা তার জন্যে প্রস্তুতি নিতো।'

এ অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে আবি সুলুল ছিলো এবং জাদ্দ ইবনে কায়েসও ছিলো। এরা ছিলো তাদের গোত্রের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, যাদের প্রভাব ছিলো সবার ওপর।

'কিন্তু তাদের রওয়ানা হওয়াটা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেননি।'

তিনি তাদের স্বভাব ও নেফাক সম্পর্কে জানতেন, জানতেন মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্যে তাদের সদা সর্বদা উদগ্রীব থাকা সম্পর্কে। এজন্যেই তিনি চাননি তারা মোখলেস মুসলমানদের দলে গিয়ে তাদের মধ্যে গন্ডগোল বাধানোর সুযোগ পাক।

'এজন্যেই তিনি তাদেরকে থামিয়ে রাখলেন।'

এবং তাদের মধ্যে বেরোনোর সাহস দান করলেন না। এরশাদ হচ্ছে,

'আর বলা হলো, বসে থাকো তাদের সাথে যারা বসা অবস্থায় রয়েছে।' আর তারা ওইসব নারী, শিশু ও অক্ষম লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পেছনে পড়ে রইলো, যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম নয় এবং যারা জেহাদে যোগ দিতে পারে না। তাদের প্রকারান্তরে বলা হলো, এটিই হচ্ছে তোমাদের জন্যে উপযুক্ত স্থান। অদৃশ্য এক শক্তি তাদেরকে যেন ডেকে ডেকে বলতে লাগলো, হে কপট কদাচার ব্যক্তিবর্গ, হে মোনাফেক কাপুরুষের দল, হে সন্দেহবাদী হীনমন্য বিশ্বাসহীন ব্যক্তিরা, এ দুর্বল ও অক্ষম নারী, বৃদ্ধ ও শিশুর দলে পড়ে থাকাটাই তোমাদের জন্যে উপযুক্ত মর্যাদা। পেছনে থেকে যাওয়ার পর প্রতি মুহূর্তে তাদের আত্মশ্লাঘা তাদেরকে কুরে কুঁরে খাচ্ছিলো।

মুসলিম সমাজে মোনাফেকদের ফেৎনা ও বিভেদ সৃষ্টি

আর তাদের এ পেছনে থেকে যাওয়াটাই ছিলো দ্বীনের দাওয়াত দানের জন্যে ও সার্বিকভাবে মোখলেস মুসলমানদের জন্যে কল্যাণকর। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা তোমাদের সাথে যদি বের হতো এবং তোমাদের মধ্যে থাকার সুযোগ পেতো, তাহলে অবশ্যই তোমাদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ও ঝগড়া ফাসাদ বাধিয়ে দিতো। আর তোমাদের মধ্যেও তাদের কথায় কান দেয়ার মতো একটা গ্রুপ অবশ্যই সর্বদা আছে, আর অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলামীন যালেমদেরকে জানেন।'

আর যাদের অন্তর দিশেহারা তারাই গুজব রটায়, চেঁচামেচি করে, সৈন্যদের সারির মধ্যে দুর্বলতা ছড়ায়। আর এ ধরনের খেয়ানতকারী ব্যক্তিরাই প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীর জন্যে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই ওই মোনাফেকরা যদি মুসলিম বাহিনীর সাথে বেরিয়ে পড়তো, তাহলে তাদের শক্তি বৃদ্ধি না করে বরং পেরেশানী ও বিশৃংখলাই সৃষ্টি করত এবং তাদের মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটাতো, বিভেদ সৃষ্টি করতো এবং তাদের মধ্যে হীনমন্যতা পয়দা করার চেষ্টা করত। আর সত্যিকারে বলতে কি, মুসলমানদের মধ্যেও এমন কিছু লোক আছে, যারা ওদের কথায় কান না দিয়ে পারে না। কিন্তু আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর দ্বীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবেনই করবেন এবং মোখলেস মুসলমানদেরকে মর্যাদার আসনে অবশ্যই বসাবেন। যতো পরীক্ষাই আসুক না কেন, সত্যিকারের মোমেনদেরকে তিনি অবশ্যই পাস করাবেন এবং তাদেরকে পাস করানোর জন্যে তিনিই যথেষ্ট। এ জন্যেই তিনি নিজের পক্ষ থেকেই ওই হীনমন্য মোনাফেকদেরকে তাদের নিজ নিজ গৃহে বসা অবস্থায় পরিত্যাগ করলেন। তাই বলা হয়েছে,

'আর (অবশ্যই) আল্লাহ তায়ালা যালেমদেরকে জানেন।'

এখানে যালেমদের অর্থে মোশরেকদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর অবশ্যই ওইসব মোনাফেককে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে!

তাদের অতীত (জীবন) অবশ্যই তাদের শেরেকবাদীদের অন্তর্ভুক্ত থাকার সাক্ষ্য বহন করে। তাদের মোশরেকদের সাথে সহযোগিতা করা ও মিলেমিশে থাকার কারণে ওদেরই দলভুক্ত বলে তারা আল্লাহর কাছে পরিচিত হয়েছে এবং মোমেনদের কাছেও তাদের এ পরিচয়ই ফুটে উঠেছে। তারা রসূল (স.)-এর সামনে অবস্থান করেছে, তাদের সাধ্যমত তারা খরচও করেছে বটে, কিন্তু তাদের স্বার্থও তারা পুরোপুরি আদায় করে নিয়েছে এবং এভাবে তারা নিজেদেরকে মুসলমানদের সাথে থেকে আত্মসমপর্পণকারী বলে পরিচিতও করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে দোষ আগে যেমন ছিলো তেমনই রয়েছে। তাই তাদের মুখোশ খুলে দেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন,

'ইতিপূর্বে তারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছিলো, আর তোমার সামনে বিভিন্ন বিষয়কে জটিল বানিয়ে দেয়ারও চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্য সমাগত হলো এবং আল্লাহর হুকুম (কাজ) বিজয়ী হয়ে গেলো, যদিও তারা এটা পছন্দ করতে পারেনি।'

ওপরের ঐশী বাণীতে রসূল (স.)-এর মদীনায় পদার্পণের পূর্বে মোনাফেকরা যে ভূমিকা নিয়েছিলো তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তখন পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাঁর দুশমনদের ওপর বিজয়ী করেননি। এরপর অবশ্য সময়ের মধ্যে পরিবর্তন এলো, সত্য সমাগত হলো এবং বিজয়ী হলো আল্লাহর কথা। অতপর অনিচ্ছা সত্তেও তাদের মাথা নত হয়ে গেলো। কিন্তু হলে কি হবে, ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর আপদ বিপদ নেমে আসুক সদা সর্বদা এ প্রতীক্ষায়ই তারা দিন গুনতে থাকলো।

যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি চাওয়া

এরপর এ প্রসংগে তাদের মিথ্যা ওজুহাত পেশ করার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে। তারপর জানানো হচ্ছে রসূল (স.) ও মুসলমানদের ক্ষতিসাধন করার জন্যে তাদের বুকের মধ্যে নিশিদিন যে সব জল্পনা-কল্পনা চলছে, তার ইতিবৃত্ত সম্পর্কে। এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যে বলে, আমাকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত থাকার অনুমতি দিন, আর আমাকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলবেন না...... আমরা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি, হয়

আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি তোমাদের ওপর আযাব এসে পড়বে অথবা আমাদের হাত দিয়ে তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।' (৪৯-৫২ আয়াত)

এ হাদীসটি মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক যুহরী থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন। সবাই বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) একদিন বনি সালামা গোত্রের জাদ্দ ইবনে কায়েস নামক এক ব্যক্তিকে বললেন, (তখন তিনি তবুক যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন), ওহে জাদ্দ, তামাটে রং-এর (রোমান) জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে তোমার মত কি? সে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ, বরং আমাকে অনুমতি (ওই যুদ্ধে যাওয়া থেকে অব্যাহতি) দিন। আর আমাকে এ কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলবেন না! আমার জাতি জানে, মহিলাদের ব্যাপারে আমার থেকে দুর্বল আর কেউ নেই। আমার ভয় হয় ওই রোমান সুন্দরীদের দেখলে হয়তো আমি নিজেকে সামলাতে পারবো না। তখন রসূলুল্লাহ (স.) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'ঠিক আছে, আমি তোমাকে অনুমতি দিয়ে দিলাম।' এরপর এ জাদ্দ ইবনে কায়েস সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হলো।

মোনাফেকরাও অনুরূপ নানা প্রকার ওযর অজুহাত পেশ করতে লাগলো এবং তাদের জওয়াবেই অবতীর্ণ হলো, 'শোনো, ফেতনাতেই ওরা পড়ে গেছে, আর অবশ্যই জাহান্নাম কাফেরদেরকে ঘিরে রেখেছে।'

এ আয়াতের ব্যাখ্যাতে একটি দৃশ্য ফুটে উঠছে, যেন ওই কাফেররা হাবিয়া দোযখে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তাদের চতুর্দিক থেকে জাহান্নাম তাদেরকে ঘিরে রেখেছে। তারা ওখান থেকে বেরোনোর বিভিন্ন পথ দেখবে ঠিকই, কিন্তু বেরোতে পারবে না। এর দ্বারা ইংগিত পাওয়া যায়, তারা নিরন্তর গোনাহের কাজের মধ্যে জড়িত রয়েছে। ওই সব অপরাধ থেকে কিছুতেই দূরে সরে আসতে তারা প্রস্তুত নয়, প্রকারান্তরে তারা ধ্বংসাত্মক শাস্তির জন্যে অপেক্ষমাণ রয়েছে। হাঁ, মিথ্যা কথা বলে জেহাদ থেকে পিছিয়ে থাকার কারণেই তাদের এ চূড়ান্ত অধপতন এবং মিথ্যা ওজুহাত দেখানোর জন্যে তাদের জন্যে অবধারিত হয়ে রয়েছে এ চরম শাস্তি। যদিও নিজেদেরকে তারা ইসলামের গন্ডির লোক মনে করে, কিন্তু আসলে তারা হচ্ছে চরম মোনাফেক তাদের এসব আচরণে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তারা রসূল (স.) ও মুসলমানদের কোনো কল্যাণই চায় না। রসূল (স.) ও মুসলমানদের কোনো কল্যাণ স্পর্শ করলে ওদের মুখ কালো হয়ে যায়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাকে কোনো কল্যাণ স্পর্শ করলে ওদের খারাপ লাগে (এবং ওদের মুখ কালো হয়ে যায়)।' মুসলমানদের ওপর কোনো বিপদ-আপদ নেমে আসলে অথবা তাদের কোনো কষ্ট হলে ওরা বড়ই খুশী হয়ে উঠে। তাই বলা হচ্ছে,

'তোমাকে কোনো বিপদ স্পর্শ করলে ওরা বলে ওঠে আমরা আমাদের কাজ পূর্বেই গুছিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ, আমরা আগেই ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়েছিলাম এবং এজন্যেই ঠিক করে নিয়েছিলাম, মুসলমানদের সাথে যোগ দিয়ে আমরা ওই বিপদের মধ্যে কিছুতেই পড়বো না। আর এ কারণেই যুদ্ধ যাত্রা ও যুদ্ধ করা থেকে আমরা পিছিয়ে ছিলাম। জানানো হচ্ছে,

'আর ওরা মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে এমন অবস্থায় যে এতেই তারা মহা খুশী।' অর্থাৎ, খুশী এ জন্যে যে ওরা বিপদ থেকে বেঁচে গেছে আর মুসলমানদের ওপর যে বালা মুসীবত আসবে তার থেকেও ওরা নিরাপদ হয়ে গেলো।

হাঁ, প্রকাশ্য যে অবস্থাটা তারা দেখতে পাচ্ছিলো তার ওপর ভিত্তি করেই তারা খুশীতে বগল বাজাচ্ছিলো এবং যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা হওয়ার এ কাজটাকে তারা সর্বাবস্থায়ই অকল্যাণকর মনে

করছিলো। তারা অবশ্যই মনে করছিলো, পেছনে থেকে যাওয়া ও ঘরে বসে থাকার কাজটা করে অবশ্যই তারা নিজেদের জন্যে কল্যাণকর কাজ করেছে। কিন্তু এটা তারা ভেবে দেখেনি যে তাদের অন্তর আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা থেকে দূরে থেকেছে (পূর্ব নির্ধারিত) ভাগ্যমনে নেয়নি। তকদীরে যা লেখা আছে তার ওপর ওরা খুশী থাকেনি। যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার মধ্যেই যে কল্যাণ রয়েছে এটা তারা মেনে নেয়নি। অথচ নিষ্ঠাবান মুসলমান তো হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে তার প্রচেষ্টাকে চূড়ান্তভাবে সত্যের পথে কাজে লাগায় এবং এগিয়ে যায় সত্য সংগ্রামের পথে কোনো কিছুকে সে ভয় করে না। সে বিজ্ঞান করে, কল্যাণ অকল্যাণ যাই আসুক না কেন, আল্লাহর ইচ্ছাতেই তা পূর্ব থেকে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, আর অবশ্যই আল্লাহ তার সাহায্যকারী ও সর্বাবস্থায় তিনি তার সাথে আছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে যা লিখে রেখে দিয়েছেন তাই ছাড়া, আমাদেরকে কিছুতেই অন্য কিছু স্পর্শ করবে না এবং আল্লাহর ওপরই মোমেনদের তাওয়াক্কুল করা দরকার।'

অর্থাৎ, মোমেনদেরকে সাহায্য করার কথা অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা লিখে রেখে দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তিনি সাহায্য করে যাবেন এটাও তিনি তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন। তাহলে কিভাবে তাদের সংকট সমস্যায় পেয়ে বসবে? কিভাবে আসবে তাদের ওপর বালা মুসীবত? যা কিছু সংকট-সমস্যা আসছে– তা তো আল্লাহর ওয়াদা করা সাহায্য লাভের প্রস্তুতি ও পূর্ব সূচনা মাত্র, যা অবশ্যই মোমেনরা লাভ করবে। হাঁ, কিছু পরীক্ষা শেষেই তারা তা পাবে। সে পথেই সে সাহায্য তারা পাবে, যা আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের জন্যে তাঁর পদ্ধতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট করে রেখে দিয়েছেন। এ সাহায্য হবে অতি শক্তিশালী, কোনো নাযুক বা ভংগুর সাহায্য এটা নয়। এ সাহায্যের সাথে থাকবে সেই মহা সম্মান যার অধিকারী হবে সেই সব ব্যক্তি, যে কোনো বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আল্লাহর পথে ঝাঁপিয়ে পড়তে সদা সর্বদা প্রস্তুত। এ পথের যে কোনো সংকট-সমস্যায় এবং এপথে যে কোনো কোরবানী দিতে গিয়ে সে হবে অবিচলভাবে অগ্রণী। আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালাই সাহায্যদাতা এবং তিনি সমর্থন দানকারী। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর আল্লাহর ওপরই মোমেনদের ভরসা করা দরকার।'

আর আল্লাহর নির্ধারিত তকদীরে বিশ্বাস থাকা তাঁর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল ও শক্তি সামর্থ অনুযায়ী চেষ্টা করার পরিপন্থী নয়। এব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন, (আর ওদের জন্যে সাধ্যানুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করো, শক্তি দ্বারা..... আনফাল আয়াত ৬০) আর যে আল্লাহর হুকুম চালু করে না, যে (আল্লাহর দেয়া) উপায় উপকরণ ব্যবহার করে না, যে আল্লাহর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কাউকে ভালোবাসে না এবং মানুষের আশা আকাংখা বা চিন্তাধারার পরওয়া করে না, তার আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের দাবী সঠিক নয় এবং কারও এধরনের ভরসা করাকে সে সঠিকভাবে ভরসা করেছে বলে মনে করা যায় না!

যে প্রকৃত অর্থে মোমেন, তার সকল কাজই ভালো, সে আল্লাহর সাহায্য পাক (এবং বিজয়ী হোক) বা শাহাদাত লাভ করুক। আর কাফেরের সকল কাজই মন্দ, তা সে সরাসরি আল্লাহর আযাবে পতিত হোক অথবা মোমেনদের হাত দিয়ে শাস্তি পাক। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, তোমরা কি আমাদের জন্যে দুটি সুন্দর জিনিসের যে কোনো একটি আসুক বলে অপেক্ষা করছো? অথচ আমরা তোমাদের জন্যে, আল্লাহর নিজের কাছ থেকে নেমে আসা সরাসরি আযাব, অথবা মোমেনদের হাত দিয়ে পাওয়া শাস্তির অপেক্ষা করছি।'

এখন দেখা যাক মোনাফেকরা মোমেনদের জন্যে কিসের অপেক্ষা করছে। যে জিনিসের অপেক্ষাই তারা করুক না কেন, তার প্রত্যেকটিই সর্বাবস্থায় ভালো ও কল্যাণকর। যদি বিজয় আসে, যার ফলে আল্লাহর কথা সমুন্নত হবে, তাহলে তো সে বিজয় নিজেই হবে দুনিয়াতে তাদের

জন্যে পুরস্কার, আর যদি আল্লাহর পথে শাহাদাত আসে। তাহলেও তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদার আসনে সমাসীন হবে। আর মোমেনরা মোনাফেকদের জন্যে কিসের অপেক্ষা করছে? একটি তো হচ্ছে আল্লাহর আযাব, যা তেমনি করে তাদের পাকড়াও করবে যেমন করে তাদের পূর্ববর্তী মিথ্যাবাদী ও সত্যকে অস্বীকারকারীদের পাকড়াও করেছে। অথবা মোমেনদের হাতে তাদের ধরা পড়া যেমন করে মোশরেকদের ইতিপূর্বে ধরা পড়তে হয়েছে...... (সুতরাং অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি)। আর ওদের পরিণতি তো জানাই আছে .... আর (শুভ) পরিণতি তো মোমেনদের জন্যেই (রয়েছে অপেক্ষমাণ)।

মোনাফেকদের চরিত্র পর্যালোচনা

ওযর ওজুহাত পেশ করে যারা যুদ্ধাভিযানে যোগ না দিয়ে পেছনে থেকে গিয়েছিলো এবং মোমেনদের ওপর বিপদ আসার অপেক্ষায় ছিলো, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলো যাদের সম্পদ তাদের জন্যে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এ কারণেই এহেন ব্যক্তি জেহাদে যাওয়ার ব্যাপারে ওযর পেশ করছিলো। সর্বকালে ও সর্বদেশে এধরনের কিছু অর্থগৃধনু মানুষ থাকে, যারা সেই মোনাফেকদের মতো মাঝখানে এসে লাঠি ধরতে চায়। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা তাদের যুদ্ধে যোগদান করার এ মিথ্যা পাঁয়তারাকে প্রতিহত করেছেন এবং রসূলকে হুকুম দিয়েছেন, তিনি যেন তাদের দান একেবারেই গ্রহণ না করেন। কারণ এ দান হচ্ছে লোক দেখানোর জন্যে এবং ভয়ের কারণে– ঈমান ও দ্বীন ইসলামের জন্যে নিষ্ঠাপূর্ণ এ দান নয়। তারা মুসলমানদের ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে খুশী হয়ে দান করুক, অথবা তাদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার ভয়ে বাধ্য হয়ে খরচ করুক– উভয় অবস্থাতেই তাদের এ দান অগ্রহণযোগ্য। এর কোনো প্রতিদান নেই এবং আল্লাহর হিসাবেও এদান গৃহীত হবে না। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো (হে রসূল) খুশী খুশীতে অথবা ভয়ে পড়ে তোমরা দান করো, তোমাদের এ দান কিছুতেই কবুল করা হবে না (কারণ) তোমরা হচ্ছ মহা অপরাধী জাতি ...... এরা নামাযে এলেও ঢিলেমি করতে করতে আসে, আর খরচ করলেও বাধ্য হয়ে খরচ করে।'

এটিই হচ্ছে সর্বকালে মোনাফেকদের রূপ কখনও ভয়ে পড়ে আর কখনো অন্য বিভিন্ন বিবেচনা........... তারা নামাযে আসে। মন থাকে অনিচ্ছায় ভরা, বিবেক থাকে অকেজো, সকল কাজই থাকে প্রাণহীন এবং শুধু লোক দেখানোই মাত্র, এমন কিছু তারা প্রকাশ করে যা তাদের অন্তরের মধ্যে নেই। এ বিষয়ে দেখুন আল কোরআন কি ব্যাখ্যা দিচ্ছে,

'তারা নামাযে আসে না, যদিও বা আসে, তো অলসতার সাথে আসে।'

তারা নামাযে যোগ দিতে যদি আসে তো আন্তরিকতার সাথে আসে না, আসে মাত্র মানুষকে দেখানোর জন্যেই। আসলে আল্লাহর কাছে তার কোনো মূল্য নেই। তারা নামাযকে নিজেদের মধ্যে চালু করার ব্যবস্থা করে না, নিজেরাও নিজেদের মধ্যে নামাযী যিন্দেগী কায়েম করার জন্যে দৃঢ় নয়। জামায়াতে যদি যোগ দিতে আসে তো অলসতার সাথেই আসে, সেখানে থাকে না কোনো নিষ্ঠা, কোনো আন্তরিকতা, যেহেতু মনের গভীর থেকে এজন্যে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। তারা কোনো রকম দায়সারা গোছের নামায আদায় করে আর মনে তারা অনুভব করে যে, তারা মুসলিম জামায়াতের সাথে ঠাট্টা মস্কারি করছে! আর তারা যদি কিছু দান করে, সেখানেও কোনো আন্তরিকতা থাকে না, নেহাত মযবুর যেন তারা দান করে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের এ প্রকাশ্য আচরণগুলো কিছুতেই কবুল করেন না। যার মধ্যে নেই কোনো বিশ্বাসের ছাপ, নেই কোনো বিবেকের পরশ। সুতরাং, যে জিনিসের কারণে মানুষের দান কবুল হয়, তা হচ্ছে, কোন উদ্দেশ্যে এবং কোন নিয়তে সে এ কাজটি করছে এ ইচ্ছাটাই হচ্ছে তার কাজের সঠিক মাপকাঠি।

এ ছিলো ওই মোনাফেকদের অবস্থা। তারা ছিলো অনিচ্ছুক কিন্তু যথেষ্ট সম্পদ ও সন্তানের অধিকারী। তাদের জাতির মধ্যে বাহ্যিকভাবে তারা যথেষ্ট মান-সম্ভ্রমের অধিকারী ছিলো। হলে কি হবে, এসব আল্লাহর কাছে কোনো মূল্যই রাখে না। আর এ কারণেই আল্লাহর রসূল ও মোমেনদের কাছেও তাদের ওসব জিনিসের কোনো কদর নেই। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তারা এমন কোনো নেয়ামতের অধিকারী হয়নি যার কারণে তারা নিজেদের ভালো অবস্থায় আছে মনে করতে পারে। তাদের যে সম্পদ রয়েছে তাই হচ্ছে তাদের জন্যে এক পরীক্ষার জিনিস, যা তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এবং তাদেরকে এরই জন্যে আযাব দেয়া হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং, তাদের সম্পদ ও সমন্তানাদি যেন তাদেরকে মুগ্ধ করে না রাখে। আল্লাহ তায়ালা, এ সব সম্পদের কারণেই দুনিয়াতে তাদের শাস্তি দিতে চান এবং চান যে, তারা কাফের থাকা অবস্থাতেই ধ্বংস হয়ে যাক।'

নিশ্চয়ই সম্পদ ও সন্তানাদি তখনই কোনো বান্দাহর জন্যে নেয়ামতে পরিণত হয়, যখন আল্লাহ তায়ালা তাকে এসবের জন্যে তাঁর শোকর গোযারির তাওফীক দেন। তার দ্বারা পৃথিবীতে নেক কাজ করান। যেন সে তাঁর দিকে তার মনকে ঝুঁকিয়ে রাখতে পারে, তার বিবেক নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, অন্তর হয়ে যায় স্থির এবং প্রত্যাবর্তন স্থলে যাওয়ার ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়ে যায়। যতোবারই সে খরচ করে, সে অনুভব করে যে, পরকালের জন্যে সে কিছু সঞ্চয় করলো। আর যখন তার সম্পদ ও সন্তানদের ওপর কোনো বিপদ আসে, তখন সে আত্মসমালোচনা করে, আত্মতৃপ্তিতে সে স্নাত হয় এবং আল্লাহর মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়ার আকাংখা তার কঠিন অবস্থাকে সহজ করে দেয় ..... অপরদিকে আর এক ব্যক্তির ওপর আল্লাহর আক্রোশ ঝরে পড়ে। কারণ সে তার কাজ ও আচরণ দ্বারা অন্যায় কাজের প্রসার ঘটায়, অশান্তি ও বিশৃংখলা ঘটায়। তারপর যখন তার সম্পদ ও সন্তানাদির ওপর বিপদ এসে পড়ে, তখন তার জীবনটাই জাহান্নামের আগুনে পরিণত হয়, এ সম্পদের লোভ তাকে নিদ্রাহীন করে দেয় এবং তার শিরা উপশিরাকে বিপর্যস্ত করে। আর সেই সব কাজেই সে তার মাল-দওলত খরচ করে যা তাকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং সব কিছু তার জন্যে শুধু কষ্ট এবং কষ্টেরই কারণ হয়। আর যখন তার সন্তানরা অসুস্থ হয়, তখন যেমন সে তাদেরকে নিয়ে কষ্ট পায়, সুস্থ হলেও তাদের নিয়ে সুখ পায় না। এমন বহু মানুষ দুনিয়াতে আছে, যাদের তাদের সন্তানদের বিভিন্ন আচরণের কারণে দুনিয়াতে শাস্তি পেতে হয় এবং আখেরাতেও শাস্তি পেতে হবে।

এধরনের মানুষ রসূলুল্লাহ (স.)-এর যামানায় যেমন ছিলো, তেমনি প্রত্যেক যামানাতেই এদের কিছু দৃষ্টান্ত থাকে। এরা ধন সম্পদের মালিক হয় এবং এমন বহু সন্তান তাদেরকে দেয়া হয়, যারা তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে মুগ্ধ করে রাখে বটে, কিন্তু তারা বিভিন্নভাবে দুনিয়ার জীবনে আযাব ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। এদেরকে নিয়ে ওই সম্পদশালী ব্যক্তিরা যেন হাবিয়া দোযখের দিকে এগিয়ে যায়– কুফরীর ওপর হওয়ার মৃত্যু হওয়ার কারণে তাদেরকে হাবিয়া দোযখের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। আল্লাহ তায়ালা এমন ধ্বংসকর পরিণতি থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

আর, (তাযহাকা আনফুসুহুম) 'তাদের নিজেদেরকে তারা ধ্বংস করবে'–

কথাটির অর্থ হচ্ছে, তারা হয়তো পালিয়ে বেড়াবে অথবা ধ্বংস হয়ে যাবে– এটা অবশ্যই এক কষ্টকর অবস্থা। এ অবস্থায় না তারা পাবে শান্তি, না পাবে নিশ্চিন্ততা। দুনিয়ার জীবনে এ অবস্থার সাথে রয়েছে সম্পদ ও সন্তানাদির ক্ষতি অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে পেরেশানী ও ব্যস্ততা সর্বদা

তাদের সাথে লেগে থাকবে। এ বিপদের ভাগী হয়ে তাদের দুঃখ লাঘব করার জন্যে কেউ এগিয়ে আসবে না।

মুসলমানদের সারিতে থাকাকালে এসব মোনাফেক, নিজেদের কু-চিন্তার কারণে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে রেখেছিলো। তারা সর্বদা আত্মগোপন করে থাকতে চাইতো- ঈমান-এ'তেকাদের অভাবের জন্যেই শুধু নয়, বরং নিরন্তর এক ভয় এবং স্বরূপ প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তায় তারা পেরেশান থাকতো, লোভ ও ভয় তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো। এর পরও তারা নিজেদের মুসলমান বলে হলফ করে দাবী করতো, বলতো যে, তারা পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আন্তরিকতার সাথেই ঈমান এনেছে। এজন্যে এ সূরাটি তাদের লজ্জাকর অবস্থা তুলে ধরে তাদের নিন্দা করছে এবং তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিচ্ছে ...... তাদের লজ্জাজনক ব্যবহারই তাদের ধোকাবাজির খোলসকে উন্মোচন করে দিচ্ছে এবং তাদের কপটতার পোশাককে ছিঁড়ে ফেলছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর আল্লাহর নাম নিয়ে তারা হলফ করে করে বলে যে, তারা অবশ্যই তোমাদের লোক। কিন্তু না, কিছুতেই ওরা তোমাদের লোক নয়, বরং তারা এমন এক দল যারা সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে। (তাদের তো এমন করুণ অবস্থা যে,) তারা যদি কোনো আশ্রয়স্থল খুঁজে পেতো, অথবা পেতো কোনো গুহা বা মাথা গোঁজার ঠাঁই, তাহলে সেখানেই তারা পলাতক হয়ে চলে যেতো।'

অর্থাৎ, অবশ্যই ওরা ভীরু কাপুরুষ। এ আয়াতটিতে তাদের যে বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে, তাতে তাদের কাপুরুষতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং তাদের ব্যবহারে তাদের ভীরুতা মূর্ত হয়ে উঠছে। তাদের দেহ মনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিয়ে দিচ্ছে যা ফুটে উঠছে তাদের শরীরে ও চোখে মুখে। তাই বলা হচ্ছে,

'যদি পেতো তারা কোনো আশ্রয় স্থল, কিছু গুহা অথবা মাথা-গোঁজার কোনো জায়গা, তাহলে ফেরারী হয়ে সেখানেই তারা চলে যেতো।'

অর্থাৎ সর্বদাই তারা গোপন কোনো আশ্রয় কেন্দ্রের তালাশে থাকে, যেন সেখানে পৌঁছে গিয়ে তারা নিরাপদে থাকতে পারে। তাদের মনের অবস্থা যা এখানে চিত্রিত হয়েছে তা হচ্ছে, হায়, যদি তারা পেতো কোনো গোপন কেল্লা, গুহা অথবা সুড়ংগপথ, তাহলে সেখানেই তারা জান বাঁচানোর জন্যে পালিয়ে চলে যেত। অভ্যন্তরীণ এক প্রবল ভয় এবং আত্মার দুর্বলতা সর্বদাই তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আর এ অবস্থাতেও তারা,

'আল্লাহর নামে হলফ করে করে বলছে যে, তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে আছে।'

অর্থাৎ, তাদের মনের গোপন অবস্থাকে চেপে রাখার জন্যে যতো প্রকার জোরদার কথা তারা বলতে পারে সবই ব্যবহার করছে। এভাবেই তারা চায় যেন তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রকাশ না হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে তারা যেন নিরাপদে থেকে যেতে পারে .... এটা অবশ্যই কাপুরুষতা, ভয়, অন্তরের দৈন্য এবং লোক দেখানো মনোভাবাপন্ন লোকদের জন্যে এক অত্যন্ত দুঃখজনক অবস্থা। এ অবস্থাটাকে তুলে ধরার জন্যে আল কোরআনের চমৎকার এ বর্ণনাভংগি, এ অতুলনীয় বর্ণনাধারা এমন সুন্দরভাবে তাদের মানসিক অবস্থাকে তুলে ধরেছে, যা হৃদয়পটে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

এরপর মোনাফেকদের সম্পর্কিত আলোচনা এগিয়ে চলেছে এবং বিভিন্ন প্রসংগে তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের যে চরিত্র ফুটে উঠেছে তা পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হয়েছে। তাদের ঘৃণ্য মনের গোপন দুরভিসন্ধি যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে তার জন্যে তাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে

গেছে, যেহেতু তারা তাদের নিকৃষ্ট আচরণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। ওই সব কদর্য ব্যবহারের মধ্যে দেখা যায় তাদের কেউ কেউ দান খয়রাত বন্টনের ব্যাপারে নবী (স.)-কে সরাসরি দোষারোপ করে কথা বলতো। ভাগ-বাটোয়ারার সময় তিনি ইনসাফ করছেন না বলে তোহমাত দিতো। অথচ তিনি তো ছিলেন মাসুম, সকল প্রকার দোষ ক্রুটির উর্ধে মহা সম্মানিত চরিত্রের অধিকারী। আবার কেউ কেউ বলতো, তিনি কান ভারী লোক, যে কোনো লোকের কথা তিনি বিশ্বাস করেন, আর যে যা বলে তাই তিনি সত্য মনে করেন, অথচ তিনি ছিলেন বিজ্ঞ-বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নবী, মহা চিন্তায়ক, মহা ব্যবস্থাপক ও মহা বুদ্ধিমান। তাদের মধ্যে অনেকে গোপনে তাঁর নিন্দা করতো, তাঁকে অস্বীকার করার জন্যে মানুষকে উস্কানি দিতো, আর এসব প্রকাশ পেয়ে গেলে তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করতো। তাদের মধ্যে আবার এমনও কেউ কেউ ছিলো, যারা ভয় করতো, কোনো সময় না জানি তাদের মোনাফেকীর কথা প্রকাশ করতে গিয়ে রসূলের কাছে আয়াত নাযিল হয়ে যায়। তাহলে তো মুসলমানরা তাদেরকে চিনে ফেলবে।

স্বয়ং রসূলের প্রতি মোনাফেকদের অপবাদ

এ সব বিভিন্ন প্রকার মোনাফেক সম্পর্কে ইংগিত দানের পর কপটতা ও কপট (মোনাফেক)দের প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তাদের ও সেই সকল কাফেরের মধ্যে সম্পর্কের বিবরণ দেয়া হচ্ছে যাদের বর্ণনা ইতিপূর্বে এসে গেছে এবং যারা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীর নেয়ামতসমূহ ভোগ করে দূর হয়ে গেছে– আল্লাহ তায়ালা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। এসব কথা পেশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন কাফের, মোনাফেক ও সত্যনিষ্ঠ মোমেনদের প্রকৃতিগত ও চরিত্রগত পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে মানুষের কাছে ফুটে ওঠে এবং মানুষ সেই সব মোখলেস মোমেনদের চিনতে পারে যারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যথাযথ আচরণের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং কথা-কাজে কোনো দ্বৈত নীতি অবলম্বন করেনি। দেখুন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে, যে তোমাকে (হে রসূল) সদকাসমূহ বন্টনের ব্যাপারে মুখের ওপর দোষারোপ করে .... এবং আল্লাহ তায়ালা মহা জ্ঞানী বিজ্ঞানময়।' (৫৮-৬০)

মোনাফেকদের মধ্যে অনেকে আছে যারা তোমাকে কটাক্ষপাত করে, সদকা বন্টনের প্রশ্নে তোমার ইনসাফের দোষারোপ করে। ওরা বলতে চায়, তুমি নাকি বন্টনের ব্যাপারে স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব করো। আসলে তোমার ইনসাফের প্রশ্নে ওরা রাগ করে, বা তারা বড়ই সত্য প্রিয় সত্য সঠিক কাজ লংঘিত হচ্ছে বলে ওরা চিন্তিত, তাও নয় দ্বীন-ইসলামের মর্যাদা নষ্ট হচ্ছে বলে ওরা অস্থির, তাও নয়, যা কিছু ওরা বলে, তা নিছক স্বার্থের জন্যেই বলে, বলে অর্থের লোভে নিজেদের উপকার ও আত্ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'এর থেকে ওদের কিছু দিয়ে দিলে ওরা খুশী হয়ে যায়।' তখন আর ইনসাফ, সত্য প্রতিষ্ঠা বা দ্বীন ইসলামের কোনো ক্ষতি হওয়া ইত্যাদি এসব কথা মুখে থাকে না।

'তবে ওদেরকে যদি কিছু না দেয়া হয়, তখনই ওরা ক্ষেপে যায়।'

এ আয়াতটির শানে নুযুল বর্ণনা প্রসংগে কয়েকটি রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। যার দ্বারা ওইসব ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায়, যারা নির্দিষ্ট কয়েকটি ঘটনায় চোখের ইশারায় রসূল (স.)-এর প্রতি, তাঁর বন্টনের সঠিকতার ওপর কটাক্ষপাত করেছিলো।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বোখারী ও নাসাঈ রেওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, একদিনের ঘটনা, রসূল (স.) একটি সদকা বন্টন করছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে তামীমী

গোত্রের 'যুল খুওয়ায়সির' নামক এক ব্যক্তি এসে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ, ইনসাফ করুন। তখন তিনি বললেন, তোমার জন্যে দুঃখ, আমি ইনসাফ না করলে আর কে ইনসাফ করবে? তখন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলে উঠলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাকে অনুমতি দিন, ওর গর্দান উড়িয়ে দেই। রসূল (স.) বললেন, ওকে ছেড়ে দাও, তোমাদের কেউ যদি তাদের মতো তার নামাযকে তুচ্ছ করবে এবং ওদের রোযার মতো এর রোযাকেও অপছন্দ করবে, আসলে দ্বীন ইসলাম থেকে ওরা তেমনি বেরিয়ে গেছে, যেমন করে ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায় ......।' তখন তাদের সম্পর্কে নাযিল হলো,

'তাদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি এমন আছে যারা তোমাকে সদকার ব্যাপারে মুখের ওপর দোষারোপ করে।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে মারদুওয়াইয়াহ বর্ণনা করেন,

নবী (স.) যখন হুনায়নের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন, তখন এক ব্যক্তিকে আমি বলতে শুনলাম, 'এ যে ভাগ-বাটোয়ারা হচ্ছে, এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন বলে আমি আশা করি না।' তখন আমি নবী (স.)-এর কাছে এসে কথাটি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, 'মূসা (আ.)-এর ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, তাঁকে এর থেকেও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিলো, তবু তিনি সবর করেছেন। এরপর নাযিল হলো, 'তাদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি সদকার ব্যাপারে তোমার প্রতি কটাক্ষপাত করে।'

দাউদ ইবনে আসেম (রা.) থেকে মুসায়েদ এবং ইবনে জারীর বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী (স.)-এর কাছে কিছু সদকার মাল এলে তিনি তা এখানে ওখানে বন্টন করে দিলেন, অবশেষে সব ফুরিয়ে গেলো। এসময়ে আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এ বন্টন লক্ষ্য করলো ও বললো, 'এটা কি ইনসাফ হলো?' তখন এ আয়াত নাযিল হলো।

কাতাদা আয়াত– ওয়া মিনহুম মায়্যঁলমিযুকা ফিস্‌সাদাকাতে' এ আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'ওদের মধ্যে অনেকে আছে যারা সদকা বন্টনের প্রশ্নে তোমাকে দোষ দেয়।' আর আমাদের কাছে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে, মরু অঞ্চল থেকে এক ব্যক্তি এলো, যে সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। যখন সে নবী (স.)-এর কাছে এলো, তখন তিনি কিছু সোনা-চাঁদি বন্টন করছিলেন। এ বন্টন করা দেখে সে বলে উঠলো, 'হে মোহাম্মদ যদিও আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ইনসাফ করতে বলেছেন, কিন্তু তুমি ইনসাফ করনি।' তখন আল্লাহর নবী বললেন, 'দুঃখ হোক তোমার ওপর আমার পর তোমার ওপর কে ইনসাফ করবে?'

যাই হোক, আল কোরআনের আয়াতই জানাচ্ছে যে এ কটাক্ষপাতটা মোনাফেকদের একটি গ্রুপ থেকেই করা হয়েছে। দ্বীনের দরদী হয়েই যে তারা এ কথা বলেছিলো তা নয়, বরং তাদের ভাগে কিছু না হওয়াতে রাগের চোটে তারা এসব মন্তব্য করেছে। মূলত তাদেরকে কোনো হিসসা না দেয়াতেই তারা রাগে ফেটে পড়ছিলো, আর এ রাগই ছিলো তাদের মোনাফেকীর স্পষ্ট আলামত। রসূল (স.)-এর স্বভাব চরিত্রের ওপর দোষ দিয়ে এমন কোনো ব্যক্তি কথা বলতে পারে না, যে এ মহান 'দ্বীন'-এর ওপর ঈমান এনেছে। তিনি তো বরাবরই সত্যবাদী ও আমানতদার বলে পরিচিত ছিলেন, এমনকি রেসালাত হাসিল করার পূর্বেও তাঁর এ সুনাম ছিলো। আর আল্লাহ রব্বুল আলামীন প্রদত্ত আমানতগুলোর মধ্যে সঠিক বিচার ফয়সালা করা একটি বড় আমানত, যা তিনি মোমেনদেরকে দান করেছেন, বিশেষ করে মোমেনদের নবীকে এ মহান আমানত পুরোপুরিই দিয়েছেন ...... আর এটা স্পষ্ট যে, মহাগ্রন্থ আল কোরআনের এ আয়াতগুলো ইতিপূর্বে ঘটিত

বিভিন্ন ঘটনা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনা পেশ করেছে, বরং আরো বেশী গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছে ওই চিরস্থায়ী মোনাফেকদের যুদ্ধপূর্ব ও যুদ্ধ কালীন বিভিন্ন আচরণের কথা।

আর এ প্রসংগে আয়াতটি নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানদারদেরও কথা যথাযোগ্য প্রশংসার সাথে পেশ করেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদেরকে যা দিয়েছেন, তাই নিয়েই যদি ওরা খুশী থাকতো, তাহলে কতই না ভালো হতো! আর ওরা বললো, আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, শীঘ্রই আল্লাহ তায়ালা তাঁর মেহেরবানী থেকে আমাদেরকে দেবেন এবং রসূলও দেবেন। অবশ্যই আমরা আল্লাহর দিকে আগ্রহভরে এগিয়ে যাবো।'

এটাই হচ্ছে মানুষের কাজ ও কথার মাধ্যমে আদব রক্ষা। ঈমানের যথাযথ আদব হচ্ছে, আল্লাহ ও রসূলের বন্টনের ওপর সন্তুষ্ট থাকা। এ সন্তুষ্টি আসবে মেনে নেয়ার কারণে এবং যা পাওয়া গেছে তাতে তুষ্ট থাকার কারণে। জোর করে সন্তুষ্টি আনা বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তির চাপের কারণে সন্তুষ্ট হওয়া তা নয়। আর আল্লাহ তায়ালাই তো তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট। অবশ্য, আল্লাহ ও রসূলের মেহেরবানীর দৃষ্টি আশা করা, আর বস্তুগত জিনিসের তুলনায় এবং দুনিয়াবী জিনিসের সকল লোভ-লালসা থেকে আল্লাহর পথে টিকে থাকার আগ্রহ এটাই হচ্ছে সেই সঠিক আদব, যার দ্বারা মোমেনের অন্তর স্নাত হয়। কিন্তু মোনাফেকদের অন্তর এটা বুঝে না যেহেতু তাদের আত্মা ঈমানের খুশবুতে সুবাসিত হয়নি এবং তাদের অন্তরের মধ্যে নিশ্চিত বিশ্বাসের ঝলক চমকায়নি।

যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ

এরপর আসছে, আল্লা ও রসূলের হক অনুযায়ী আদব রক্ষার বিরণ। এ আদব হবে স্বতস্ফূর্তভাবে, সন্তুষ্টি ও পূর্ণাংগ আত্মসমর্পণের সাথে, এ আদব রক্ষার দাবী একথা জানায় যে এটা রসূল (স.)-এর হুকুম নয়, বরং এটা হচ্ছে আল্লাহর হুকুম, তাঁর নির্দেশমতো এটা একটা ফরয এবং এ বন্টন ব্যবস্থাও খোদ বিশ্বপালক আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। এ হচ্ছে সদকাসমূহের অবস্থা এবং এসব সদকা দ্বারা যাকাতকেই বুঝানো হয়েছে যা বাধ্য বাধকতার সাথে ধনীদের থেকে নেয়া হয় এবং ফিরিয়ে দেয়া হয় গরীবদের কাছে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষিত এক ফরয কাজ।

আর এ যাকাত দানের ব্যবস্থা একদল মানুষের মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে, যাদেরকে আল কোরআন সাহায্য করে। যাকাত দেয়ার এ ব্যবস্থা কারো ইচ্ছাধীন নয়– ইচ্ছা হলো যাকাত দিলাম, ইচ্ছা হলো না দিলাম না-এ অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। এমনকি এ ব্যাপারে রসূলেরও কোনো এখতিয়ার নেই। তিনি ইচ্ছা করলেও এ ব্যবস্থার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেন না। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্য ফরয এ সদকাসমূহের (অর্থাৎ যাকাতের) ব্যয়ের খাত হচ্ছে, ১) অভাবগ্রস্ত, ২) নিঃস্ব, ৩) যাকাত আদায়ী বিভাগের কর্মচারীদের বেতন বাবদ দেয়। ৪) নও মুসলিমদের অন্তরকে ইসলামের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে দান, ৫) বন্দী মুক্তির জন্যে দান, ৬) ঋণগ্রস্তদেরকে ঋণ থেকে মুক্ত করার জন্যে দান ৭) আল্লাহর দ্বীনকে যমীনের বুকে কায়েম রাখার জন্যে সংগ্রামের পথে দান এবং ৮) কোনো মুসাফির সফরকালে বিপদগ্রস্ত হলে বা সংকটাপন্ন হলে তাকে সাহায্য করার জন্যে দান। এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষিত এক ফরয এবং আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী মহাবুদ্ধিমান (বিজ্ঞানময়)।'

এভাবে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের মধ্যে যাকাত তার স্থায়ী আসন দখল করে রেখেছে এবং ইসলামী (পূর্ণাংগ) জীবন ব্যবস্থার মধ্যে অধিকার করে রেখেছে তার সুদৃঢ় স্থান। যে সব বিষয়

আল্লাহর বিধানের মধ্যে রয়েছে তার মধ্য থেকে এগুলো নফল বা মর্যাদাবোধক কোনো কাজ নয়– এটা অকাট্য ও চূড়ান্ত এক ফরয। এটা কোনো বিতরণকারী বা বিভক্তকারীর পক্ষ থেকে ঐচ্ছিক দান বা এলোমেলোভাবে দেয় কোনো বস্তু নয়, বরং এ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশিত অবশ্য দেয় এক সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, যা হিসাব করে আদায় করতে হয়। ইসলাম যে সব বিষয় বাধ্যতামূলক করেছে যাকাত সেগুলোর মধ্যে একটি। মুসলিম রাষ্ট্র এক নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী এ অর্থ সংগ্রহ করে, যাদের যাকাত দেয়ার ক্ষমতা আছে তাদের কাছ থেকে আদায় করে, যাতে সমাজের দুঃস্থ লোকদের খেদমতে এগুলো ব্যয় করতে পারে। এ দান কোনো দানশীল ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তির জন্যে এহসান বা কৃপা নয়, বা কোনো দাতার নিকট থেকে প্রাপ্য কোনো ভিক্ষাও এটা নয়। না, কখনও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ভিক্ষাবৃত্তি বা মানুষের কাছে মুখাপেক্ষিতার ওপর চালু হয়েছে, আর না এ ব্যবস্থার ওপর ভবিষ্যতে কোনো দিন চালু হবে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরিচালিকা-শক্তিই হচ্ছে কাজ– যে কোনো প্রকার বা যে কোনো প্রকৃতির কাজই হোক না কেন, তা করার জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে যেটা ইসলামী রাষ্ট্র হবে তার মধ্যে প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির জন্যে উপযোগী কাজের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সম্ভব হলে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, ব্যবহার করতে হবে দেশের সকল উপায় উপাদানকে। প্রত্যেক শ্রমিককে দিতে হবে শ্রমের সঠিক মর্যাদা এবং তার কাজের সঠিক পারিশ্রমিকের উপযুক্ত গ্যারান্টি। আর অবশ্যই এ ধরনের কর্মক্ষম ব্যক্তি যাকাত পাওয়ার যোগ্য নয়।

সুতরাং সক্ষম ও অক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে যাকাত এক পারস্পরিক যৌথ দায়িত্ব। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এর ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দেয় এবং আদায় ও বন্টনের ব্যবস্থা করে। এর ওপরই প্রকৃতপক্ষে গড়ে ওঠে ইসলামী সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ, চালু হয় ইসলামী আইন। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যবস্থা ছাড়া কোনো আইন প্রণয়ন করা বা কোনো সুন্দর জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভবই নয়।

হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, কোনো সচ্ছল ও সক্ষম ব্যক্তির জন্যে একইভাবে যাকাত হালাল নয়।(১)

আবদুল্লাহ ইবনে আদী দুই জন বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা রসূল (স.)-এর কাছে এসে সদকা (যাকাত) চাইলো। রসূলুল্লাহ (স.) তাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকালেন, দেখলেন তারা সুঠাম ও মযবুত দেহের অধিকারী। তখন তিনি বললেন, তোমরা চাইলে আমি দেবো, তবে যারা সচ্ছল, শক্তিশালী, কর্মক্ষম, তাদের জন্যে যাকাত থেকে হেসসা নেই।(২)

নিশ্চয়ই যাকাত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের জন্যে যে সব গ্যারান্টি আছে তাদের অন্যতম। এ সমাজ ব্যবস্থা যাকাতের চেয়ে মানুষকে আরো বেশী কিছু দিতে চায়। যেহেতু ইসলামী ব্যবস্থা গোটা জীবনের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষের জীবনের জন্যে এ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় সব কিছুর গ্যারান্টি দেয় এবং মানুষে মানুষে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে পরিপূর্ণ ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। তবে যাকাত এসব কল্যাণমুখী রেখার মধ্যে সর্বাধিক সর্ববৃহৎ মৌলিক রেখার কাজ করে।(৩)

(১) হাদীসটি আহমদ ও তিরমিযী রেওয়ায়াত করেছেন।

(২) দেখুন 'আল-আদালাতুল ইজতিমাইয়াহ' কেতাবের 'আত্তাকাফুলুল ইজতিমাইয়াহ' অধ্যায়।

(৩) দেখুন, 'আল-আদালাতুল ইজতিমাইয়াহ' কেতাবের 'আত্তাকাফুলুল ইজতিমাইয়াহ অধ্যায়।

বিভিন্ন অর্থ সম্পদের প্রকৃতি ভেদে যাকাতের হার নির্ধারিত হয়, যেমন, সেচ যোগ্য জমির ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ, মওসুমী আব হাওয়ায় স্নাত (অসেচযোগ্য) জমির ফসলের ওপর এক-দশমাংশ এবং পুঞ্জীকৃত অর্থ অথবা ব্যবসায় নিয়োজিত পণ্যের ওপর (অর্থাৎ মূলধনের ওপর) থেকে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করা হয়। ফসলের ব্যাপারে সারা বছরের খোরাকী রেখে অতিরিক্ত যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য থাকবে (যদি সেচ যোগ্য জমি থেকে এ ফসল এসে থাকে) তার ওপর থেকে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করা হবে। এমনি করে ওপরে বর্ণিত হারে যাকাত আদায় করে একত্রিত করার পর সেই সম্পদ ওপরের আয়াতে বর্ণিত মতে বিভিন্ন খাতে বন্টন করা হবে। তবে এ সমস্ত খাতের মধ্যে অগ্রাধিকার দেয়া হবে অভাবগ্রস্ত ও নিঃস্ব মানুষকে অর্থাৎ যাদের মাথা গুঁজার ঠাঁইটুকুও নেই তাদেরকে। আয়াতে 'ফুকারা' শব্দটি ফকীরের বহুবচন। এর দ্বারা বুঝায় সেই সব মানুষকে যাদের নিকট প্রয়োজনীয় জীবন ধারণ সামগ্রী থাকে না। আর মাসাকীন মিসকীন-এর বহুবচন। এর দ্বারা বুঝায় সেই সব ব্যক্তিকে যারা অবশ্যই অভাবগ্রস্ত কিন্তু নিজেদের অভাব কাউকে জানতে দেয় না বা প্রকাশ করে না এবং হাত পেতে কারো কাছে চায় না।

সঠিকভাবে যারা যাকাত দেয়, এক বছর যাকাত দেয়ার পর, তাদের অধিকাংশের অবস্থা এ হয় যে, পরবর্তী বছরে তারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। কারণ সারা বছরের খরচ বাদে যে সম্পদ বা ফসল থাকে, তার থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে যাকাত দিয়ে খুব বেশী আর অবশিষ্ট থাকে না, যার কারণে পরবর্তী বছরে তাদের অনেকে নিজেরাই অভাবগ্রস্ত হয়ে যায়। এ কারণেই যাকাত আদায় ও বন্টনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ইসলামী সরকারকে এবং ইসলামী সমাজের প্রত্যেকের মধ্যে এ দায়িত্ব বোধ পয়দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা একে অপরের জন্যে দায়ী অর্থাৎ যাকাত ব্যবস্থা পরিচালনার মাধ্যমে মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে সামাজিক সাধারণ দায়িত্ব। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে দেখা যাবে এক বছরে কেউ যাকাতদাতা, তো পরবর্তী বছরে সে গ্রহীতা। আবার আরেক শ্রেণীর মানুষও সমাজে আছে ও থাকবে যারা যাকাত দিতে পারবে না, শুধু নেবে। এদিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলেও যাকাত এক সামাজিক দায়িত্ব এবং এ অবস্থা আসার পূর্বে ও পরে সর্বদাই একাজটিকে ফরয হিসাবে জানতে হবে। এ যাকাত আদায় দ্বারা মানুষ নিজেদের পবিত্র করে এবং নিজেদেরকে আল্লাহর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে, মুক্ত করে নিজেদেরকে কৃপণতা থেকে এবং যাকাত আদায় দ্বারা নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্য অবশ্যই, (অবশ্য দেয়) সদকাসমূহ ফকীর ও মিসকীনদের জন্যে।' এর ব্যাখ্যা ওপরে এসে গেছে।

'আর (যাকাত বন্টনের) তৃতীয় খাত হচ্ছে যাকাত বিভাগীয় কর্মচারীদের বেতন বাবদ দেয়।'

অর্থাৎ যাকাত বোর্ডের যে সকল কর্মচারী ঘরে ঘরে গিয়ে হিসাব নিকাশ করে যাকাত আদায় করবে, তাদের বেতনও ওই আদায়কৃত অর্থ থেকে পরিশোধ করতে হবে।

এরপর চতুর্থ খাত হচ্ছে নও মুসলিম, অর্থাৎ যারা সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদেরকে ইসলামের পথে টিকে থাকতে সাহায্য করার জন্যে দান। এদের মধ্যে, অবশ্য আরেক দল লোক আছে যাদের সম্পর্কে আশা করা যায় যে, তাদের মন ইসলামের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, একটু আর্থিক সাহায্য পেলে আরো দ্রুত তারা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবে। আর একদল লোকও এদের মধ্যে আছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, টিকেও আছে। এদেরকে যাকাতের খাত থেকে দান করলে তারা নিজের সাবেক জাতির কাছে গিয়ে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে যে তারা ইসলাম গ্রহণ করে ঠকেনি, বরং তাদের জাতিরাও বুঝবে ইসলাম গ্রহণকারিরা পরস্পর কতো দরদী এবং

অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করার জন্যে তারা কতো তৎপর। ইসলামের এ মানবতা বোধ দেখে তাদের মনও ইসলামের দিকে এগিয়ে আসবে। অবশ্য ফেকাহবিদদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, ইসলামের বিজয় যুগ এসে যাওয়ার পর 'মুআল্লিফাতে কুলুবুহুম'দেরকে যাকাত থেকে দান করার হুকুম মওকুফ হয়ে যাবে কিনা ..... কিন্তু এটা সত্য যে, ইসলামী আন্দোলনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ করতে গিয়ে প্রতি যুগেই এমন সব অবস্থা আসার সম্ভাবনা বরাবরই রয়েছে যে, এক দল লোককে সাহায্য করার প্রয়োজন হবে, হয় তাদেরকে ইসলামের পথে মযবুতীর সাথে টিকিয়ে রাখার জন্যে সাহায্য দান প্রয়োজন হবে, (কারণ ইসলাম গ্রহণ করার ফলে তাদের জীবিকা অর্জনের পথ কন্টকাকীর্ণ হয়ে যাবে) অথবা তাদেরকে ইসলামের দিকে এগিয়ে আনার উদ্দেশ্যে যাকাত থেকে ব্যয় করতে হবে। যেমন কিছু অমুসলিম ব্যক্তিত্বকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায় এবং তাদের দ্বারা ইসলামের সাহায্য হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যায়, অথবা তাদের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে বলে আশা করা যায়। আমরা এ সত্যটি বেশ ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারছি এবং এ শব্দটির মধ্যে যে অর্থের ব্যাপকতা রয়েছে, রয়েছে আল্লাহর মহা হেকমত, স্থান-কাল ভেদে তার প্রয়োগের মধ্যে তার গভীর তাৎপর্যও বুঝতে পারছি।

এরপর দেখুন পঞ্চম খাত, 'বন্দী মুক্তির' প্রয়োজনে ব্যয়। বন্দী বিনিময়, আজকের জগতে আন্তর্জাতিক আইন হিসাবে পরিচিত ও গৃহীত। কিন্তু প্রথম যুগে এ আইন অনুসারে মুসলমান ও তাদের দুশমনদের মধ্যে বন্দী বিনিময় হতো না অর্থাৎ, প্রতিপক্ষরা এ ব্যবস্থা মানতো না। সে অবস্থায় বন্দী মুক্তির জন্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিলো, অর্থাৎ আন্তর্জাতিকভাবে এ বন্দী বিনিময় প্রক্রিয়া শুরু না হওয়া পর্যন্ত যাকাতের অর্থ দিয়েই বন্দীর মুক্তি আদায় করা হতো। বন্দীদের যখন বিভিন্ন লোকদের দাস হিসাবে বন্টন করে দেয়া হতো, তখন ওই মুনিবদের কাছ থেকে যাকাতের পয়সার বিনিময়ে তাদের ফিরিয়ে আনা হতো, অথবা কোনো দাস দাসীকে বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ সেই পয়সা দিয়ে কোনো বন্দীকে মুক্ত করানো যেতো।

ষষ্ঠ খাত হচ্ছে ঋণগ্রস্তদেরকে ঋণমুক্ত করার জন্যে দান। অর্থাৎ, এরা হচ্ছে সেই সব ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যারা বিনা অপরাধে ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছে, তাদেরকে ঋণ থেকে মুক্ত করার জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন যাকাতের ফান্ড থেকে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি চিরদিনের জন্যে এ নির্দেশ বহাল রেখেছেন। তবে এজন্যে প্রয়োজন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিজের ঋণের কথা জানানো এবং পরিশোধের ক্ষমতা তার নেই বলে ঘোষণা দান। যেমন বর্তমান জগতের বহু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ও কোনো ব্যবসায়ী যদি দেউলে হওয়ার ঘোষণা দেয়, তাহলে তার উপায় উপকরণ যতোই থাকুক না কেন, উক্ত রাষ্ট্র তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে। ইসলামী রাষ্ট্রও অবশ্যই কল্যাণ রাষ্ট এবং আল্লাহর দেয়া এ মহান ব্যবস্থা ও সর্ব সাধারণের জন্যে কল্যাণ ব্যবস্থা হিসাবে প্রেরিত। এ ব্যবস্থার মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পতন হয়ে যাবে, কোনো আমানতদার ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে অথবা কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষের জন্যে অধপতন ডেকে আনবে, তা কিছুতেই বরদাশত করা হয় না, যেমন অন্যান্য পার্থিব আইন ও অন্যান্য ধর্মীয় আইনেও এভাবে ব্যবস্থা নেয়া হয়।

'আর আল্লাহর পথে খরচের খাত' এটা হচ্ছে যাকাত বন্টনের সপ্তম খাত.....এ খাতটির দরযা বহু প্রশস্ত। এর আওতায় ইসলামী জামায়াতের সকল কল্যাণ খাতই অন্তর্ভুক্ত, যার দ্বারা আল্লাহর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

এরপর শেষ ও অষ্টম খাত হচ্ছে মোসাফেরদের ব্যয়ের খাত। এমন মোসাফের, সফরে এসে যার সকল সম্পদ শেষ হয়ে গেছে, যদিও নিজ দেশে সে সম্পদশালী ও অভাবমুক্ত।

এ হচ্ছে যাকাত ব্যবস্থা ও তার ব্যয়ের খাতগুলোর বিবরণ, যার সম্পর্কে আজকের পৃথিবীর সমালোচকরা নানা প্রকার কথা বলে থাকে এবং এ ব্যবস্থাকে তারা বৃত্তি ও খয়রাতী ব্যবস্থা বলে কটাক্ষপাত করে(১) ...... এ ব্যবস্থা ইসলামী সমাজের বাধ্যতামূলক (ফরয) ব্যবস্থা। আমরা ইসলামী এবাদাত হিসাবে এ ব্যবস্থা মেনে চলি। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরকে কৃপণতা থেকে মুক্ত করেন এবং এভাবে তাদের পবিত্র বানান এবং উম্মতে মুসলিমার ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, দরদ মহব্বত ও পরস্পর কল্যাণকামিতা গড়ে তোলেন। এ মহান ব্যবস্থার দ্বারা তিনি মানুষের মধ্যে পয়দা করেন সজীবতা, গোটা জীবনকে বানান মহীয়ান এবং মানুষের জীবনে আগত বিভিন্ন ক্ষতকে নিরাময় করেন, বৃহত্তর সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে তিনি পয়দা করেন মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতা এবং প্রতিপালন করেন মানুষের মধ্যে সঠিক বন্দেগীর চেতনাকে, যার ফলে মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে মানুষে মানুষেও গড়ে ওঠে নিবিড় বন্ধন। তাই দেখুন, রাব্বুল আলামীনের অমিয় বাণী,

'আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা হচ্ছে বাধ্যতামূলক ও অপরিহার্য-এক কাজ'-এর দ্বারাতেই সঠিকভাবে জানা যায় মানুষের কল্যাণ কোন্ কোন্ জিনিসে এবং এভাবে আল্লাহ তায়ালা মহা বুদ্ধিমত্তার সাথে তাঁর কাজগুলো পরিচালনা করেন।

'আর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জ্ঞানবান, বিজ্ঞানময়।'

রসূলের সাথে মোনাফেকদের বেয়াদবী ও চাটুকারীতা

সদকাসমূহ (যাকাত) এর মূলনীতি ও তার বন্টন ব্যবস্থা বর্ণনা করার পর ওই সব মূর্খ হঠকারী নাদান বে আদবদের কটাক্ষের জওয়াব দেয়া হচ্ছে, যারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকার কারণে চরম ও পরম বিশ্বস্ত রসূল (স.)-এর প্রতি কটাক্ষপাত করছে। এরপর বিবরণ আসছে নানা প্রকার মোনাফেকের এবং সেই সকল বিষাক্ত কথা ও কাজের, যা তারা ইসলামী জামায়াতের মধ্যে থেকে সদা সর্বদা বলতো ও করতো। দেখুন এ বিষয়ে আল্লাহর এরশাদ,

'ওদের মধ্যে অনেকে আছে যারা নবী (স.)-কে কষ্ট দিতো ও বলতো .... যদি আমরা তোমাদের একদলকে মাফ করে দেই, তবু অপর এক দলকে অবশ্যই আযাব দেবো। কারণ তারা বরাবরই মহা অপরাধী হিসাবে থেকেছে।' (আয়াত ৬১-৬৬)

অবশ্যই রসূলের শানে এটা ছিলো বিরাট বেআদবী, যা সদকা সম্পর্কে কটাক্ষপাত করা থেকেও অন্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ওরা রসূল (স.)-এর কাছে থেকে উন্নতমানের আদব শিখছিলো। তারা দেখছিলো রসূলুল্লাহ (স.) কতো আদর মহব্বতের সাথে লোকদের কথা শোনেন, মানুষকে কিভাবে মর্যাদা দেন, কিভাবে তাদের সাথে শরীয়তের নিয়ম মতো লেন দেন করেন। কতো বিনয় নম্রতার সাথে মানুষের সাথে ব্যবহার করেন এবং মানুষের জন্যে তাঁর দিলো কতো প্রশস্ত, তাঁর অন্তর কতো উদার। এতদসত্তেও তাঁকে তারা কি জঘন্য অপবাদ দিলো। দেখুন কতো হীন তাদের আচরণ। তারা বললো, তিনি 'কান-ভারী' মানুষ, যে যা বলে তাই তিনি বিশ্বাস করেন। তারা তাঁর জন্যে মিথ্যা, ধোকাবাজি ও অতিরঞ্জিত করে কথা বলা জায়েয করে নিলো। অর্থাৎ তারা মনে করলো তাঁর পক্ষে এসব কদাচার সহজ কাজ, তিনি মিথ্যা বলতে পারেন ও কাউকে ঠকাতে পারাটা তাঁর জন্যে মোটেই কঠিন নয়। তাঁর সত্যবাদিতার ওপর তারা হলফ করে করে অপবাদ দিলো এবং তাঁর সামনেই তাঁকে অপমানজনক কথা বললো। এতেও তারা ক্ষান্ত হলো না বরং তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁর নিন্দামন্দ বলাবলি করতে থাকলো এবং তারা নিশ্চিন্ত ছিলো যে, এসব

(১) দেখুন, 'আসসালামুল আলামে অল ইসলাম' কেতাবের যাকাত অধ্যায়।

কথা তিনি জানতে পারবেন না, তাদের মনোবৃত্তি তিনি বুঝতে পারবেন না এবং তাদের মোনফেকী তাঁর কাছে ধরা পড়বে না। অথবা তাদের মোনাফেকীর কারণে তিনি তাদের পাকড়াও করতেও পারবেন না। অথবা মোখলেস মোমেনরা যে সময়ে সময়ে রসূল (স.)-কে তাদের মোনাফেকী কথা ও কাজ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করতো তারা নবী (স.) ও মুসলমানদের সম্পর্কে যে সব কদর্য কথা বলতো, সেগুলো রসূল (স.)-কে জানিয়ে দিলে তিনি সেগুলো বিশ্বাস করতেন– এটাই ছিলো ওদের দৃষ্টিতে তাঁর অপরাধ। এজন্যেই তাঁকে তারা কান ভারী বলে দোষারোপ করত। তাদের এসব আচরণের ওপরই আলোচ্য আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে বলে বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়। তাদের ওই সব কথা ও কাজ সব কিছু মিলে তাদের মোনাফেকী প্রকাশ করে দিচ্ছিলো। এজন্যে কোরআনে করীম তাদের কথা তাদের ওপর ছুঁড়ে মারতে গিয়ে বলছে,

'ওরা বলে, উনি কান-ভারী'

হাঁ, কান ভারী তো বটে, কিন্তু

'বলো, তোমাদের ভালোর জন্যেই তিনি কান-ভারী।'

অর্থাৎ তোমাদের কল্যাণের জন্যেই তো তিনি কান-ভারী। আর এ তথ্য জানতে পারার কারণেই তো তাঁর কাছে ওহী নাযিল হয়ে তোমাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারিত হচ্ছে। এতে যদি তোমরা থেমে যাও, সাবধান হয়ে যাও এবং নিজেদের আচরণকে শুধরে নাও, তাহলে তাঁর শোনাটা কি তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হলো না? তিনি শুনছেন, শুনে আল্লাহর প্রেরিত বাণী অনুসারে তোমাদের সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তোমাদের ধোকাবাজির কারণে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন না, দোষারোপ করছেন না এবং তোমাদের লোক দেখানো ব্যবহার ও কাজের জন্যে তোমাদের পাকড়াও করছেন না– এসব কি তোমাদের জন্যে কল্যাণকর নয়?

'তিনি তো আল্লাহর বিশ্বাস রাখেন।'

এজন্যে তোমাদের সম্পর্কে এবং তোমাদের কদর্য ব্যবহার সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালা যে সংবাদ দিয়েছেন, তো তিনি নিজেই বিশ্বাস করেছেন।

'তিনি মোমেনদের বিশ্বাস করেন'।

অর্থাৎ তিনি তাদের কথায় নিশ্চিন্ততা লাভ করেন এবং তাদের বিশ্বাস করেন, কারণ তিনি জানেন তাদের মধ্যে ঈমানের কারণে সত্যবাদিতা আছে, যা তাদের মিথ্যা থেকে বাঁচায়, বাঁচায় বক্রতা ও লোক দেখানো কৃত্রিমতা থেকে।

'আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্যে রহমত, যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান এনেছে।' অর্থাৎ তিনি তাদের হাত ধরে ভালোর দিকে নিয়ে যেতে চান।'

'আর যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।' অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার যে, তিনিই সর্বশক্তিমান আরই তাঁর প্রতিনিধিকে মানুষ কষ্ট দেবে!

'ওরা তোমাদেরকে খুশী করার জন্যে তোমাদের কাছে এসে আল্লাহর কসম খেয়ে খেয়ে কথা বলে। অথচ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকেই ওদের খুশী করা দরকার– যদি প্রকৃতপক্ষে ওরা মোমেন হয়।'

অর্থাৎ, তোমাদের খুশী করার জন্যে ওরা প্রত্যেক যামানায় মোনাফেকদের কায়দায় আল্লাহর নামে হলফ করে কথা বলে। ওরা যা বলতে চায়, তা সামনে না বলে পেছনে বলে এবং যা করতে চায়, তা সামনে না করে পেছনে করে। এরপর তাদের কোনো অভিযোগ দূর করার জন্যে তারা মোকাবেলা করতে প্রস্তুত নয়, অর্থাৎ ওদের অভিযোগগুলো সামনে বলতে রাযী নয় এবং কোনো

বিষয়কে পরিষ্কার করতেও ওরা দুর্বলতা বোধ করে। তারপর ওরা অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে এবং নিজেদের খুবই ছোট করে পেশ করে, যেন মানুষ তাদের ওপর খুশী হয়ে যায়।

'আর ওরা সত্যিকারে মোমেন হলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকেই খুশী করার চেষ্টা করবে, এ ব্যাপারে আল্লাহর অধিকারই সবচেয়ে বেশী।

কিন্তু বাস্তবে মানুষ কী করে? তাদের শক্তি তারা কি কাজে লাগায়? সাধারণভাবে মানুষ সঠিকভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং তাঁর জন্যে অন্তরের মধ্যে কোনো আগ্রহও পোষণ করে না। দেখা যায়, তারই মতো মানুষের জন্যেই তার হৃদয়াবেগ এবং এ মানুষকেই সে ভয় পায়। অথচ তার জন্যে কল্যাণকর পথ তো এটাই ছিলো যে সদা সর্বদা তার মনোযোগ মহান আল্লাহর দিকে রুজু করে রাখবে, যাঁর নযরে সবাই সমান। তিনি সেই ব্যক্তিকে কখনও অপমানিত করেন না, যে তাঁর দিকে ঝুঁকে থাকে। আর অবশ্যই যে ব্যক্তি তাঁর বান্দার কাছে নতি স্বীকার করে, তাকে তিনি অপমানিত করেন। আর তাঁকে যে ভয় করে, তাকে তিনি (কারো কাছে) ছোট করেন না। যে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর বান্দাদেরকে যারা ভয় করে তাদেরকেই তিনি ছোট করে দেন। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা কি জানে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ঘোরতর দুশমনি করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, চিরদিন সে থাকবে সেখানে, এটিই হচ্ছে চরম লাঞ্ছনা।'

ধমক ও তিরস্কারের সাথে তাদের এভাবে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। কারণ ওরা ঈমানকে পরিত্যাগ করেছে। আর অবশ্যই এটা সত্য, যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে, সে অবশ্যই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে লড়াই করা সব থেকে বড় কবীরা গুনাহ। আর আল্লাহর যে কোনো বান্দা এ কাজ করবে অবশ্যই জাহান্নাম তার জন্যে অপেক্ষা করছে। আর বিদ্রোহী যে কোনো ব্যক্তির জন্যে ইহকাল ও পরকালে অপমানই হচ্ছে সমুচিত প্রতিদান। কাজেই যে ঈমানের দিকে তাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে, তা গ্রহণ করলে তাদের প্রতিদান কি হতে পারে তা কি তারা বুঝতে পারে না? এটা তারা না জানবে কেমন করে?

ওরা তো আল্লাহর বান্দাদের ভয় করে, তাদেরই খুশী করার জন্যে তারা হলফ করে করে কথা বলে। কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে যা পেয়েছে তাই তারা অস্বীকার করে। তাহলে এসব বান্দার স্রষ্টাকে ভয় না করলে তাদের কি অবস্থা হতে পারে। ওরা রসূলকে কষ্ট দেয় এবং তাঁর আনীত দ্বীনের বিরোধিতা করে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথেই লড়াই করা হয়। কেউ তাঁর সাথে লড়াই করতে পারে এর চিন্তাই করা যায় না। মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি এতো বড় যে, তাঁর সাথে লড়াই করার কোনো প্রশ্নই আসে না। তারা যে কদর্য কাজ করছে, তা অত্যন্ত ঘৃণার্হ। আর যে অপরাধ তারা করছে, তার বাস্তব চিত্র একথার দ্বারা ফুটে উঠেছে এবং রসূলকে যে কষ্ট তারা এ পর্যন্ত দিয়েছে তাদের প্রতি এ আয়াতের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে তারা সদা সর্বদা গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে রয়েছে।

ওরা তো এত ভীরু ও কাপুরুষ যে, রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সংগী সাথীদের সাথে তারা মুখোমুখি হতে সাহস পায় না। সর্বদা ওরা ভয়ে ভয়ে থাকে। যে কোনো সময় হয়তো আল্লাহ তায়ালা ওদের গোপন কথা প্রকাশ করে দেবেন এবং রসূলুল্লাহ (স.)-কে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করে দেবেন। এরশাদ হচ্ছে,

'মোনাফেকরা সব সময় ভয় ভয়ে রয়েছে, যে কোনো সময় যেন তাদের মনোবাঞ্ছা সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে কোনো সূরা নাযিল হয়ে যায়। .... আমি মহান আল্লাহ যদি তোমাদের কোনো এক দলকে ক্ষমা করি, তাহলে অন্য কোনো দলকে আযাব দেবো কারণ তারা ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধী জাতি ছিলো। (আয়াত ৬৪-৬৬)

মোনাফেকদের পক্ষ থেকে মুসলিম বাহিনীর মনোবল বিনষ্ট করা

মোনাফেকদের এ অন্তরের গ্লানি প্রকাশ করে তাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে কোরআনের আয়াত যে অবশ্যই নাযিল হবে, তা আলোচ্য আয়াতগুলোতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আয়াতগুলো তাদের অন্তরের মধ্যে প্রবহমান কথাগুলো প্রকাশ করে দিচ্ছে যাতে করে মানুষ সেই সত্য কথাটা জেনে যায় যা তারা গোপন করছে। এ আয়াতগুলোর নাযিল হওয়া বিষয়ে বিশেষ বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করে বেশ কয়েকটি রেওয়ায়াত এসেছে।

মদীনাবাসী আবু মা'শার মোহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কুরযি নামক এক ব্যক্তি এবং আরো কিছু লোকের বরাত দিয়ে একটি বর্ণনা পেশ করেছেন। তাঁরা বলেন, মোনাফেকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললা,

'আমরা কোরআনের এ আয়াতগুলোর দিকে পেটের কারণে (স্বার্থের জন্যে) ঝুঁকে পড়েছি, মুখে অস্বীকার করেছি, কিন্তু সাক্ষাতে এসব কথা প্রকাশ করতে সাহস পাইনি (অর্থাৎ কোরআন পাঠকদের সামনে একথা প্রকাশ করিনি)। অতপর রসূলুল্লাহ (স.)-কে এ কথাটি জানানো হলো, (একথা জানতে পেরে) ওই লোকটি অবিলম্বে উটে সওয়ার হয়ে রসূলুল্লাহর কাছে এসে বললো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা নিছক ঠাট্টা মস্কারি করে একথাগুলো বলেছিলাম তখন তিনি বললেন, 'তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর আয়াতসমূহের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা মস্কারি করছো?' ৬৪নং আয়াতের শেষের কথাটি 'মুজরিমীন' পর্যন্ত তিনি পড়লেন। এসময়ে দেখা গেলো ওই লোকটির পা-দুটো পাথরের মতো কালো হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (স.) সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না, আর সে তো রসূলুল্লাহ (স.)-এর তরবারির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিলো।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, মোনাফেকদের দলের মধ্যে অদীয়াত ইবনে সাবেত নামক এক ব্যক্তি ছিলো। এ ব্যক্তি বনু উমাইয়া ইবনে যায়দ ইবনে আমর ইবনে আওফ গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলো। মাখশা ইবনে হুমায়ের নামক আর এক ব্যক্তি ছিলো। সে ছিলো বনু সালমার খুবই শক্তিশালী মিত্র। রসূলুল্লাহ (স.) যখন তাবুক অভিযানে যাচ্ছিলেন, তখন এরাও তাঁর সাথে এগিয়ে চলেছিলো। এসময়ে তারা পরস্পর বলাবলি করছিলো, রোমান সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ আরবদের পারস্পরিক যুদ্ধের মতো নাকি? আল্লাহর কসম করে বলছি, হয়তো আগামীকালই তোমাদেরকে শেকলে আবদ্ধ করে নিয়ে যাওয়া হবে। এসব কথা বলে তারা মুসলমান দলের মধ্যে ভীতি ও আতংক সৃষ্টি করতে চাইছিলো। তখন মাখশা ইবনে হুমায়ের বলে উঠলো, আল্লাহর কসম, আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের ওপর একশত করে দোররা মারার শাস্তির ফয়সালা হয়ে যাক। উপরন্তু আমরা মোনাজাত করবো, তোমাদের এ সব কথার কারণে যেন আমাদের সম্পর্কে আল কোরআনের আয়াত নাযিল হয়ে যায়। আর আম্মার ইবনে ইয়াসিরের যে ঘটনা আমার কাছে এসেছে, সে বিষয়ে রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, একটি গুজব রটিয়ে দেয়া হলো যে তাঁকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। বলা হলো, বেশ তো, ওদেরকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করো ব্যাপারটা সত্য কিনা। যদি ওরা কথাটা অস্বীকার করে তো বলবে, অবশ্যই তোমরা এটা ওটা বলেছো।' এরপর আম্মার ইবনে ইয়াসির তাদের কাছে ফিরে এলেন এবং তিনি তাদেরকে ওই রটনার পেছনে যে মূল ঘটনা ছিলো তা বললেন। তারপর ওরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এসে নানা প্রকার কথা বলে ক্ষমাপ্রার্থী হলো। তখন অদীয়াত ইবনে সাবেত বললেন, এসময়ে রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর উটের ওপর বসে ছিলেন। অদীয়াত তাঁর উটের বেল্ট ধরে বলতে লাগলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা ও ঠাট্টা মস্কারিতে লিপ্ত ছিলাম। তখন মাখশা ইবনে

হুমায়ের বলে উঠলেন, আমার ও আমার বাপের নাম লিখে রাখুন। এরপর অবতীর্ণ এ আয়াতে মনে হলো তাকে (মাখশা ইবনে হুমায়েরকে) মাফ করে দেয়া হয়েছে। তারপর তার নাম রাখা হলো আবদুর রহমান। তখন সে দোয়া করলো যেন সে যুদ্ধে এমনভাবে শহীদ হয়ে যায় যে, তাকে আর খুঁজে না পাওয়া যায়। সত্য সত্যই এরপর তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে যোগদান করে শহীদ হয়ে যান এবং তাঁর কোনো চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আবুল মুনযির ও আরও কতিপয় ব্যক্তি কাতাদা (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'তাবুক অভিযানে রসূলুল্লাহ (স.) আমাদের মাঝে ছিলেন। আর তাঁর সামনে কিছু মোনাফেক ও উপস্থিত ছিলো। এসময়ে গোপনে ওরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, এ লোকটা কি আশা করে যে, তার লোকেরা সিরিয়ার বালাখানাগুলো ও কেল্লাসমূহ দখল করে তাকে সেগুলোর মালিক বানিয়ে দেবে? অসম্ভব, অসম্ভব। এ তো এক দারুণ দুরাশা! অবিলম্বে আল্লাহ তায়ালা এসব বিষয়ে তাঁর নবীকে জানিয়ে দিলেন। অতপর নবী (স.) ওদের গ্রেফতার করে আনার হুকুম দিলেন। ওদের ধরে আনা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি এগুলো বলেছো? ওরা স্বীকার করে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা নিছক ঠাট্টাচ্ছলে একথাগুলো বলেছিলাম। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে সেই কথাগুলো নাযিল করলেন যা তোমরা শুনছো।

এই যে কথাটা– অবশ্য আমরা ঠাট্টা মস্কারি করছিলাম.... জেনে রেখো, এসব বড় বড় প্রশ্ন, যার দ্বারা তারা মুসলমানদের জীবনে নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিলো, তাদের কাছে ছিলো অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু আসলে তো এগুলো ছিলো তাদের মূল ঈমান আকীদার সাথে জড়িত বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর কথা। কিন্তু তাদের কাছে ছিলো এগুলো অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার, যা নিয়ে তারা খেল তামাশা করতে পারে। তাই আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'বলো (হে রসূল) তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রসূলকে নিয়ে ঠাট্টা মস্কারি করছো?'

অবশ্যই এ কাজটি ছিলো এক মহা অপরাধ। তাই সরাসরি তাদের সম্বোধন করে বলে দেয়া হচ্ছে যে, তারা কুফরী কথাই বলেছে। তারা ঈমান আনার কথা প্রকাশ করেছে, তারপর এসব কুফরী কথাও তারা উচ্চারণ করেছে। এজন্যেই তাদের সেই আযাবের ভয় দেখানো হচ্ছে যা হয়তো ওই সকল লোক থেকে দূর করা হবে যারা অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করবে এবং প্রকৃত ঈমানের দিকে ফিরে আসবে। তবে এটাও ঠিক যে, ওই কঠিন আযাব সে মূর্খ নাদান হঠকারী মোনাফেকদের জন্যে অবধারিত যারা অনুতপ্ত হবে না, তাওবা করবে না এবং মৃত্যুদম পর্যন্ত নেফাকের ওপর টিকে থাকবে। আর তারা আল্লাহ, তাঁর রসূল, আল্লাহর প্রতি আকীদা ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেই থাকবে। এরশাদ হচ্ছে,

'(এ শাস্তি এই কারণে) যে, তারা মহা-অপরাধ করেই চলেছে।'

মোনাফেকদের পারস্পরিক সাদৃশ্য

এখানে মোনাফেকদের কথা, কাজ ও চিন্তাধারার কিছু উদাহরণ দেয়া হলো। তারপর মোনাফেকদের সাধারণ যে সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলোরও কিছু বিবরণ পেশ করা হচ্ছে। উল্লেখ করা হচ্ছে তাদের সেই সব বিশেষ ও মৌলিক দোষ ক্রটির কথা, যা তাদের বরাবর সত্যনিষ্ঠ মোমেনদের থেকে পৃথক করে রাখে এবং তাদের সেই সব আযাবের সংবাদ দেয়া হচ্ছে যা তাদের জন্যে অপেক্ষমাণ রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'মোনাফেক পুরুষ ও নারীরা পরস্পর সহযোগী ও তারা একই পত্রের পথিক, তারা একে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে মন্দ কাজের দিকে ..... তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আযাব।'

মোনাফেক পুরুষ ও নারী একই মাটি দ্বারা তৈরী, তাদের স্বভাব প্রকৃতিও একই। প্রত্যেক যামানায় ও প্রত্যেক দেশে মোনাফেকদের প্রকৃতি একই, তাদের কাজ এবং কথার মধ্যে হয়তো কিছু পার্থক্য আছে, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত একই স্বভাবের দিকে ফিরে যায় এবং একই উৎস থেকে তারা বেরিয়ে আসে। নিকৃষ্ট তাদের চিন্তাধারা এবং নিকৃষ্ট তাদের মন, সর্বদা তাদের অনুভূতিটা থাকে পুরোপুরি বিগড়ানো এবং নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের চিন্তা তাদের মাথায় সদা সর্বদা বিরাজমান। তারা মুখোমুখি কথা বলায় দুর্বলতা অনুভব করে এবং তাদের কোনো কথা বা আচরণ প্রকাশিত হয়ে পড়ুক তা তারা চায় না– এটাই হচ্ছে তাদের আসল গতিবিধি। তাদের ব্যবহারের দিকে তাকালে দেখা যাবে তারা অন্যায় কাজের জন্যে মানুষকে উস্কানি দেয় এবং ভাল কাজ করার ব্যাপারে মানুষকে নিরুৎসাহিত করে। তারা সাধারণভাবে কৃপণতা করে। কিন্তু মন্দ কাজে খরচ করার সময় দেখা যায় তারা বড়ই উদারহস্ত এবং মানুষকে দেখানোর জন্যে বা সুনামের জন্যে খরচ করতে তারা বেশ দরায দিল। তাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য বেশ স্পষ্ট, তা হচ্ছে তারা অন্যায় কাজে গোপনে ইন্ধন যোগায় এবং ভালো কাজে প্রকাশ্যে বাধা না দিয়ে অতি সংগোপনে ভালো কাজের পথে মানুষের গতিরোধ করে। এ সব অন্যায় কাজের প্রসার ঘটানোর জন্যে তারা গোপনে কূট চক্রান্তের আশ্রয় নেয় এবং ফিসফিসিয়ে ও কানে কানে কথা বলে। কথা বলে আকারে ইংগিতে। আবার সুযোগ মতো কখনও মুখের ওপর দোষ দিয়েও তারা কথা বলে। কারণ নিজেদের নিরাপত্তা বিধান না করে তারা প্রকাশ্যে কোনো কথা বলার সাহস রাখে না। 'তারা আল্লাহকে ভুলে রয়েছে,' সুতরাং মানুষের কাছে হিসাব দেয়া ছাড়া তাদের মধ্যে অন্য কোথাও জবাবদিহি করার চিন্তা নেই। অথবা তাদের স্বার্থোদ্ধার হবে, সেই আংগিকে চিন্তা করেই তারা যে কোনো ব্যাপারে অগ্রসর হয়। তারা শক্তিমান ব্যক্তিদের ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না এবং একমাত্র তাদের কাছেই মাথা নত করে এবং তাদেরকেই জায়গা দেয়। 'যার কারণে তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন।' অর্থাৎ আল্লাহর কাছে তাদের কোনো স্থান নেই, নেই কোনো মূল্য ও নেই কোনো মর্যাদা। দুনিয়ায় মানুষের সাথে বসবাস করার ব্যাপারে যেমন তারা থেকেছে নিকৃষ্ট, তেমনি আখেরাতেও তারা আল্লাহর কাছে হবে সমধিক ঘৃণ্য। তারা শক্তিশালী লোক ছাড়া আর কাউকে হিসাবেই আনে না এবং একমাত্র ভয় করে তাদেরকে যারা তাদের খোলস খুলে দিতে। তারা তাদের নিজেদের মত বেশী বেশী প্রকাশ করে এবং তাদের নিজেদের বদ্ধমূল বিশ্বাসের পেছনে অবস্থান নেয়। তারা তাদের নিজেদের চিন্তাধারা দিয়ে দুনিয়ার বিষয়াদির ফয়সালা করে। এভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে নিজ বুদ্ধিতে যুদ্ধ অথবা সন্ধি করে। এরা মানুষের প্রভুকে স্মরণ করার ওজুহাতে মানুষের কল্যাণ ভুলে যায়। সুতরাং এরা কারো অধিকার নষ্ট করার ব্যাপারে কোনো কাউকে ভয় করে না। তাই এদেরকে আল্লাহ তায়ালা উপদেশ দিচ্ছেন, মানুষও এদেরকে কর্তব্য পালনের কথা স্মরণ করায় এবং তারাও নিজেদের হিসাব সম্পর্কে বুঝতে পারে। কিন্তু হলে কি হবে, এরা বুঝেও বুঝবে না। যেহেতু,

'অবশ্যই এ মোনাফেকরা আসলেই জঘন্য অপরাধী।'

ওরা ঈমান থেকে দূরে সরে গেছে, সঠিক পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আর আল্লাহ তায়ালাও তাদের সাথে তাদের গন্তব্য স্থলের ব্যাপারে সেই ওয়াদাই করেছেন, যা তিনি কাফেরদের সাথে করেছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'মোনাফেক পুরুষ ও নারীদের সাথে এবং কাফেরদের সাথে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের ওয়াদা করেছেন। এ জাহান্নামই তাদের জন্যে যথেষ্ট।'

ওই জাহান্নামই হবে তাদের প্রাপ্য হিসাবে যথেষ্ট এবং তাদের পাপের জন্যে ওইটিই হবে উচিত প্রতিদান।

'আর আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করেছেন।'

অতএব, তারা আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়ে যাবে।

'আর রয়েছে তাদের জন্যে স্থায়ী শাস্তি।'

এটিই হচ্ছে পথভ্রষ্ট, দ্বীন থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ও অপরাধীদের প্রকৃতি। এটা তাদের কোনো নতুন অবস্থা নয়। এদের দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ দ্বারা মানুষের ইতিহাসের পাতা ভরপুর হয়ে রয়েছে। আর মানব জাতির ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যাবে অতীতের মোনাফেকদেরও ছিলো এ একই ধরণের বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তীরাও তাদের অপরাধের উপযুক্ত পরিণতি ভোগ করেছে। তাদের মন্দ আচরণের কারণে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দুনিয়াতে তারা তাদের যথোপযুক্ত প্রাপ্য তো পাবেই, তারপর পাবে আখেরাতে তাদের যোগ্য প্রতিদান। দুনিয়াতে তারা শক্তি, ধন সম্পদ ও সন্তানাদির অধিকারী, অন্যান্যদের তুলনায় অধিক থাকলেও সেগুলো সেই কঠিন দিনে তাদের জন্যে কোনো উপকারেই আসবে না।

ওদের পূর্ববর্তীদের কঠিন অবস্থার কথা উল্লেখ করে আল কোরআন তাদের নসীহত করছে এবং তাদের চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, তারা অবিকল তাদের পূর্বসূরীদের পদাংক অনুসরণ করছে এবং এজন্যে তাদের মতো একই পরিণতি তাদের ভোগ করতে হবে বলে কোরআনে করীম সতর্ক করে দিচ্ছে। যেন তারা সময় থাকতেই সঠিক পথ গ্রহণ করে। এরশাদ হচ্ছে,

ঠিক তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতোই তোমাদেরকে শাস্তি পেতে হবে বলা হচ্ছে, ওরা তোমাদের থেকেও বেশী শক্তিশালী ছিলো, সম্পদ ও সন্তানাদিতেও ছিলো ওরা বেশী। এতদসত্তেও তারা তাদের উপযুক্ত হিসসা পেয়ে গেছে। তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো একই পরিণতি ভোগ করবে। তোমরাও সেইভাবে জল্পনা কল্পনা করছো, যেমন তারা করেছিলো। ওরাই সেই সব ব্যক্তি, দুনিয়া ও আখেরাতে যাদের কাজগুলো বরবাদ হয়ে যাবে এবং ওরাই হবে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।'

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে শক্তি সম্পদ ও সন্তানাদি দিয়ে পরীক্ষা করেন। যারা মহা শক্তিমান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, তারা পৃথিবীতে সাময়িকভাবে যে শক্তির অধিকারী হয়েছে তার জন্যে অহংকারী হয় না। কারণ তারা ভয় করে তাঁকে, যিনি আরো বড় শক্তির অধিকারী, অতপর তাদের শক্তি তারা তাঁর আনুগত্য ও তাঁর বিধানকে সমুন্নত করার কাজে লাগায়। তাদেরকে সম্পদ ও সন্তানাদি দ্বারা যে পরীক্ষা করা হয়, সেটা ততো বড় নয় এবং তারা এটাকে কোনো পরীক্ষা বলেই মনে করে না। যেহেতু তারা এসব জিনিসকে সেই মহান সত্ত্বার দান বলে স্মরণ করতে থাকে। যিনি তাদের এসব দিয়েছেন। কাজেই তারা তাঁর নেয়ামতের শোকর গোযারি করার কাজে লেগে যায় এবং তাদের সম্পদ ও সন্তানাদি দ্বারা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের চেষ্টা করে। আর যারা শক্তি ও নেয়ামতের উৎস মহান আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়, তারাই অহংকার করে এবং পৃথিবীতে পাপ কাজের প্রসার ঘটায়। তারা নানা প্রকার আমোদফূর্তি ও ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়ে যায় এবং জীব-জানোয়ারের মতো শুধু পেট পূজার কাজেই ব্যস্ত থাকে। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরাই হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি, যাদের কাজগুলো দুনিয়া ও আখেরাতে বাতিল হয়ে গেছে।'

অর্থাৎ মৌলিকভাবে তাদের সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কারণ সেগুলো তো সেই সব শেকরহীন লতাপাতার মতো, যার নেই কোনো স্থায়িত্ব, যা তেমন বাড়ে না বা যার কোনো ফুল ফোটে না।

'আর তারাই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত।'

নিজেদের হীন আচরণ দ্বারা যারা সাধারণভাবে সব কিছুকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তাদের এ ধ্বংসের কোনো সীমা শেষ নেই এবং তাদের ধ্বংসের সুনির্দিষ্ট কোনো বিবরণ দেয়া যায় না।

জাতি সমূহের ধ্বংসের কারণ

অতপর কালামে পাকে উল্লেখিত বর্ণনাধারায় দেখা যায়, তাদের থেকে সম্বোধনের গতির মোড় ফিরিয়ে সর্বসাধারণ মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে যেন আল্লাহ তায়ালা আশ্চর্য হচ্ছেন ওই সব লোকদের গতিবিধি দেখে, যারা নিশ্চিন্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের পদাংক অনুসরণ করে চলেছে। দেখুন আল্লাহ পাকের বর্ণনাভংগি,

'ওদের নিকট কি তাদের পূববর্তী নূহ, আদ, সামুদ, ইবরাহীম (আ.)-এর জাতিসমূহের বার্তা পৌঁছায়নি? আসেনি কি তাদের কাছে সেই মাদয়ানবাসীর খবর যাদের– যমীনকে, (তাদের সহ) উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিলো? তাদের কাছে তাদের রসূলরা স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলো। আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর কোনো যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করতে থেকেছে।'

ওরা তো হচ্ছে সেই সব মানুষ, যারা না বুঝে সুঝে ও কোনো চিন্তা ভাবনা না করে বিলাসবহুল জীবন যাপন করে চলেছে। তারা চলছে ধ্বংসের পথে এবং তারা কোনো উপদেশেরই পরওয়া করছে না ..... ওদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে,

'তাদের কাছে কি পূর্ববর্তী জাতির ঘটনা আসেনি?'

তাদের পথেই তো ওরা চলেছে। পূর্ববর্তীদের পরিণতির খবর কি ওদের কাছে আসেনি? আসেনি কি 'নূহ জাতির খবর', যাদেরকে ডুবিয়ে মেরেছিলো এক মহা প্লাবন, যার উত্তাল তরংগ তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলো? আসেনি কি তাদের কাছে আদ জাতির খবর, যাদের এক তীব্র বায়ু প্রবাহ দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো? সামুদ জাতির ঘটনাও কি তাদের কাছে পৌঁছায়নি, যাদেরকে পাকড়াও করেছিলো বিকট এক চীৎকারধ্বনি? আসেনি কি তাদের কাছে ইবরাহীম (আ.)-এর জাতির বার্তা, যার বিদ্রোহী ও অহংকারী গোষ্ঠীকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং বাঁচিয়ে নিয়ে-ছিলেন তাঁর অন্তরংগ বন্ধু ইবরাহীমকে? আসেনি কি তাদের কাছে মাদয়ানবাসীর খবর, যাদেরকে পেয়ে বসেছিলো প্রচন্ড ভূমিকম্প এবং গ্রাস করে নিয়েছিলো তাদের সকল আবাসভূমিকে? আর মু'তাফিকাত (যাদের যমীনকে উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিলো), এদের খবরও কি তাদের কাছে পৌঁছায়নি? এরা ছিলো লূত (আ.)-এর জনপদ– অল্প কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া এদের সবাইকে মূলোৎপাটিত করা হয়েছিলো। তাদের কাছে কি ওইসব জনগণের খবর আসেনি, যাদের নিকট তাদের রসূলরা স্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিলো, কিন্তু তারা সে সব নিদর্শন অগ্রাহ্য করেছিলো। যার ফলে (তাদের গোনাহের শাস্তি স্বরূপ) আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন।

'সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে।'

নিশ্চয়ই সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া মানুষই নিজের শক্তির ওপর বড়াই করে। যার কারণে সে শিক্ষা নিতে পারে না। আল্লাহ পাকের নেয়ামত তাদের অন্ধ করে ফেলে, যার ফলে তারা দেখেও দেখতে পায় না। তাদেরকে অতীতের শিক্ষা কোনো উপকার দিতে পারে না। হাঁ শিক্ষা নিতে সক্ষম হয় তারাই, যারা আল্লাহর অলংঘনীয় নিয়ম জানার ও বুঝার জন্যে তাদের জ্ঞানের চোখ খুলে তাকায়। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চায় এবং কোনো সময়েই জ্ঞান সাধনা থেকে থেমে যায় না। তারা কোনো না-ফরমান ও না-শোকর লোকের সাথে দোস্তি করে না। আল্লাহ তায়ালা বেশীর ভাগ লোককে পরীক্ষা করেন শক্তি ক্ষমতা ও সম্পদ দান করে। যার ফলে তাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে এবং তাদের চোখগুলো পর্দাবৃত হয়ে যায়, এরই কারণে তাদের পূর্বেকার শক্তিমান জাতিসমূহের শক্তি প্রদর্শনে কি করুণ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো তা আর তারা দেখতে সক্ষম হয় না। দেখতে পায় না তারা অতীতের অহংকারী ও বিদ্রোহীদের, কি কঠিন পরিণতির সম্মুখীন তাদের হতে হয়েছিলো। এ কারণেই তাদের প্রতি আযাব নাযিল হওয়ার জন্যে উচ্চারিত আল্লাহর কথা সত্যে পরিণত হয়েছে। এ কারণেই আল্লাহর অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী তাদের ওপর ফয়সালা এসে গেছে। আর এ কারণেই মহাশক্তিমান আল্লাহর পাকড়াও তাদেকে ঘেরাও করে ফেলেছে। এমন অবস্থায় তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছে যখন তারা বিলাসিতার মধ্যে ডুবে ছিলো এবং শক্তি প্রদর্শনের নানা রকম কাজে মেতে ছিলো।

'আর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাওকারী।'

নিয়ত আমরা এ সত্য অবলোকন করি যে সমাজের শক্তিমান সচ্ছল ও বিত্তশালীরাই সত্যকে অবহেলা করে, সত্যকে দেখেও দেখে না এবং হঠকারিতায় মেতে থাকে। প্রত্যেক দেশেই আমরা এ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। তবে এসব উদাসীনতা ও সত্যবিমুখতা থেকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর যে সব নেক বান্দাকে বাঁচিয়েছেন তাদের কথা স্বতন্ত্র।

মোমেনদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আল্লাহর ওয়াদা

অপরদিকে, মোনাফেক ও কাফেরদের পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই সত্যনিষ্ঠ মোমেনদেরকে। দেখি তাদের ভিন্ন এক প্রকৃতি, স্বতন্ত্র এক ব্যবহার এবং অন্যান্যদের পরিণতির বাইরে ভিন্ন আর এক পরিণতি। এরশাদ হচ্ছে,

'মোমেন পুরুষ ও নারীরা পরস্পরের বন্ধু-দরদী .... এ হচ্ছে মহাসাফল্য।' (আয়াত ৭১-৭২)

একদিকে যখন দেখা যায় মোনাফেক পুরুষ ও নারীরা একে অপরেরই মতো স্বভাবে চরিত্রে ব্যবহারে, তেমনি মোমেন পুরুষ ও নারীরাও একে অপরের বন্ধু দরদী সহানুভূতিশীল। মোনাফেক পুরুষ ও নারীরা, প্রকৃতিতে তারা এক হলেও তারা পরস্পরের বন্ধু দরদী ও সহানুভূতিশীল হওয়ার পর্যায়ে নিজেদের উন্নীত করতে পারে না। কারণ পারস্পরিক দরদ মহব্বতের জন্যে প্রয়োজন অন্তরের উদারতা ও হৃদয়ের প্রশস্ততা। এর ফলে গড়ে ওঠে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা এবং পরস্পরকে সাহায্য করার জন্যে প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকারের মনোভাব। অপরদিকে নেফাকের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেখানে এসব উন্নত মানের গুণাবলী সৃষ্টির কোনো মন মানসিকতার সুযোগ নেই। মোনাফেক ব্যক্তিবর্গ চরিত্রের দিক দিয়ে হয় দুর্বল এবং তারা পরস্পর খোঁচা মারা কথায় হয় অভ্যস্ত। এরা দৃঢ় কোনো নীতি মেনে চলতে চায় না তা যতোই এদের প্রকৃতিতে, চরিত্রে ও ব্যবহারে মিল থাকুক না কেন। মহাপবিত্র কালাম আল কোরআনে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাদের মধ্যে বিরাজমান এ পার্থক্যগুলোর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এ জন্যে বলা হয়েছে,

'মোনাফেক পুরুষ ও নারীরা একে অপরের সদৃশ।' অপরদিকে 'মোমেন পুরুষ ও নারীরা পরস্পর দরদী বন্ধু ও সহানুভূতিশীল।'

এক মোমেনের যে প্রকৃতি তাই হচ্ছে গোটা মোমেন জাতির প্রকৃতি। তাদের প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায় একই স্বভাব। তাদের মধ্যে সদা সর্বদা পরস্পর সহানুভূতি থাকার কারণে তারা একে অন্যের জন্যে দায়িত্ব অনুভব করে।

মোমেনদের নিজেদের মধ্যে এই পারস্পরিক সহযোগিতা, সত্য প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়কে দমনের মনোবৃত্তি থাকার কারণে তারা যেন একই পরিবারের মানুষ। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তারা ভালো কাজের জন্যে উৎসাহিত করে এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে।'

ভালো কাজ প্রতিষ্ঠা ও মন্দ কাজ দমন করার জন্যে প্রয়োজন পারস্পরিক দায়িত্ব বোধ, দায়িত্ব গ্রহণ ও সহযোগিতার মনোভাব। আর এ কারণেই মোমেন জাতি এক সারিতে এসে দাঁড়াতে পারে। ঈমানের কারণেই তাদের মধ্যে বিভেদের অনুভূতি কার্যকরী হয় না। অর্থাৎ মতপার্থক্য থাকলেও তা তাদের মধ্যে সহজে ভাংগন ধরাতে পারে না। মতপার্থক্য নিসন্দেহে স্বার্থপরতার কারণেই গড়ে ওঠে এবং এটা অবশ্যই একটা সামাজিক ব্যাধি, যা তাদের একতার প্রতি হুমকি স্বরূপ। মহাজ্ঞানী সব কিছুর খবর রাখনেওয়ালা মহান আল্লাহ মুসলমানদের মধ্যে ঈমানের মাধ্যমেই এ একতা গড়ে তুলতে চান।

'তারা পরস্পরের বন্ধু দরদী সহানুভূতিশীল।'

এ পারস্পরিক দরদ মহব্বতের দ্বারাতেই তারা ভালো কাজের প্রসার ঘটায়, মন্দ কাজ বন্ধ করে, আল্লাহর মত ও পথকে সমুন্নত করার জন্যে কাজ করে এবং পৃথিবীতে এ উম্মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথ রচনা করে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তারা নামায কায়েম করে।

'এ সালাত বা নামাযই হচ্ছে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রধান মাধ্যম।

'যাকাত আদায় করে।'

এমন একটি কাজ, যা মুসলমানদের দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং বস্তুর কোরবানী ও আত্মার প্রশস্ততা প্রদর্শনের মাধ্যমে গড়ে তোলে পারস্পরিক মহব্বত এবং পারস্পরিক দায়িত্বানুভূতি।

'এভাবে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে।'

এসব কিছুর মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম পালন ছাড়া তাদের নিজেদের ইচ্ছাকে কার্যকর করার কোনো খেয়াল বা সুযোগ নেই। আল্লাহ ও রসূলের আইন ছাড়া তাদের আর কোনো জীবন বিধান নেই। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যবস্থা ছাড়া তাদের জীবনের অন্য কোনো কর্মসূচী নেই এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ফয়সালা ছাড়া নেই তাদের কোনো ব্যক্তিগত ইচ্ছা-এখতিয়ার এভাবে তারা একই কর্মসূচী মেনে চলে, একটি মাত্র লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে চলে এবং তারা সবাই একই পথের পথিক হিসাবে জীবন যাপন করে। সুতরাং একমাত্র সরল সঠিক মযবুত এ ইসলামী পথ বাদ দিয়ে তারা অন্য বিভিন্ন পথে চলে না।

' প্রতিই অতি শীঘ্র আল্লাহ তায়ালা রহমত বর্ষণ করবেন।'

এ রহমত শুধু আখেরাতের জীবনেই আসবে তা নয়, অবশ্যই এ দুনিয়ার জীবনেই প্রথম আসবে এ রহমত। আর আল্লাহর রহমত সেই ব্যক্তির ওপরেই আসবে, যে ভালো কাজের সূচনা করবে, মন্দ কাজ বন্ধ করবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে এবং এ ধরনের সৎ লোকদের নিয়ে এক মহান জামায়াত গড়ে তুলবে। অন্তরের নিশ্চিন্ততার রূপ ধরে আসবে আল্লাহ

সোবহানাহু ওয়া তায়ালার এ রহমত। আসবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে, ফেতনা ফাসাদ ও বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনার মধ্যে জীবন যাপন করার মাধ্যমে। আসবে মহান আল্লাহর রহমত ইসলামী দলের মধ্যে শাস্তি বিধান ও সংশোধনী আনা পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলা, সম্পর্ক মযবুত করা, প্রত্যেক মানুষের জীবনে প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা আনয়ন এবং নিশ্চিন্ত মনে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে।

ভালো কাজের নির্দেশ দান, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা মোমেনদের মধ্যে এ চারটি গুণ থাকায় তারা মোনাফেকদের থেকে পৃথক এক জাতি বলে চিহ্নিত ও বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। যেহেতু তাদের মধ্যে দেখা যায় তারা মন্দ কাজের দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয়......... ভালো কাজ করতে মানা করে, আল্লাহকে ভুলে থাকতে শেখায় এবং কৃপণতা করার জন্যে মানুষকে প্ররোচনা দেয়। মোনাফেক ও কাফেরদের প্রতি আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হওয়াটাও মোমেনদের জন্যে তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ এক রহমত মনে করা যায়। যে মোমেন গোষ্ঠীর মধ্যে উক্ত চারটি গুণ থাকবে, তাদেরকে অবশ্যই তিনি সাহায্য করবেন, পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করবেন এবং মানব জীবনের সঠিক পরিচালক হিসাবে তাদেরকে প্রাধান্য দান করবেন বলে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মহা শক্তিমান মহা বিজ্ঞানময়।'

অর্থাৎ, তিনি মোমেন দলকে সম্মানিত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং খেলাফতের এ মহান দায়িত্ব এবং উন্নত গুণাবলীর বিকাশের লক্ষ্যে তাদেরকে অবশ্যই সম্মানিত করবেন। তিনি তাদের সাহায্য ও সম্মান দান করার মাধ্যমে তাঁর নিজ ক্ষমতা বাস্তবায়িত করায় অবশ্যই তিনি মহা বিজ্ঞানময়, যেন পৃথিবীর অশান্তি দূর হয়ে সেখানে কল্যাণ ও ভালো কাজের প্রসার ঘটে আর সর্বদা আল্লাহর বিধান মানুষের সকল কাজের তদারক করতে পারে।

এটা স্থির সত্য যে, মোনাফেক ও কাফেরদের জন্যে জাহান্নামের আযাব অপেক্ষা করছে এবং ওদের জন্যে তাঁর লা'নত ওঁৎ পেতে রয়েছে। আর ওরা তাঁকে ভুলে থাকায় তাদের জন্যে পথভ্রষ্টতা ও কল্যাণ থেকে বঞ্চনা নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। অপরদিকে জান্নাতের নেয়ামতসমূহ মোমেনদের জন্যে অপেক্ষা করছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের জন্যে রয়েছে বাগ বাগিচায় ভরা বেহেশতসমূহ, যার নীচু দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে ছোট ছোট নদীসমূহ এবং চিরস্থায়ী সেই বেহেশতগুলোতে থাকবে তাদের পবিত্র বাসস্থান।'

এসব নেয়ামত ভরা বেহেশত তৈরী রয়েছে যেন তারা নিশ্চিন্তে সেখানে বসবাস করতে পারে। এছাড়া আর যে জিনিসটি তারা পাবে তা আরো বড়, আরও মহান। তা হচ্ছে, দেখুন আল্লাহর এরশাদ–

'আর রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, যা সব থেকে বড় (নেয়ামত)।'

আর জান্নাতের মধ্যে যতো নেয়ামত রয়েছে, সব কিছু এক সাথে মিলিত হলেও মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির কাছে ম্লান মনে হবে। এজন্যেই এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহর সন্তুষ্টি সব থেকে বড়।'

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে মিলিত হওয়ার যে মধুর মুহূর্ত তার কোনো তুলনা নেই। এ হচ্ছে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ দীদারের মুহূর্ত। এ সময় নেককার মানবমন্ডলীর হৃদয় তন্ত্রীর বদ্ধ দুয়ার খুলে যাবে, হালকা হয়ে যাবে দুনিয়ার সকল দুঃখ কষ্টের বোঝা, যা মনে হবে এইমাত্র তারা ছেড়ে

এসেছে। এসময়ে মোমেন তার হৃদয়ের গভীরে এমন এক নূরের জ্যোতি অনুভব করবে, যা সাধারণ চর্ম চোখে মালুম হওয়া সম্ভব নয়। এ হচ্ছে সেই মহান মুহূর্ত, যখন আল্লাহর নূরের আলোকে গভীরভাবে আলোকিত হবে মোমেনের আত্মা। আনন্দঘন এ মুহূর্তগুলোর যে কোনো একটি মুহূর্তকে তুলনা করা যায় মানুষের হৃদয়ের সেই গভীর অনুভূতির সাথে যা মেঘমুক্ত আকাশে শুভ্র সমুজ্জ্বল ও স্বচ্ছ কিরণের পরশে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং যার উজ্জ্বলতার সামনে ম্লান হয়ে যায় ধরণীর বুকের সকল বস্তু এবং উন্মুক্ত আকশে ঘূর্ণিয়মান সকল গ্রহ উপগ্রহ। কল্পনার চোখে একবার চেয়ে দেখুন ওই মধু মিলনের আনন্দঘন মুহূর্তের দিকে কেমন করে পরম প্রেমময় পরওয়ারদেগারে হাকীমের সন্তোষের বারিধারায় অবগাহন করবে মোমেনদের আত্মাসমূহ। যার মধুর পরশ বিচ্ছিন্ন হবে না কখনো।

'হাঁ, এটিই সেই মহা মহা সাফল্য।'

মোনাফেকদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের নির্দেশ

সত্যনিষ্ঠ মোমেনদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর ওইসব মোনাফেকের ত্রুটি বিচ্যুতি আলোচনা করা হচ্ছে যারা ঈমানের দাবী করতো........ এ পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। এ প্রসংগে আল কোরআন জানাচ্ছে যে, ওই মোনাফেকরা নানা প্রকার কুফরী কথা উচ্চারণ করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর বাস্তবে তারা কুফরী কাজে মশগুল রয়েছে। নবীকে কষ্ট দেয়ার জন্যে তারা এমন জল্পনা-কল্পনা ও পরিকল্পনা করেছে, যার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের কঠিনভাবে তিরস্কার করছেন। ওরা বলতে চেয়েছে যে, নবী (স.)-এর কাছে ওহী আসা একটা বাজে কথা। তাদেরই সচ্ছলতা বিধান ও কল্যাণের জন্যে তিনি প্রেরিত হয়েছেন একথা বুঝা সত্তেও তাঁকে দোষারোপ করার অপচেষ্টার কারণে আল কোরআন চরম বিস্ময় প্রকাশ করছে। সাথে সাথে এ পবিত্র কালাম তাদেরকে সময় থাকতেই তাওবা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করছে এবং কুফরী ও নেফাকের মধ্যে নিমজ্জিত থাকার পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে নবী, কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো এবং কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করো তাদের বিরুদ্ধে ...... পৃথিবীতে তাদের কোনো বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই। (আয়াত ৭৩-৭৪)

রসূলুল্লাহ (স.) মোনাফেকদের প্রতি খুবই নরম ছিলেন, তাদের অনেকের ওপর ক্রুদ্ধও ছিলেন এবং অনেককে ক্ষমার চোখেও দেখতেন। তাদের ব্যাপারে তিনি চরম সহনশীলতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর ক্ষমাও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো এবং এমন একটা পর্যায় এসে গিয়েছিলো যখন তাঁর রব, তাদের সাথে ব্যবহারের ব্যাপারে নতুন এক অধ্যায় খোলার নির্দেশ দিলেন। আল কোরআন তাদেরকে কাফেরদের মধ্যে গণ্য করার নির্দেশ দিলো এবং কোনো প্রকার দয়া মায়া না করে এবং কোনো প্রকার নরম পন্থা অবলম্বন না করে তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ও কঠিন জেহাদ ঘোষণা করার হুকুম জারি করলো।

আসলে নরম ব্যবহারের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র আছে, যেখানে নরম ব্যবহার করাতে ফায়দা হয়। তেমনি কঠোর ব্যবহার করার জন্যেও কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে কঠিন ব্যবহারের মাধ্যমে দেশ ও দশের কল্যাণ সাধিত হয়। অতএব, নরম ব্যবহারের মাত্রা চরমে পৌঁছে যাওয়ার পর কঠোর ব্যবহারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর পারস্পরিক ধৈর্যাবলম্বনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তখন চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করাই অপরিহার্য হয়ে যায়। এখানে অবশ্যই হিসাব করে দেখতে হবে কোন পর্যায়ে কি ব্যবহার উপযোগী এবং কোন ক্ষেত্রে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। এমন

কিছু পর্যায় মানুষের জীবনে এসে যায় যখন নরম ব্যবহার সার্বিকভাবে মানুষের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং বুঝা যায় যে, আরো বেশী দিন নরম ব্যবহার করলে গোটা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এখন, মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রকৃতি কী হবে, সে বিষয়ে কিছু মতভেদ পাওয়া যায়। হযরত আলী কাররমাল্লাহু ওয়াজহাহু মনে করেন। হাঁ, এটা সশস্ত্র জেহাদ হতে হবে। ইবনে জারীরও এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন। আবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মতে এ জেহাদ হতে হবে অর্থনৈতিক অবরোধ ও সামাজিক বয়কটের মাধ্যমে এবং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এর মাধ্যমে তাদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। এ বিষয়ে তাঁর দলীল হচ্ছে, রসূলুল্লাহ কোনো মোনাফেককে হত্যা করেননি, অথবা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করেননি। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা যে সব কথা বলে তার প্রতিটি কথার পেছনে আল্লাহর নামে কসম খায়, আর তারা নানা কুফরী কথা উচ্চারণ করে। তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরী করেছে এবং এমন সব চিন্তা তারা করেছিলো যা বাস্তবায়িত করতে পারেনি।'

খেয়াল করে দেখুন, ওপরের আয়াতটি মোনাফেকদের বিভিন্ন পদক্ষেপের অবস্থা সামনে রেখে তাদের মূল চেহারা তুলে ধরেছে এবং তারা যে বারবার রসূল (স) ও মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিলো, সে কথা ইশারায় বলে দিয়েছে। এ পর্যায়ে আরো কিছু রেওয়ায়াত পেশ করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

কাতাদা বলেন, আয়াতটি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলো। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, জুহন কবীলার এক ব্যক্তি এবং এক আনসারীর মধ্যে ঝগড়া লাগে। তখন জুহনী লোকটি আনসারীর ওপর বেশ বাড়াবাড়ি করে। এসময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (ঘটনাটি জানতে পেরে) আনসারীকে উস্কানি দিতে গিয়ে বলে ওঠে, তুমি তোমার দলের লোকদের সাহায্যের জন্যে ডাকো না কেন? আল্লাহর কসম, আমাদের আর মোহাম্মদ-এর উদাহরণ হচ্ছে, যেমন একজন বলেছিলো, তোমার কুকুরটাকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা-তাজা বানিয়েছো, এখন সেতো তোমাকেই খেতে চায়। আর এক দিন সে বলেছিলো, আমরা যখন মদীনায় ফিরে যাবো, তখন আমাদের সম্মানিত ব্যক্তি ছোট লোকদের ঝেঁটিয়ে বের করে দেবে। এক মুসলমান একথাটা শুনতে পায় এবং সাথে সাথে ছুটে গিয়ে রসূলুল্লাহ (স.)-কে জানিয়ে দেয়। রসূল (স.) তৎক্ষণাত তাকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞাসা করেন। তখন সে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বললো যে, না সে কিছুতেই একথা বলেনি। অতপর এ আয়াতটি নাযিল হলো।

ইমাম আবু জা'ফর ইবনে জারীর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে একটি হাদীস রেওয়ায়াত করেন। তাতে বলা হয়েছে, ইবনে আব্বাস বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) একটি গাছের নীচে বসে ছিলেন। এ সময় তিনি বলেন। 'শীঘ্রই তোমাদের কাছে একজন লোক আসবে, সে তোমাদের দিকে শয়তানের দৃষ্টি দিয়ে তাকাবে, কাজেই সে এলে খবরদার তোমরা তার সাথে কেউ কথা বলবে না।' কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই কালো মতো একটি লোককে আসতে দেখা গেলো। তখন রসূলুল্লাহ (স.) তাকে ডাক দিতেই সে বলে উঠলো, 'আপনি এবং আপনার সংগী সাথীরা আমাকে কি কারণে গালি দিচ্ছেন?' এরপর লোকটি চলে গেলো এবং তার কিছু সাথীকে নিয়ে আবার ফিরে এলো এবং যা বললো তার প্রত্যেকটা কথাই কসম খেয়ে বললো। তখনই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা এ আয়াতটি নাযিল করলেন,

'ওরা যা বললো তার প্রত্যেকটা কথাই কসম খেয়ে বললো .... আয়াতটি শেষ পর্যন্ত দেখুন।'

ওরওয়াহ ইবনে যোবায়ের ও তাঁর কয়েকজন বন্ধুর বিবরণীতে জানা যায় যে আয়াতটি নামে তার হয়েছিলো জাল্লাস ইবনে সোওয়ায়েদ ইবনে সামত সম্পর্কে। উমায়ের ইবনে সা'দ স্ত্রীপক্ষের এক পালক পুত্র ছিলো। জাল্লাস বললো, মোহাম্মদ যা নিয়ে এসেছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে যে গাধাগুলো আমাদের বাড়ীতে আছে আমরা সেগুলো থেকেও নিকৃষ্ট ও অধম হয়ে যাবো। তখন উমায়ের বললো, আল্লাহর কসম হে জাল্লাস, আপনি আমার দৃষ্টিতে সকল মানুষ থেকে সেরা মানুষ, সর্বাবস্থায় আপনি আমার কাছে সুন্দরতম মানুষ এবং আমি মনে করি আপনাকে কোনো খারাপ জিনিস স্পর্শ করতে পারবে না। আমি একটি কথিকা বানিয়েছি, আপনাকে সেটা জানালে আমাকে লজ্জা দেবেন, আর না বললেও আমি কুরে কুরে মরবো। অবশ্য আমার জন্যে একটা আর একটা থেকে ভালো। রসূল (স.)-কে কথাটা জানানো হলে তিনি ওকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তখন সে এসব কথা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে অস্বীকার করলো। তারপর নাযিল হলো আল্লাহর আয়াতগুলো। লোকটি ওই কথাগুলো বলেছে বলে যখন স্বীকার করলো, তখন তাকে তাওবা করতে বলা হলো এবং সে তাওবা করলো এবং এতে তার তাওবা কবুলও হয়ে গেলো।

তবে এসব রেওয়ায়াত কোরআনের আয়াত 'ওরা সেই সব কুচিন্তা করেছিলো যা ওরা পায়নি'— একথার সাথে মিল খায় না। অবশ্য এ রেওয়ায়াতগুলো এ কারণে একটা আর একটার সহায়ক যে, এগুলো দ্বারা ওই অর্থটা জোরদার হয়, যা তাবুক অভিযান থেকে ফেরার সময় মোনাফেকরা মনে-প্রাণে চেয়েছিলো। আর তা ছিলো রসূলুল্লাহ (স.)-কে কতল করা, অর্থাৎ তাবুক অভিযান থেকে ফেরার সাথে সাথে তাকে হত্যা করতে হবে।

ইমাম আহমদ আবু তোফায়েলের একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেন। যখন রসূলুল্লাহ (স.) তাবুক অভিযান থেকে ফিরে আসার জন্যে রওয়ানা হলেন, তখন একজনকে ঘোষণা দিতে বললেন। সে বললো, রসূলাল্লাহ (স.) এক গিরি সংকটে পাহাড়ের এক চূড়ার দিকে উঠছেন। সেখানে আর কারো যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এর মধ্যে দেখা গেলো রসূল (স.)-কে হুযায়ফা পথ দেখাতে দেখাতে সামনে এগিয়ে আসছেন এবং তাঁর উটের রশি ধরে টেনে আনছেন আম্মার। এ সময় হঠাৎ করে মুখোশ পরা এক দল উটের আরোহী এগিয়ে এলো এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর উঁটের রশিধারক আম্মারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আম্মারও ওদের কাফেলার উঁটের মুখের ওপর আঘাত করতে করতে এগিয়ে গেলেন। তখন রসূলুল্লাহ (স.) হুযায়ফাকে বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে' এ বলতে বলতে তিনি উঁটের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালেন। আম্মার ইতিমধ্যে তাঁর কাছে ফিরে এলেন। তখন রসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন হে আম্মার, এলোকগুলোকে চিনতে পেরেছো কি? তিনি বললেন, হাঁ আমি সাধারণভাবে সবাইকে চিনেছি, যদিও ওরা নেকাব পরে এবং ছদ্মবেশে ছিলো। রসূল (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা কি চেয়েছিলো বুঝতে পেরেছো কি?' আম্মার বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। এরপর বললেন, ওরা রসূলুল্লাহ (স.)-কে নিয়ে পালাতে চেয়েছিলো, ওদের উদ্দেশ্য ছিলো, তাঁর সওয়ারী সহ তাঁকে হাইজাক করে নিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে ফেলে দেবে। রেওয়ায়াতকারী বলেন, আম্মার রসূল (স.)-এর একজন সাথীকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বললেন, 'তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, বলো দেখী তোমার জানামতে কতো জন লোক ছিলো ওই পাহাড়ের চূড়ায়? ওই ব্যক্তি বললো, চৌদ্দজন মানুষ। তখন রসূল (স.) বললেন, তুমি ওদের সাথে থাকলে তোমাকে নিয়ে মোট পনের হতো, তাই না? তারপর রসূলুল্লাহ (স.) ওদেরকে গুনলেন। ওদের মধ্য থেকে তিন জন বললো, আল্লাহর কসম, আমরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর ঘোষণাকারীর আওয়ায শুনতে পাইনি। আর ওই

লোকগুলো কী করতে চেয়েছিলো তাও আমরা জানি না। এরপর আম্মার বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, বাকি বারো জনকে যতো দিন দুনিয়ার জীবনে দেখেছি, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যে যুদ্ধ করেছে এবং সে দিনও করবে যেদিন সকল মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

এ ঘনটনাটি ওই লোকদের পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছে, যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাফেলার মধ্যে প্রবেশ করতে চেয়েছিলো। আয়াতটি তাদের ও তাদের মতো অন্য সম চরিত্রের লোকদের সম্পর্কে যদি উল্লেখ করে থাকে সেটা বিচিত্র কিছু নয়। তবে আয়াতটিতে এহেন খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতার পেছনে যুক্তিসংগত কি কারণ থাকতে পারে, সে বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। কোরআনের আয়াতে এভাবে বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

'আল্লাহ তাদের প্রতি কৃপা করেছেন বলেই তো তারা অভাবমুক্ত হয়েছে এবং রসূল (স.)-এর উদারতা তাদেরকে এ সচ্ছলতা দান করেছে আর সেই কারণেই তো তাদের এত ক্রোধ ঝরে পড়ছে।'

ইসলাম তো তাদের এমন কোনো ক্ষতি করেনি যার কারণে তাদের রাগ হতে পারে এবং ইসলাম ও তার ধারক বাহকের ওপর তারা এমনভাবে মারমুখী হয়ে উঠতে পারে। আসলে ইসলাম তাদেরকে যে সচ্ছলতার নেয়ামত দান করেছে এটাই তাদের ক্রোধ দুশ্চিন্তার মূল কারণ। ইসলাম মুসলমানদের জীবনে এনে দিয়েছে শান্তি শৃংখলা ও নিশ্চিন্ততা এটা যেন তাদের সহ্য হচ্ছে না, তার জন্যেই এতো রাগ!

তাদের অকৃতজ্ঞতা ও নিকৃষ্ট চরিত্রের মুখোশ খুলে দেয়ার পর এবং তাদের এ অসদাচরণের ওপর বিস্ময় প্রকাশ করে তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হচ্ছে,

'যদি তারা তাওবা করে, তাহলে তা তাদের জন্যে ভালো হবে, আর যদি মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বেদনাদায়ক আযাব দান করবেন এবং পৃথিবীতে তাদের জন্যে কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না।'

অর্থাৎ, এসব আশ্বাসবাণী দান করার পর তাদের জন্যে তাওবার দরযা খুলে রাখা হচ্ছে, তা তাদের অতীতের অশুভ তৎপরতা যতো কঠিনই হোক না কেন। এখন যার ইচ্ছা সে পায়ে পায়ে তাওবার সেই খোলা দরযার দিকে এগিয়ে যাক, আর যে বাঁকা পথে চলতে চায় সেই দিকেই তারা চলুক– তাদের পরিণতি তো জানাই আছে, আর তা হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি এবং দুনিয়ায় তাদের কোনো সাহায্যকারী ও সমর্থনকারী না থাকা..... যে ব্যক্তি এপথ ধরতে চাইবে ধরবে, যে না চাইবে না ধরবে এবং এ ব্যাপারে যাবতীয় দোষের ভাগী সে একাই হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'যদি তারা তাওবা করে, তা হবে তাদের জন্যে কল্যাণকর। আর তাওবা না করে যদি সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে তারা অন্যদিকে চলে যায় তাহলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব, আর তাদের জন্যে পৃথিবীতে কোনো বন্ধু থাকবে না, থাকবে না কোনো সাহায্যকারীও।

সম্পদের মোহ মানুষকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে দেয়

এরপর আলোচনাধারায় মোনাফেকদের উদাহরণ ও তাদের বিভিন্ন অবস্থা ফুটে উঠেছে, ফুটে উঠেছে যুদ্ধাভিযানের পূর্বে ও অভিযান কালে মোনাফেকদের বিভিন্ন কথা। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে আল্লাহর সাথে এ বলে ওয়াদা করেছিলো, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর মেহেরবানী দান করেন, তাহলে অবশ্যই দান খয়রাত করব এবং আমরা

ভালো মানুষ হয়ে যাবো। ....তাদের এ কঠিন পরিণতি........ যেহেতু তারা মিথ্যা কথা বলেছে। (আয়াত ৭৫-৭৭)

অর্থাৎ মোনাফেকদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যে আল্লাহর সাথে এ বলে ওয়াদা করেছিলো যে, যদি আল্লাহ তায়ালা তাকে নেয়ামত ও বিভিন্ন প্রকার জীবন সামগ্রী দান করেন, তাহলে অবশ্যই সে দান খয়রাত করবে এবং তার আচরণ শুধরে নেবে......... কিন্তু তার ওয়াদা তো তার দুঃখ-দৈন্যের সময়েই ছিলো, যখন সে বড়ই সংকটের মধ্যে ছিলো এবং যখন বুকে নানা প্রকার আশা আকাংখা বিরাজ করছিলো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যখন তার দোয়া কবুল করে নিলেন এবং তাঁর নিজ মেহেরবানীতে তার সকল দুঃখ দৈন্য ও সংকট দূর করে দিলেন, তখন তার ওয়াদা সে অবলীলাক্রমে ভুলে গেলো, বরং সে ওয়াদা করেছিলো বলেও অস্বীকার করে বসলো। তাকে লোভ লালসা ও কৃপণতা পেয়ে বসলো এবং তখন তার হাত চাপা হয়ে গেলো। অতপর তার ওয়াদার কথা একেবারেই সে বে-মা'লুম ভুলে গেলো। এতোটুকুতেই সে ক্ষান্ত হলো না, বরং ওয়াদা ভংগের পাশাপাশি সে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার ওপর মিথ্যাও আরোপ করে বসলো। এ মিথ্যারোপই তার মধ্যে মোনাফেকী মনোবৃত্তি জিইয়ে রাখতে তাকে সাহায্য করলো। আর তার এ আচরণ নেফাক নিয়ে মৃত্যুবরণ করা ও এ নেফাক নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করার দিকে তাকে এগিয়ে দিলো।

মানুষ মাত্রই দুর্বল ও লোভী। তবে আল্লাহ তায়ালা যাকে বাঁচান তার কথা সম্পূর্ণ আলাদা। ঈমানে যার হৃদয় ভরপুর হয়ে রয়েছে, সে ছাড়া এ লোভের হাতছানি থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। একমাত্র এ ঈমানের মোহনী স্পর্শ তাকে এতটা মহীয়ান করে যে, সে পার্থিব প্রয়োজন ও তা আকর্ষণ থেকে নিজেকে উর্ধে তুলতে সক্ষম হয়, একমাত্র সে-ই সহজ আশুপ্রাপ্তির লোভের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারে। কারণ সে জানে ও বিশ্বাস করে যে, এ লোভ সংবরণের ফলে তার জন্যে অপেক্ষা করছে মহা সৌভাগ্য, অপেক্ষা করছে সর্বশ্রেষ্ঠ, গরীয়ান মহীয়ান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি। আর মোমেনের হৃদয় ঈমানী প্রভায় নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্ত, সুতরাং খরচ করলে অভাব আসার ভয় সে করে না। কারণ সে তো বিশ্বাস করে যে, মানুষের কাছে যা আছে তা সবই শেষ হয়ে যাবে, আর মহান আল্লাহর কাছে যা আছে তাই বাকি থাকবে। এ নিশ্চিন্ততাই তো তাকে আল্লাহর রাহে তার কষ্টার্জিত ধন সম্পদ ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করে, উৎসাহিত করে আনুগত্য ভরা মন নিয়ে তাঁর রাহে ব্যয় করতে, ব্যয় করতে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে ও পবিত্রতা অর্জনের জন্যে। সে বিশ্বাস করে, যদি তার সম্পদ হারিয়ে যায় ও দৈন্য দশা এসে যায়, তবু সে এর থেকে আরো আরো অনেক বড় বদলা আল্লাহর কাছে পাবে।

মানুষের অন্তর যখন সঠিক ঈমান থেকে খালি হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে স্বভাবসুলভ প্রকৃতিগত কৃপণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, যার কারণে যখনই সে কিছু খরচ করতে চায় বা দান খয়রাত করার জন্যে হাত প্রসারিত করে, তখনই তার সংকীর্ণ মন তাকে বাধা দেয়, তাকে গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায়, ব্যস আর সে খরচ করতে পারে না। এরপর সে এমনভাবে সংকীর্ণতা ও ভয়ের শিকার হয়ে যায় যে তার মনের প্রশান্তিও স্থিরতা দূর হয়ে যায়।

এহেন ব্যক্তিই তো আল্লাহর সাথে চুক্তি করে তা ভংগ করে, এমনই মানুষ অবলীলাক্রমে আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে, যার কারণে তাঁর সাথে করা ওয়াদা ভংগ করতে সে কোনো দ্বিধাবোধ করে না এবং তার অন্তরও নেফাকের কদর্যতা থেকে দূরে থাকতে পারে না। এ বিষয়ে

রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'মোনাফেকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে– মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভংগ করে, তার কাছে আমানত রাখলে, সে আমানতের খেয়ানত করে।(১)

সুতরাং ওয়াদা খেলাফী ও আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করার পর এদের অন্তরের ওপর স্থায়ীভাবে মিথ্যা সওয়ার হয়ে যায়, যার দিকে আলোচ্য আয়াতটি ইশারা করেছে।

'আল্লাহর সাথে ওয়াদাখেলাফী করায় ও মিথ্যা কথা বলায় কেয়ামত পর্যন্ত তাকে নেফাক তাড়া করে ফিরবে এবং স্থায়ীভাবে তার অন্তরে এ কপটতা গোপনে বাসা বেঁধে থাকবে। আরও এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা কি জানে না যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের গোপন কথা জানেন এবং নিভৃতে যে পরামর্শ ওরা করে, তাও জানেন? আর এও কি ওরা জানে না যে, তিনি গায়েবের সব বিষয় সম্পর্কেই পুরোপুরি খবর রাখেন?'

ওরা কি জানে না– একথা বলে তাদেরকে ঈমানের দিকে আহবান জানানো হচ্ছে। জানানো হচ্ছে যে, আল্লাহ সকল গোপনীয়তা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। যতো কথাই তারা নিজেদের মধ্যে চালাচালি করে, সবই আল্লাহর নখদর্পণে রয়েছে। ওরা হয়তো ভাবে, যা ওরা বলাবলি করেছে, সবই গোপন রয়ে গেছে। কারণ তারা মানুষের অগোচরে অনেক সলা পরামর্শ করে, আর ভাবে কেউই বোধ হয় জানলো না! হায় ওরা যদি বুঝতে পারতো যে, ওদের অবচেতন মনের গোপন ইচ্ছা এরাদাও আল্লাহর কাছে অবিদিত নয়, তাহলে কিছুতেই আল্লাহর সাথে করা চুক্তি ভংগ করতো না, আর দান করার জন্যে আল্লাহর নামে যে শপথ করেছিলো, সে বিষয়েও আল্লাহর ওপরে কোনো মিথ্যারোপ করতো না।

এ তিনটি আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বহু রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্য থেকে আমরা ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়াত দুটি পেশ করছি। দুটি হাদীসই সা'লাবা ইবনে হাতেব আনসারীর বরাত দিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)-কে তিনি বললেন, (ইয়া রসূলাল্লাহ) আমার জন্যে আল্লাহর কাছে মেহেরবানী করে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে সম্পদশালী করে দেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) তাকে বললেন, দুঃখ হোক তোমার জন্যে হে সা'লাবা, এতো সম্পদ চেয়ো না, যার শোকর গোযারি করতে তুমি অপারগ হয়ে যাবে। তার থেকে বরং কম সম্পদ নিয়েই খুশী থাকো, যার শোকরগোযারি তুমি করতে পারবে। সা'লাবা বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) পুনরায় কথাটি বললেন। এরপর বললেন, তুমি কি আল্লাহর নবীর মতো হওয়া পছন্দ করবে না? শোনো, আমার জীবন যাঁর হাতের মধ্যে রয়েছে, আমি তাঁর কসম খেয়ে বলছি, আমি যদি চাইতাম (আশপাশের) পাহাড়গুলো আমার জন্যে স্বর্ণ ও চাঁদিতে পরিণত হয়ে এগিয়ে আসুক, তাহলে সেগুলো অবশ্যই সোনা-চাঁদি হয়ে এগিয়ে আসত।' সা'লাবা বলে উঠলেন,

'কসম সেই মহান সত্ত্বার, যিনি আপনাকে সত্য সহ (সত্য জীবন ব্যবস্থা নিয়ে) পাঠিয়েছেন, যদি দয়া করে আপনি আমার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, আর তিনি যদি আমাকে প্রচুর সম্পদ দিতেন, তাহলে আমি প্রত্যেক হক দারের হক আদায় করে দিতাম।' তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! সা'লাবার জন্যে আপনি ধন সম্পদ বরাদ্দ করুন।' সা'লাবার পর রেওয়ায়াতকারী বাহেলী বলেন, তিনি (সা'লাবা) কিছু ভেড়া বকরী পালতে শুরু করলেন, অতপর এগুলো কৃমির মতো বাড়তে থাকলো, এমনকি এগুলোর জন্যে মদীনা নগরী সংকীর্ণ হয়ে গেলো,

(১) বোখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীসটি এসেছে।

যার কারণে তিনি এদেরকে নিয়ে মদীনার বাইরে এক উপত্যকায় চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে এগুলো এতো বাড়তে থাকলো যে, তিনি শুধুমাত্র যোহর ও আসরের নামায জামায়াতের সাথে পড়তে থাকলেন এবং বাকি নামাযগুলো তিনি পরিত্যাগ করতে লাগলেন। এরপর ভেড়া বকরীর সংখ্যা আরো বেড়ে গেলো, সেগুলো নিয়ে তিনি এতো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, জুময়ার নামায ছাড়া বাকি সমস্ত নামায বাদ যেতে শুরু হলো। এগুলো কৃমির মতো বাড়তেই থাকলো, এমন কি ব্যস্ততার কারণে জুময়ার নামায পড়ার অবসরও আর তার থাকলো না। হঠাৎ একদিন কয়েকজন উঁটের আরোহী এদের খোঁজখবর নেয়ার জন্যে সেখানে উপস্থিত হলো। তাদের কাছে রসূলুল্লাহ (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'সা'লাবার অবস্থা কি?' তারা বললো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, তার তো এতো ছাগল-ভেড়া হয়ে গেছে যে, মদীনার যমীন তার জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গেলো। এরপর তার বৃত্তান্ত শুনে রসূলুল্লাহ বললেন, হায় আফসোস সা'লাবার জন্যে! হায় আফসোস সা'লাবার জন্যে! হায় আফসোস সা'লাবার জন্যে! তারপর আল্লাহ জাল্লা শানুহু নাযিল করলেন,

'তাদের সম্পদ থেকে সাদকা (যাকাত) গ্রহণ করো ....।

এ সাথেই পুরো যাকাতের আয়াতটি নাযিল হলো। এর অব্যবহিত পরেই রসূলুল্লাহ (স.) বিত্তশালী মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করার জন্যে দু'জন লোক পাঠিয়ে দিলেন– একজন বনী বুহায়লা এবং অন্য জন বনী সোলায়মের মধ্য থেকে ছিলো। তারা মুসলমানদের কাছ থেকে কিভাবে যাকাত আদায় করবে, সে বিষয়ে তাদেরকে রসূলুল্লাহ (স.)-এর পক্ষ থেকে লিখিত নির্দেশিকা দিয়ে দেয়া হলো। তাদের দুজনকে রসূলুল্লাহ (স.) বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিলেন। বললেন, সা'লাবা এবং বনী সুলায়েমের অমুক অমুক ব্যক্তিকে যাকাত দিতে বলবে। তারপর যদি তারা দেয়, তাদের কাছ থেকে হিসাব করে যাকাত নিয়ে নেবে। এরপর তারা রওয়ানা হয়ে প্রথমেই সা'লাবার কাছে এসে যাকাত চাইলেন এবং তাকে রসূল (স.)-এর নির্দেশটি পড়ে শোনালেন, তখন সে বলে উঠলো, এটাও তো দেখা যায় এক প্রকার জিযিয়া, জিযিয়া যদি নাও হয়, তাহলে জিযিয়ার বোন তো বটেই। জানি না এটা কি জিনিস। আচ্ছা, এখন তো যাও, অন্য জায়গা থেকে কাজ সেরে তারপর এখানে এসো কেমন? সুলামী কাবীলার অন্য একটি লোক কথাগুলো শুনছিলো, সে তাকালো তার উঁটের সুন্দর দাঁতগুলোর দিকে। তারপর তাকে যাকাত বাবদ আদায়কারী ওই দুই ব্যক্তির দিকে ওটাকে এগিয়ে দিলো। এটা দেখে যাকাত আদায়কারী ব্যক্তিরা বলে উঠলেন, তোমার ওপর তো এতোটা ওয়াজেব হয়নি এবং তোমার থেকে আমরা এটা নিতেও চাইনি। সুলামী কাবীলার ওই লোকটি তখন বললো, ঠিক আছে, এটা তোমরা নিয়ে নাও। আমার মন, এর দ্বারা পবিত্র হোক এটা আমি চাই এবং এজন্যেই এটা আমি দিয়ে দিলাম। তখন যাকাত আদায়কারী ব্যক্তিদ্বয় তার থেকে এটা গ্রহণ করলেন এবং ওখান থেকে চলে গিয়ে অন্যান্যদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করলেন। এরপর তাঁরা সা'লাবার কাছে ফিরে আসলে সে বললো, তোমাদের কাছে লিখিত যে নোটস আছে ওটা আমাকে দেখাও। সে এটা পড়ে দেখে বললো, এটা তো জিযিয়া ছাড়া আর কিছু নয়, আর জিযিয়া না হলেও জিযিয়ার বোন তো বটেই। তোমরা এখন যাও, দেখি কি করা যায়। ওরা দুজন চলে গেলেন এবং নবী (স.)-এর কাছে পৌঁছুলেন। তাঁদের দেখে নবী (স.) তাদের সাথে কথা না বলেই বললেন, হায় দুঃখ সা'লাবার জন্যে! তারপর সুলামীর অর্থে বরকত হওয়ার জন্যে তিনি দোয়া করলেন। তখন আদায়কারী ব্যক্তিদ্বয় সা'লাবা কি করেছে এবং সুলামী কাবীলার ব্যক্তি যা করেছে সে সব কথা খুলে বললেন। তারপরই আল্লাহ রব্বুল আলামীন নাযিল করলেন,

'ওদের মধ্যে কেউ এমন আছে, যে আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর মেহেরবানী দ্বারা যদি দান করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই দান খয়রাত দেবো ....।'

এসময় রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে সা'লাবার আত্মীয়দের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলো। সে একথাগুলো শুনে সা'লাবার কাছে এসে বললো, আফসোস তোমার জন্যে হে সা'লাবা! তোমার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এই কথা নাযিল করেছেন। অতপর সা'লাবা রওয়ানা হয়ে নবী (স.)-এর কাছে আসলো এবং তাঁকে যাকাত গ্রহণ করার জন্যে অনুরাধ করলো। তখন নবী (স.) বললেন, 'তোমার যাকাত গ্রহণ করতে আমাকে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেছেন।' তারপর সা'লাবা মাথায় মাটি মেখে আর্তনাদ করে উঠলো। রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, এ হচ্ছে তোমার আমল (কৃতকর্ম), আমি তোমাকে বেশী ধন সম্পদ সম্পর্কে কিছু নির্দেশ দিয়েছিলাম, তুমি আমার কথা মানোনি।' রসূল (স.) তার যাকাত গ্রহণ করতে অস্বীকার করার পর সে ফিরে এলো। এরপর রসূল (স.)-এর ইন্তেকাল হওয়া পর্যন্ত তার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেননি। এরপর আবু বকর (রা.) খলীফা হলে তাঁর কাছে সে এলো এবং বললো, রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে আমার সম্পর্ক কেমন ছিলো তা তো আপনি জানেন এবং আনসারদের মধ্যেও আমার স্থান কতোটা তাও আপনার জানা আছে। অতএব, দয়া করে আমার যাকাত গ্রহণ করুন। আবু বকর (রা.) বললেন, রসূল (স.) যা গ্রহণ করেননি, আমি তা গ্রহণ করতে পারি না– এ বলে তিনি তার যাকাত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। এরপর ওমর (রা.) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলে সা'লাবা তার কাছে এসে বললো, হে আমীরুল মোমেনীন, আমার যাকাত গ্রহণ করুন।' তিনি বললেন, যে জিনিসটি আল্লাহর রসূল ও আবু বকর (রা.) গ্রহণ করেননি, আমি তোমার কাছ থেকে তা গ্রহণ করবো? তিনি মারা যাওয়া পর্যন্ত তার থেকে আর তা গ্রহণ করেননি। এরপর হযরত ওসমান (রা.) দায়িত্ব পেলে তার কাছে সে এসে বললো, দয়া করে আমার যাকাত গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, তোমার যে অর্থ আল্লাহর রসূল (স.), আবু বকর (রা.) এবং ওমর (রা.) গ্রহণ করেননি আমি তোমার থেকে তা গ্রহণ করবো? তিনি তার থেকে তা গ্রহণ করলেন না। এরপর ওসমান (রা.)-এর খেলাফত আমলেই সা'লাবা মৃত্যু বরণ করলো।

এ ঘটনাটা আলোচ্য আয়াতগুলোর সমসাময়িক হোক বা অন্য আয়াতের সাথে সম্পর্কিত হোক এ আয়াতগুলোর হুকুম সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেহেতু আয়াতগুলো সকল অবস্থারই ছবি তুলে ধরেছে এবং যে সব মানুষের মধ্যে ঈমানের মযবূতী নেই তাদের ক্ষেত্রে ওপর এ উদাহরণগুলো বারবার প্রযোজ্য এবং যে সব মানুষের মনে ঈমান গভীরভাবে বর্তমান নেই সেখানেও অবশ্যই এসব আয়াত কিছু না কিছু রেখাপাত করে। বিশেষ করে যখন বুঝা যাচ্ছে যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিলো তার সাথে রেওয়ায়াতটি বেশ সামঞ্জস্যশীল।

নিশ্চয়ই ওয়াদা খেলাফী এবং আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপের স্বভাবটি কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ বিরোধীদেরকে নেফাকের অধিকারী বানিয়ে রাখবে। এ নেফাক (কপটতা)ই তো সা'লাবার যাকাত ও তাওবা কবুল হতে দেয়নি বলে বুঝা যাচ্ছে। তবে শরীয়তের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এ ব্যবহারটি রসূলুল্লাহ (স.) করেছেন বলে বাহ্যিক ভাবে বুঝা যাচ্ছে না। অবশ্যই এটা ঠিক তার প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ীই তিনি সেই ব্যবহারটি করেছেন, যা তিনি মহাজ্ঞানী ও চির বিজ্ঞানময় আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে জেনেছেন এবং সা'লাবার সদকা ফেরত দিয়ে রসূলুল্লাহ (স.) ইসলামের নিয়ম শৃংখলা রক্ষা করেছেন যদিও সে মুরতাদ হয়ে গেছে বলে তিনি মনে

করেননি, যার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারতো এবং পুরোপুরি মুসলমান বলেও তাকে গ্রহণ করেননি, যার কারণে তার কাছ থেকে যাকাত নেয়া যেতে পারতো। ঘটনাটা দ্বারা এ অর্থও বুঝায় না যে, আইনত মোনাফেকদের কাছ থেকে যাকাত নেয়া যায় না। শরীয়তের বিধান তো মানুষের বাহ্যিক ব্যবহারের ওপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যে বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু বুঝা যায় না, যেমন উপরোক্ত ঘটনায় ঘটেছে, কেয়াস করে কোনো পদক্ষেপ নেয়া যায় না।

তাছাড়া বর্তমানের এ ঘটনাটা দ্বারা আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি, প্রথম যুগের লোকেরা ফরয যাকাতকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন। আল্লাহ তায়ালার এ হুকুমকে তারা তাদের জন্যে এক নেয়ামত মনে করতেন। কেউ যাকাত দিতে না চাইলে বা কারও কাছ থেকে যাকাত নিতে না চাওয়া হলে সে এমন এক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বলে বিবেচিত হতো যেন তার ওপর এমন বিরাট এক মুসীবত এসে গেছে যে, তার ওপর করুণা হয়! প্রকৃতপক্ষে তাদের ওপর ওই সত্য কথাটি প্রযোজ্য, যা নীচের আয়াতে জানা যায়।

তাদের অর্থ সম্পদ থেকে যাকাত 'গ্রহণ করো, যা তাদেরকে পরিচ্ছন্ন করবে এবং পবিত্র করবে এর দ্বারা তাদের গোটা সত্ত্বাকে'.......

যাকাতকে তারা তাদের জন্যে এক আশীর্বাদ মনে করতেন, এটাকে কোনো জরিমানা বা কষ্টদায়ক কিছু বলে মনে করতেন না। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে ফরয জ্ঞানে দান এবং সরকার কর্তৃক আরোপিত ট্যাক্স-এর মধ্যে এটাই হচ্ছে মূল পার্থক্য। কারণ সরকারী আইন ট্যাক্স দিতে বাধ্য করে এবং তাদের থেকে জোর করে ট্যাক্স আদায় করার জন্যে সরকারী লোক তাদের পেছনে লেগে থাকে!

মোমেনদের প্রতি মোনাফেকদের কটাক্ষ

এবারে যাকাত সম্পর্কে মোনাফেকদের চিন্তাধারার আর একটি দিক তুলে ধরা হচ্ছে, যার কারণে তারা সত্যনিষ্ঠ মোমেনদের মধ্যে থেকেও এ কল্যাণকর ব্যবস্থার বিরোধিতা করতো এবং তাদের এ বিরোধিতা প্রকাশ পেতো তাদের চোখের এশারা ইংগিতে এবং অনেক সময়ে মুখের ওপর তাদের দোষারোপের মাধ্যমেও। এসব অসদাচরণ দ্বারা তাদের প্রকৃতির মধ্যে দ্বীনের নির্দেশাবলী অমান্য করার যে প্রবণতা লুকিয়ে ছিলো, তারই বহিপ্রকাশ ঘটাত। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি, যারা অনুগত ও সত্যনিষ্ঠ মোমেনদেরকে আল্লাহর পথে দান করার ব্যাপারে মুখের ওপর দোষ দিয়ে নানা প্রকার কটূক্তি করতো, আর বিদ্রূপ করতো ওই সব অভাবগ্রস্ত মানুষকে যারা যথাসাধ্য আল্লাহর হুকুম মানার চেষ্টা করতো এবং শ্রম দেয়া ছাড়া দেয়ার মতো (তাদের কাছে) আর কিছুই ছিলো না। আল্লাহ তায়ালাও তাদের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করছেন এবং পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।'

এ আয়াতটির শানে নুযুল সম্পর্কে যা জানা যায় তা হচ্ছে, আল্লাহর পথে খরচ করার ব্যাপারে বিরোধী মনোভাবাপন্ন মোনাফেকদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিলো এবং তার যে বহিপ্রকাশ তারা ঘটিয়েছিলো, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

ইবনে জারীর এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন শব্দে উচ্চারিত এবং নানা সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা হচ্ছে, ইকরামা বলেন, তবুক যুদ্ধের অভিযানের প্রাককালে যথাসম্ভব দান করার জন্যে লোকদেরকে রসূলুল্লাহ (স.) অনুপ্রাণিত করলেন। তখন হযরত আবদুর রহমান

ইবনে আওফ (রা.) চার হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা নিয়ে হাযির হয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার কাছে ছিলোই সর্বসাকুল্যে মোট আট হাজার, তার থেকে আমি অর্ধেক নিয়ে এসেছি এবং অর্ধেক রেখে এসেছি।' তখন রসূলুল্লাহ তাকে দোয়া দিতে গিয়ে বললেন, 'তুমি যা রেখে এসেছো এবং যা নিয়ে এসেছো তার প্রতি আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করুন।' আবু উকায়েল আসলেন এক সা' (এক সের সাড়ে বারো ছটাক পরিমাণ) খোরমা নিয়ে। তিনি এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার ছিলো দুই সা, খোরমা, তার থেকে এক সা' আমার রবের জন্যে নিয়ে এসেছি এবং আমার পরিবারের জন্যে রেখে এসেছি এক সা'। বর্ণনাকারী ইকরামা বলেন, তখন মোনাফেকরা এ দেখে বিদ্রূপ করে বলে উঠলো, আবদুর রহমান তো মানুষকে দেখানোর জন্যে এ পরিমাণ অর্থ নিয়ে এসেছে ...... তারপর ওই এক সা' খোরমার দিকে ইংগিত করে বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল কি এ এক সা' পরিমাণ খোরমার ভুখা নাকি? অবশ্যই না।

অন্য আরো কিছু বর্ণনায় জানা যায়, আবু উকায়েল সম্পর্কে ওরা এ কথাগুলো বলেছিলো। অথচ তার অবস্থা তো ছিলো এই যে, গতকাল সে যে কায়িক শ্রমের কাজ করেছিলো, তার মজুরী বাবদ সে পেয়েছিলো মাত্র দুই সা' খোরমা। তার মধ্য থেকেই তো সে আল্লাহর রসূলের কাছে এক সা' নিয়ে হাযির হয়েছিলো। এ কথাটাই তো সে নিজে বলতে চেয়েছিলো! কিন্তু হায়, সব কথা সে খুলে বলতে পারেনি।

আর এভাবেই তো তোমরা (হে মোনাফেকরা) সেই সব লোকের দানের প্রতি কটাক্ষপাত করছো যারা কষ্টার্জিত পয়সা থেকে যতোদূর সম্ভব আনুগত্যভরা মন নিয়ে পরম প্রশান্ত বদনে এবং জেহাদে অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে দান করার জন্যে বেরিয়ে এসেছে। আর এটাই ছিলো মোমেনদের চরম ত্যাগ ও জেহাদের জন্যে পরম আগ্রহের নমুনা। আখেরাতে আল্লাহর কাছে পাওয়ার পবিত্র এক আশা ছাড়া শুধু বিবেকের ডাকে এভাবে দান করা সম্ভব হয় না। মানুষের পরিবর্তনশীল চেতনা আপনা থেকেই এভাবে তাকে এমন কঠিন ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না, পারে না এভাবে তাকে ঈমানের দাবী পূরণে উজ্জীবিত করতে। এভাবে ত্যাগ করতে এবং এভাবে জেহাদে শরীক হতে। একথা না বুঝার কারণেই ওই হতভাগা কপট কদাচাররা অধিক দানকারী ব্যক্তি সম্পর্কে মানুষ দেখানো দান বলে এমন হীন মন্তব্য করতে পারে এবং তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে দরিদ্র মোমেনের সামান্য এদানকে। এ সব দরিদ্র ব্যক্তি তো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে খরচ করে। অপরদিকে তারা ধনীদেরকে বেশী দান করার জন্যে টিপ্পনী কাটে, আর গরীবদেরকে তাদের সামান্য দান করার কারণে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। এ দু'দলের কেউ তাদের খোঁচা মারা কথা থেকে রেহাই পায় না। অথচ তারা নিজেরা ঘরে বসে থাকে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়া থেকে পেছনে পড়ে থাকে এবং আল্লাহর রাহে দান করা থেকে এমনভাবে হাত সংকুচিত করে রাখে যে তাদের চরম কৃপণতা ফুটে ওঠে। আর কোনো সময় কিছু খরচ যদি তারা করে তো নিছক লোককে দেখানোর জন্যেই করে। আর এ হীন উদ্দেশ্য ছাড়া তাদের মনে অন্য কোনো মহান উদ্দেশ্য কিছুতেই জাগরিত হয় না।

তাদের এসব ঘৃণ্য ব্যবহারের জওয়াবে আল্লাহ তায়ালা এক চূড়ান্ত ও সুনির্দিষ্ট কথা বলছেন,

'আল্লাহ তায়ালাও তাদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করছেন এবং (অবশেষে) তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।'

হায়, কি ভয়ানক তাদের এ বিদ্রূপ এবং কতো ভয়ানক হবে এর পরিণতি! এ তুচ্ছ, দুর্বল ও ধ্বংসশীল মানুষের পক্ষে মহা ক্ষমতাধর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সমালোচনা করা কি কঠিন কথা, কতো বড় অপরাধ এবং কতো ভয়ানক হতে পারে তার পরিণতি একথা কি এসব ভ্রান্ত মানুষ একবার

চিন্তা করে দেখেছো? দেখো, একবার চিন্তা করে দেখো হে অর্বাচীন কপটের দল, কতো মারাত্মক পরিস্থিতি তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এরশাদ হচ্ছে,

'(হে নবী) তাদের জন্যে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করো আর নাই বা করো, উভয় অবস্থা তাদের জন্যে সমান। তুমি সত্তর বারও যদি তাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাও, তবু তিনি তাদের মাফ করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে। আর আল্লাহ তায়ালা এ মহা অপরাধী জাতিকে ক্ষমা করেন না।'

এ আয়াতে ওইসব মোনাফেকের কথা বলা হয়েছে, যারা সদকা-যাকাত সম্পর্কে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে এবং আল্লাহর নেক ও ফরমাবর্দার লোকদের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে। তাদের প্রত্যাবর্তন-স্থল নির্ধারিত হয়ে গেছে, সেখানে তাদের যেতেই হবে, সেখান থেকে ফেরার আর কোনো পথ তাদের নেই। এরশাদ হচ্ছে,

আর কিছুতেই তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন না।'

তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কোনোই কাজে লাগবে না। কাজেই তাদের জন্যে ক্ষমা চাওয়া না চাওয়া উভয় অবস্থাই তাদের জন্যে সমান।

প্রকাশ থাকে যে, রসূলুল্লাহ (স.) অপরাধীদের প্রতি এতোই দরদী ছিলেন যে, প্রতি মুহূর্তেই তাঁর মনে হতো এই বুঝি ওদের ওপর আযাব এসে পড়ে। এজন্যে তাদের জন্যে তিনি আল্লাহর কাছে বারবার মাফ চাইতেন- যদি আল্লাহ রব্বুল ইযযত মেহেরবানী করে তাদের তাওবা কবুল করেন! এজন্যে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, তাদের গন্তব্যস্থল চূড়ান্তভাবে স্থির হয়ে গেছে, সেখান থেকে তাদেরকে ফেরানোর আর কোনো পথ নেই। এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের এ পরিণতি এ জন্যে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে ..... আর আল্লাহ তায়ালা অপরাধী জাতিকে সঠিক পথ দেখান না।'

ওই সকল লোক সঠিক পথ থেকে সরে গেছে। অতএব, সেখান থেকে ফিরে আসার আর কোনো উপায় দেখা যায় না এবং তাদের অন্তরগুলোও পচে গেছে। ওই অবস্থা থেকে নিরাময় হওয়ারও আর কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যদি তুমি তাদের জন্যে সত্তর বারও ক্ষমা চাও, তবু কিছুতেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।'

আরবী ভাষায় সত্তর শব্দটি আসলে 'আধিক্য' বোঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়। শুধু ওই সংখ্যার মধ্যে এর অর্থ সীমাবদ্ধ নয়। এর দ্বারা সাধারণ যে অর্থটি বোধগম্য হয় তা হচ্ছে, তাদের জন্যে ক্ষমার কোনো আশা নেই। কারণ তাদের তাওবা কবুল হওয়ার কোনো পথ নেই। আর মানুষের অন্তর বিগড়ে যেতে যেতে এমন একটি পর্যায়ে এসে যায়, যখন সেটাকে শোধরানোর আর কোনো উপায় থাকে না। একইভাবে পথভ্রষ্টতা, অর্থাৎ ভুল পথে চলতে চলতে এমন এক স্তরে মানুষ পৌঁছে যায়, যখন তার জন্যে সঠিক পথ পাওয়ার আর কোনোই আশা থাকে না। আর আল্লাহ তায়ালাই সকল মনের খবর ভালো জানেন।

যুদ্ধের ডাকে গড়িমসি ও মোনাফেকদের চিরতরে বহিষ্কার

এরপর আলোচনার মোড় ফিরে যাচ্ছে ওই সব ব্যক্তির দিকে, যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে তাবুক যুদ্ধের অভিযানে রওয়ানা না হয়ে পেছনে থেকে বসে গিয়েছিলো। তাদের সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে,

'পেছনে পড়ে থাকা মানুষগুলো রসূলুল্লাহ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে নিজেদের অবস্থানে খুশী হয়ে গেলো ...... তাদের ধন সম্পদ ও সন্তানাদি তোমাদের যেন বিমুগ্ধ না করে দেয়। ওগুলো দিয়েই তো আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতে চান এবং চান কাফের থাকা অবস্থাতেই যেন তারা ধ্বংস হয়ে যায়।' (আয়াত ৮১-৮৫)

এরাই হচ্ছে সেই সব মানুষ, যাদেরকে দুনিয়ার আকর্ষণের বোঝা পেয়ে বসেছে। বোঝা হচ্ছে লোভ লালসা ও আরাম আয়েশের বোঝা, খরচ করার ব্যাপারে কৃপণতার বোঝা এবং সাহসের দুর্বলতা ও অহংকারের চাপ রূপ বোঝা এবং অন্তর ঈমানশূন্য হওয়া রূপ এক বোঝা– এ সব নানাবিধ বোঝার চাপে তৎকালীন পেছনে থেকে যাওয়া মোনাফেকরা ছিলো জর্জরিত। তাদের এ গাফলতিতে বুঝা যাচ্ছে তারা চাইছিলো যদি সম্পদ সম্পত্তির দেখাশুনা করার জন্যে তাদেরকে পেছনে রেখে যাওয়া হতো অথবা বে-খেয়ালিতে তাদেরকে ভুলে যাওয়া হতো তাহলে তারা শান্তিতে এবং আরামে থাকতে পারতো। 'রসূল (স.) থেকে পেছনে থেকে যেতো।' তারা মনে প্রাণে আকাংখা করছিলো ওই প্রচন্ড গরমে এবং এতো কঠিন ও দূরের সফরে যে মোজাহেদরা যেতে চায় যাক। তারা তো মনে করতো আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তি, যার জন্যে মানুষ লালায়িত।' 'ওরা আল্লাহর পথে মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করতে অপছন্দ করেছে।' .... এবং বলেছে, এতো গরমের মধ্যে যুদ্ধাভিযানে বেরিয়ো না।'

একথাটা সেই সব মানুষের মুখ দিয়ে বের হয়, যারা বিলাসিতার মধ্যে ডুবে থাকে এবং মানুষের উপকার বা সংশোধন কিসে হবে তার ধার ধারে না।

এ লোকগুলোই হচ্ছে দুর্বল মনের দৃষ্টান্ত, যাদের ইচ্ছাশক্তি বলতে কোনো জিনিস নেই। আর অনেকে ওদের মধ্যে আছে, যারা কোনো কষ্টকর কাজ করতে চায় না এবং যে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করা থেকে দূরে থাকতে চায়। সম্মানজনক সংগ্রামের ওপর তারা জীবনের আরাম-আয়েশকেই প্রাধান্য দেয়। তারা অগ্রাধিকার দেয় অপমানজনক শান্তিকে সম্মানজনক বিপদের ওপর। তারা যুদ্ধের জন্যে আহ্বানকে তাদের জন্যে বড়ই কষ্টকর মনে করেছে এবং যুদ্ধের ডাককে এড়াতে না পেরে রওয়ানা হয়েছে সত্য কিন্তু অতি সংগোপনে পেছনে পড়ে থেকেছে যাতে সুযোগ পেলেই পেছন থেকে পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছানো যায়। আর এভাবেই তারা তাদের দুর্বলতাকে ঢাকতে চেয়েছে। তারা সর্বদাই একথা মনে করতে থেকেছে যে, মুসলমানরা যে অভিযানে এগিয়ে চলেছে, তার প্রতি পদে পদে রয়েছে নানা প্রকার বিপদ আপদ ও শত্রুর কঠিন আক্রমণের আশংকা। এজন্যে তারা যে কোনো প্রকারে ঐ ভীষণ ও কষ্টকর অভিযান থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছে। ওরা মনে করে বিপদ আপদের আশংকা যেখানে নিশ্চিত, সেখানে না যাওয়ার প্রবণতা প্রত্যেক মানুষের জন্যে স্বাভাবিক। অপরদিকে প্রকৃত সত্য হচ্ছে বিপদের মোকাবেলা করা এবং ঘরে বসে থাকা, পেছনে পড়ে থাকা এবং পলায়ন করা থেকে ভালো। এজন্যে আল কোরআন তির্যকভাবে সত্য কথাটা এভাবে তুলে ধরছে,

'ওরা বললো, প্রচন্ড এ গরমের মধ্যে বেরিয়ো না। (হে রসূল, তুমি) বলে দাও জাহান্নামের আগুন আরো বেশী উত্তপ্ত। হায়, যদি ওরা বুঝতে পারতো!'

অর্থাৎ, ওরা যদি পৃথিবীর উত্তাপ থেকে বাঁচতে চায় এবং ছায়ায় থেকে দুনিয়ার আরাম আয়েশ ভোগ করাকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে তাদের একবার ভেবে দেখা দরকার, জাহান্নামের আগুনে যখন তারা পুড়বে, তখন তাদের কি অবস্থা হবে। সে আগুন তো হবে আরো দীর্ঘস্থায়ী এবং আরো আরো গরম। এ আযাব তাদের চিরদিনের জন্যে ঘিরে রাখবে। এটাই বাস্তব সত্য। আর গরমের মধ্যে আল্লাহর পথে জেহাদ সাময়িক ব্যাপার। কিন্তু কতকাল যে জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হবে আল্লাহ আলেমুল গায়েব ছাড়া তা আর কেউ জানে না।

'সুতরাং তাদের হাসা দরকার কম, বরং কাঁদা দরকার বেশী। (কারণ বড়ই করুণ পরিণতি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে) এটাই হবে তাদের কৃতকর্মের ফল।

অর্থাৎ যে ধরনের কাজ তারা করছে, তার উচিত প্রতিদান হবে এটাই আর এটাই তাদের জন্যে ইনসাফপূর্ণ ও সূক্ষ্ম বিনিময়।

ওরাই হচ্ছে সেই সব মানুষ, যারা (দুনিয়ার সাময়িক) আরামের জীবনকে জেহাদী যিন্দেগীর ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। যারা কষ্টের সময় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম পালন করা থেকে পিছিয়ে থাকা পছন্দ করেছে এবং প্রথম বারেই তারা দূরের পথে যুদ্ধাভিযানে যাওয়া থেকে পিছিয়ে থেকেছে, তারা কোনো কঠিন সংগ্রামের জন্যে মোটেই উপযোগী নয়। জেহাদী কাজ তাদের দ্বারা হবে বলে আশাও করা যায় না এবং এজন্যেই তাদের ক্ষমা করা হবে না এবং তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হবে। আর সেই জেহাদে শরীক হওয়ার মর্যাদাও তাদের দেয়া যেতে পারে না, যার সুযোগ তারা স্বেচ্ছায় ও অবহেলায় হারিয়েছে।

'তারপর যদি কোনো সময় আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ওদের কোনো এক গ্রুপের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং তোমার কাছে ওরা যুদ্ধাভিযানে যাওয়ার অনুমতি চায় তখন তুমি তাদের বলে দিয়ো, না, আমার সাথে তোমরা আর কোনো দিন বের হবে না এবং আমার সাথে থেকে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে তোমরা আর যুদ্ধ করবে না। প্রথম বারেই তো যুদ্ধে না গিয়ে বসে থাকাতে তোমরা খুশী হয়ে গিয়েছিলে, অতএব বসে থাকো তোমরা তাদের সাথে– যারা পেছনে পড়ে রয়েছে।'

একদিকে দেখা যায় কোনো যুদ্ধের জন্যে ডাক দিলে একদল লোক দৃঢ়সংকল্প নিয়ে যে কোনো অবস্থায় এগিয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষ যতো কঠিন শত্রুই হোক না কেন এবং যতো দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধই হোক না কেন, কোনো অবস্থায়ই তারা সাহসহারা হয় না বা পিছপা হয় না। পাশাপাশি ছোট হলেও, এমনও এক দল বরাবরই থাকে, যাদের নানা প্রকার দুর্বলতা পেয়ে বসে। তারা কঠিন সময়ে যোগ দিতে গিয়ে ঢিলেমি করে। এদের ওপর কোনো ভরসা করা যায় না। কারণ কঠিন মুহূর্তে এরা মূল দল ছেড়ে হঠাৎ করে সরে পড়ে এবং পুরো দলের মধ্যে বিশৃংখলা ও দুর্বলতা সৃষ্টি করে দেয়। সুতরাং যাদের সম্পর্কে জানা যাবে যে, তারা নিজেরা কঠিন সময়ে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং দলের মধ্যে ভাংগন ধরানোর ভূমিকা পালন করবে, তাদেরকে পূর্বাহ্নেই দল থেকে বের করে দেয়া দরকার এবং কোনো প্রকার বিশৃংখলা ও পেরেশানী ছড়ানোর সুযোগ কোনো অবস্থাতেই তারা যেন না পায়, সে জন্যে সঠিক সময়েই ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। যে সব মানুষ কঠিন সময়ে দল-ছুট হয়ে যায়, পেছনে পড়ে থাকে এবং পরক্ষণেই ক্ষমা প্রার্থী হয় এবং সুসময় আসলে নানা প্রকার ওযর পেশ করে, তাদের ক্ষমা করার অর্থ হচ্ছে দলের মধ্যে অন্যায় অপরাধকে টিকিয়ে রাখার সুযোগ করে দেয়া এবং যে যুদ্ধাভিযানে কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করতে হবে, তার জন্যে আহ্বানের প্রতি যুলুম করা। এজন্যেই এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব বলো, না, কিছুতেই তোমরা আমার সাথে বের হবে না এবং কোনো অবস্থাতেই আমার সাথে থেকে কোনো শত্রু সৈন্যের মোকাবেলা করবে না।'

এর কারণ কি? জওয়াবে বলা হচ্ছে,

'তোমরা প্রথম বারেই (যুদ্ধে না গিয়ে) বসে থাকটাকেই পছন্দ করে নিয়েছিলে।'

সুতরাং যুদ্ধাভিযানে বের হওয়ার যে মর্যাদা, তা লাভ করার অধিকার তোমরা হারিয়ে ফেলেছো, হারিয়ে ফেলেছো ইসলামী সেনাবাহিনীর মধ্যে সাংগঠনিক কোনো ভূমিকা রাখতে। যুদ্ধ অর্থ এক মারাত্মক প্রস্তুতি, এতে অংশ গ্রহণ করা তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা এ কাজের জন্যে যোগ্য। এ ব্যাপারে কোনো আপোষ করা বা কাউকে ক্ষমা করার কোনো সুযোগ নেই এবং তাদের সাথে কোনো মেলামেশাও করা যাবে না।

'অতএব তোমরা বসে থাকো তাদের সাথে, যারা পেছনে পড়ে থেকেছে।'

অর্থাৎ পড়ে থাকো তাদের সাথে, যারা তোমাদের মতো পেছনে পড়ে থেকেছে এবং যুদ্ধের জন্যে রওয়ানা না হয়ে ঘরে বসে থেকেছে।

এটাই হচ্ছে সেই পথ, যা আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর সম্মানিত নবীর জন্যে চিহ্নিত করে দিয়েছেন এবং এটাই হচ্ছে চিরদিন এ আহ্বানের পদ্ধতি এবং ওরাই ছিলো তার ঈপ্সিত জনগণ। সুতরাং সর্বকালের সকল স্থানের মানুষকে নিশ্চিতভাবে এপথ জেনে নিতে হবে।

মোনাফেকদের জানাযা না পড়ার নির্দেশ

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে ওইসব পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাদের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ না করা হয়, যেহেতু তারা কঠিন দুঃসময়ে রসূলের ডাকে সাড়া দেয়নি। আল্লাহ তায়ালা চান না যে, ওইসব মানুষ পুনরায় এসে সত্যনিষ্ঠ মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ পরিকল্পনার মধ্যে মাথা ঘামানোর সুযোগ পাক। মোজাহেদদের সাথে মিলিত হওয়ার সম্মান তারা লাভ করুক আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাও চান না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'ওদের মধ্যে কেউ মারা গেলে কখনও তাদের জানাযা পড়বে না, তাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্যে দোয়াও করবে না। কারণ ওরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে না-ফরমানী করেছে আর ওরা ফাসেক (মহা-অপরাধী) থাকা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে।'

এ আয়াতে যে বিষয়টাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে মোফাসসেররা কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আয়াতের হুকুম ওই বিশেষ কিছু ঘটনার জন্যেই যে নির্দিষ্ট, তা নয়, বরং এর হুকুম অনুরূপ সকল ঘটনার ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য। মযবুত আকীদা নিয়ে যারা আল্লাহর পথে জেহাদে শরীক হয়, তাদের দলীয় সংগঠনের নীতিমালা এ আয়াত দ্বারা নিরূপিত হয়ে গেছে। যারা দুঃসময়ে ও কঠিন সংগ্রামে যোগ দান করতে পিছপা হবে এবং যারা জীবনের আরাম আয়েশকে আল্লাহর পথে জেহাদ করার ওপর প্রাধান্য দেবে, তাদের কোনো প্রকার সম্মান না দেয়া এবং কোনো সম্মানজনক কাজে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ না দেয়ার জন্যে এ আয়াতটি নির্দেশ দিচ্ছে। এমনকি এ আয়াতটি আরো জানাচ্ছে যেন তাদের সাথে কোনো প্রকার মেলামেশাও না করা হয়। মুসলমানদের দলে যোগদান করার জন্যে যোগ্যতার যে মাপকাঠি নির্ধারিত হয়েছে তা হচ্ছে বিপদে অবিচল থাকা ও মানসিক বলকে অটুট রেখে পূর্ণ সংকল্পের সাথে কঠিন সংগ্রামে লেগে থাকা। কোনো পর্যায়ে ঢিলেমি না করাও কোনো অবস্থাতেই নমনীয় না হয়ে যাওয়া।

এখানে আল্লাহর কালামই ওই মোনাফেকদের প্রতি নিষেধাজ্ঞার কারণ জানাতে গিয়ে বলছে, 'ওরা কুফরী করেছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে এবং কাফের থাকা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে।'

অর্থাৎ ওদের জানাযা না পড়া ও তাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করার প্রতি নিষেধাজ্ঞার কারণ এটাই যে, জেহাদের ডাক পাওয়া সত্তেও সাড়া না দিয়ে এবং দুনিয়ার লোভ লালসা চরিতার্থ করার ও ভোগ-বিলাসে মেতে থাকার জন্যে পেছনে পড়ে থাকার মাধ্যমে ওরা আল্লাহর হুকুম শুধু অমান্যই করেনি, বরং অবজ্ঞা করার মাধ্যমে কুফরীও করেছে। সুতরাং মুসলিম জামায়াতকে ওদের সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে এবং জেহাদ থেকে পিছিয়ে থাকা এসব মানুষকে কোনো প্রকার সম্মান দেয়া যাবে না। তাদের কোনো মূল্যই যেন ইসলামী সমাজে না থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ নির্দেশের মাধ্যমে এ কথাও চূড়ান্তভাবে স্থির হয়ে গেছে যে, আল্লাহর কাছে মূল্য রয়েছে একমাত্র ওইসব মোজাহেদের, যারা ইসলামের কঠিন দুর্দিনে মাল ও জানের কোরবানী নিয়ে এগিয়ে আসে, দুশমনের মোকাবেলায় দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যায় এবং সকল বিপদ আপদে দৃঢ়তা অবলম্বন করে। এভাবেই তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আল্লাহর সম্মানিত সৈন্য হিসাবে প্রত্যাবর্তন করে।

এটা বাহ্যিক কোনো সম্মান নয়, যা দলের লোকদের নযরে পড়ে বা শুধু গোপন কোনো মর্যাদা নয়, যা মনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। এটা আল্লাহ প্রদত্ত সার্বিক সম্মান যা মোখলেস মোজাহেদরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই পাবে। অপরদিকে মোনাফেকদের সম্পর্কে জানানো হচ্ছে,

'ওদের বাহ্যিক চাকচিক্য তোমাদের যেন চমৎকৃত না করে, তোমাদের যেন মুগ্ধ না করে ওদের সম্পদ ও সন্তানাদির জৌলুস! ওইসব জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ওদের দুনিয়াতেই আযাব দিতে চান এবং কাফের থাকা অবস্থাতেই তারা দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে যাবে।'

আয়াতটির সাধারণ বোধগম্য অর্থ ইতিমধ্যে আলোচনায় এসে গেছে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো, সে সম্পর্কে কিছু মতভেদ আছে। ঘটনা যাই হোক, আয়াতটির মূল যে উদ্দেশ্য বুঝা যাচ্ছে তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা বলতে চেয়েছেন যে, ওই সব মোনাফেক লোকের ধন সম্পদ ও সন্তানাদির কোনো মূল্যই আল্লাহর কাছে নেই ও থাকবে না। মুসলিম সমাজে ও সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন কারণে মান সম্মান গড়ে ওঠে, যেমন ধনবল, জনবল, পদ মর্যাদা ইত্যাদি। কিন্তু উপরোক্ত আয়াতটিতে মোমেন সমাজকে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হচ্ছে যে, তাদের নযরে মান-সম্ভ্রামের মাপকাঠি যেন এগুলো না হয়। জেহাদের ডাকে যারা পিছিয়ে থাকবে সেই সব মোনাফেককে যেন বাহ্যিক দিক দিয়ে কোনো সম্মান না দেয়া হয় এবং তাদের প্রতি কারো আন্তরিক শ্রদ্ধাও যেন না থাকে। তাদের প্রতি ব্যবহারে সদা সর্বদা যেন ঘৃণা ও অবজ্ঞা ঝরে পড়ে এবং তাদের ধন সম্পদ ও সন্তানাদির প্রতিও যেন কোনো ভ্রুক্ষেপ না করা হয়।

ধনাঢ্য মোনাফেকদের যুদ্ধে না যাওয়ার বাহানা

'আর যখন কোনো সূরা নাযিল করে তোমাদেরকে বলা হয় আল্লাহর ওপর ঈমান আনো এবং তাঁর রসূলের সাথে থেকে জেহাদ করো, তখন ওদের মধ্য থেকে কিছু সচ্ছল ব্যক্তি যুদ্ধে না যাওয়ার জন্যে তোমার কাছে অনুমতি চায়..... চিরদিন থাকবে তারা সেখানে। ওইটিই হচ্ছে মহা সাফল্য। (আয়াত ৮৬-৮৯)

এরা হচ্ছে দুই ধরনের মানুষ। এক ধরন হচ্ছে, যাদের মধ্যে রয়েছে নেফাকের খাসলাত, মানসিক দুর্বলতা এবং দুনিয়াতেই চাওয়া ও পাওয়ার প্রবল আকাংখা। অপর দল হচ্ছে যাদের স্বভাবের মধ্যে দেখা যায় ঈমানী শক্তি, মেযাজের দৃঢ়তা, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও দুঃখ কষ্টের মধ্যে টিকে থাকার মতো মনোবল। এ দুই দলের পদক্ষেপগুলোও ভিন্ন। এক দলের পদক্ষেপ হচ্ছে বক্রতা, পিছপা হওয়া এবং দায়িত্বপালন থেকে ফিরে যাওয়া। অন্য পদক্ষেপটি হচ্ছে দৃঢ়তা, দানশীলতা এবং মহানুভবতা।

তারপর জেহাদের হুকুম নিয়ে যখন কোনো সূরা নাযিল হয়, তখন ওই সচ্ছল লোকের দলটি, যাদের জেহাদের উপায় উপকরণ ও দান করার মতো সচ্ছলতা আছে, এগিয়ে এসে অগ্রগামী দল থেকে পেছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি চাইতে থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যে আর্থিক সচ্ছলতা দিয়েছেন তাকে কাজে লাগাতে চায় না এবং আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের সদ্ব্যবহার এবং শোকরগোযারি করতে চায় না, ভীষণ দুর্বলতা দেখায় ও নানা প্রকার ওযর পেশ করে মেয়েদের সাথে পেছনে পড়ে থাকতে চায়। কারো সম্ভ্রম রক্ষা করা বা কোনো বাসস্থানের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে যে এ পেছনে থেকে যাওয়া তাও নয়। আর যতোদিন নিরাপদ থাকে, ততোদিন এই দুর্বল

বাচ্চা ও বৃদ্ধদের সাথে পেছনে পড়ে থাকাতে তাদের কতো হীনমন্যতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, তাও তারা বুঝে না। এভাবে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে যারা থাকতে চায়, তাদের লাজ লজ্জা বলতেও কোনো কিছু থাকে না। অন্য যে কোনো জিনিসের তুলনায় ঝুঁকি ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকাই তাদের কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য। তাই ওদের সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে,

'তারা পেছনে পড়ে থাকাতেই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে।'

'তাদের অন্তরের ওপর মোহর লেগে গেছে। অতএব, তারা আর কিছুতেই বুঝবে না।'

আর কিছু মাত্র বুঝশক্তি যদি তাদের থাকতো, তাহলে তারা বুঝতো জেহাদে যোগদান করায় কতো শক্তি বৃদ্ধি পায়, কতো মর্যাদা বাড়ে ও কতো স্থায়ী সম্মান অর্জিত হয়। আর পাশাপাশি অনুভব করতে পারত যুদ্ধাভিযান থেকে পেছনে পড়ে থাকার মধ্যে রয়েছে কতো হীনতা এবং কতো অপমানের গ্লানি।

সম্মানের মতো অবমাননারও রয়েছে বিশেষ এক প্রকৃতি। অনেক জীব বিজ্ঞানীরের মতে আর্থিক ক্ষতি থেকে অপমানের জ্বালা অনেক বেশী তীব্র এবং অধিক কষ্টকর। আবার কোনো কোনো দুর্বলচেতা মানুষের কাছে মনে হয়, সম্মান লাভ করার জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয় যা সাধ্যের বাইরে। এজন্যে এহেন হীনমন্য মানুষ এসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে পিছিয়ে থেকে অপমানের গ্লানি সইতে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং তারা সস্তা ও মূল্যহীন জীবনের পথ বেছে নয়, বেছে নেয় কাপুরুষের যিন্দেগী এবং সার্বক্ষণিক এক মানসিক অস্থিরতার জীবন। সর্বদা ভয়ভীতি ও উদ্বেগ তাকে তাড়া করতে থাকে। যে কোনো দিক থেকে কোনো শব্দ হয়, সেটা তাদের বিরোধী কোনো হুঁশিয়ারী মনে করে তারা আতংকিত হয়ে ওঠে। তাদের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কখনও তারা মরতে প্রস্তুত নয়....... অর্থাৎ শত অপমানের মধ্য দিয়ে হলেও তারা জীবনে বেঁচে থাকতে চায়। মৃত্যুর আশংকা যেখানে, সেখানে তারা কিছুতেই যেতে চায় না। এইসব হীনমন্য মানুষ সম্মানিত জীবন যাপন করার জন্যে যে মূল্য দিতে হয়, প্রকৃতপক্ষে তার বেঁচে থাকার জন্যে তার থেকেও বেশী তারা মূল্য দিয়ে থাকে। এরা পুরোপুরি অপমানের গ্লানি ভোগ করে, তাদের মর্যাদা নষ্ট করে দেয়। তাদের কান দিয়ে যে ধিক্কারবাণী শোনে, তা তাদেরকে মর্মে মর্মে পীড়া দিতে থাকে, তাদের অন্তরের প্রশান্তি বিনষ্ট হয়। এভাবে তাদের মান-সম্ভ্রম থেকে অর্থের ও জানের ক্ষয়ক্ষতি এমনভাবে হতে থাকে যে তারা বুঝতেও পারে না।(১) আর........ ওরা এবং ওরাই হচ্ছে সেই সব মানুষ যারা 'পেছনে পড়ে থাকা মানুষের সাথে থেকে যাওয়াতেই খুশী হয়ে গেছে এবং তাদের অন্তরের ওপর মোহর লেগে গেছে, এখন তারা আর বুঝবে না।'

'কিন্তু রসূল ও যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে'........ এরা হচ্ছে, ওই দল থেকে ভিন্ন আর একটি দল যারা 'তাদের মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করেছে।' ...... বিশ্বাসের কারণে তাদের ওপর যে দায়িত্বভার এসে যায়, তা তারা বহন করেছে, ঈমানের কর্তব্য পালন করেছে এবং সেই ইযযত রক্ষার জন্যে কাজ করেছে, যা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকে অর্জন করা যায় না। 'আর ওদেরই জন্যে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ,.... অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। দুনিয়াতে রয়েছে তাদের জন্যে মান সম্ভ্রম, আছে তাদের জন্যে শ্রদ্ধা, আছে মালে গনীমত এবং আছে সুনাম সুখ্যাতি। আর এরপর রয়েছে পরবর্তী যিন্দেগীতে পুরোপুরি পুরস্কার ও সম্মানজনক প্রতিদান। উপরন্তু তাদের জন্যে রয়েছে মহা দয়াময় আল্লাহর সন্তুষ্টি।

'আর ওরা এবং ওরাই হচ্ছে সাফল্যমন্ডিত।'

(১) দেখুন, 'দেরাসাতু ইসলামিয়্যাহ' পুস্তকের 'দারিবাতুযযুল্লে অধ্যায়

এ সাফল্য দুনিয়ার জীবনে স্থায়ী ও সম্মানজনক আরাম আয়েশের কারণে, আর চিরস্থায়ী সাফল্য আখেরাতের যিন্দেগীতে, যা আসবে মহা প্রতিদান আকারে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'নির্ধারণ করে রেখেছেন তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা (ফুলে-ফলে সুশোভিত) জান্নাতসমূহ (বাগ বাগিচা) যার নীচু বা পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে ছোট ছোট নদীসমূহ, চিরদিন তারা থাকবে সেখানে।'

'ওটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।'

'বেদুইনদের মধ্য থেকে একদল ওযর পেশকারী মানুষ এগিয়ে এলো, যেন তাদেরকে (যুদ্ধে না গিয়ে) ঘরে বসে থাকার অনুমতি দেয়া হয়। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে মিথ্যা কথা বলেছিলো, তারা বসেই রয়ে গেলো (নিজ নিজ বাড়ীতে)। তাদের মধ্যে যারা কুফরী কাজে লিপ্ত ছিলো, তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।'

'এ আয়াতটিতে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথম যে দলটি যুদ্ধে না যাওয়ার জন্যে অনুমতি চাইতে এসেছিলো তাদের প্রকৃতপক্ষে কিছু না কিছু কারণ ছিলো। আর এ কারণেই তারা পেছনে থেকে যেতে চাইছিলো। অপর যে দলটির কথা বলা হয়েছে, তারা বিনা কারণেই ঘরে বসেছিলো। তারা আল্লাহ ও রসূলের সাথে মিথ্যা কথা বলে নিজ নিজ ঘরে বসেছিলো, যেন যুদ্ধে যেতে না হয় এবং মৃত্যুর আশংকা থেকে বাঁচতে পারে। ওই সব ব্যক্তিই কাফের এবং তাদের জন্যেই রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। কিন্তু যারা তাওবা করবে এবং কুফরী (কাজ) করবে না, তাদের ব্যাপারে আল কোরআন নীরব। তাদের জন্যে হয়ত দোযখ ছাড়া অন্য কোনো ফিরে যাওয়ার জায়গা নির্ধারিত রয়েছে।

অবশেষে সফলের দায়িত্ববোধকে চাংগা করে তোলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, যুদ্ধের ডাকে সাড়া দিয়ে বের হওয়াটা শক্তিশালী ও শক্তিহীন সবার জন্যে বাধ্যতামূলক হবে তা জরুরী নয়। ইসলাম তো সহজ এবং মানুষের জন্যে কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থা এবং আল্লাহ তায়ালা কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো কষ্ট দেন না। যারা যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা হতে সত্যিই অক্ষম, তাদের ওপর কোনো জবরদস্তি নেই এবং তাদের জন্যে কোনো পাকড়াও নেই। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'দুর্বল, অসুস্থ এবং যাদের কাছে যুদ্ধে ব্যায়ভার বহন করার মতো কোনো অর্থ সম্পদ না থাকে, তাদের জন্যে কোনো অপরাধ নেই .... আর তাদের চোখগুলো দুঃখের কারণে অশ্রুধারা প্রবাহিত করছে। কারণ খরচ করার মতো কোনো সম্পদ তাদের কাছে নেই।' (আয়াত ৯১-৯২)

শারীরিক অসুস্থতা, বয়সের আধিক্য এবং অর্থের সংকটের কারণে যারা যুদ্ধে যেতে অক্ষম এবং অসুখের কারণে যারা নড়তে চড়তে পারে না বা যুদ্ধ করার যোগ্যতা রাখে না, তাদের জন্যে ঘরে থেকে যাওয়াতে কোনো দোষ নেই। যাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র বা মরুভূমির মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সফরে যাওয়ার মতো কোনো বাহন নেই অথবা এতো টাকা পয়সা নেই যার দ্বারা বাহন সংগ্রহ করতে পারে, তাদের জন্যেও যুদ্ধের ময়দানে যেতে না পারাটা কোনো অপরাধের বিষয় নয়। তাদের অন্তর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যে নিবেদিত, তারা কোনো কিছু গোপন রাখছে না বা কোনো ধোকাবাজিও করছে না, বরং যুদ্ধ ছাড়া অন্য যে কোনো দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে তা সাধ্যমতো পালন করে চলেছে। যেমন পাহারা দেয়া, পরিবারের দেখাশুনা করা, বাজার ঘাট করে দেয়া বা দারুল ইসলামের মধ্যে মহিলা ও শিশুদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করে দেয়া অথবা মুসলমান জনগোষ্ঠীর উপকারার্থে কোনো কাজ করা- এদের জন্যেও কোনো অপরাধ নেই। এরা সাধ্যমতো

এসব খেদমত তো আনজাম দেয়ই, উপরন্তু পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে এসব দায়িত্ব পালন করে– এসব সুন্দর ব্যবহারকারীদের যুদ্ধে না যাওয়ার কারণে কোনো দোষ দেয়া হবে না। অপরাধ তো হবে তাদের, যারা প্রকৃতপক্ষে জেনে-বুঝে অন্যায়কারী।

একইভাবে সেই সব লোকের জন্যেও কোনো অপরাধ নেই, যারা যুদ্ধ করতে সমর্থ বটে, কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার জন্যে তাদের কাছে কোনো বাহন নেই। এ কারণে যদি কেউ যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে, সে অবস্থাতেও তাদের জন্যে কোনো অপরাধ নেই, যেহেতু শরীক হতে না পারায় তারা খুশী তো নয়ই যুদ্ধের বাহন যোগাড় করার মতো অর্থ সংগ্রহ করতে না পেরে দুঃখের চোটে তাদের চোখগুলো দরবিগলিত ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে।

এটাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে জেহাদে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছার বাস্তব প্রভাবপূর্ণ প্রমাণ এবং এ মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে না পারার ব্যথার বহিপ্রকাশ। রসূলুল্লাহ (স.)-এর সময়ে মুসলমানদের মধ্যে একটি দলের এ বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছিলো যা বেশ কিছু রেওয়ায়াতে জানা যায়। তবে ওই ব্যক্তিদের নাম বলায় রেওয়ায়াতগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য পাওয়া যায়। তা সত্তেও সকল বর্ণনার মধ্যে একইভাবে প্রকৃত অবস্থাটা ফুটে উঠেছে।

আওফী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে যে হাদীসটি পেশ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাথে যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা হওয়ার জন্যে লোকদেরকে নির্দেশ দিলেন, তখন তাঁর সাথীদের মধ্য থেকে একটি ছোট্ট দল সামনে এলো। এদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মেগফাল ইবনে মাকভী, আল মাযনীও ছিলেন। তারা বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাদেরকে সফরের জন্যে বাহন দান করুন। তখন তাঁদেরকে রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'আল্লাহর কসম, তোমাদের বহন করে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো বাহন আমার কাছে নেই।' তখন, অনন্যোপায় হয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় ও অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁরা ফিরে গেলেন। জেহাদে যেতে না পারায় এবং কোনো সরঞ্জাম ও বাহন যোগাড় করতে না পারার ব্যথা তাদের কাছে বড় কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছিলো। আল্লাহ রব্বুল আলামীন যখন তাদের মধ্যে তাঁর এবং তাঁর রসূলের এ গভীর মহব্বত দেখতে পেলেন, তখন তাঁর কেতাবের মাধ্যমে তাদের ওযরগুলো তুলে ধরলেন।

মোজাহেদ বলেন, মুযায়না গোত্রের বনী মুকরেন কাবীলার ঘটনা বলতে গিয়ে এ আয়াত দুটি নাযিল হয়েছে।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেন, যাদের সম্পর্কে এ আয়াত দুটি নাযিল হয়েছে, তাঁরা ছিলেন বনী ওমর ইবনে আওফ গোত্রের সাত জন লোক- ১) সালেম ইবনে আওফ, বনী ওয়াকেফের, ২) হাযরামী ইবনে ওমর, বনী মাযেন ইবনে নাজ্জারের, ৩) আবদুররহমান ইবনে কা'ব (যার ডাকনাম ছিলো আবু লায়লা), বনী মুয়াল্লার, ৪) ফযলুল্লাহ, বনী সালামার ৫) আমর ইবনে আতামা এবং, ৬) আবদুল্লাহ ইবনে আমর আর, ৭) মুযানী।

তবুক যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে এসহাক বলেন, এরপর মুসলমানদের মধ্য থেকে রসূলুল্লাহ (স.)-এর দিকে একদল লোক এগিয়ে এলেন। তারা কাঁদছিলেন, সংখ্যায় ছিলেন তাঁরা সাত জন। তারা কয়েকজন ছিলেন আনসাদের মধ্য থেকে। বাকিরা ছিলেন, ১) বনী আমর ইবনে আওফ থেকে সালেম ইবনে আমর, ২) বনী হারেশার মিত্র উলিয়্যাহ ইবনে যায়দ, বনি মাযেনের মিত্র, ৩) আবু লায়লা ৪) আবদুররহমান ইবনে কা'ব, ৫) বনী সালামার মিত্র আমর ইবনুল হাম্মাম ইবনুল জামূহ, ৬) আবদুল্লাহ ইবনুল মুগাফফাল এবং ৭) আল মুযানি। আর কোনো কোনো লোক বলেছেন, বরং উনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর

মুযানী এবং ৫) বনী ওয়াকেফ-এর মিত্র হাযরামী ইবনে আবদুল্লাহ, ৬) এবং আ'য়ায ইবনে সারিয়া আলফাযারী। এরা খুবই অভাবী লোক ছিলেন, যে জন্যে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এরা সফরের বাহন চাইলেন। তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'তোমাদের দেয়ার মতো আমার কাছে এমন কোনো যানবাহন নেই, যাতে তোমাদের সওয়ার করাতে (এবং যুদ্ধের ময়দানে পাঠাতে) পারি।' এরপর তাঁরা ফিরে গেলেন। তখন তাঁদের অবস্থা ছিলো এই যে, খরচ করার মতো কিছু না পাওয়াতে তাঁদের চোখ দিয়ে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো।

এ প্রাণ প্রবাহের কারণেই বরাবর ইসলাম সাহায্য পেয়েছে এবং বিজয়ী হয়েছে। আর ইসলামের মধ্যে এ প্রাণের প্রবাহ থাকাতেই তার কথা জগতে সম্মান লাভ করেছে। সুতরাং আমাদের আজ চিন্তা করা দরকার, আমরা আজ ওদের তুলনায় কোথায় আছি। আরো আমাদের হিসাব করে দেখা দরকার উপরোক্ত ওই দলটির তুলনায় আমাদের কি প্রাণ প্রবাহ রয়েছে। তারপর যদি আমাদের মধ্যে সত্যিকারে চেতনার উদয় হয় এবং আমরা আত্মসমালোচনা করে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারি, তাহলে আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য ও সম্মান লাভ করার জন্যে অবশ্যই দরখাস্ত করতে পারবো। আর তা যদি না পারি, তা হলে এখনও সময় আছে, আমরা নিজেদের সংশোধন করে নিতে পারি এবং এভাবে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি। আর অবশ্যই একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সাহায্যকারী, সুতরাং সাহায্য একমাত্র তাঁরই কাছে চাইতে হবে।

দশম পারাভুক্ত অংশের পরিশিষ্ট

একাদশ খন্ডে সূরা আত তাওবার শেষাংশ এবং সূরা ইউনুসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, সূরা আত তাওবার অধিকাংশ দশম পারায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে আমি প্রথমে সূরা আত তাওবার শেষাংশ বর্ণনা করবো। অতপর অংশ সূরা ইউনুস সম্পর্কে আলোচনা পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

দশম পারায় সূরা আত তাওবার ওই সমস্ত আয়াত বর্ণিত হয়েছে, যা আলোচ্য সূরার প্রকৃতি এবং নাযিলের পরিবেশ পরিস্থিতি উন্মোচন করে। সাথে সাথে এ আয়াতসমূহ মুসলিম সমাজ এবং অমুসলিম সমাজসমূহের মধ্যকার চূড়ান্ত সম্পর্ক এবং দ্বীন ইসলামের গতিশীল বিধানের প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে এ সূরার গুরুত্বও বর্ণনা করে।

এ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরাটি কোরআনে হাকীমের সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এটি সর্বশেষ সূরা নয়। আলোচ্য সূরাটি এ পৃথিবীতে বিদ্যমান মুসলিম এবং অমুসলিম জাতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিধি বিধানসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন অন্তর্ভুক্ত করে খোদ মুসলিম সমাজের শ্রেণী বিন্যাস তার মূল্যবোধ, মর্যাদাকে। পরিশেষে এটি সমাজের প্রত্যেক গোত্র এবং বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থাকেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে। অনুরূপভাবে এ সূরা গোটা সমাজ এবং তার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক গোত্র এবং শ্রেণীর বাস্তব চিত্রকে সূক্ষ্মভাবে চিত্রায়িত করে। এ সূরার অন্তর্ভুক্ত চূড়ান্ত বিধিবিধানকে যদি আমরা পূর্বের সূরাসমূহের অস্থায়ী ও সাময়িক বিধি বিধানের সাথে তুলনা করি, তাহলে আমরা বলতে পারি যে, আলোচ্য সূরাটি ইসলামের গতিশীল বিধান তার বিভিন্ন স্তর ও পদক্ষেপের প্রকৃতির বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশেষ একটা গুরুত্বের দাবীদার। এ উভয় বিধানের তুলনামূলক আলোচনা ইসলামের গতিশীল বিধানের নমনীয়তা এবং এর চূড়ান্ত রূপকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে। আর এই তুলনামূলক আলোচনা ছাড়া এর বিভিন্ন চিত্র, বিধি বিধান এবং নিয়মাবলীর মধ্যে একটা পারস্পরিক সংমিশ্রণের প্রবল আশংকা রয়েছে। আর এটা সচরাচর

তখনই হয়ে থাকে, যখন কোরআনের কিছু আয়াতের সাময়িক বিধি বিধান সরিয়ে নিয়ে তাতে চূড়ান্ত বিধান বসিয়ে দেয়া হয়। অতপর চূড়ান্ত বিধানধারী আয়াতসমূহকে সাময়িক বিধানধারী আয়াতসমূহের সাথে খাপ খাইয়ে চেষ্টা করা হয়, নেয়ার বিশেষ করে ইসলামী জেহাদ এবং মুসলিম সমাজের বিধর্মী সমাজের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যখন এর ওপরই নির্ভর করা হয়।

আমি আলোচ্য সূরার শুরুতে উল্লেখ করেছি যে, এটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যদিও তার বিষয়বস্তু ও পরিবেশ পরিস্থিতি এক ও অভিন্ন। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে স্ব-স্ব বিষয়ের চূড়ান্ত বিধি বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আরব উপদ্বীপের মুসলমান এবং মোশরেক সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্পর্কের চূড়ান্ত বিধি বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুসলমান এবং আহলে কেতাবদের মধ্যকার সম্পর্কের চূড়ান্ত নিয়মাবলী বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে যে সকল মন্থরগতি সম্পন্ন মুসলমানকে আহবান জানানো হয়েছে, তাদের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ সেসব মুসলমানকে আহলে কেতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যারা ইসলাম এবং মুসলিম সমাজকে এ পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় করে দেয়ার লক্ষ্যে আরব উপদ্বীপের চতুর্দিকে সন্নিবেশিত হয়েছিলো। আর চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে মোনাফেক এবং মুসলিম সমাজে তাদের ঘৃণ্য কর্মকান্ডের তিরস্কার, তাদের মানসিক অবস্থা, তবুক যুদ্ধ চলাকালীন সময় তার পূর্বে এবং পরে তাদের ভূমিকা। অনুরূপভাবে এই অধ্যায়ে মোনাফেকদের চক্রান্ত ও তাদের দুরভিসন্ধি এবং জেহাদে অংশগ্রহণ না করে পেছনে থাকার বিভিন্ন ঠুনকো ওজুহাত উন্মোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে আরো বিবৃত হয়েছে মুসলিম সারিতে মোনাফেকদের দুর্বলতা, ফেতনা, বিভেদ সৃষ্টি করা আল্লাহর রসূল এবং খাঁটি মোমেনদেরকে কষ্ট দেয়ার বিবরণ। সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকদের প্রতারণা থেকে খাঁটি মোমেনদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এ উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক, পার্থক্য, বৈশিষ্ট্য এবং কর্মকান্ড তিনি নির্ধারণ করেছেন।

উল্লেখিত চারটি অধ্যায়ের বিস্তারিত বর্ণনা দশম খন্ডে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেনি, তাদের এই জেহাদে অংশগ্রহণ না করার পরিণামের ব্যাবধান সংক্রান্ত আলোচনার অবশিষ্টাংশ এ পারায় বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, নবম পারার শেষ আয়াতটি ছিলো (৯১ ও ৯২ আয়াত) উল্লেখিত আলোচনার উপসংহার আর যার মাধ্যমে এ খন্ডের সূচনা হয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহ এরশাদ,

(সব) অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা সামর্থবান হওয়া সত্তেও অব্যাহতি চাইলে...... (আয়াত ৯৩-৯৬)

আল্লাহর রসূল (স.) এবং খাঁটি মুসলমানরা যখন তবুক যুদ্ধ থেকে নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা পেছনে পড়া মোনাফেকদের অবস্থা এবং তাদের নানাবিধ খোঁড়া ওজুহাত সম্পর্কে রসূল (স.)-কে অবহিত করেন। পাশাপাশি মোনাফেকদের সাথে কি ধরনের আচরণ করবে এবং তাদের খোঁড়া ওজুহাতের কি জবাব দেবে, তিনি তাও নবী করীম (স.) এবং সাহাবীদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

অতপর পঞ্চম অধ্যায়ের সূচনা হতে যাচ্ছে, যেখানে মক্কা বিজয় থেকে শুরু করে তবুক যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ে গোটা মুসলিম সমাজের শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে। এর আলোকে আমরা জানতে পারি– যা আমি সূরার সূচনাতেও বর্ণনা করেছি যে, মোহাজের এবং আনসারদের খাঁটি অগ্রবর্তী

দল (যারা মুসলিম সমাজের শক্তিশালী ইস্পাতকঠিন ঘাঁটি নির্মাণ করেছিলেন)-এর পাশাপাশি আরো অসংখ্য দল ছিলো। তারা হচ্ছে প্রথমত, বেদুইনরা, এরা দুভাগে বিভক্ত– খাঁটি মোমেন ও মোনাফেক। দ্বিতীয়ত, মদীনার মোনাফেকরা। তৃতীয়ত, ওই সমস্ত লোক, যাদের কাজকর্ম মিশ্র ধরনের– কিছু ভালো, কিছু মন্দ। তাদের ধারণা, আবেগ ও অনুভূতি এখনবধি ইসলামী ছাচে গড়ে উঠেনি। তারা ইসলামী মহা পরীক্ষায় এখনবধি উত্তীর্ণ হয়নি। চতুর্থত, ওই সম্প্রদায় যাদের অবস্থা ও পরিণাম এখনবধি জানা যায়নি। তাদের বিষয়টি আল্লাহর হুকুমের ওপর নির্ভরশীল। তিনি তাদের বর্তমান অবস্থা ও পরিণাম সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তিনি চাইলে তাদের শাস্তি দেবেন, আবার চাইলে তাদের প্রতি নতুন করে অনুগ্রহ করবেন। পঞ্চমত, ওই সকল লোক, যারা ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ছিলো, তারা বাহ্যত ইসলামের আবরনে আবৃত। কিন্তু যোপনে তারা ইসলামের শত্রুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। কোরআনে হাকীম সংক্ষেপে উল্লেখিত দলগুলোর কথা বর্ণনা করেছে। সাথে সাথে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে মুসলিম সমাজে তাদের আচরণ কি ধরনের হওয়া উচিত? রসূলে মাকবুল (স.) এবং খালেস মুসলমানদের তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করা দরকার? নিম্নে এ প্রসঙ্গের আয়াতগুলো প্রদত্ত হলো,

(আয়াত নং ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৬, ১০৭, ১০৮)

ওপরে বর্ণিত এই দলগুলো দ্বারা কাকে কাকে বুঝানো হয়েছে? আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যার সময় তা আমি উপস্থাপন করব।

আলোচ্য সূরার শেষ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে এসে মোমেনদের আল্লাহর পথে জেহাদ করার লক্ষ্যে, তাদের ইসলামী বায়আতের ধরন, এ জেহাদের ধরন এর সীমারেখা এবং এতে মদীনাবাসী ও তার আশেপাশের মরুবাসীদের করণীয় সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে এ অধ্যায়ে আরো বর্ণিত হয়েছে একমাত্র আকীদার ভিত্তিতে মুসলমান এবং অমুসলমানদের মাঝে সম্পর্ক পৃথকী করণের প্রয়োজনীয়তা এবং একমাত্র এই আকীদার ভিত্তিতেই উভয় দলের মাঝে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। আর এ সম্পর্ক বিভিন্ন পর্যায়ের সম্পর্কও হতে পারে যেমন পরিবার পরিজন, ভাই বোন, পিতা মাতা, সন্তান ও পিতা মাতার সম্পর্ক, আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্ক এবং গোত্রীয় সম্পর্ক। পাশাপাশি এতে ওই সকল লোকের পরিণামের বিবরণও এসেছে, যারা নেফাক সত্ত্বেও তবুক যুদ্ধ থেকে পেছনে থাকেনি। এখানে কোরআনী নির্দেশের প্রতি মোনাফেকদের স্বতন্ত্র অবস্থানেরও কিছু দিক বর্ণিত হয়েছে। এর বর্ণনা এসেছে। নিম্নের আয়াতসমূহে আয়াত নং ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৭, ১১৮, ১২০, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৭)

আলোচ্য সূরার শেষভাগে রসূল (স.)-এর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে একমাত্র আল্লাহর প্রতি ভরসা করা এবং তাঁর যিম্মাদারীকে যথেষ্ট মনে করার জন্যে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সূরার বিভিন্ন আয়াতের দ্রুত পর্যালোচনা করার পর আমি সামনে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করবো।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا
مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾
يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ
قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾ سَيَحْلِفُونَ
بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ
رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ
لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾

৯৩. (সব) অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা সামর্থবান হওয়া সত্ত্বেও তোমার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা পেছনে পড়ে থাকলো তাদের সাথে (ঘরে বসে) থাকাই তারা পছন্দ করলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন, (এ কারণেই) তারা (তা) জানতে পারছে না (কোন্টা তাদের জন্যে ভালো)। ৯৪. (যুদ্ধ শেষে) তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে; তখন এরা তোমাদের কাছে ওযর পেশ করবে, তুমি (তাদের) বলো, (আজ) তোমরা কোনো রকম ওযর-আপত্তি পেশ করো না, আমরা আর কখনো তোমাদের বিশ্বাস করবো না, আল্লাহ তায়ালা (ইতিমধ্যেই) তোমাদের (অন্তরের) সব কথা আমাদের বলে দিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন, অতপর তোমাদের সেই মহান সত্তার কাছেই ফিরে যেতে হবে, যিনি (যেমন) জানেন তোমাদের গোপন করে রাখা সব কিছু, (তেমনি) জানেন প্রকাশ্য বিষয়সমূহ, অতপর তিনি (সে আলোকে) তোমাদের বলে দেবেন (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা কি কাজ করছিলে। ৯৫. যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা আল্লাহ তায়ালার নামে কসম করে তোমাদের বলবে, তোমরা যেন তাদের কাছ থেকে (এ) ব্যাপারটা উপেক্ষা করো; (আসলেই) তোমরা ওদের উপেক্ষা করো, কেননা ওরা হচ্ছে (চিন্তা ও আদর্শের দিক থেকে) নাপাক, তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, (দুনিয়ার জীবনে) তারা যা কিছু করে এসেছে এটা হচ্ছে তার (যথার্থ) বিনিময়। ৯৬. এরা তোমাদের কাছে এ জন্যেই কসম করে যেন তোমরা (সব কথা ভুলে আবার) তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও, কিন্তু তোমরা যদি (শত বারও) তাদের ওপর সন্তুষ্ট হও, আল্লাহ তায়ালা কখনো এ ফাসেক সম্প্রদায়ের ওপর সন্তুষ্ট হবেন না।

তাফসীর

আয়াত ৯১-৯৬

জেহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলে ওই সমস্ত লোকের কোনো প্রকার দোষ বা গুনাহ হবে না, যারা দুর্বল, অসুস্থ এবং অসহায়-ফকীর যাদের আল্লাহর রাহে খরচ করার মতো কিছুই নেই। আর যারা জেহাদে অংশ গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত ছিলো, বরং জেহাদে যাবার জন্যে ব্যাকুলও ছিলো, কিন্তু তাদেরকে জেহাদের মাঠে বহন করে নিয়ে যাওয়ার মতো রসূলের কাছে সওয়ারীর কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। কিন্তু দোষ সে সকল ধনী ও সক্ষম লোকদের হবে, যারা শরয়ী কোনো ওযর ছাড়া নিজেদের ঘরবাড়ীতে বসে থাকাকে পছন্দ করেছে। এমনকি তারা খোঁড়া ওজুহাত দেখিয়ে শিশু ও মহিলাদের সাথে স্বীয় বাড়ীতে থাকার জন্যে রসূল (স.)-এর অনুমতি প্রার্থনা করেছে ও অনুমতি নিয়েছে।

মোনাফেকদের সমাজচ্যুত করার নির্দেশ

জেহাদে অংশগ্রহণ না করে ঘরে বসে থাকার অনুমতি প্রার্থনার জন্যে ধনীদের আল্লাহর দরবারে তাদেরকে পাকড়াও হতে হবে। কারণ তারা অলস ও মন্থরগতি সম্পন্ন, ধনী ও সক্ষম হওয়া সত্তেও আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক অর্পিত হক আদায় করেনি। তারা ইসলামের হকও আদায় করেনি। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিপদ আপদ থেকে হেফাযত করেছেন এবং তাদেরকে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন। তারা যে সমাজে বাস করে সে সমাজেরও হক আদায় করেনি। অথচ আল্লাহ তায়ালা সমাজে তাদেরকে সম্মান দিয়েছেন এবং তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে এই গুণটি বাছাই করেছেন।

'তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে।'

এটা তাদের ভগ্নসাহস, দুর্বল ঈমান ও সংকল্পের পরিচায়ক। সত্যিকার দুর্বল, রুগ্ন লোকেরা এবং যেসব লোক জেহাদে শরীক হবার জন্যে পাথেয় পায়নি, তারা যদি মহিলা, শিশু এবং প্রকৃত অক্ষমদের সাথে পেছনে থেকে যায়, তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ তারা সত্যিকারেই অক্ষম। কিন্তু সুস্থ সবল ব্যক্তি যদি সত্যিকারের কোনো ওযর আপত্তি ছাড়াই নিজ গৃহে থেকে যায়, তাহলে তারা ক্ষমার অযোগ্য।

'আর আল্লাহ মোহর এঁটে দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহে। তাই তারা এখন কিছুই জানে না' (যে, আল্লাহর কাছে তাদের এহেন কর্মনীতি গ্রহণের ফল কী দাড়াবে।)

আল্লাহ তায়ালা তাদের অনুভূতি ও জ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন এবং তিনি তাদের গ্রহণ ও হৃদয়ঙ্গম করার যাবতীয় উপায় উপকরণকেও অকার্যকর করে দিয়েছেন। কারণ তারা তাদের জন্যে অলসতা, মন্থরতা, কৃত্রিম অসুস্থতা এবং জীবন্ত গতিশীল কর্মকান্ড থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখাকে বাছাই করে নিয়েছে। যখনই মানুষ অপমানজনক নিরাপত্তা এবং ঘৃণ্য বিলাসিতাকে প্রাধান্য দিয়েছে, তখনই তার হৃদয় থেকে অনুসন্ধিৎসা, পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং জ্ঞানের আগ্রহ উদ্দীপনা লোপ পেয়ে গেছে। অধিকন্তু সে তখন বাস্তব জীবনে বিচরণ, এর প্রভাবগ্রহণ ও বিস্তার, এর সক্রিয় উপস্থিতি ও প্রেরণা থেকে বঞ্চিত হয়।

নিসন্দেহে ঘৃণ্য বিলাসিতা অনুভূতির দ্বারকে রুদ্ধ করে এবং বিবেক ও অন্তরে মোহর এঁটে দেয়। গতি জীবনের চাঞ্চল্য আনে। আর গতি জীবনের চালিকাশক্তিও। বিপদের মুখোমুখি হওয়া অন্তরের অদৃশ্য শক্তি এবং বিবেকের সুপ্ত শক্তিকে উত্তেজিত করে, পেশীশক্তিকে শক্তিশালী করে। আর এটা লুপ্ত প্রস্তুতিসমূহকে উন্মোচন করে, যা প্রয়োজনের মুহূর্তে তার মনে উদ্রেক হয় এবং যা মানবশক্তিকে কাজের প্রশিক্ষণ দেয় এবং তাকে প্রয়োজনের সময় সাড়া দেয়ার জন্যে প্রস্তুত করে।

আর এগুলো জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সচেতনতার বিভিন্ন দিক যা থেকে ঘৃণ্য বিলাসিতা এবং অপমানজনক নিরাপত্তার অন্বেষণকারীরা অহরহ বঞ্চিত থাকে।

যারা সক্ষম বিত্তশালীদের সাথে পেছনে থাকক পছন্দ করেছে তাদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে হচ্ছে যে, তাদের নম্রতা ও কোমলতা পছন্দ করা এবং নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দেয়ার পশ্চাতে রয়েছে সাহস হারিয়ে ফেলা, আত্মার নীচুতা, হীনতা, মাথা অবনত করা এবং সমস্যার মুখোমুখি হওয়া এবং স্পষ্ট বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত থাকা।

'তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের নিকট নানা ধরনের ছল ছুতা ও ওযর পেশ করবে।'

এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়নবী ও খাঁটি মোমেনদেরকে জেহাদ থেকে ফিরে আসার পর যে সকল মোনাফেক জেহাদে অংশগ্রহণ করেনি, তাদের মিথ্যা ওজুহাত পেশ সম্পর্কে অবহিত করেন। এ আয়াতগুলো মদীনা তাইয়েবায় ফিরে আসার পূর্বে পথিমধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিলো।

জেহাদে অংশগ্রহণ না করে ঘরে বসে থাকা সম্পর্কে তারা তোমাদের কাছে নানাবিধ খোঁড়া ওজুহাত পেশ করবে, কারণ তারা জেহাদে অংশগ্রহণ না করার সঠিক কারণ এবং তাদের নগ্ন কাজ প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায় লজ্জাবোধ করবে এবং ভীত সন্ত্রস্ত হবে। তাদের জেহাদে অংশগ্রহণ না করার প্রকৃত কারণ হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতা, নিরাপত্তা ও সুস্থতাকে প্রাধান্য দেয়া এবং জেহাদে অংশগ্রহণ করাকে ভয় পাওয়া।

'হে নবী! তুমি তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দাও, বাহানাবাজী করো না, আমরা তোমাদের কোনো কথাই বিশ্বাস করবো না। তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।'

হে নবী, তুমি তাদেরকে বলো, তোমরা বেশী বেশী খোঁড়া ওযর আপত্তি পেশ করো। কিন্তু আমরা এতে, কখনো আশ্বস্ত হবো না এবং বিশ্বাস করবো না। পূর্বে আমরা তোমাদের যাহেরী ইসলামকে যেভাবে গ্রহণ করতাম এখন তা আমরা আর কখনো করবো না। কারণ আল্লাহ তায়ালা এখন আমাদের সামনে তোমাদের বাস্তব অবস্থা এবং অন্তরের কুটিলতা প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি তোমাদের এসব কাজের উৎস এবং উদ্দেশ্য উন্মোচন করেছেন তিনি তোমাদের সত্যিকার অবস্থা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তোমাদের কোনো বিষয়ই আর আমাদের কাছে গোপন নয়।

'লান নু'মেমনা লাকুম' (আমরা তোমাদের কথা কখনোই বিশ্বাস করবো না) এ বাক্যটি একটি বিশেষ অর্থের দাবীদার। এর মাধ্যমে বিশ্বাস এবং আস্থা না রাখার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কারণ ঈমান হচ্ছে মুখের স্বীকৃতি, বুদ্ধি ও বিবেকের আস্থা, অন্তরের বিশ্বাস এবং যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখার নাম। আর এ আস্থা মোমেনদের একে অপরের মাঝে বিনিময় হয়। কোরআনে করীমের বর্ণনা ভংগির মাঝে সর্বদা এর কিছু স্বতন্ত্র স্বকীয়তা অর্থাৎ নিজস্ব অর্থ ও ইংগিত বিদ্যমান থাকে।

সুতরাং হে নবী, তুমি ওই সকল লোককে বলে দাও, যারা সত্যিকার শরয়ী ওযর ছাড়াই গযওয়ায়ে তবুকে অংশগ্রহণ না করে নিজেদের ঘরে শিশু ও মহিলাদের সাথে রয়ে গেছে, তোমরা মিথ্যা ও অযথা ওযর-আপত্তি পেশ করো না, কারণ তোমাদের এ বক্তব্য অনর্থক। বরং কথা না বলে কাজ করে যাও। কারণ তোমাদের কাজ যদি তোমাদের কথার স্বীকৃতি দেয়, তবেই ভালো হবে। অন্যথায় তোমাদের কথায় বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন এবং তাতে আশ্বস্ত হওয়ার কি অর্থ হতে পারে।

'এখন আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন।'

আল্লাহর কাছে তোমাদের যাবতীয় কাজ এবং তার পেছনে লুক্কায়িত সকল নিয়ত ও উদ্দেশ্য, কিছুই গোপন নেই। রসূল (স.) কাজের মাধ্যমে তোমাদের বক্তব্যকে মূল্যায়ন করবেন। আর তারই ভিত্তিতে মুসলমান সমাজে তোমাদের সাথে আচরণ করা হবে।

দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ঘটছে, তাই একটি মানুষের জীবনের শেষ নয়। বরং তার পশ্চাতে হিসাব এবং প্রতিদান রয়েছে, যা আল্লাহর নিরংকুশ জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

'তারপর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সব কিছুই জানেন এবং তোমরা কি কাজ করছিলে তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।'

'গায়ব' (অদৃশ্য) হচ্ছে যা মানুষের জ্ঞান বহির্ভূত গোপন বস্তু। আর শাহাদাত (দৃশ্যমান) হচ্ছে প্রকাশ্য বস্তু যা মানুষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এবং তাকে ভালো করেই চিনে। উল্লেখিত অর্থ বা তার চেয়ে ব্যাপক ও বড় অর্থে আল্লাহ তায়ালা গোপন ও অগোপন এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি এই দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উভয় জগতে যা কিছু আছে সবই জানেন। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সম্বোধন করে ইংগিত করেছেন' তিনিই তোমাদের বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে।' তারা কি কাজ করেছিলো এ সম্পর্কে তারা ভালো জানে, আল্লাহ তায়ালা তাদের চেয়েও বেশী ভালো জানেন, তাই তিনি কাল কেয়ামতে তাদের আমল সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবেন। আসলে এমন অনেক গোপন কারণ রয়েছে, যার ভিত্তিতে মানুষ কাজ করে থাকে। অথচ সে নিজেও সেই কারণ সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ তায়ালা সে কারণ ভালো করেই জানেন। কাজের এমন অনেক পরিণাম রয়েছে যে ওই কাজ করেছে সে ওই সম্পর্কে কিছুই জানে না, অথচ আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। এখানে পরিণাম বলতে কেয়ামতের দিন তা বলে দেয়ার পরিণামকে বুঝানো হয়েছে। আর তা হচ্ছে কাজের হিসাব নিকাশ এবং সঠিক প্রতিদান। কিন্তু এ পরিণামের কথা এখানে স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়নি। এখানে শুধু বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা কাল কেয়ামতে তাদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। এরশাদ হচ্ছে,

যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে .... (আয়াত ৯৫)

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রসূল মোহাম্মদ (স.)-এর জন্যে আরেকটি অবগতি যে, যখন তিনি এবং তাঁর সংগীরা নিরাপদে স্বীয় সমাজের লোকদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তাদের অবস্থা কি হবে। মোনাফেকদের ধারণা ছিলো যে, তিনি এবং তাঁর সাথীরা রোমানদের সাথে যুদ্ধ করে বাড়ীতে ফিরতেই পারবেন না।

আল্লাহ তায়ালা পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁর প্রিয় হাবীব মোহাম্মদ (স.)-কে এ মর্মে অবহিত করেন যে, মোনাফেকরা সাহাবীদের যুদ্ধের মাঠ থেকে ফিরে আসার পর মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে তোমাকে ও মুসলমানদেরকে আশ্বস্ত করতে চাইবে এবং তাতে তাদের উদ্দেশ্য হবে, তুমি ও অপরাপর মুসলমানরা যেন তাদের জেহাদের অনুপস্থিতির বিষয়টি উপেক্ষা করে এবং সেজন্যে যেন কোনো ভর্ৎসনা না করে তাদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। তাদের ঘৃন্য কৃতকর্মের জন্যে যেন তাদেরকে পাকড়াও করে শাস্তি না দাও।

অতপর আল্লাহ তায়ালা রসূলকে তাদের বিষয় উপেক্ষা করা, ভর্ৎসনা না করা এবং ভালো সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেন। কারণ, ভর্ৎসনা করে কোনো ফায়দা নেই। তাদের মনে যখন ঈমান নেই এবং তার বাসনাও নেই, তখন ভর্ৎসনা করেই বা কি হবে। অনর্থক নিজের সময় নষ্ট করা।

'তুমি তাদের উপেক্ষা করো। নিসন্দেহে এরা অপবিত্র।'

এটা তাদের অশরীরী অপবিত্রতার বাহ্যরূপ, তাদের শরীর ও সত্ত্বা অপবিত্র একথা বলা হয়নি; বরং তাদের আত্মা ও আমলসমূহ অপবিত্র ও কদর্য এটা বলা হয়েছে। এখানে তাদের বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে, যা অত্যন্ত ঘৃণ্য, স্পষ্ট নোংরামি, বিরক্তিকর ও অবজ্ঞার সংক্রান্ত।

যুদ্ধের মাঠে যাওয়ার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যারা স্বীয় গৃহে কোনো কারণ ছাড়াই বসেছিলো, তারা নিসন্দেহে অপবিত্র ও নোংরা। তাদের এ অপবিত্রতা তাদের আত্মাকে কলুষিত করে। তাদের ঘৃণ্য নোংরামি আবেগ অনুভূতিকে কষ্ট দেয় যেমন জীবিত লোকের মাঝে গন্দময় মৃত লাশ কষ্টদায়ক ও সংক্রামক হয়ে থাকে।

'এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের ঠিকানা হলো দোযখ।'

তারা মনে করে যে, তাদের পশ্চাৎপদ অবলম্বন করা এবং স্বীয় গৃহে থাকার মাধ্যমে তারা বুঝি লাভবান হয়েছে, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি অর্জন করেছে এবং শারীরিক সুস্থতা ও সম্পদ সংরক্ষণ করেছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা দুনিয়াতে অপবিত্র অবস্থায় থাকবে এবং পরকালে স্বীয় অংশ হতে বঞ্চিত হবে। মূলত এটা সব দিকেরই ক্ষতি।

মোজাহেদরা জেহাদের মাঠ থেকে ফিরে আসার পর যারা জেহাদে অংশগ্রহণ করেনি, তাদের অবস্থা কি হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে এভাবে অবহিত করছেন। এরশাদ হচ্ছে,

এরা তোমাদের কাছে এজন্যেই কসম করে যেন তোমরা.......... (আয়াত ৯৬)

মুসলমানদের কাছে মোনাফেকদের কামনা হচ্ছে তারা যেন তাদের কৃতকর্মকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এবং তাদের প্রতি রাযী ও খুশী থাকে। এটা এজন্যে যে, তারা এ সন্তুষ্টির মাধ্যমে মুসলিম সমাজে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে বলে মনে করে। পাশাপাশি তারা এটাও আশা করবে যে, মুসলমানরা পূর্বের ন্যায়ই তাদের সাথে আচরণ করবে, তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবে না এবং কঠোরতা অবলম্বন করবে না, যার নির্দেশ আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি মুসলমান এবং মোনাফেকের চূড়ান্ত সম্পর্কও এখানে নির্ধারণ করেছেন।

এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নেফাক থেকে উৎপন্ন, পেছনে পড়ে থাকা ও স্বীয় গৃহে অবস্থান নেয়ার কারণ আল্লাহর দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে। আর আল্লাহ তায়ালা ফাসেক না-ফরমান লোকদের প্রতি কখনও রাযী ও খুশী হন না। এমনকি তারা যদি কসম খেয়ে মিথ্যা ওযর আপত্তি পেশ করার মাধ্যমে মুসলমানদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষমও হয় তবু আল্লাহ তায়ালা খুশী হবেন না। তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এ অবস্থাতে মানুষ তথা মুসলমানের সন্তুষ্টি আল্লাহর গযব ও অভিশাপের কোনো পরিবর্তন করবে না এবং তাদের সামান্য উপকারেও আসবে না। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র পথ হচ্ছে ফাসেকী কাজ থেকে ফিরে আসা এবং আল্লাহর সঠিক দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা।

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জামায়াতের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত ওযরবিহীন পিছটান দেয়া মোনাফেকদের মুখোশ উন্মোচন করেন এবং মুসলমান ও মোনাফেকদের মধ্যকার চূড়ান্ত সম্পর্ক নির্ধারণ করেন– যেমন আগে মুসলমান ও মোশরেক এবং মুসলমান ও আহলে কেতাবদের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণ করেছিলেন। আলোচ্য সূরাটি এ বিষয়ে সর্বশেষ চূড়ান্ত নির্দেশ।

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٩٧﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ
مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾
وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ
عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِیْ
رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾ وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ
وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ
وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٠٠﴾ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ؕ وَمِنْ اَهْلِ

৯৭. (এ) বেদুইন (আরব) লোকগুলো কুফুর ও মোনাফেকীর ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর (প্রকৃতির), আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর (স্বীয় দ্বীনের) সীমারেখার যে বিধানসমূহ নাযিল করেছেন, সে জ্ঞান লাভ না করার ক্ষমতাই মনে হয় এদের (মধ্যে) প্রবল; (মূলত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সুবিজ্ঞ, কুশলী। ৯৮. (এ) বেদুঈন (আরব)-দের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা কখনো যদি (আল্লাহ তায়ালার পথে) কিছু ব্যয় করে, তাকে (নিজেদের ওপর) জরিমানাতুল্য মনে করে এবং তোমাদের ব্যাপারে কালের বিবর্তন (-মূলক কোনো বিপদ-মসিবত) আসুক— তারা এ অপেক্ষায় থাকে; (আসলে) কালের মন্দচক্র তো তাদের (নিজেদের) ওপরই ছেয়ে আছে; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন। ৯৯. (আবার) এ বেদুঈন (আরব)-দের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, (এরা) আল্লাহর পথে যা কিছু খরচ করে তাকে আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও রসূলের দোয়া (পাওয়ার একটা অবলম্বন) মনে করে; সত্যি সত্যিই তা হচ্ছে তাদের জন্যে আল্লাহর নৈকট্যলাভের (একটা) উপায়; অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের স্বীয় রহমতে প্রবেশ করাবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

রুকু ১৩

১০০. মোহাজের ও আনসারদের মাঝে যারা প্রথম (দিকে ঈমান এনেছে) এবং পরে যারা একান্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ তায়ালার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে এমন এক (সুরম্য) জান্নাত তৈরী করে রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; আর তাই (হবে) সর্বোত্তম সাফল্য। ১০১. (এ) বেদুঈন (আরব)-দের

الْمَدِينَةِ ۛ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم

مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ

خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٢﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ

عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ

وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

যারা তোমার আশেপাশে (বাস করে), তাদের মধ্যে কিছু কিছু মোনাফেক আছে; আবার (কিছু মোনাফেক) মদীনাবাসীদের মধ্যেও আছে। এরা সবাই কিন্তু মোনাফেকীতে সিদ্ধহস্ত। তুমি এদের জানো না; কিন্তু আমি এদের জানি, অচিরেই আমি এদের (অপমান ও পরাজয়ের দ্বারা) দুবার শাস্তি দেবো, অতপর (ধীরে ধীরে) এদের সবাইকে এক বড়ো আযাবের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। ১০২. (তোমাদের মাঝে) আরো কিছু লোক আছে, যারা (অকপটে) নিজেদের গুনাহসমূহের কথা স্বীকার করে, (শয়তানের ফেরেবে) তারা তাদের নেক কাজকে গুনাহের কাজের সাথে মিশিয়ে ফেলেছে; আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হবেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ১০৩. তুমি তাদের ধন-সম্পদ থেকে (যাকাত ও) সাদকা গ্রহণ করো, সাদকা তাদের পাক-সাফ করে দেবে, তা দিয়ে তুমি তাদের পরিশোধিত করে দেবে, তুমি তাদের জন্যে দোয়া করবে; কেননা তোমার দোয়া তাদের জন্যে (হবে পরম) সান্ত্বনা; আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন। ১০৪. তারা কি একথাটা জানে না, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তিনি (যাকাত ও) সাদকা গ্রহণ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন তাওবা গ্রহণকারী ও পরম দয়ালু। ১০৫. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, তোমরা (ভালো) কাজ করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনরা তোমাদের (ভবিষ্যত) কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করবেন; অতপর মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকে এমন এক সত্তার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, যিনি দেখা-অদেখা সব কিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত, অতপর তিনি তোমাদের বলে দেবেন তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) কোন্ ধরনের কাজ করছিলে,

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا ۢ بَيْنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ
اَرَدْنَآ اِلَّا الْحُسْنٰى ۚ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ۚ
لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ۚ فِيْهِ
رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ۚ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿١٠٨﴾ اَفَمَنْ اَسَّسَ
بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى
شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّآ اَنْ
تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١١٠﴾

১০৬. (তোমাদের মাঝে) আরো কিছু লোক রয়েছে, যাদের ব্যাপারে এখনো আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তের আশা করা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের হয় শাস্তি দেবেন, না হয় তিনি তাদের ওপর দয়া পরবশ হবেন; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সুবিজ্ঞ, কুশলী। ১০৭. (মোনাফেকদের—) যারা (তোমাদের ক্ষতি সাধন করার জন্যে) মাসজিদে যেরার বানিয়েছে, এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বিরোধিতা করা, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা, (সর্বোপরি) আগে যেসব লোক আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের জন্যে গোপন ঘাঁটি (সরবরাহ) করা; এরা তোমাদের কাছে শক্ত কসম খেয়ে বলবে, আমরা সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশে (এটা) করিনি; আল্লাহ তায়ালা (নিজে) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। ১০৮. তুমি (এবাদাতের উদ্দেশে কখনো) সেখানে দাঁড়াবে না— তোমার তো দাঁড়ানো উচিত সেখানে, যে মাসজিদ প্রথম দিন থেকেই আল্লাহর ভয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা (ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে) নিজেরা সব সময় পাক-পবিত্র হওয়া পছন্দ করে; আর আল্লাহ তায়ালা তো পাক-সাফ লোকদেরই ভালোবাসেন। ১০৯. যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছে আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর— সে ব্যক্তি উত্তম, না যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি দাঁড় করিয়েছে পতনোন্মুখ একটি গর্তের কিনারায় এবং যা তাকে সহ (অচিরেই) জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়বে; আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না। ১১০. ওরা যা বানিয়েছে তা হামেশাই তাদের অন্তরে একটি সন্দেহের বীজ হয়ে (আটকে) থাকবে, যে পর্যন্ত না ওদের অন্তরসমূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (তদ্দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে); আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর

আয়াত ৯৭-১১০

এখানে তবুক যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুসলমান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, তাদের ঈমানী স্তর এবং তাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট ও কাজ কর্ম বর্ণিত হয়েছে।

আমি দশম খন্ডে আলোচ্য সূরার ভূমিকায় এর ঐতিহাসিক কারণসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছি, যা ঈমানের দিক থেকে মদীনার মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করেছে। আমি এ বিস্তারিত বর্ণনার সর্বশেষ অনুচ্ছেদসমূহ এখানে বর্ণনা করবো।

কোরায়শের দীর্ঘ একগুঁয়ে কঠিন অবস্থান আরব উপদ্বীপে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ছিলো শক্তিশালী বাধা, আরব উপদ্বীপে ধর্মীয় কাজ কর্মে কোরায়শেরই কথা বলার অধিকার ছিলো সর্বোচ্চ। অধিকন্তু তাদের ছিলো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক আধিপত্য ও প্রাধান্য। এ নতুন দ্বীন (ইসলাম)-এর ক্ষেত্রে কোরায়শের একগুঁয়ে অবস্থান আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন স্থানের আরববাসীকে নতুন দ্বীনে দীক্ষিত হওয়ার পথে বাঁধার কারণ ছিলো। যখন কোরায়শ মুসলমানরা বিজয়ের নিকটবর্তী হলো। অতপর তায়েফস্থ হাওয়াযেন এবং সাকীফ গোত্র বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌছল। মদীনার শক্তিশালী তিন ইহুদী গোত্র পরাভূত হওয়ার উপক্রম হলো। অন্যদিকে বনু কায়নুকা এবং বনু নাযীরকে সিরিয়ায় দেশান্তরিত করা হলো। আর বনু কোরায়যাকে নিশ্চিহ্ন করা হলো সাথে সাথে খায়বরও পরাস্ত হলো। আর এটা হয়ে পড়লো মানুষের আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করা এবং এক বছরের ভিতরে পুরো আরব উপদ্বীপে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পূর্বাভাস।

কিন্তু বিভিন্ন ভূখন্ডে ইসলামের আদিগন্ত ব্যাপ্তির সাথে তার বিভিন্ন উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য ব্যাপক পরিধির ভেতরে নিয়ে এসেছে যা বদর বিজয়ের পর সমাজে প্রকাশ পেয়েছিলো। অথচ তখনকার সমাজ সুদূর প্রসারী প্রশিক্ষণের অভাবে ছিলো এ সকল বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য থেকে ছিলো দূরে। কিন্তু বদর যুদ্ধের পর সাত বছরের ভেতরে তার প্রসার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যদি গোটা মাদানী সমাজ ইসলামী আকীদার শক্ত ঘাঁটি এবং সে সমাজের মযবুত ভিত্তিতে রূপান্তরিত না হতো, তবে আরব উপদ্বীপের ইসলামী ভূখন্ডে দ্রুত ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে বড় একটা সমস্যার সৃষ্টি হতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং যেহেতু এ দ্বীনের প্রচার প্রসারের ও সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনি মোহাজের ও আনসারের অগ্রবর্তীদলকে এমনভাবে প্রস্তুত করলেন, যার ফলে বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর কিছু সম্প্রসারণের পর অগ্রবর্তী এই দলটি দ্বীন ইসলামের নিরাপদ ঘাঁটিতে রূপান্তরিত হলো। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা গোটা মাদানী সমাজকে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যাপক সম্প্রসারণের পর নির্ভরযোগ্য ঘাঁটি হিসাবে প্রস্তুত করেন। আল্লাহ তায়ালা এবিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় তার পয়গাম কিভাবে প্রেরণ করতে হবে।

তাদের সে বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম প্রকাশ পেয়েছিলো হুনায়নের যুদ্ধের দিন। সে সম্পর্কে আলোচ্য সূরায়ও বর্ণনা এসেছে। (আয়াত ২৫, ২৬)

এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের বাহ্যিক কারণের প্রধানতম একটি ছিলো এই, মক্কা বিজয়ের দিন যে দু'হাজার স্বাধীন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তারা মক্কা বিজয়ী মদীনার দশ হাজার সৈন্যের সাথে এই যুদ্ধের জন্যে বের হয়েছিলো। দশ হাজার সৈন্যের সাথে নতুন দু'হাজার মুসলমানের উপস্থিতি মুসলিম শিবিরের ভারসাম্যে ত্রুটির কারণ হয়ে দেখা দিলো। পাশাপাশি ছিলো হাওয়াযেন গোত্রের অধিক সৈন্যের প্রতি তাদের দুর্বলতা। আর এটা এজন্যে সম্ভব ছিলো

যে, গোটা মুসলিম সৈন্য বাহিনী ওই সকল খাঁটি মোমেনদের দ্বারাও সংঘটিত ছিলো না, যাদের প্রশিক্ষণ বদর যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়ের মধ্যকার দীর্ঘ সময় ব্যাপী চলে আসছিলো।

অনুরূপভাবে তবুক যুদ্ধ চলাকালীন বেদনাদায়ক ক্ষণস্থায়ী সময়ে যে সকল কারণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিলো, তা ইসলামের দ্রুত ব্যাপ্তি এবং জনসাধারণের দলে দলে ঈমানের বিভিন্ন স্তরে প্রবেশ করার স্বাভাবিক পরিণতি ছিলো। এ সকল ক্ষণস্থায়ী কারণ ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে সূরা আত তাওবা বিস্তারিত আলোচনা করেছে। আলোচ্য সূরার বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় সেদিকে আমি ইতিপূর্বে আলোকপাতও করেছি।

বেদুঈন মরুবাসীদের চরিত্র বিশ্লেষণ

এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার আলোকেই বিভিন্ন আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো ইনশা আল্লাহ। এরশাদ হচ্ছে,

(এই) বেদুইন আরব লোকগুলো কুফর ও মোনাফেকীর ব্যাপারে ....(আয়াত ৯৭, ৯৯)

ওপরের আয়াতগুলোতে বেদুইনদের প্রকারভেদের বর্ণনা এসেছে। মদীনা মোনাওয়ারার আশেপাশে বেদুইনদের বিভিন্ন গোত্র বাস করতো। এরা ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে মদীনায় দারুল ইসলামে অসংখ্যবার আক্রমণ করেছিলো। অতপর যখন তারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো, তারা দুটো দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো, যাদের বর্ণনা আলোচ্য আয়াতে এসেছে।

বেদুইনদের স্বভাব সম্পর্কিত সাধারণ কথা বর্ণনার মাধ্যমে এ দু'দলের আলোচনার সূচনা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

(এই) বেদুইন আরব লোকগুলো কুফর ও মোনাফেকীর ব্যাপারে............(আয়াত ৯৭)

আলোচ্য আয়াতের বর্ণিত এ আরব বেদুইনদের অবস্থা হচ্ছে, তারা কুফর এবং মোনাফেকীতে বেশী কঠোর এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি যে দ্বীন নাযিল করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের প্রতি যে দ্বীন নাযিল করেছেন, তার সীমারেখা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ হওয়ার বেশী সম্ভাবনাটি সৃষ্টি হয়েছে তাদের জীবনের বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে। তাদের প্রকৃতির কঠোরতা, জ্ঞান ও সীমারেখা থেকে দূরে থাকাও এর আরেকটা কারণ, অবশ্য ঈমান তাদেরকে তাদের কঠোর প্রকৃতি থেকে ফিরাতে চেয়েছিলো, জড়বাদী মূল্যবোধ থেকেও তাদের ঊর্ধে উঠাতে চেষ্টা করছিলো।

মরুবাসীদের স্বভাবের কঠোরতা সম্পর্কিত অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। তন্মধ্যে আল্লামা ইবন কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন, তা নিম্নে প্রদত্ত হলো,

'আল আ'মাশ ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন, একদিন যায়দ ইবনে সাওহান তাঁর সাথীদের সাথে কথা বলার সময় জনৈক বেদুইন তার পাশে এসে বসলো। নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে যায়দ তাঁর একটি হাত হারিয়েছিলেন। ওই বেদুইন ব্যক্তি তাঁকে সম্বোধন করে বললো, আল্লাহর কসম, তোমার কথা অতি চমৎকার। কিন্তু তোমার হাত আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। তখন যায়দ বললেন, আমার হাতের কোন জিনিস তোমাকে সন্দেহের মাঝে নিমজ্জিত করছে, এটা তো আমার বাম হাত। বেদুইন ব্যক্তিটি তখন বললো, আমি জানি না শত্রুরা ডান হাত কাটে– না বাম হাত কাটে। যায়দ বিন সাওহান তখন বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.) সত্যই বলেছেন, 'বেদুইনরা কুফর ও মোনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা সেসব নীতি কানুন শেখার যোগ্য নয় যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর নাযিল করেছেন।'

ইমাম আহমদ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেন, 'যে মরু অঞ্চলে বসবাস করে সে কঠোর হয়। যে শিকারের সন্ধানে থাকে সে গাফেল হয়। আর যে বাদশাহর দরবারে আসে সে পরীক্ষায় নিমজ্জিত হয়।'

মরুবাসীদের চরিত্রে কঠোরতা ও কর্কশতা থাকার দরুন আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্য হতে কোনো রসূল পাঠাননি বরং তিনি সকল রসূলকে নগরবাসীদের মধ্য থেকে পাঠিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে, 'হে মোহাম্মদ, আমি তোমার পূর্বের সকল রসূলকে নগরবাসীদের মধ্য হতে পাঠিয়েছি।'

জনৈক বেদুইন রসূলের দরবারে কিছু হাদিয়া নিয়ে আসলে তিনি তার সন্তুষ্টির জন্যে তাকে তার পরিবর্তে কয়েকগুণ উপহার সামগ্রী দিলেন এবং বললেন, 'আমি কোরায়শ, বনু সাকীফ, দৌস গোত্র এবং আনসার সম্প্রদায় ছাড়া আর কোনো লোকের কাছ থেকে কোনো প্রকার হাদিয়া গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাদের থেকে হাদিয়া গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত এ জন্যে নিয়েছি যে, তারা মক্কা, তায়েফ, মদীনা এবং ইয়ামনের মত শহরে বসবাস করতো। তাদের চরিত্রে মধুরতা ও কোমলতা বেশী। বেদুইনদের মতো তাদের স্বভাবে কঠোরতা ও কর্কশতা নেই।'

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, একদা একদল বেদুইন রসূলুল্লাহ (স.)-এর খেদমতে এসে নিবেদন করল। আপনি কি আপনাদের বালকদেরকে গ্রহণ করবেন। জবাবে তিনি বললেন, হাঁ অবশ্যই। তারা বললো, আমরা তো কখনও তাদেরকে গ্রহণ করব না। রসূল (স.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদের অন্তর থেকে রহমত উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে কোনো অবস্থায়ই আমি তা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম নই!

আরো বহু বর্ণনা মরুবাসীদের অন্তরের কঠোরতা ও কর্কশতা সম্পর্কে এসেছে। এ কারণেই তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়েছিলো। নিসন্দেহে তাদের অবস্থা হচ্ছে তারা কুফর ও মোনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা সেসব নীতি কানুন না শেখারই যোগ্য যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-এর ওপর নাযিল করেছেন। আদিমতা তাদের অন্তরে কঠোরতা ও রুক্ষতা এনে দিয়েছে। মোনাফেকী ও বক্রতা সৃষ্টি করেছে। অধিকন্তু আদিমতা তাদেরকে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়িতেও অভ্যস্ত করে দিয়েছে।

'বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই জানেন এবং তিনি অত্যন্ত কুশলী।'

তিনি তাঁর বান্দাদের যাবতীয় অবস্থা, গুণাবলী ও প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক অবগত। আর তিনি যোগ্যতা, প্রতিভা এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ বন্টনে এবং জাতি, গোত্র ও পরিবেশের বৈচিত্র্য সাধনে প্রজ্ঞাবান ও কুশলী।

বেদুইনদের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পর তাদের শ্রেণী বর্ণনা শুরু হচ্ছে। আর এটার ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। ঈমান তাদের অন্তরে যে পরিবর্তন সাধন করেছে এবং ওই দুই ধরনের অন্তরের মাঝে সে মোতাবেক যে পার্থক্য সূচনা করেছে তার ওপর। ঈমানের দাওয়াত পাওয়ার পর যাদের অন্তর ঈমান গ্রহণ করেছে এবং যাদের অন্তর কুফর এবং নেফাকের ওপর বিদ্যমান রয়েছে কিছুটা তার ওপরও। এরশাদ হচ্ছে,

এই বেদুইন আরবদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে ....(আয়াত ৯৮)

মোমেন বেদুইনদের বর্ণনার পূর্বে মোনাফেক বেদুইনদের আলোচনা এ জন্যে করা হয়েছে যাতে তাদের আলোচনা মদীনার ওই সকল মোনাফেকের আলোচনার সাথে সংযুক্ত করা যায়, যাদের কথা পূর্বের অধ্যায়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাতে এ দু'ধরনের মোনাফেকের আলোচনা প্রসংগ একই স্থানে এসে সন্নিবেশিত হয়।

'আবার কোনো কোনো বেদুইন এমনও রয়েছে যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ব্যয় করাকে জরিমানা বলে গণ্য করে।'

মুখে মুখে ইসলাম স্বীকার করার ফলে মালের যাকাত দিতে এবং জেহাদে সম্পদ খরচ করতে সে বাধ্য হয়ে যায়। এর মাধ্যমে সে মুসলিম সমাজ জীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে এবং আরব উপদ্বীপের মুসলমানদের থেকে উপকৃতও হতে পারে। সে আল্লাহর পথে যা খরচ করে তাকে যেহেতু জরিমানা, অর্থদন্ড এবং ক্ষতি মনে করে তাই সে যা খরচ করে তা অনিচ্ছাকৃত প্রদান করে থাকে। এ অর্থ প্রদান মুসলিম মোজাহেদদের সাহায্যার্থে স্বেচ্ছায় অর্থ প্রদান নয়।

'এবং তোমার ওপর কোনো দুর্দিন আসে কিনা সে অপেক্ষায় থাকে।'

সে অপেক্ষায় থাকে কখন মুসলমানদের ওপর দুর্দিন আসবে। অনুরূপভাবে সে কামনা করে যে, মুসলমান যোদ্ধারা যেন যুদ্ধের মাঠ থেকে নিরাপদে কখনোই ফিরে না আসে।

তাদের কুকামনার পাশাপাশি তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

'তাদের ওপর দুর্দিন আসুক।'

এ আয়াতে তাদের খারাপ কামনার জবাব দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তোমরা তাদের জন্যে দুর্দিন কামনা করছ, অথচ সে দুর্দিন তোমাদের ওপরই পতিত হবে। তা থেকে তোমরা মোটেই রক্ষা পাবে না।

'আর আল্লাহ সব কিছুর শোনেন, সব কিছু জানেন।'

শোনা এবং জানা এখানে মুসলমানদের শত্রুদের অমংগল কামনার পথে এবং তাদের মোনাফেকীর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এটাই তাদের জন্যে রক্ষা করা। এরশাদ হচ্ছে,

(আবার) এই বেদুইন আরবদের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে............... (আয়াত ৯৯)

এ আয়াতে আলোচিত মোমেন বেদুইনদের কাছে আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনাই তাঁর রাহে খরচ করার কারণ। মানুষের ভয়, বিজয়ীদের তোষামোদ এবং লাভ লোকসান কোনো কারণ নয়।

আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনয়নকারী বেদুইনের এই দলটি আল্লাহর পথে খরচের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য কামনা করে এবং রসূলের দো'য়া অন্বেষণ করে। যেই দোয়া তাঁর (স.) সন্তুষ্টির পরিচায়ক এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। এ দলের জন্যে আল্লাহ তায়ালা এটাই চান। তাই কোরআনে করীম এ কথাই বলছে, যে, আল্লাহর পথে খরচ তথা দান-সদকা নিসন্দেহে তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য একটি নৈকট্য।

'হাঁ, অবশ্য তা তাদের জন্যে নৈকট্য লাভের উপায়।'

নিম্নে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের শুভ পরিণামের সুসংবাদ দিচ্ছেন। এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনও মিথ্যা হতে পারে না।

'আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন।'

এখানে রহমতকে ঘর হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে তারা সেদিন প্রবেশ করবে।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।'

তিনিই তাওবা কবুল করেন, দান খয়রাত গ্রহণ করেন, গুনাহ মাফ করেন এবং করুণাকামীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন।

ঈমানের স্তরভেদে মুসলিম সমাজের শ্রেণী বিন্যাস

সংক্ষিপ্তভাবে বেদুইনদের শ্রেণী বিভাগের পর গোটা আরব সমাজের প্রকারভেদ বর্ণনা করা হয়েছে। শহর এবং গ্রামের আরব সমাজকে সাধারণত চারটি ঈমানী স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. মোহাজের ও আনসারদের মধ্য থেকে যারা সবার আগে ঈমানের দাওয়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে এবং যারা পরে নিষ্ঠা সহকারে তাদের অনুসরণ করেছে।

২. মদীনাবাসী এবং মরুবাসী মোনাফেকের দল যারা মোনাফেকীতে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে।

৩. যাদের কাজকর্ম মিশ্র ধরনের কিছু ভালো, কিছু মন্দ।

৪. কিছু লোক যাদের ব্যাপার আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছে। (আয়াত ১০০, ১০১, ১০২, ১০৫, ১০৬)

উল্লেখিত আয়াতের শ্রেণী বিভাগ সূচিত হয়েছে তবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর। বিশেষ করে- যখন পেছনে অবস্থানকারী মোনাফেক এই এবং মুসলমানদের মধ্য হতে কিছু লোক ওযর আপত্তি পেশ করতে শুরু করেছে। তাদের মধ্য হতে কিছু লোক ওজুহাত প্রদর্শনে আসলেই সত্যবাদী ছিলো এবং নিজেদের তারা মাসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছিলো। যাতে আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে ফয়সালা দেন এবং স্বয়ং রসূলুল্লাহ তাদের বন্ধন খুলে দেন। তাদের মধ্য হতে কিছু লোক কোনো ওযর আপত্তি পেশ করেনি এই আশায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সত্য তাওবা কবুল করবেন। তারা হচ্ছেন ওই তিনজন ব্যক্তি, যারা তবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। তাদের তাওবা কবুল না করা পর্যন্ত তাদের ব্যাপারে কোনো হুকুম নাযিল হয়নি।

তবুক যুদ্ধের পর আরব উপদ্বীপে ওপরে বর্ণিত এই শ্রেণীগুলো ছিলো। আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো যে, ইসলামী আন্দোলনের পুরো ক্ষেত্র ও স্থানকে রসূল (স.) ও তাঁর অনুসারী খাঁটি মোমেনদের সামনে তুলে ধরবেন। এখানে যে অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা ইসলামের পূর্ণ ব্যপ্তির আগের ঘটনা। ইসলামের পূর্ণ ব্যাপ্তি ও বিকাশ ওই সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে ঘটেছিলো যাতে বলা হয়েছিলো, এবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্যেই নিবেদিত হবে এবং নৈকট্য তারই হাসিল করতে হবে। আর বিভিন্ন প্রকারের এবাদাত ও পূজা থেকে মুক্ত করে মানব সমাজকে একমাত্র আল্লাহর এবাদাতের জন্যে নির্দিষ্ট করতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর জন্যে যে বিষয়টি নিতান্ত প্রয়োজন, তা হচ্ছে, আন্দোলনের স্থান, ক্ষেত্র এবং সেখানকার সমাজ তাদের সামনে পরিষ্কার ভাবে উন্মোচিত হওয়া। আর এটা ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের জন্যে চলার পথে নিতান্ত প্রয়োজন। এরশাদ হচ্ছে,

মোহাজের ও আনসারদের মাঝে যারা .... (আয়াত ১০০)

এখানে মুসলমানদের তিনটি দলের কথা বলা হয়েছে,

১. মোহাজেরদের অগ্রগামী দল। ২. আনসারদের অগ্রগামী দল (যারা সবার আগে ঈমানের দাওয়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে)। ৩. যারা পরবর্তী যুগে নিষ্ঠাসহকারে মোহাজের ও আনসারদের অনুসরণ করেছে। এ তিনটি দল মিলে একটি স্তরে পরিণত হয়েছে। মক্কা বিজয়ের পর আরব উপদ্বীপের মুসলিম সমাজের জন্যে এরা ইস্পাতকঠিন দুর্গে রূপান্তরিত হয়েছিলো। আলোচ্য সূরার ভূমিকায় দশম খন্ডে আমি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তিন দলের সমন্বয়ে গঠিত মুসলমানদের এ স্তরটি তখনকার আরব সমাজের সুখে দুঃখে ও বিপদে-আপদে ছিলো সমান অংশীদার। সচ্ছলতা অসচ্ছলতা ও সুখ দুঃখের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন। অনেক সময় সচ্ছল অবস্থার পরীক্ষা অসচ্ছল অবস্থার পরীক্ষার চেয়েও কঠিন হয়।

মোহাজেরদের অগ্রগামী দল বলতে আমি ওই সকল মুসলমানদেরকে বুঝিয়েছি, যারা বদর যুদ্ধের পূর্বে হিজরত করেছে। অনুরূপভাবে আনসারদের অগ্রবর্তী দল বলতে আমি মদীনার ওই সকল লোককে বুঝিয়েছি, যারা বদর যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর পরবর্তী যুগে নিষ্ঠাসহকারে মোহাজের ও আনসারদের অনুসারী বলতে ওই সকল মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা তবুক যুদ্ধের সময় বিদ্যমান ছিলো। তারা মোহাজের ও আনসারদের পথ অনুসরণ করেছিলো। তাদের মতো পাকা ঈমান গ্রহণ করেছিলো, সেজন্যে তারা বিভিন্ন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে উত্তীর্ণও হয়েছিলো এতদসত্তেও মোহাজের ও আনসারদের অগ্রবর্তী দলের মর্যাদা ও সম্মান তাদের চেয়ে অনেক বেশী। কারণ তারা বদর যুদ্ধের পূর্বে কঠিন মুহূর্তগুলোও অতিক্রান্ত করেছে,।

মোহাজের এবং আনসারদের অগ্রগামী দল বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে, সে ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। কারো কারো মতে যারা বদর যুদ্ধের পূর্বে হিজরত করেছে এবং আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করেছে। কারো মতে যারা দুই কেবলার দিকেই মুখ করে নামায পড়েছে। আবার কেউ বলেন, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, কারো মতে হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে যারা হিজরত করেছে ও আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করেছে। আবার কারো দৃষ্টিতে, যারা বায়য়াতে রেদওয়ানের সময় উপস্থিত ছিলেন। মুসলিম সমাজ গঠনের বিভিন্ন পর্যায় ও তার ঈমানী বিভিন্ন স্তরের প্রতি লক্ষ্য সাপেক্ষে আমি মনে করি যে, আমার মতটি এক্ষেত্রে অধিকতর প্রবল ও গ্রহণযোগ্য।

মুসলিম সমাজ গঠনের বিভিন্ন পর্যায় ও তার বিভিন্ন ঈমানী স্তর সম্পর্কে যা আমি দশম খন্ডে আলোচনা করেছি, তার কতেক অনুচ্ছেদ এখানে পুনরোল্লেখ করাকে শ্রেয় মনে করছি। কারণ এ বিষয়গুলো এ খন্ডের পাঠকের সামনে উপস্থিত থাকলে তাকে পূর্বের খন্ডে প্রত্যাবর্তন করতে হবে না, যার ফলে প্রয়োজনের সময় আয়াতে বর্ণিত মুসলিম সমাজের চূড়ান্ত শ্রেণী বিভাগের একটি সুস্পষ্ট চিত্র তার হাতের নাগালেই থাকবে।

মক্কাতে অত্যন্ত দুরবস্থায় ইসলামী আন্দোলনের জন্ম হয়েছিলো। জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারী কোরায়শ সম্প্রদায় প্রথমে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, আর মোহাম্মদ (স.) তাঁর প্রেরিত রসূল)-এর দাওয়াতের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। তা ছিলো মূলত প্রত্যেক বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল, যে বাদশাহ আল্লাহর কাছে কোনো সাহায্য কামনা করে না। কোরায়শরা রসূল (স.)-এর নেতৃত্বে এ দাওয়াতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলো তার প্রকৃত বিপদ সম্পর্কেও তারা প্রথম দিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। এ আন্দোলনমুখী সমাজ দাওয়াতের সূচনা লগ্ন থেকে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং কোরায়শের জাহেলী নেতৃত্ব এবং বিরাজমান অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারী কোরায়শ নতুন দ্বীনের দাওয়াতের গুরুত্ব উপলব্ধি না করেই নতুন নেতৃত্ব, নতুন দ্বীনের দাওয়াত এবং এই আন্দোলনমুখী সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং কষ্ট, ধোকা প্রতারণা, ষড়যন্ত্র এবং ফেতনাসহ যাবতীয় মাধ্যম তার জন্যে ব্যবহার করে।

জাহেলী সমাজ সর্বশক্তি দিয়ে ওই 'বিপদ' প্রতিরোধ করতে উদ্যেত হয়েছিলো, যার অস্তিত্বকে তাদের জন্যে হুমকি স্বরূপ মনে করেছিলো। তারা ওই বিপদকে নিজেদের থেকে দূরে রাখার জন্যে এমন সচেষ্ট হয়েছিলো যেমন মানুষ মৃত্যুকে নিজেদের থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে। যখনই কোনো জাহেলী সমাজে সর্বজাহানের 'রবের' প্রতি আহ্বান জানান হয়- যে সমাজ

বান্দাকে বান্দার রব (প্রভু) বানাবার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর যখনই নতুন দ্বীনের দাওয়াত কোনো নতুন একটি আন্দোলনমুখী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন সে সমাজ আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন নেতৃত্বের অনুসরণ করেছে এবং পুরাতন জাহেলী সমাজের এমনভাবে মুখোমুখি হয়েছে যেমন এক বিপরীত বস্তু অন্য বস্তুর মুখোমুখি হয়ে থাকে।

সে সময় নতুন ইসলামী সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিই বিভিন্ন প্রকার ফেতনা ও যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়েছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তারা হত্যারও সম্মুখীন হয়েছে। এ অবস্থা আল্লাহর একত্ববাদ এবং মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাতের সাক্ষ্য দেয়া, শিশু ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং তার নতুন নেতৃত্বের নিকটবর্তী হওয়া ওই ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই সাহস করেনি যে নিজেকে একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করে নিয়েছে এবং কোনো কোনো সময় মারাত্মক কষ্ট, নির্যাতন, ফেতনা, ক্ষুধা, দেশান্তরিত হওয়া এবং মৃত্যুকে পর্যন্ত বরদাশত করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে।

এর মাধ্যমে আরব সমাজে ইসলামের এক মযবুত ঘাঁটিও তৈরী হয়, যার উপাদানগুলো ছিলো অত্যন্ত শক্তিশালী। আর যে সকল দুর্বল উপাদান জাহেলী সমাজের নানাবিধ চাপ বরদাশত করতে সক্ষম হয়নি, তারা দ্বীন ইসলাম থেকে সটকে পড়ে পুনরায় জাহেলিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেছে। অবশ্য এদের সংখ্যা ছিলো খুবই নগণ্য। এ নতুন দ্বীনের যাবতীয় বিষয় ছিলো অত্যন্ত পরিচিত ও উন্মুক্ত। তাই এ অবস্থায় একমাত্র নির্বাচিত, উত্তম ও অনন্য গঠনের অধিকারী উপাদান ছাড়া কেউ জাহেলিয়াত থেকে ইসলামের দিকে ফিরে আসতে এবং কন্টকাকীর্ণ বিপদ সংকুল ভীতিকর রাস্তা অতিক্রম করতে সাহস করেনি।

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা মোহাজেরদের অগ্রবর্তী দলকে বিরল অতুলনীয় সেই উপাদান থেকে বাছাই করে নেন। যার ফলে তারা প্রথমে মক্কাতে দ্বীন ইসলামের মযবুত ঘাঁটিতে পরিণত হতে পারে। তারপর তারা মদীনায় যাওয়ার পর আনসারদের অগ্রবর্তীদলের সাথে একত্রিত হয়ে আরো মযবুত দুর্গে রূপান্তরিত হয়। আনসাররা যদিও মোহাজেরদের মতো প্রথমে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়নি, তথাপি রসূলুল্লাহ (স.)-এর জন্যে তাদের বায়য়াত এ কথার পরিচায়ক যে, তাদের উপাদান ও মৌলিক স্বভাবধর্মী এবং দ্বীন ইসলামের সম্পূর্ণ উপযোগী! আল্লামা ইবন কাসীর (র.) তার বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে মোহাম্মদ বিন কা'ব কুরাযীর সূত্রে বর্ণনা করেন, আকাবার রাত্রিতে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রসূলুল্লাহ (স.)-এর খেদমতে নিবেদন করে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! এখানে এখন অংগীকার নেয়া হচ্ছে, আপনি আপনার ইচ্ছা মাফিক আপনার প্রভু ও নিজের জন্যে শর্তারোপ করুন। জবাবে তিনি বললেন, আমি আমার রবের ব্যাপারে শর্তারোপ করছি যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই গোলামী করবে, তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করবে না। আর আমার ব্যাপারে এ শর্তারোপ করছি যে, তোমরা আমাকে ওই জিনিস থেকে হেফাযত করবে, যার থেকে তোমরা তোমাদের জান ও মাল হেফাযত করো। তখন তারা আরয করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি আমরা আপনার নির্দেশানুসারে কাজ করি এবং দু'টি শর্ত পূরণ করি, তবে আমাদের জন্যে কী নির্ধারিত রয়েছে। জবাবে তিনি বললেন, তোমাদের জন্যে বেহেশত নির্ধারিত রয়েছে। তখন তারা পুলকিত হয়ে বললো, আমাদের ব্যবসা খুবই লাভজনক হলো। অর্থাৎ আমাদের বায়য়াত গ্রহণ ফলপ্রসূ হলো। সুতরাং আমরা এর জন্যে রাযী যে, নিজেদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি রহিত করার আবেদন কোনো দিনই পেশ করব না এবং রহিতকরণকে পছন্দও করবো না।

যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাতে বায়য়াত গ্রহণ করেছিলো। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো জান্নাত লাভ করা, অতপর তারা উত্তরোত্তর তাদের বায়য়াতকে জোরদার করতে লাগলো। তারা এ

কথা ঘোষণা করতে লাগলো যে, তারা এক্ষেত্রে নিজেদের ও রসূলে করীম (স.)-এর সাহায্য থেকে পেছনে ফিরে যাবে না তারা জানতো, যে বিষয়ে তারা বায়য়াত গ্রহণ করেছে তা কোনো সহজ বিষয় নয়, বরং তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলো যে, কোরায়শ তাদের পেছনে রয়েছে, অন্যদিকে গোটা আরববাসীও তাদেরকে এর ফলে দূরে নিক্ষেপ করবে। আর তারা আরব উপদ্বীপ, বিশেষ করে মদীনার বিস্তীর্ণ জাহেলী সমাজের সাথে মোটেও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না।

সুতরাং আনসার সমাজ এই বায়য়াতের দায় দায়িত্ব ও দায়িত্ব কর্তব্য ভালো করেই উপলব্ধি করতো। তারা এটাও জানতো যে, তাদের সাথে এর বিনিময়ে পার্থিব জগতের সাহায্য বা বিজয় কোনোটারই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি। পরকালে তারা একমাত্র জান্নাতেরই প্রতিশ্রুতিই পেয়েছে। এই ছিলো তাদের অনুভূতি ও জ্ঞান। সুতরাং তাদের মর্যাদা ও মোহাজেরদের অগ্রগামী দলের মর্যাদা নিসন্দেহে এক ও অভিন্ন হওয়া উচিত। তাই তারা মদীনার জীবনের শুরুতে মুসলিম সমাজে শিশাঢালা প্রাচীরে রূপান্তরিত হয়েছিলো।

কিন্তু মদীনার সমাজ এরূপ নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতার অধিকারী ছিলো না। দ্বীন ইসলামের আবির্ভাবের পর যখন তা গোটা মদীনাতে বিস্তার লাভ করলো– যে সমাজের অধিকাংশ লোক মর্যাদার অধিকারী ছিলো, তখন তাদের অনেকেই স্বীয় মর্যাদার সংরক্ষণের লক্ষ্যে নতুন সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে এবং তাদের প্রতিবেশীত্ব গ্রহণ করতে চাইলো। এমনকি যখন বদর যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছিলো, তখন তাদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুল বললো, 'এ বিষয়টি তো পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিলো। যা হবার তা হয়ে গেলো।' সে আত্মরক্ষার জন্যে লোক দেখানো ইসলাম গ্রহণ করলো, স্রোতের টানে দেখাদেখি আরো অনেক লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলো। যদিও তাদের সবাই মোনাফেক নয় কিন্তু তারা এখনবধি ইসলামের বিভিন্ন বিধি বিধান হৃদয়ঙ্গম করতেও তেমন সক্ষম হয়নি এবং ইসলামের ছাচে তারা গড়ে উঠতেও সক্ষম হয়নি। তাই তাদের ঈমানী স্তরের ভিন্নতা নগর জীবন গঠনে কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলো।'

রসূলুল্লাহ (স.)-এর নেতৃত্বে প্রশিক্ষণমূলক কোরআনী বিধানগুলো নতুন উপাদানগুলোতে কাজ করতে লাগলো।

আমরা যদি কাছাকাছি সময়ে নুযুলের ধারানুসারে মাদানী সূরাগুলো অধ্যয়ন করি, তাহলে আমরা ওই বৃহৎ ও ব্যাপক প্রচেষ্টার অবগত হতে পারি, যা মুসলিম সমাজে বিভিন্ন উপাদানের স্থায়ী সমন্বয় প্রক্রিয়ায় জন্যে ব্যয় করা হয়েছে। বিশেষ করে নতুন সমাজের দ্বার প্রান্তে এই উপাদানগুলোর আগমনধারা ছিলো ক্রমাগত অব্যাহত। এক্ষেত্রে কোরায়শের অবস্থান ছিলো অত্যন্ত বিরোধী শিবিরে। তারা আরব উপদ্বীপের সকল গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছিলো। অনুরূপভাবে ইহুদীদের অবস্থানও ছিলো অত্যন্ত ঘৃণ্য। তারা নতুন দ্বীন ও নতুন সমাজের বিরোধী উপাদানগুলোকে উস্কিয়ে দিচ্ছিলো আর মুসলিম সমাজের বিভিন্ন মানুষের সমন্বয় প্রক্রিয়ার প্রয়োজন অব্যাহত ছিলো। তাদের এই প্রচেষ্টা সামান্য সময়ের জন্যেও অবহেলিত হয়নি।

এ পুরো প্রচেষ্টা সত্তেও কখনও কখনও বিশেষ করে কঠিন মুহূর্তগুলোতে দুর্বলতা, নেফাক, ইতস্তা, জান মাল কোরবানীর ক্ষেত্রে কৃপণতা এবং বিপদের মুখোমুখি হওয়াকে ভয় করার দিকগুলো অহরহ দেখা যেতো। বিশেষ করে আকীদাগত অস্পষ্টতার কারণে এ দিকগুলো ফুটে উঠতো। একথা ধ্রুব সত্য যে, আকীদাগত স্পষ্টতা মুসলমান ও জাহেল তথা বিধর্মীর সম্পর্ককে চূড়ান্ত ভাবে নির্ণীত করে। ধারাবাহিক সূরায় কোরআনের ভাষ্য উল্লেখিত দুর্বলতার দিকগুলো

আমাদের সামনে উন্মোচন করে এবং তার সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও বিভিন্ন পন্থায় আমাদের বাতলে দেয়।

মদীনার মুসলিম সমাজের পুরো উপাদান ও কাঠামো ছিলো সঠিক। যেহেতু এ সমাজ মূলত আনসার ও মোহাজেরদের অগ্রগামী দলের নিষ্কলুষ মযবুত খাঁটির ওপর নির্ভরশীল ছিলো। তাছাড়া সকল নিত্য নতুন পরিবর্তন, প্রবণতা এবং সকল আপদ বিপদের তাদের অবস্থান ছিলো দৃঢ়।

ধীরে ধীরে এ উপাদানগুলো মযবুত ঘাঁটির সাথে সমন্বিত, পবিত্র এবং দৃঢ় হতে লাগলো। সেই সাথে দুর্বল অন্তরের অধিকারী, মোনাফেক, ইতস্ততকারী এবং ভীতুদের মধ্যে যারা অবাধ্য তাদের সংখ্যা, কমতে লাগলো। অধিকন্তু তাদের সংখ্যাও কমতে লাগলো, যাদের অন্তরে আকীদার স্পষ্টতা তখনও সাধিত হয়নি, যার ভিত্তিতে তারা অপরাপর মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। যখন মক্কা বিজয়ের সময় ঘনিয়ে আসলো, তখন মুসলিম সমাজ নিষ্কলুষ এই মযবুত ঘাঁটির সব দিক থেকেই সমন্বিত হয়ে গেলো।

হাঁ, এ সমাজে বিভিন্ন ভাগ্যের অধিকারী লোক ছিলো, যা এই আন্দোলনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিলো। সুতরাং মোমেনরা তাদের আন্দোলনের অগ্রগামিতা এবং ধীরস্থিরতায় পরীক্ষার ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাগ্যের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছিলো। মোহাজের ও আনসারদের অগ্রগামীদলও সম্পৃক্ত হচ্ছিলো একইভাবে হচ্ছিলো, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা। হোদায়বিয়ার বায়য়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণকারীরা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছিলো। অতপর যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহর রাহে খরচ করেছিলো এবং জেহাদ করেছিলো, তারাও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছিলো। কোরআনে করীম, রসূল (স.)-এর বিভিন্ন ভাষ্য সে সময়ের মুসলিম সমাজের বাস্তব অবস্থা ঐ সকল বৈশিষ্ট্যকে বর্ণনা করে, যাকে আকীদার এই আন্দোলন সৃষ্টি করে দিয়েছে।'

ইসলামী আন্দোলনের বদৌলতে সৃষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর ঈমানী স্তরের পার্থক্যের কারণে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে মদীনার সমাজের সাথে উক্ত শ্রেণীর সমন্বয় সাধন ও একাত্মতা প্রকাশে তাই কোনো বাধার সৃষ্টি হয়নি। তদ্রূপ উক্ত সমাজের মাঝে যে অনৈক্য, দুর্বলতা, সিদ্ধান্তহীনতা, কার্পণ্য, ঈমান আকীদার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা ও কপটতার দোষগুলো বিদ্যমান ছিলো, তাও দূরীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধার সৃষ্টি হয়নি। ফলে গোটা মদীনার সমাজকেই ইসলামের ভিত বলে গণ্য হয়ে গেলো।

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর আরব উপদ্বীপের দুই পরাশক্তি হাওয়াযেন এবং সাকীফ গোত্রের আত্মসমর্পণের পর দলে দলে লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে লাগলো। ঈমান গ্রহণ করার পর তাদের সকলের ঈমানী স্তরও কখনো এক ছিলো না। তাদের মধ্য থেকে একদল ছিলো ইসলামকে অপছন্দকারী মোনাফেক। আবার একদল এমন ছিলো যাদেরকে তাদের গোত্রের লোকেরা ইসলামের দিকে টেনে এনে ছিলো। আরেকদল এমন ছিলো যারা মুসলমানদেরকে খুশী করার জন্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু ইসলামের মূল হাকীকত ও বিধি বিধানের ওপর তাদের পূর্ণ আস্থা ছিলো না এবং তার প্রকৃত চেতনার সাথে তাদের ঐকমত্য ছিলো না।

এই সব উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমাদের সামনে মোহাজের এবং আনসারদের অগ্রগামী দল এবং যারা পরে নিষ্ঠা সহকারে তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের মর্যাদা ও ঈমানী স্তর স্পষ্ট হয়ে গেছে। তারা ঈমানের উঁচু স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিলো এবং তারা আন্দোলনগত বিভিন্ন পরীক্ষারও সম্মুখীন হয়েছিলো। পাশাপাশি আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও তার প্রকৃত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট মুসলমানদের প্রকৃত ভূমিকা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই। আমরা তাদের ব্যাপারে আল্লাহর উক্তির মাহাত্ম্য হৃদয়ংগম করতে পারবো।

'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।'

তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি বলতে ওই সন্তুষ্টিকেই বুঝানো হয়েছে, যার পেছনে রয়েছে নেক বিনিময়। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই হচ্ছে সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক পুণ্য প্রতিদান। অপরদিকে তাদের সন্তুষ্টি আল্লাহর প্রতি বলতে বুঝায় তাঁর ওপর ভরসা করা, তাঁর তাকদীরের ওপর আস্থা স্থাপন করা, তাঁর বিচার ফয়সালার প্রতি সুধারণা পোষণ করা, তাঁর অগণিত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর পক্ষ থেকে বিভিন্ন পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর বান্দার ক্ষেত্রে 'রেযা' তথা সন্তুষ্টি শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের মাঝে বিনিময় যোগ্য, ব্যাপক সন্তুষ্টির পরিবেশ বিস্তৃত হয়েছে এবং এই বান্দাদের মর্যাদা এমন ভাবে সমুন্নত করেছে যে, তারা তাদের রবের সাথে সন্তুষ্টি বিনিময় করেছে। তিনি হচ্ছেন তাদের সুউচ্চ মহান রব ও পালনকর্তা। আর তারা তাঁর সৃষ্ট বান্দা। সত্যিকারার্থে এটা এমন অবস্থা ও পরিবেশ, মানব রচিত শব্দমালা দিয়ে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

'আল্লাহ তায়ালা সে সমস্ত লোকের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।'

আর সেখানে (জান্নাতে) এই সন্তুষ্টির নিদর্শন তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

'আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে এমন বাগান তৈরী করে রেখেছেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। তার মধ্যে তারা থাকবে চিরকাল।' 'এটাই মহা সাফল্য।' এর চেয়ে বড় আর কোন সাফল্য হতে পারে?

এটা হচ্ছে এর একটি স্তর, তার বিপরীতে রয়েছে এর আরেকটি স্তর। এরশাদ হচ্ছে,

এই বেদুইন আরবরা যারা তোমার আশপাশে (বাস করে), তাদের.........(আয়াত ১০১)

পূর্বে মোনাফেক সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা হয়েছে। সেখানে বেদুইন মোনাফেক ও মদীনাবাসী মোনাফেকদের কথা আলোচিত হয়েছে। এখানে বিশেষ ধরনের মোনাফেক সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে, যারা নিজেদের মোনাফেকী গোপন করার ব্যাপারে এতই দক্ষতা অর্জন করেছে যে, নবী করীম (স.) নিজেও তাঁর অসাধারণ অন্তরদৃষ্টি, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সত্ত্বেও তাদেরকে চিনতে পারতেন না।

আল্লাহ তায়ালা এখানে বলছেন যে, এ ধরনের মোনাফেক মানুষ মদীনাবাসী এবং মদীনার আশেপাশের মোনাফেকদের মাঝে বিদ্যমান ছিলো। পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ (স.) ও মোমেনদেরকে এদের গোপন প্রতারণা থেকে সতর্ক ও আশ্বস্ত করেন। অনুরূপভাবে তিনি প্রতারক অভিজ্ঞ সে সকল মোনাফেককে এ বলে ভীতি প্রদর্শন করেন যে, তিনি তাদেরকে কখনও ছাড়বেন না। শীঘ্রই তিনি তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে দ্বিগুণ শাস্তি দেবেন।

'তোমরা তাদেরকে চিন না, আমি চিনি তাদেরকে। শীঘ্রই আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেবো। তারপর আরো বেশী বড় শাস্তির জন্যে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।'

পৃথিবীতে তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেয়া হবে। এ কথাটির কাছাকাছি ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হলো, মুসলিম সমাজে তাদের আসল মুখোশ উন্মোচন হয়ে যাওয়ার আশংকায় তাদের ওপর অবতীর্ণ চিন্তা ও অস্থিরতার শাস্তি। অপরটি হলো মৃত্যুর শাস্তি। মৃত্যুর পর ফেরেশতারা তাদের আত্মাসমূহকে প্রশ্ন করবে এবং তাদের চেহারা ও পশ্চাৎ ভাগে প্রহার করবে। অথবা তার ব্যাখ্যা হবে প্রথম শাস্তি বলতে ওই হা-হুতাশের শাস্তি যা সাধারণত মুসলমানদের বিজয় ও প্রাধান্য লাভের দরুন তাদের কাছে পৌঁছবে। আর দ্বিতীয় শাস্তি হচ্ছে ভয়-ভীতির শাস্তি, যা তাদের নেফাক উন্মোচন হওয়া এবং জেহাদের মুখোমুখি হওয়ার দরুন তাদের ওপর আসবে। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় ইচ্ছা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

যুদ্ধে না যাওয়ার অপরাধ ও সাহাবীদের প্রায়শ্চিত্ত

দুই বিপরীতমুখী স্তরের মাঝে মধ্যমপন্থী দুটি স্তরও রয়েছে। প্রথমটি হলো যেমন আল্লাহ বলছেন,

(তোমাদের মাঝে এমন কিছু) লোকও আছে .... (আয়াত ১০২-১০৫)

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত লোকদের সাথে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অবলম্বন করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে নির্দেশ করেছেন। এটা এ কথার পরিচায়ক যে, ওরা রসূল (স.)-এর নিতান্ত পরিচিত ও হাতে গণা কতেক ব্যক্তি।

বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো মূলত নির্দিষ্ট এক বিশেষ দল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তবুক যুদ্ধে রসূলের সাথে অংশগ্রহণ না করে নিজেদের বাড়ী ঘরে রয়ে গিয়েছিলো। অতপর তারা অপরাধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করলো। তাই তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে আল্লাহর দরবারে ভুলের জন্যে তাওবা করে ক্ষমা চাইলো। এই আয়াতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে নিজেদের বাড়ীতে বসে থাকাকে মন্দ কাজ হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করাকে ভাল কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আবু জাফর ইবনে জারীর তাবারী উবাইদ বিন সালমান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যাহহাককে বলেছেন। 'আরো কিছু লোক আছে, যারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের কাজ-কর্ম মিশ্র ধরনের– কিছু ভালো, কিছু মন্দ।' আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যে, এটি আবু লুবাবা ও তার সংগী-সাথীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা তবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে নিজেদের বাড়ী ঘরে রয়ে গিয়েছিলো। যখন রসূলুল্লাহ (স.) যুদ্ধ শেষে মদীনার কাছে ফিরে আসলেন, তখন তারা স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হলো এবং এরাই বলেছিলো আমরা আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী-সন্তানদের মাঝে নিরাপদে থেকে পানাহার ও ভোগ-বিলাসে মত্ত আছি। পক্ষান্তরে আল্লাহর নবী যুদ্ধের মাঠে জেহাদে মগ্ন ও আশ্রয়হীন অবস্থায় আছেন। আল্লাহর শপথ, আমরা আমাদেরকে মাসজিদের খুঁটির সাথে ততোক্ষণ পর্যন্ত বেঁধে রাখবো, যতোক্ষণ না রসূল (স.) স্বয়ং এসে আমাদের বাঁধনমুক্ত করবেন এবং আমাদের ওযর-আপত্তি গ্রহণ করবেন, এ বলে তারা নিজেদেরকে মাসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে ফেললো। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে তিনজন মাসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদের দেহ বাঁধলো না। এমতাবস্থায় আল্লাহর রসূল (স.) যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফিরে এসে মসজিদে নববীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে বাঁধা অবস্থায় দেখে সাহাবীদেরকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তারা বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ, তারা হচ্ছে আবু লুবাবা ও তার সাথীরা। তারা আপনার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলো। অতপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে নিজেদেরকে মাসজিদের সাথে বেঁধে ফেলেছে যা আপনি স্বয়ং দেখতে পাচ্ছেন। তারা এ শপথ করেছে, যতোক্ষণ না আপনি তাদেরকে বাঁধনমুক্ত করবেন, তারা তাদেরকে বাঁধন মুক্ত করবে না। জবাবে রসূলুল্লাহ বললেন, আল্লাহ রব্বুল ইযযতের পক্ষ থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আমি তাদেরকে বাঁধনমুক্ত করতে পারি না। আর তিনি তাদের ওযর আপত্তি গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমি তা, গ্রহণ করতে পারি না। কারণ তারা মুসলমানদের সাথে জেহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলো। অতপর আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন।

'আরো কিছু লোক আছে, যারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিয়েছে। .... অসম্ভব নয়, আল্লাহ তাদের প্রতি আবার মেহেরবান হয়ে যাবেন।' অতপর রসূল (স.) তাদের ওযর গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন।

এছাড়া আরো অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, উল্লেখিত আয়াতটি শুধু আবু লুবাবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কারণ তিনি বনু কোরায়যা যুদ্ধে বনু কোরায়যাকে এমর্মে সতর্ক করেছিলেন যে, যুদ্ধে পরাস্ত হলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। এ কথাটি বুঝাবার জন্যে তিনি স্বীয়

ঘাড়ের দিকে আংগুল দিয়ে ইংগিত করেন। কিন্তু এ অভিমতটি অবাস্তব। কারণ বনু কোরায়যার ঘটনার সাথে আলোচ্য আয়াতসমূহের কোনো সম্পর্ক নেই। অপর বর্ণনানুসারে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে বেদুইনদের সম্পর্কে।

ওপরে বর্ণিত সকল রেওয়ায়াত সম্পর্কে ইবনে জারীর এ বলে মন্তব্য করেন, 'এক্ষেত্রে সর্বাধিক বিশুদ্ধ উক্তি হচ্ছে তাদের উক্তি, যারা বলে, আলোচ্য আয়াতটি ওই সকল লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা রসূল (স.) থেকে পেছনে থাকা, তাঁর সাথে জেহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা এবং তবুক যুদ্ধে না গিয়ে রোম সাম্রাজ্য দখলের জন্যে বের হওয়ার কাজকে ভুল হিসাব আখ্যায়িত করেছে। যাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে, তন্মধ্যে এক জনের নাম হচ্ছে আবু লুবাবা।'

ইবনে জারীর বলেন, উপরোক্ত উক্তিটি বিশুদ্ধতম উক্তি, আমি এটা এ জন্যে বলছি, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, 'আরো কিছু লোক আছে, যারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিয়েছে।' .... এখানে আল্লাহ তায়ালা কিছু সংখ্যক লোকের ভুলের স্বীকারোক্তি বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি নিজের ভুল স্বীকার করে নিজেকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে ফেলবে, সে বনু কোরায়যার অবরোধে থাকতে পারে না, আর সেই ব্যক্তিটি আবু লুবাবা ছাড়া আর কেউ নয়। ঘটনা যখন এরূপ, আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর কালামে পাকে 'আরো কিছু লোক রয়েছে, যারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিয়েছে' বলে অপরাধ ও ভুল স্বীকৃতির সাথে একদল লোককে আখ্যায়িত করেছেন, এতে স্পষ্টভাবে বুঝা গেলো একদল লোক বলতে একজন বুঝায় না। পাশাপাশি এ বিষয়টিও পরিষ্কার হলো যে, আয়াতে বর্ণিত বিশেষণটি (আরো কিছু লোক রয়েছে, যারা নিজেদের অপরাধকে স্বীকার করে নিয়েছে।) একদল লোক ছাড়া শুধু একজনের জন্যেও হতে পারে না। ইতিহাসবেত্তা ও জীবন চরিত বর্ণনাকারীরা বলেন, এখানে একদল লোক বলতে ওই সকল লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা তবুক যুদ্ধে রসূল (স.)-এর সাথে অংশগ্রহণ না করে নিজেদের বাড়ীতেই থেকে গিয়েছিলো। এ অভিমতের ব্যাপারে মোফাসসেররাও একমত। সুতরাং আমার বক্তব্যই আমি সঠিক বলে মনে করি। আমি বলেছি, তাদের মধ্যে আবু লুবাবাও ছিলো। কারণ গ্রহণযোগ্য মোফাসসেরদের এ ব্যাপারে ঐকমত্য ছিলো।

আর এদের বৈশিষ্ট্য পেছনে অবস্থানকারী ওযর পেশকারী ও তাওবাকারী বর্ণনা করার পর আল্লাহ তায়ালা নিম্নের মন্তব্য পেশ করেন।

'অসম্ভব নয়, আল্লাহ তাদের প্রতি আবার মেহেরবান হয়ে যাবেন। কারণ, তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।'

ইবনে জরীরের ভাষায় 'আসা' (আশা করা যায়) আল্লাহর পক্ষ হতে হলে নিশ্চিতের অর্থ দেয়। এ আলোচ্য আয়াতে ওই সত্ত্বা আশা পোষণ করছেন যিনি স্বয়ং আশা পূর্ণ করবেন। সুতরাং সেই আশা নিশ্চিত পূরণ হবে। ওপরে বর্ণিত পন্থায় অপরাধ ও ভুলের স্বীকৃতি এবং তার ভয়াবহতার অনুভূতি অন্তরের জীবন ও স্পন্দনের পরিচায়ক। সুতরাং তাওবা কবুল হওয়ার আশা করা হচ্ছে এবং ক্ষমাশীল ও করুণাময়ের পক্ষ থেকে ক্ষমারও কামনা করা হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা পরবর্তীতে তাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করেন।

নিম্নে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবকে সম্বোধন করে বলেন,

তুমি তাদের ধন সম্পদ থেকে (যাকাত ও) সাদকা গ্রহণ কারো। এই........ (আয়াত ১০৩)

যে সংবেদনশীলতা তাদের মনে অনুতাপ এবং অন্তরে তাওবার অনুভূতির উদ্রেক করে, তা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার, স্বস্তির উপযোগী এবং করুণার যোগ্য। যাতে আশার বারিধারা সিঞ্চিত হয় এবং ক্ষমার দ্বার উন্মুক্ত হয়। যেহেতু রসূল (স.) ইসলামী আন্দোলনের কর্ণধার, মুসলিম উম্মার প্রশিক্ষক এবং নতুন জীবন বিধানের আবিষ্কারক, সেহেতু তিনি তাদের ব্যাপার অত্যন্ত দূরদর্শিতার

সাথে আঞ্জাম দেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে কোনো নির্দেশ আসা পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন ।

ইবনে জারীর তাবারী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন রসূল (স.) আবু লুবাবা ও তার দুই সাথীকে বাঁধনমুক্ত করলেন, (উল্লেখ্য, তবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার ফলে অনুতপ্ত হয়ে যারা নিজেদেরকে মাসজিদে নববীর খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিলো, তাদের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। কারো মতে তিন জন। অন্য বর্ণনানুসারে সাত জন। অপর বর্ণনা মতে দশজন। আর যারা খুঁটির সাথে নিজেদেরকে বাঁধেনি, তাদের সংখ্যা তিন।) মুক্ত হওয়ার পর তারা স্বীয় সম্পদ নিয়ে রসূল (স.)-এর খেদমতে এসে নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ আমাদের ধন সম্পদ থেকে সদকা নিয়ে আমাদেরকে পবিত্র করুন। নেকীর পথে আমাদেরকে এগিয়ে দিন এবং আমাদের জন্যে রহমতের দোয়া করুন। আমাদের অপরাধ মার্জনার জন্যে দোয়া করুন। জবাবে রসূল (স.) বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট না হয়ে আমি তোমাদের কোনো সম্পদই গ্রহণ করবো না। অতপর আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন।

'হে নবী, তুমি তাদের ধন সম্পদ থেকে সদকা নিয়ে তাদেরকে পাক পবিত্র করো। (নেকীর পথে) তাদেরকে এগিয়ে দাও এবং তাদের জন্যে রহমতের দোয়া করো। নিসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের সান্ত্বনার কারণ হবে।'

'হে নবী, তুমি তাদের অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো।'

আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূল (স.) তাদের ধন-সম্পদের কিছু অংশ নিয়ে আল্লাহর রাহে দান সদকা করেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীব মোহাম্মদ (স.)-কে তাদের খাঁটি তাওবা ও সৎ নিয়তের বিষয় অবহিত করে তাদের ওপর করুণা করেন। তাই তিনি তাঁর রসূলকে তাদের ধন সম্পদের কিছু অংশ গ্রহণ করে আল্লাহর রাহে দান খয়রাত করতে এবং তাদের জন্যে দোয়া করতে নির্দেশ করেন। সালাত শব্দটি মূলত দোয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটা এজন্যে যে, তাদের থেকে সদকা গ্রহণ তাদের হৃদয়ে এ অনুভূতি জাগরিত করবে যে, তারা মুসলিম সমাজের পূর্ণ সদস্য। তারা সেই সমাজের করণীয় কর্মকান্ডের অংশীদার এবং তার দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতেও সদা প্রস্তুত। তারা তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, পরিত্যক্তও নয়। তাদের স্বেচ্ছায় দান-সদকার মাঝে তাদের পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধি নিহিত আছে। আর রসূলের দোয়া তাদের জন্যে সান্ত্বনা ও প্রশান্তি স্বরূপ।

'বস্তুত আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন।'

তিনি তাদের দোয়া শুনেন, তাদের মনের কথা জানেন এবং শ্রবণকারী এবং জ্ঞানী হিসাবে তিনি তাদের ব্যাপারে বিচার ফয়সালা করে থাকেন। আর তিনিই একমাত্র সত্ত্বা যিনি বান্দার বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। তিনি তাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাদের দান-সদকা গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে রসূল (স.) তাঁর প্রভুর নির্দেশই বাস্তবায়ন করেন, নিজ থেকে কিছুই করেন না। এ বাস্তব সত্য জিনিসটি প্রমাণ করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন,

তারা কি একথাটা জানে না যে............ (আয়াত ১০৪)

আয়াতে বর্ণিত বিষয়টিকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তাদের এ বিষয়টি ভালো করেই জেনে রাখা উচিত যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তাওবা কবুল করার মালিক এবং তিনিই সদকা গ্রহণ করার অধিকার রাখেন। আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের তাওবা কবুল করে তাদের ওপর করুণা বর্ষণ করেন। আর এ অধিকার তিনি ছাড়া অন্য কারো নেই। ইবনে জারীর এ ক্ষেত্রে বলেন, যারা তবুক যুদ্ধে রসূল (স.)-এর সাথে অংশগ্রহণ না করে এবং পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে নিজেদেরকে মাসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে ফেলে এবং প্রতিজ্ঞা করে যতোক্ষণ রসূল (স.) তাদের বাঁধনমুক্ত না

করবেন তারা বাঁধনমুক্ত হবে না। এক্ষেত্রে রসূল (স.) তাদের বাঁধনমুক্ত করতে অস্বীকার করলেন। অনুরূপভাবে যখন তারা তাদের ধন সম্পদ সদকা করার উদ্দেশ্যে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলো, তখন তিনি তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করলেন না। কারণ বাঁধনমুক্ত করা বা সদকা গ্রহণ করা কোনোটার এখতিয়ারই রসূলের হাতে ছিলো না। তিনি আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছুই করতেন না।

তারপর পশ্চাতে অবস্থানকারী তাওবাকারীদের প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন,

(হে নবী এদের) তুমি বলো............. (আয়াত ১০৫)

এটা এজন্যে যে, ইসলামী আকীদা ও আমলের বিধান, আকীদার সত্যতা প্রমাণ করে। সুতরাং তাদের তাওবার সত্যতার মাপকাঠি হচ্ছে তাদের বাহ্যিক কাজ, যা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মোমেনরা দেখেন। পরকালে তাদেরকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সব কিছু জানেন। যিনি অংগ-প্রত্যংগের কর্ম এবং অন্তরের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক অবগত আছেন।

নিসন্দেহে অপরাধ করার পর লজ্জিত হওয়া এবং তাওবা করাই যথেষ্ট ও বিবেচ্য বিষয় নয়। বরং বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে তাওবার পরবর্তী কাজ। কাজ যদি তার অনুতপ্ত হওয়া এবং তাওবার অনুকূলে হয়, তবেই সে সত্যিকারের সফল ব্যক্তি, অন্যথায় সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত ।

ইসলাম হচ্ছে বাস্তব জীবন বিধান, এতে শুধু অনুভূতি এবং নিয়তই যথেষ্ট নয়। আর এই অনুভূতি ও নিয়ত যতোক্ষণ পর্যন্ত বাস্তব কর্মে পরিণত না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তার কোনো মূল্যই নেই। ভাল কাজ করার নিয়তের অবশ্যই মূল্য রয়েছে। কিন্তু তা প্রতিদান ও বিনিময়ের জন্যে যথেষ্ট নয়। বরং তা কাজের সাথেই তা বিবেচ্য হবে। সুতরাং কাজই নিয়তের মূল্যায়নের চাবিকাঠি, আর এদিকেই ইংগিত করেছে নিম্নোক্ত হাদীস,

'সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।'

এখানে মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে কাজ, শুধু নিয়ত নয়।

সর্বশেষ দল যাদের ব্যাপারটি ছিলো সন্দেহপূর্ণ। যাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত নির্দেশ তখনবধি নাযিল হয়নি। যাদের বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

(তোমাদের মাঝে) আরো একটি দল রয়েছে............... (আয়াত ১০৬)

যে দশজন মোমেন বিনা ওযরে তবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত ছিলেন, তাঁদের সাতজন মাসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নিয়ে মনের অনুতাপ অনুশোচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এদের উল্লেখ পূর্ববর্তী আয়াতে হয়েছে। বাকী তিন জনের হুকুম আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যারা প্রকাশ্যে এভাবে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেননি, আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়া পর্যন্ত তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনো নির্দেশ আসেনি। তাদের বিষয়টি আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলো। তারা বা অপরাপর মানুষরা তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালাটি তখনবধি জানতো না। বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াতটি তিনজন ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা প্রকাশ্যে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেনি। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের তাওবার কথা ঘোষণা করেন এবং তাদের বিষয়েও সিদ্ধান্তও দেন। সেই তিনজন সাহাবী হচ্ছেন, মু'রারা ইবনুর রবী, কা'ব ইবনে মালিক এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া। তারা অলসতা, শান্তিপ্রিয়তা এবং রোদের প্রখরতা থেকে মুক্তি পাবার লোভেই তবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে ঘরে অবস্থান করছিলো। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা এ সূরায় পরবর্তী আয়াতে আসবে ইনশাআল্লাহ।

ইবনে জারীর সনদসহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন 'হে নবী, তাদের ধন সম্পদ থেকে সদকা নিয়ে তাদেরকে তায়ালা পবিত্র করো,

নেকীর পথে তাদেরকে এগিয়ে দাও।' এ আয়াত নাযিল হয়, তখন রসূল আবু লুবাবা ও তার দুই সাথীর কাছ থেকে সম্পদ গ্রহণ করে সদকা করে দেন। অবশিষ্ট তিনজন যারা আবু লুবাবার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলো, তারা নিজেদেরকে মসজিদের খুঁটির সাথেও বাঁধেনি। তাদের ওযর সম্পর্কে কোরআনের কোনো আয়াত তখনবধি নাযিল হয়নি। রসূল (স.)-ও তাদের ব্যাপারে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। তাই তারা খুবই চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লো। যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্তেও তাদের ওপর সংকীর্ণ হয়ে গেলো। তখন তাদের শানে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো,

'অপর কিছু লোকের ব্যাপার এখনো আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছে। তিনি চাইলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, আবার চাইলে তাদের প্রতি নতুন করে অনুগ্রহ করবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।'

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ তাদের ওযর সম্পর্কিত কোনো আয়াতই নাযিল হয়নি। অপর কিছু সংখ্যক লোক বলতে লাগলো, হয়তো আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। তাই তাদের কাজকর্ম আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। অতপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

'আল্লাহ নবীকে মাফ করে দিয়েছেন এবং অত্যন্ত কঠিন সময়ে যে মোহাজের ও আনসাররা নবীর সাথে সহযোগিতা করে (অর্থাৎ যারা তাঁর সাথে তবুক গিয়েছিলো) তাদেরকেও মাফ করে দিয়েছেন। যদিও তাদের মধ্য থেকে কিছু লোকের দিলে বক্রতার দিকে আকৃষ্ট হতে যাচ্ছিলো। (কিন্তু তারা এ বক্রতার অনুগামী না হয়ে নবীর সহযোগী হয়েছে। ফলে) আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। নিসন্দেহে এ সব লোকের প্রতি তিনি স্নেহশীল ও মেহেরবান।'

অতপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর যে তিন জনের ব্যাপার মুলতবী করে দেয়া হয়েছিলো, তাদেরকেও তিনি মাফ করে দিয়েছেন।'

অর্থাৎ যাদের কাজকর্ম আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলো, তাদের তাওবা ও ক্ষমার ব্যাপারটি এ আয়াতে নাযিল হয়েছে। অতপর তিনি বলেন, 'পৃথিবী তার সমগ্র ব্যাপকতা সত্তেও যখন তাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গেলো, তাদের নিজেদের প্রাণও তাদের জন্যে বোঝা হয়ে দাঁড়ালো। .... অবশ্য আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।' (অনুরূপভাবে ইবনে জারীর সনদসহ ইকরামা, মোজাহেদ, যাহহাক, কাতাদা এবং ইবনে ইসহাক থেকে পৃথক পৃথক বর্ণনা করেন।) উপরোক্ত বর্ণনাটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

যেহেতু এ তিন জনের বিষয়টি আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় আছে, সুতরাং আমিও তাদের আলোচনাটি যথাস্থানে করা জন্যে অপেক্ষা করছি। বাকী আল্লাহর মরযী।

মসজিদে যেরার নির্মাণ ও তা ধ্বংসের ঘটনা

এরপর আলোচনা আসছে মসজিদে যেরার প্রসঙ্গে, এরশাদ হচ্ছে,

মোনাফেকদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা তোমাদের ক্ষতি সাধন করার জন্যে .... (আয়াত ১০৭-১১০)

মসজিদে যেরার তবুক যুদ্ধের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। এ জন্যেই মোনাফেকদের মধ্য থেকে যারা এ মসজিদ নির্মাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিলো, তাদের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তখনকার মুসলিম সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধারণ পর্যালোচনা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তাদের জন্যে পৃথক আলোচনা বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে বলেন, আলোচ্য আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার কারণ হচ্ছে, মদীনায় নবী (স.)-এর আগমনের আগে খাযরাজ গোত্রে আবু আমের নামে এক ব্যক্তি ছিলো। জাহেলী যুগে সে খৃষ্টান রাহেব (সাধু)-এর মর্যাদা লাভ করেছিলো। তাকে আহলে কেতাবদের আলেমদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি গণ্য করা হতো। অন্যদিকে সাধুগিরির কারণে

পন্ডিতসুলভ মর্যাদার পাশাপাশি তার দরবেশীর প্রভাবও মদীনা ও আশপাশের এলাকার অশিক্ষিত আরব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো। নবী (স.) যখন মদীনায় পৌঁছলেন, মুসলমানরা তাঁর আশেপাশে এসে জড়ো হলো।

এরপর ইসলামের সুমহান বাণী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আল্লাহ তায়ালা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় দান করেন। তখন আবু আমের অত্যন্ত রাগান্বিত হলো এবং রসূল, মুসলমান এবং ইসলামের বিরোধিতা করার জন্যে আদা জল খেয়ে লাগলো। এমনকি সে পালিয়ে মক্কার কোরায়শ কাফেরদের কাছে গেলো এবং তাদেরকে রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে উত্তেজিত করে তুললো। অবশেষে কোরায়শ গোত্রসহ যেসব গোত্র তার কথায় সাড়া দিলো, তাদেরকে নিয়ে সে ওহুদ প্রান্তরে পৌঁছলো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়লো। যুদ্ধের ফলাফল যা হবার হলো। আল্লাহ তায়ালা সে যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরীক্ষা করলেন। কিন্তু পরিণাম মোত্তাকীদের পক্ষেই ছিলো। বলা হয়ে থাকে, ওহুদের যুদ্ধের ময়দানে সে অনেকগুলো গর্ত খুঁড়েছিলো, এরই একটির মধ্যে পড়ে গিয়ে নবী করীম (স.) আহত হয়েছিলেন। তাঁর মাথা ফেটে সারা চেহারা মোবারক রক্তে রঞ্জিত হয়েছিলো। তাঁর দাঁত শহীদ হয়ে গেলো। ওহুদ প্রান্তরে মল্লযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে আবু আমের তার সম্প্রদায়ের আনসারদের সম্বোধন করে এক আবেগপূর্ণ বক্তব্য পেশ করে। তার মাধ্যমে সে তাদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলো। এমনকি সে তাদের সাহায্য-সহযোগিতারও আশ্বাস দিয়েছিলো। তারা যখন তার বক্তব্যের মর্মবাণী বুঝতে পারে তখন তারা তাকে সম্বোধন করে বললো, ওহে ফাসেক, ওহে আল্লাহর শত্রু, তোমার গুপ্তচরবৃত্তিতে আল্লাহ যেন বরকত না দেন। অতপর তারা তাকে গালিগালাজ করলো। তারপর সে একথা বলতে বলতে চলে গেলো, আল্লাহর শপথ, আমি মক্কায় যাওয়ার পর আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা অনিষ্ট ও অন্যায় কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েছে।

মক্কায় পালিয়ে যাবার আগে রসূল (স.) তাকে আল্লাহর পথে আবার আহ্বান করেছিলেন এবং কোরআনে হাকীম থেকে কিছু তেলাওয়াত করেও তাকে শুনিয়েছিলেন, কিন্তু সে ইসলামে দীক্ষিত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো। অবশেষে রসূল (স.) তাঁর বিরুদ্ধে এ মর্মে বদ দোয়া করলেন, সে যেন বিতাড়িত অবস্থায় স্বদেশ থেকে দূরে মৃত্যু বরণ করে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেন। তাকে বিতাড়িত এবং আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সিরিয়ায় মৃত্যু বরণ করতে হয়।

মানুষ যখন ওহুদ যুদ্ধের ব্যস্ততা থেকে অবসর গ্রহণ করে এবং রসূল তথা দ্বীন ইসলামের উন্নতি ও ব্যাপ্তি দেখতে পায়, তখন আবু আমের রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কাছে গিয়ে নতুন নবীর বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করলো। জবাবে সে সাহায্যের আশ্বাসও দিলো। অতপর সে সেখানে অবস্থান করলো। সে সেখান থেকে তার সম্প্রদায়ের মোনাফেক একদল লোকের কাছে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি ও আশা দিয়ে চিঠি লিখলো যে, সে একদল সেনাবাহিনী নিয়ে রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আসছে এবং সে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ারও আশা পোষণ করলো। সে সাথে সে চিঠিতে তাদেরকে একটি দুর্গ নির্মাণের নির্দেশ দিলো, যেখানে তার প্রতিনিধিরা এসে নিরাপদে তাদের কাছে তার বার্তা পৌঁছিয়ে দেবে। পরবর্তীতে সে যখন মদীনায় ফিরে আসবে, তখন তা তার আশ্রয়স্থল হিসাবে বিবেচিত হবে। তাই তারা মাসজিদে কুবার কাছে আরেকটি নতুন মসজিদ বানাতে শুরু করলো, রসূল (স.) তবুক যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বেই তারা মসজিদ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করলো এবং তাদের একটি প্রতিনিধিদল রসূল (স.)-এর খেদমতে এসে সেখানে একবার নামায পড়িয়ে মসজিদটির উদ্বোধন করার জন্যে তাঁর কাছে আবেদন জানালো। এরপূর্বে অবশ্য তারা তাঁর সামনে এসে এ নতুন নির্মাণ কাজের প্রয়োজন এভাবে পেশ করে যে, বৃষ্টি বাদলের জন্যে এবং শীতের রাতে সাধারণ লোকদের বিশেষ করে মাসজিদে কুবা ও মসজিদে নববী থেকে দূরে

অবস্থানকারী বৃদ্ধ, দুর্বল ও অক্ষম লোকদের প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে হাযিরা দেয়া কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই আমরা শুধুমাত্র নামাযীদের সুবিধার্থে এ নতুন মসজিদটি নির্মাণ করতে চাই। জবাবে রসূলে করীম (স.) বললেন, আমি এখন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছি এবং শীঘ্রই আমাকে একটি বড় অভিযানে বের হতে হবে, সেখান থেকে ফিরে এসে ইনশাআল্লাহ নামায আদায় করবো। এরপর তিনি তবুক রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং তাঁর রওয়ানা হওয়ার পর এ মোনাফেকেরা এ মাসজিদে নিজেদের জোট গড়ে তুলতে এবং ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগলো। কিন্তু তবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন তিনি মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন মসজিদে যেরার সম্পর্কিত আলোচ্য আয়াতগুলো তার ওপর নাযিল হয়। এতে মোনাফেকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়া হলো। আর তা হচ্ছে, সত্যের দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। আল্লাহর বন্দেগীর পরিবর্তে কুফরী করা, মোমেনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং বাহ্যিক এবাদাতগাহকে এমন এক ব্যক্তির জন্যে গোপন ঘাঁটি বানানো, যে ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলো। আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর রসূলে করীম (স.) কতিপয় সাহাবীকে যাদের মধ্যে আমের এবং হযরত হামযা (রা.)-এর হন্তা ওয়াহশীও উপস্থিত ছিলেন, এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, এখনি গিয়ে কথিত মসজিদটি ধ্বংস করো এবং এতে আগুন লাগিয়ে দাও। আদেশ মতে তারা মসজিদটি সমূলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন। অনুরূপভাবে সনদসহ উপরোক্ত ঘটনাটি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যোবার, মোজাহেদ, ওরওয়া ইবনুয যোবায়র এবং কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে।

এ সেই মসজিদুয যেরার (যেরার মসজিদ) যেখানে না দাঁড়াবার তথা নামায না পড়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বরং সেই প্রথম মসজিদ– মসজিদে কুবাতেই এবাদাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবার নির্দেশ দিলেন, যেই মসজিদটি প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিলো, আর যে মসজিদ এমন কিছু লোককে অন্তর্ভুক্ত করে যারা পাক-পবিত্র থাকা পছন্দ করে। 'আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।'

যে মাসজিদে যেরারকে রসূলের যুগে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে ষড়যন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিলো, তার উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমানদের ক্ষতি করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, আলোর আধাঁরে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো তাদেরকে গোপন করা এবং দ্বীনের আলখেল্লা পরে দ্বীনের শত্রুদের সহযোগিতা করা।

এ সেই মসজিদ, যাকে আজকের যুগেও বিভিন্ন চিত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা দ্বীন ইসলামের শত্রুদের গ্রহণ করা একটি ঘৃণ্য মাধ্যম। এ মাধ্যমগুলোকে এমন কর্মকান্ডের আকারে গ্রহণ করা হয়, যার বাহ্যিক অবয়ব মনে হয় ইসলামের স্বার্থেই ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু তার অভ্যন্তর ইসলামকে নিশ্চিহ্ন বা বিকৃত ও পরিবর্তনের জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে তাকে এমনসব অবস্থার আকৃতিতে ব্যবহার করা হয় যার ওপর দ্বীনের সাইনবোর্ড লাগানো থাকে, কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে দ্বীনের মস্ত বড় ক্ষতি করা। অধিকন্তু এ মাধ্যমগুলো বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা, বই পুস্তকের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে শান্ত্বনা দেয়, যে ইসলাম খুব ভালো অবস্থানেই আছে। যাকে নিয়ে চিন্তা ও অস্থিরতার কোনো কারণ নেই।

মাসজিদে যেরাররূপী অসংখ্য চিত্র আজকের যুগেও ব্যবহার করা হচ্ছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করা। এখন সময় এসেছে এগুলোকে উন্মোচন করা, এদের ওপর থেকে প্রতারণার সাইনবোর্ড সরিয়ে ফেলা, এর বাস্তব অবস্থা মানুষের সামনে তুলে ধরা, তার গোপন রহস্য সম্পর্কেও মানুষকে সতর্ক করা দরকার। এরশাদ হচ্ছে,

মোনাফেকদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা তোমাদের ক্ষতি সাধন করার জন্যে .... (আয়াত নং ১০৭-১১০)

কোরআনে হাকীমের অভিনব বর্ণনাভঙ্গি আমাদের সামনে গতিসম্পন্ন একটি চিত্র অংকন করছে, যা মসজিদে তাকওয়ার পাশে নির্মিত প্রত্যেকটি মাসজিদে যেরারের পরিণতি সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে দিচ্ছে। পাশাপাশি সে চিত্র প্রতারণার উদ্যোগেরও উন্মোচন করে, যার পেছনে ঘৃণ্য উদ্দেশ্য লুক্কায়িত থাকে। এরশাদ হচ্ছে,

যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছে আল্লাহর ভয় .... (আয়াত ১০৯)

তাকওয়ার উঁচু মযবুত নিরাপদ বুনিয়াদ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তার বিপরীত যেরারের বুনিয়াদ সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত। এই বুনিয়াদ এক গর্তের কিনারায় অবস্থিত, যা যে কোনো সময়ই ধসে পড়তে পারে এবং যা একটি উপত্যকার স্থিতিহীন প্রান্তের ওপর অবস্থিত। এটা ধ্বংসপ্রাপ্ত নড়বড়ে একটি মাটির টিলার ওপর দন্ডায়মান। আমরা সে নড়বড়ে ভিতকে দেখতে পাচ্ছি তা আস্তে আস্তে সোজা জাহান্নামে গিয়ে পতিত হচ্ছে। 'আর আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের যালেমদেরকে কখনো সোজা পথ দেখান না।' তারা কাফের মোশরেক, যারা এ বুনিয়াদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলো। এটা ছিলো এ দ্বীনের সাথে প্রতারণা।

নিসন্দেহে এটি একটি অভিনব দৃশ্য। যাকে কয়েকটি শব্দ অত্যন্ত নিপুণভাবে অংকন করেছে। যারা প্রতারণা, কুফর এবং নেফাকের পথে মানুষকে আহ্বান করছে, তাদের বিপরীতে যারা বিশ্ব মানবতাকে হকের প্রতি আহ্বান করছে, তাদের সবাইকে এর মাধ্যমে সেই আহ্বানের পরিণতির ব্যাপারেও আশ্বস্ত করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে এর মাধ্যমে যারা প্রতারণা, ষড়যন্ত্র এবং ক্ষতি সাধনের বিপরীতে তাকওয়ার ওপর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছে, তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

ওরা যে ঘর বানিয়েছে, তা হামেশাই তাদের অন্তরে .... (আয়াত ১০)

ধসে পড়ার নিকটবর্তী গর্তের কিনারা ধসে পড়লো। ধসে পড়লো যেরারের বুনিয়াদসহ, যার ওপর তা প্রতিষ্ঠিত ছিলো। সেই ইমারতটি বুনিয়াদসহ সোজা জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়লো। আর জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট স্থান। ভংগুর এই ইমারতের প্রভা মোমেনদের অন্তরে সর্বদা জাগরূক থাকবে।

ধসে পড়া ইমারতের চিত্র নিসন্দেহে মানুষের মনে সন্দেহ, চিন্তা এবং অস্থিরতার সৃষ্টি করে। প্রথম চিত্রটি হচ্ছে বাস্তব, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে হৃদয় বিদারক এ দুটি চিত্র পরস্পর বিরোধী দুটি অভিনব দৃশ্য, এখানে একত্রিত করেছে। যাকে কোরআনের অতুলনীয় বর্ণনা ভংগি একে দিয়েছে। প্রতারক, নড়বড়ে আকীদার অধিকারী এবং অস্থিরচিত্তের ব্যক্তি কখনো নিরাপদ ও স্থির হতে পারে না, সে তার দোষ উন্মোচনের ব্যাপারে সদা অস্থির ও সন্দিহান থাকে।

এটাই হচ্ছে কোরআনে হাকীমের অভিনবত্ব যে, কোরআন যে কোনো অদেখা বস্তুকে নিখুত বাস্তব চিত্রের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় মানুষের সামনে উপস্থাপন করে।

মাসজিদে যেরার এবং তার প্রতিষ্ঠাতাদের মুখোশ উন্মোচন মুসলিম সমাজকে সুস্পষ্ট ঈমানী বিভিন্ন স্তরে সুবিন্যস্ত করে, ইসলামী আন্দোলনের পথ তার জন্যে খুলে দেয়।

কোরআনে হাকীম মুসলিম সমাজের নেতৃত্বদান করা, তাকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দেয়া, অনুপ্রাণিত করা এবং বৃহৎ দায়িত্বের জন্যে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সদা কাজ করে যাচ্ছে। কোরআনে করীমকে বুঝতে একমাত্র ওই ব্যক্তিই সক্ষম, যে তার আন্দোলনগত বিশাল ক্ষেত্রকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে। অনুরূপভাবে তাকে একমাত্র ওই সকল লোকেরাই বুঝতে সক্ষম, যারা নিজেরাও তার সাথে আন্দোলিত হবে।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي

التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا

بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾ التَّائِبُونَ

الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ

وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا

রুকু ১৪

১১১. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের কাছ থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান ও তাদের মাল খরিদ করে নিয়েছেন, এরা আল্লাহর পথে জেহাদ করে, অতপর (এ জেহাদে কখনো কাফেরদের) তারা হত্যা করে, (কখনো আবার শত্রুর হাতে) তারা নিজেরা নিহত হয়। তার ওপর (এ) খাঁটি ওয়াদা (এর আগে) তাওরাত এবং ইনজীলেও করা হয়েছিলো, আর (এখন তা) এ কোরআনে করা হচ্ছে, এই ওয়াদা পালন করা আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব দায়িত্ব; আর আল্লাহর চাইতে কে বেশী ওয়াদা পূরণ করতে পারে? অতএব (হে মোমেনরা), তোমরা তাঁর সাথে যে কেনাবেচার কাজ (সম্পন্ন) করলে তাতে সুসংবাদ গ্রহণ করো (কেননা) এটিই হচ্ছে মহাসাফল্য। ১১২. (যারা আল্লাহর দরবারে) তাওবা করে, (নিষ্ঠার সাথে তাঁর) এবাদাত করে, (তাঁর) প্রশংসা করে, (তাঁর জন্যে) রোযা রাখে, (তাঁর জন্যেই) রুকু-সাজদা করে, (যারা অন্যদের) ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, (সর্বোপরি যারা) আল্লাহ তায়ালার (নির্ধারিত হালাল-হারামের) সীমা রক্ষা করে চলে; (হে নবী,) তুমি (এ ধরনের সব) মোমেনদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দাও। ১১৩. নবী ও তার ঈমানদার (সাথীদের) জন্যে এটা মানায় না যে, তারা মোশরেকদের জন্যে কখনো মাগফেরাতের দোয়া করবে, এমনকি যদি তারা তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও হয়, যখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তারা (আসলেই) জাহান্নামের অধিবাসী! ১১৪. ইবরাহীমের স্বীয় পিতার জন্যে মাগফেরাতের ব্যাপারটি একটি ওয়াদা পালন ছাড়া আর কিছুই ছিলো না, যা সে তার পিতার কাছে (আগেই) করে রেখেছিলো, এ (ব্যতিক্রম)-টা ছিলো শুধু তার একার জন্যেই, কিন্তু যখন এ কথা তার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে,

تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَمَا كَانَ
اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ
وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾ لَقَد تَّابَ
اللَّهُ عَلَى النَّبِىِّ وَالْمُهَٰجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ
الْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُۥ
بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الثَّلَٰثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ
اللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

সে অবশ্যই আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললো; অবশ্যই ইবরাহীম ছিলো একজন কোমল হৃদয় ও সহানুভূতিশীল মানুষ। ১১৫. আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে, কোনো জাতিকে একবার হেদায়াতদানের পর পুনরায় তিনি তাদের গোমরাহ করে দেবেন, যতোক্ষণ না তাদের সুস্পষ্টভাবে (এ কথাটা) জানিয়ে দেয়া হয় যে, (কোন্ জিনিস থেকে) সাবধান থাকতে হবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ের জ্ঞান রাখেন। ১১৬. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতেই; তিনিই জীবন দেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও। ১১৭. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর ওপর অনুগ্রহ করেছেন, অনুগ্রহ করেছেন মোহাজেরদের ওপর, আনসারদের ওপর, যারা একান্ত কঠিন সময়ে তার অনুগমন করেছিলো তাদের (সবার) ওপর, এমনকি যখন তাদের একটি (ছোট্ট) দলের চিন্তা (একটু) বাঁকা পথে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা এদের সবার ওপর দয়া করলেন; নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন তাদের প্রতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল, ১১৮. সে তিন ব্যক্তির ওপরও (আল্লাহ তায়ালা দয়া করলেন), যাদের (ব্যাপারে) সিদ্ধান্ত মুলতবি করে রাখা হয়েছিলো; (তাদের অবস্থা) এমন এক পর্যায়ে (এসে পৌঁছুলো) যে, যমীন তার বিশালতা সত্ত্বেও তাদের ওপর সংকুচিত হয়ে গেলো, (এমনকি) তাদের নিজেদের জীবন নিজেদের কাছেই দুর্বিষহ হয়ে পড়লো, তারা (এ কথা) উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো যে, (আসলেই) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের আর কোনো জায়গা নেই যেখানে কোনো আশ্রয় পাওয়া যাবে; অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর অনুগ্রহ করলেন যেন তারা (তাওবা করে) পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾ مَا كَانَ لِأَهْلِ
ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا۟ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا
يَرْغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا
مَخْمَصَةٌ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ
عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا
إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾ وَمَا كَانَ
ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟
فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

রুকু ১৫

১১৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (হামেশা) সত্যবাদীদের সাথে থেকো। ১২০. মদীনার (মূল) অধিবাসী ও তাদের আশেপাশের বেদুঈন (আরব)-দের জন্যে এটা সংগত ছিলো না যে, তারা রসূলের সহগামী না হয়ে পেছনে থেকে যাবে এবং তাঁর জীবন থেকে নিজেদের জীবনকে বেশী প্রিয় মনে করবে; (আসলে) এটা এ জন্যে, আল্লাহ তায়ালার পথে তাদের যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় কষ্ট পাওয়া– (তা তাদের নেক আমলের মধ্যেই শামিল হবে, তাছাড়া) এমন কোনো স্থানে তারা যাবে, যেখানে যাওয়ায় কাফেরদের তাদের ওপর ক্রোধ আসবে এবং শত্রুদের কাছ থেকেও (মোকাবেলার সময়) তারা কিছু (সম্পদ) লাভ করবে, (মূলত) এর প্রতিটি কাজের বদলে তাদের জন্যে নেক আমল লেখা হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নেক লোকদের কাজের প্রতিফল বিনষ্ট করেন না, ১২১. (এভাবেই) তারা আল্লাহর পথে যা খরচ করে (তা পরিমাণে) কম হোক কিংবা বেশী– (তা বিনষ্ট হয় না) এবং যদি তারা আল্লাহর উদ্দেশে কোনো প্রান্তর অতিক্রম করে চলে, তাও তাদের জন্যে লিপিবদ্ধ হবে, যাতে করে তারা (দুনিয়ায়) যা কিছু করে এসেছে, (আখেরাতে) আল্লাহ তায়ালা তার চাইতে উত্তম পুরস্কার তাদের দিতে পারেন। ১২২. মোমেনদের কখনো (কোনো অভিযানে) সবার একত্রে বের হওয়া ঠিক নয়; (তারা) এমন কেন করলো না যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে কিছু কিছু লোক বের হতো এবং দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন করতো, অতপর যখন তারা (অভিযান শেষে) নিজ জাতির কাছে ফিরে আসতো, তখন তাদের জাতিকে তারা (আযাবের) ভয় দেখাতো, আশা করা যায় এতে তারা সতর্ক হয়ে চলবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ
غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم
مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ
إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ
رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿١٢٥﴾ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ
فِى كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ وَإِذَا
مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ
ٱنصَرَفُوا۟ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾ لَقَدْ جَآءَكُمْ
رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ

রুকু ১৬

১২৩. হে ঈমানদার লোকেরা, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের (সীমান্তের) কাছাকাছি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো, (এমনভাবে জেহাদ করো) যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা (দেখতে) পায়; (জেনে রেখো,) আল্লাহ তায়ালা (হামেশাই) মোত্তাকী লোকদের সাথে রয়েছেন। ১২৪. যখন কোনো (নতুন) সূরা নাযিল হয় তখন এদের কিছু লোক এসে (বিদ্রূপের ভাষায়) জিজ্ঞেস করে, এ (সূরা) তোমাদের কার কার ঈমান বৃদ্ধি করেছে! (তোমরা বলো, হাঁ) যারা (সত্যি আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে, এ সূরা (অবশ্যই) তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং (এর ফলে) তারা আনন্দিতও হয়েছে। ১২৫. আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এ (সূরা তাদের মধ্যে আগের জমে থাকা) নাপাকীর সাথে আরো (কিছু নতুন) নাপাকী (যুক্ত করে) দিয়েছে এবং তারা (এ নাপাকী ও) কাফের অবস্থায় মারা যাবে। ১২৬. তারা কি দেখতে পায় না, প্রতিবছর তাদের কিভাবে (বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেলে) একবার কিংবা দুবার বিপর্যস্ত করা হচ্ছে, এরপরও তারা তাওবা করে না এবং (এ বিপর্যয় থেকে) তারা কোনো শিক্ষাও গ্রহণ করে না। ১২৭. আর যখনি কোনো নতুন সূরা নাযিল হয় তখন তারা পরস্পর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে (এবং ইশারায় একে অপরকে জিজ্ঞেস করে); 'কেউ কি তোমাদের দেখতে পাচ্ছে?' অতপর তারা (হেদায়াত থেকে) ফিরে যায়; আর আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরকে এভাবেই (সত্য থেকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন, কেননা এরা হচ্ছে এমন সম্প্রদায়ের লোক, যারা কিছু অনুধাবন করে না। ১২৮. (হে মানুষ,) তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে এক রসূল এসেছে, তোমাদের কোনোরকম কষ্ট ভোগ তার কাছে দুঃসহ, সে তোমাদের একান্ত কল্যাণকামী,

رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ

تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

ঈমানদারদের প্রতি সে হচ্ছে স্নেহপরায়ণ ও পরম দয়ালু। ১২৯. এরপরও যদি এরা (এমন কল্যাণকামী একজন রসূলের কাছ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি (তাদের খোলাখুলি) বলে দাও, আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্যে যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; (সমস্যায় সংকটে) আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের একচ্ছত্র অধিপতি।

তাফসীর

আয়াত ১১১-১২৯

সূরার এটি হচ্ছে শেষ অংশ, শেষ আলোচনা। এতে মুসলিম সমাজের সাথে অমুসলিম সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের অবশিষ্ট বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এ আলোচনা শুরু করা হয়েছে মুসলমানের সাথে তার মালিকের সম্পর্কের মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে। এখানে ইসলামের সে মূল প্রকৃতি বর্ণিত হয়েছে যার ঘোষণা সূরার এ পর্যায়ে দেয়া হয়েছে। এখানে দ্বীনের হুকুম আহকামের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। এর সাথে এই আন্দোলনের দিক ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনাও করা হয়েছে।

ইসলামী জীবন বিধানে কোনো মানব সন্তানের প্রবেশ যেন একজন ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে সম্পাদিত কোনো চুক্তি। এখানে আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন ক্রেতা আর মোমেন হচ্ছে বিক্রেতা। এটা হচ্ছে আল্লাহর সাথে মোমেনের সম্পাদিত একটি আনুগত্যের চুক্তিনামা– এ চুক্তিনামায় স্বাক্ষর দানের পর মোমেনের কোনো জিনিসই তার আর নিজের থাকে না, না তার মাল, না তার জান। এরপর সে তার জীবনকে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর পথে জেহাদ করা থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর বিধান সমুন্নত হোক এবং জীবনের সব কয়টি দিক ও বিভাগ আল্লাহর দ্বীনের অনুগত হয়ে থাক। সূরার এ শেষ অংশে মোমেন তার জীবন ও তার সম্পদকে একটি সুনির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে আর সে নির্দিষ্ট মূল্যটি হচ্ছে জান্নাত। মূল্যের দিক থেকে তার জান আর মাল তো কোনো অবস্থায়ই জান্নাতের সমান হতে পারে না। আসলে এটাকে বিনিময় মূল্য হিসেবে নির্ধারণ করা মোমেনের ওপর আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের কাছ থেকে......... *(আয়াত ১১১)*

যে সব লোক এ ক্রয় বিক্রয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, তারা ছিলো সমাজের কতিপয় বাছাই করা আল্লাহর নেক বান্দাহ। তাদের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিলো, যা সাধারণত অন্য মানুষের মধ্যে পাওয়া যেতো না। এর কিছু গুণ বৈশিষ্ট্য ছিলো তাদের ব্যক্তি-চরিত্রের সাথে জড়িত, যা দিয়ে তারা আল্লাহর সাথে বেচাকেনার চুক্তি করেছে। এগুলোর কিছু তাদের দৈনন্দিন অভ্যাসের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলো। আবার তাদের এমন কিছু গুণও ছিলো যার সম্পর্ক ছিলো ব্যক্তিগত সীমারেখার বাইরে– এগুলোকেও তারা নিজেদের ওপর করণীয় করে নিয়েছিলো। যেমন আল্লাহর অন্য বান্দাহকে নেক কাজের আদেশ দেয়া, তাদের অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা। এই গুণটি দ্বারা আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠা করা এবং এর দ্বারা নিজেদের জীবনে ও অন্যান্য

মানুষদের জীবনে আল্লাহর সীমারেখাকে যথাযথ কায়েম রাখা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

(যারা আল্লাহর দরবারে) তাওবা করে (নিষ্ঠার সাথে তাঁর) এবাদাত করে........ (আয়াত ১১২)

কোরআনের বর্ণনার গতি অনুযায়ী পরবর্তী আয়াতে যারা আল্লাহর সাথে এ বেচাকেনার চুক্তি সম্পাদন করেছে, আর যারা আল্লাহর সাথে এমন কোনো ধরনের চুক্তি সম্পাদন করেনি– এ উভয় দলের সম্পর্ককে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। এমনকি তারা যদি একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও আপনজনও হয়, তাহলেও এদের মধ্যে আর পারস্পরিক কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এর কারণ হচ্ছে, এদের উভয়ের লক্ষ্য হচ্ছে ভিন্নমুখী। উদ্দেশ্য ও মনযিল আলাদা আলাদা। যারা এই বন্ধনে একবার আল্লাহর সাথে নিজেদের জড়িয়ে নিয়েছে, তারা হচ্ছে জান্নাতের বাশিন্দা। অপরদিকে যারা এখনো এ চুক্তি সম্পাদন করেনি, তারা হচ্ছে জাহান্নামী। এখন এ দু'দলের মাঝে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সম্পর্ক, চলাফেরা শেষ হয়ে গেলো। এ থেকে এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, রক্ত, বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক কখনো জান্নাতীদের সাথে জাহান্নামী মানুষের সম্পর্কের সেতুবন্ধ হতে পারে না– এসব বৈষয়িক সম্পর্কের মাঝে এমন কোনো যোগ্যতাই নেই যে, এদের উভয়ের মিলাতে পারে। এ পর্যায়ে আল্লাহর এরশাদ হচ্ছে,

নবী ও তার ঈমানদার (সাথীদের) জন্যে এটা মানায় না................(আয়াত ১১৩-১১৪)

মোমেন আনুগত্যের এই চুক্তি শুধু আল্লাহর সাথে করেছে। তাই তার যাবতীয় বন্ধুত্ব শুধু আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট। তার সব সম্পর্ক এরই ওপর নির্ভর করে আল্লাহর পক্ষ থেকে একথাটার ঘোষণা– ঈমানদারদের যাবতীয় সন্দেহ যাবতীয় দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচিয়ে দেয়। এই স্পষ্ট ঘোষণা তাদের সব ধরনের গোমরাহী থেকেও মাহফুয করে রাখে। তাদের জন্যে আল্লাহর বন্ধুত্ব ও তাঁর সাহায্যই যথেষ্ট। একবার এই বিষয়টি অর্জিত হয়ে গেলে তাদের সত্যিকার অর্থে আর কোনো জিনিসেরই দরকার হয় না। তিনিই হচ্ছেন আসমান যমীনের সর্বময় বাদশাহ। তিনি ছাড়া আর কারো কোনো কিছুর ক্ষমতাই নেই। আল্লাহ তায়ালা বলছেন–

আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে, কোনো জাতিকে একবার হেদায়াত দানের পর........(আয়াত ১১৫-১১৬)

আল্লাহর সাথে চুক্তি ও আনুগত্যের এই যখন আসল প্রকৃতি, তখন একবার এই চুক্তি সম্পাদন করে নেয়ার পর আল্লাহর পথে জেহাদ করা থেকে দ্বিধা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া কিংবা এ পথ থেকে পিছু হটে যাওয়া অবশ্যই একটা বিরাট রকমের ব্যাপার। তারপরও যারা এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করেছে এবং জেহাদে না গিয়ে পেছনে থেকে গেছে, সে সব মোমেনকে আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদের নেক নিয়তের কথা জানতেন। তাদের নিষ্ঠার কথাও তিনি জানতেন। এটা ছিলো তাদের ওপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই......... (আয়াত ১১৬)

এখান থেকে আল্লাহ তায়ালা মদীনার অধিবাসী ও এই শহরের পার্শ্ববর্তী লোকজনদের রসূলের প্রতি আনুগত্যের দায়িত্ব বর্ণনা করছেন। কেননা তারাই ছিলো রসূলের সবচাইতে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাদের সামষ্টিক কর্মকান্ডের ওপর ইসলামের ভিত্তি ছিলো নির্ভরশীল। ইসলামী আন্দোলনেরও কেন্দ্রভূমি ছিলো এটি। জেহাদের ময়দানে তাই এদের পেছনে পড়ে থাকা ছিলো খুবই খারাপ ব্যাপার। তাদের প্রতিটি কদমে এখানে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার কথার গুরুত্বও বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তির এটাও ছিলো একটি বিশেষ দাবী যে, তারা এ পথে নিজেদের অর্থ ব্যয় করবে। এরশাদ হচ্ছে,

মদীনার (মূল) অধিবাসী ও তাদের আশপাশের বেদুইন আরবদের জন্যে .... (আয়াত, ১২০-১২১)

আল্লাহর পক্ষ থেকে জেহাদের সাধারণ ঘোষণা আসলে দেশের সব মানুষের ওপর জেহাদ ফরয হয়ে যায়। সে অবস্থায় কারো জন্যেই পেছনে পড়ে থাকা বৈধ নয়। তবে এ ধরনের অবস্থা না হলে জেহাদের জন্যে প্রতিটি বস্তি ও দল থেকে একটা গ্রুপ জেহাদের ময়দানে যাবে এবং দ্বীনের জ্ঞান শিখে নিজেদের লোকদের কাছে ফিরে আসবে। আর বাকী লোকেরা সমাজের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করবে, যেমন যমীনের উন্নতি করা, ফসলের উৎপাদন করা– পরিশেষে এ উভয় দলের কাজ একীভূত হয়ে উভয়ের উদ্দেশ্যে একটি প্রান্তে এসে মিশে যাবে। ঘোষণা হচ্ছে,

মোমেনদের কখনো (কোনো অভিযানে) সবার.......... (আয়াত ১২২)

পরবর্তী আয়াতে জেহাদী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। এ সময় গোটা আরব উপদ্বীপ ইসলামের সমগ্র বুনিয়াদ ও তার অগ্রগামিতা রোধ করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিলো। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়ে পড়েছিলো যে, সবকটি কাফেরের সাথে যুদ্ধ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো– যেন কুফরী ফেৎনা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং দ্বীন সার্বিকভাবে আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত হয়ে যায়। একইভাবে সব আহলে কেতাবদের সাথেও যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়েছিলো– যাতে করে তারা তোমাদের সামনে নত হয়ে তোমাদের অধীনতার করো– তথা জিযিয়া দিতে বাধ্য হয়ে যায়। এরশাদ হচ্ছে,

হে ঈমানদার লোকেরা, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের ....(আয়াত ১২৩)

আল্লাহর সাথে আনুগত্যের চুক্তি সম্পাদন করা, তার দাবী তার আন্দোলনের প্রকৃতির বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পর পরবর্তী আয়াত কটিতে কোরআনের প্রতি মোনাফেকদের আচরণ ও মোমেনদের আচরণ দেখানো হয়েছে। কেননা তাতে একদিকে মোমেনদের আকীদা বিশ্বাস তাদের ব্যবহারিক জীবনের আদেশ নিষেধ নিয়েই নাযিল হয়েছিলো। অপরদিকে এ কথাও বলা হচ্ছিলো যে, মোনাফেকদের জন্যে কোনো রকম দলীল প্রমাণ, ভীতি প্রদর্শন ও বিপদ মুসীবত নাযিল এর কোনেটাই কোনো কাজে আসে না। বলা হচ্ছে,

যখনি কোনো (নতুন) সূরা নাযিল হয়, তখন .... (আয়াত ১২৪-১২৬)

শেষ যে দুটো আয়াত দিয়ে সূরার শেষ আলোচনার সমাপ্তি টানা হচ্ছে, তাহলো রসূলের প্রকৃতি ও তাঁর মেযাজ বর্ণনা। মোমেনদের জন্যে তাঁর আগ্রহ, তাঁর দয়া ও স্নেহসুলভ মনোভাব। সর্বশেষ আয়াতটিতে রসূলকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তিনি সর্বাবস্থায় শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করেন এবং যারা আল্লাহর হেদায়াত গ্রহণ করেনি, তাদের সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলেন। বলা হয়েছে,

(হে মানুষরা শোনো) তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে...... (আয়াত ১২৮-১২৯)

সূরার এই শেষ অংশের বর্ণনায় সম্ভবত এ কথাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, দ্বীন ইসলামে জেহাদের মর্যাদা একটি কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আকীদা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইসলাম ও কুফরীর সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। মোমেনরা জান মাল দিয়ে রসূলের সাথে যে জান্নাত পাবার চুক্তি করেছে তার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে যে, তারা দ্বীনকে গোটা দুনিয়ার সামনে পেশ করার জন্যে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা এর বিনিময় দুনিয়ায় নয়– আখেরাতে জান্নাতের মাধ্যমে পেতে চায়। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর সীমা সরহদকে সংরক্ষণ করা। আল্লাহর বান্দাদের সামনে তাঁর সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করা। যে ব্যক্তি ও দল এর বিরোধীতা করে সর্বশক্তি দিয়ে তাদের মোকাবেলা করবে।

একই ভাবে এই আলোচনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এ কথাও জানা যায় যে, বর্তমান সময়ে আল্লাহর আয়াত ও শরীয়তের ব্যাখ্যাতারা কি মানসিক দৈন্যের শিকার হয়ে আছে। তারা চেষ্টা করছে ইসলামী জেহাদের এই আদেশকে একটি সংকীর্ণ সময় ও সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিতে। অথচ আল্লাহ তায়ালার কেতাব ঘোষণা করছে গোমরাহী ও জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে প্রতিটি যামানায় প্রতিটি ভূখন্ডে এই জেহাদ জারী রাখতে এবং এই কেতাব এই হুকুম দিচ্ছে আশেপাশের কাফেরদের সাথে একটি স্থায়ী যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে। কোনো অবস্থায়ই এই স্থায়ী জেহাদ থেকে গাফেল হওয়া যাবে না এবং এ ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে কঠোরতা সৃষ্টি করতে হবে। কেননা তাদের সাথে তোমাদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তোমরা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও একত্বে বিশ্বাস করো, তারা তা বিশ্বাস করে না। তারা গায়রুল্লাহর সার্বভৌমত্ব শুধু তাদের নিজেদের ওপরেই নয়, তোমাদের ওপরও চাপিয়ে দিতে চায়। তারা বান্দাদের অন্য মানুষের গোলামীতে নিমজ্জিত করে দিতে চায়। অথচ সার্বভৌমত্ব সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালার জন্যে। এই হচ্ছে তাদের একটা বুনিয়াদী যুলুম ও বাড়াবাড়ি যার কারণে মুসলমানদের সর্বশক্তি দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে হবে।

আমি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ করছি। এবার আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যায় অবতীর্ণ হবো।

আল্লাহর সাথে মোমেনের ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি

কোরআনের এই অংশটিকে আমি কোরআন হেফয করার সময় অসংখ্য বার পড়েছি এবং শুনেছি। তারপর গত সিকি শতক ধরে অসংখ্য বার আমি এ আয়াতের তেলাওয়াত করেছি, দরস দিয়েছি। কিন্তু তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআনে' যখন আমি এ আয়াত কয়টিকে দেখলাম, তখন মনে হলো আমি এ থেকে এখন এমন কিছু জিনিস অর্জন করছি, যা ইতিপূর্বেকার অসংখ্য তেলাওয়াত ও দরসে হাসিল করতে পারিনি।

মূলত, এ হচ্ছে মহান কয়েকটি আয়াতের সমষ্টি- যাতে মোমেনের সাথে আল্লাহ তায়ালার সম্পর্ক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মোমেন আল্লাহর সাথে আনুগত্যের যে চুক্তি সম্পাদন করেছে, তার প্রকৃতি বর্ণনা করে। অতএব একমাত্র সেই হচ্ছে সঠিক অর্থে মোমেন, যে ব্যক্তি এ সম্পাদিত চুক্তি মেনে চলে এবং তার জীবনে এই চুক্তির বাস্তব লক্ষণ ফুটে ওঠে। অন্যথায় এটি হচ্ছে নিছক একটি দাবী মাত্র- যার সত্যতা অবশ্যই প্রমাণের দাবী রাখে।

এই আনুগত্যের চুক্তি- যাকে আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করে পারস্পরিক বেচাকেনার চুক্তি নাম দিয়েছেন, তার মূল কথা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের জান ও মাল তার নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। এখন থেকে তাদের কোনো জিনিসই আর তাদের নিজের রইলো না। তাদের কর্তব্য হচ্ছে এর কোনো কিছুই সে নিজের জন্যে বাঁচিয়ে রাখবে না। সব কিছুকেই আল্লাহর রাহে ব্যয় করে দেবে। এগুলোর কোনো কিছুর ওপরই তার আর নিজস্ব মালিকানা কিংবা অধিকার নেই। বেচাকেনার চুক্তি যেহেতু সম্পাদিত হয়ে গেছে- ক্রেতা যেভাবেই চাইবে, যখনই চাইবে তার কেনা মাল সে ব্যবহার করবে, এবং এই কেনা মালের ওপর সে যখন চাইবে তখন তাই কর্তব্য বলে আরোপ করবে। আবার সীমাবদ্ধ করতে চাইলেও তা সে করবে। আর বিক্রেতা- যে তার জিনিস বিক্রি করে দিয়েছে তাতে তার কোনো মালিকানা কিংবা অধিকার থাকবে না। এখন সেই বিক্রীত বস্তু ক্রেতার সম্পদে পরিণত হয়ে গেছে- বিক্রেতার অধিকার নেই যে, সে তার এই জান ও মালকে তার নিজস্ব মরযী মোতাবেক খরচ করবে, ক্রেতার মরযী

মোতাবেক যখন তখন তাকে তার সামনে হাযির করতে হবে। তার এখতিয়ার বলতে শুধু এটুকু যে, ক্রেতার ইচ্ছানুযায়ী বিনা বাক্য ব্যয়ে তাকে তার মরযী মোতাবেক কাজে লাগানোর জন্যে তার আনুগত্য ও ফরমাবরদারী করবে। এই বিক্রয়ের বিনিময়ে সে অবশ্যই জান্নাত পাবে, যদি চুক্তি মেনে চলে। সে জান্নাত পাবার পথ হচ্ছে আল্লাহর পথে সংগ্রাম ও জেহাদে আত্মনিয়োগ করা, এর পরিণাম হয় শাহাদাত, না হয় বিজয় লাভ।

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের বিনিময়ে মোমেনদের কাছ থেকে তাদের জানমালকে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে। এই জেহাদে তারা অন্যদের হত্যা করে, আবার কখনো নিজেরাও নিহত হয়।

মোমেন হচ্ছে সে ব্যক্তি– যে এই কেনাবেচার চুক্তি সম্পাদন করে এবং এই চুক্তি মোতাবেক চলে।সর্বোপরি আল্লাহর নির্ধারিত মূল্যে সন্তুষ্ট হয়। মোমেন সে ব্যক্তি যে জানে যে, ক্রেতা হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা আর সে হচ্ছে বিক্রেতা। জানমাল তো আল্লাহরই দেয়া, তিনিই এর একমাত্র মালিক। এটা মোমেনদের জন্যে আল্লাহর একান্ত মেহেরবানী যে, তবু তিনি এর একটা মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অথচ তিনি মূল্য নির্ধারণ নাও করতে পারতেন। কারণ তিনিই আমাদের জানমালের চূড়ান্ত মালিক। এটা তাঁর বিশেষ রহমত যে, তিনি মোমেনকে এর বিক্রেতা বলেছেন এবং এই বিক্রয় চুক্তি পালনকারী সাব্যস্ত করেছেন। এটাও তাঁর বিশেষ দয়া যে, তিনি এর মূল্য হিসেবে নিজের ওয়াদা অংগীকারের কথা ঘোষণা করেছেন এবং এই চুক্তি পালন করাকে মানবতার চূড়ান্ত মাপকাঠি হিসেবে স্থির করেছেন। অপরদিকে এই চুক্তির লংঘনকে পশুত্বের মাপকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাও কোন স্তরের পশু! একান্ত নিম্নমানের পশু। আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট স্তরের জানোয়োর হচ্ছে– 'যারা কাফের, যারা ঈমান আনে না। যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছো– অথচ তারা বারবার সে চুক্তির বরখেলাপ করে।' সর্বোপরি এরা আল্লাহকেও ভয় করে না।

আল্লাহর দরবারে পুরস্কার কিংবা শাস্তি সম্পূর্ণভাবে এই চুক্তি মেনে চলা কিংবা তা ভংগ করার ওপর নির্ভর করে। এই ঈমানের আনুগত্যের বন্ধন প্রতিটি মোমেনের ঘাড়ের ওপরই রয়েছে। সে এ বন্ধনের দায়িত্ব পালনের অবশ্যই ক্ষমতা রাখে। যতোক্ষণ পর্যন্ত তার ঘাড় থেকে ঈমান খসে পড়বে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত তার ঘাড়ে এই আনুগত্যের বন্ধনও অব্যাহত থাকবে। এ কথা কয়টি যখন আমি এখানে লিখতে যাচ্ছি, তখন আমার নিজের প্রচন্ড ভয় হচ্ছে আল্লাহর এই ফরমান কতো মহান কতো ভীতিপ্রদ। আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের কাছ থেকে তাদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে– জেহাদের ময়দানে অন্যদের যেমন তারা হত্যা করে, নিজেরাও নিহত হয়। হে মালিক! একান্তভাবে তোমারই সাহায্য চাই। কেননা এটা বড়ো কঠিন প্রতিশ্রুতি। আজ দুনিয়ার আনাচে কানাচে বসবাসকারী অসংখ্য মানুষ যারা নিজেদের মুসলমান মনে করে– এদের অবস্থা হচ্ছে, এরা সবাই ঘরের কোণে নিভৃতে বসে আছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করার জন্যে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। মানুষরূপী যে ডাকাত ও বিদ্রোহীরা মানুষের জীবন থেকে আল্লাহর মালিকানার বন্ধন ছিনিয়ে নিয়েছে এরা তাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলে না– এদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে না, জেহাদের ময়দানে কাউকে হত্যা করে না– নিজেরাও নিহত হয় না।

রসূলে করীমের মোবারক যুগে এই আয়াত ও এর বাক্যগুলো শানিত তরবারির ন্যায় মানুষের হৃদয়ে প্রচন্ড আঘাত হানতো। তারা সাথে সাথেই তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ মোমেন হয়ে যেতো। তাদের কানের কাছে এসব আয়াত কিছু শব্দ বিশিষ্ট কথা হিসেবে বিবেচিত হতো না

কিংবা তাদের বিবেকের দুয়ারে এগুলো কিছু অনুভূতি হিসেবেই কাজ করতো না বরং তারা আল্লাহর কালামের এই বাক্যগুলোকে নিজেরা হযম করতো এবং নিজেদের জীবনে তা অক্ষরে অক্ষরে কার্যকর করতে গিয়ে জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তো। তাদের জীবনের প্রতিটি কর্মতৎপরতায় এগুলো ছিলো কার্যকর। শুধু চিন্তা গবেষণার মাঝেই এরা সীমাবদ্ধ থাকতো না।

এই বাক্য দ্বারা দ্বিতীয় আকাবার বায়য়াতের সময় আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা এই অর্থই বুঝেছিলেন। মোহাম্মদ বিন কাব আল কুরযী-এর বর্ণনা মতে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রসূলকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আপনার নিজের জন্যে ও আপনার মালিকের পক্ষে যে শর্তই আরোপ করতে চান– করতে পারেন। আল্লাহর নবী বললেন, আমি আমার মালিকের পক্ষ থেকে এই শর্তই আরোপ করতে চাই যে, তোমরা শুধু তাঁরই দাসত্ব করবে, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না এবং আমি আমার পক্ষ থেকে এই শর্তই আরোপ করবো যে, তোমরা যেমনি করে নিজেদের জান মালের হেফাযত করো, তেমনিভাবে আমারও প্রতিরক্ষা করবে। আবদুল্লাহ বললেন, আমরা যদি এ শর্ত মেনে চলি, তাহলে আমরা কি পাবো। নবী বললেন, জান্নাত। আবদুল্লাহ বললেন, এটা এক উত্তম ব্যবসা। আমরা নিজেরাও এটা প্রত্যাখ্যান করবো না এবং আপনার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান না করার আবেদন জানাবো। অতপর এ লোকেরা এই বেচাকেনার চুক্তিকে একটি পাকা পূর্ণাংগ ও লাভজনক ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এর থেকে পেছনে হটে যাওয়া না এতে কোনো রকমের অধিকার খাটানোর শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

জান্নাত এমন কোনো মূল্য নয় যে, যার শুধু ওয়াদাই করা হয়েছে। মূলত এটা ছিলো তাদের জন্যে নিশ্চিত পাওনা। এটা কি আল্লাহর ওয়াদা ছিলো না– এখানে কি ক্রেতা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নন? দাম-দস্তুর কি তিনি ঠিক করে দেননি। এই প্রতিশ্রুতি তিনটি কেতাবের মাধ্যমেও পেশ করা হয়েছে। এটা তার পাকা ওয়াদা– যার প্রতিপালন তিনি অবশ্যই করবেন। একই ওয়াদা করা হয়েছে তাওরাতে, ইনজীলে ও কোরআনে। আল্লাহর চাইতে কে বেশী ওয়াদা পালনকারী হতে পারে? হাঁ আসলেই আল্লাহর চাইতে কে বেশী ওয়াদার পাবন্দ হতে পারে? জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-র এ চুক্তি প্রতিটি মোমেনের ঘাড়েই একটি অনবদ্য বন্ধন হিসেবে হামেশাই কায়েম আছে। যেদিন থেকে মানব জাতির জন্যে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে এ দ্বীন তাদের দেয়া হয়েছে, যেদিন থেকে আল্লাহর নবী এ দুনিয়ায় এসেছেন, সেদিন থেকে এটা হচ্ছে আল্লাহর এক স্থায়ী সুন্নাত, একে বাদ দিয়ে এই যমীনে মানুষের জীবনের স্থায়িত্বকে চিন্তাই করা যায় না এবং তাকে বাদ দিলে জীবনের কখনো সংশোধনের সম্ভাবনা এগুতেই পারে না। 'যদি আল্লাহ তায়ালা একদল লোককে আরেক দল লোক দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে না দিতেন, তাহলে এ যমীন সত্যিই বিপর্যয়ে ভরে উঠতো।'

'যদি আল্লাহ তায়ালা একদল লোক দিয়ে আরেক দল লোককে ধ্বংস না করে দিতেন, তাহলে এ যমীনের গীর্জা, ধর্মীয় স্থান ও মসজিদসমূহ বিধ্বংস হয়ে যেতো– যেখানে আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করা হয়।

'হক' যা, তার একান্ত দাবী হচ্ছে তা স্বীয় পথে স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাবে। আবার এ কথাও অপরিহার্য যে, 'বাতিল' 'হকের' পথ রুখে দাঁড়াবে এবং তার কাছ থেকে তার পথকে ছিনিয়ে নেবে। মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে যাবার জন্যে দ্বীনকে এগিয়ে যেতেই হবে। যাতে করে সে আল্লাহর গোলামীকে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অপরদিকে 'তাগুত' শক্তির ক্ষেত্রে এটা অপরিহার্য যে তাগুত 'হকের' পথে বাধা হয়ে

দাঁড়াবে এবং হকের কাছ থেকে তার পথকে ছিনিয়ে নিতে চাইবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর এ যমীনে গোটা মানব সন্তানকে গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্যে একান্ত আযাদীর সাথে এগিয়ে যেতে হবে। 'হক' যা, তার দায়িত্বই হচ্ছে তা এভাবে আপন গতিতে এগিয়ে যাবে এবং এ ব্যাপারে কখনো কোনো অবহেলা দেখাবে না। যতোক্ষণ পর্যন্ত যমীনে বাতিলের রাস্তা খোলা থাকবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর যমীনে কুফরী ব্যবস্থা চালু থাকবে যতোক্ষণ পর্যন্ত এ যমীনে বাতিল নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখবে– সর্বোপরি যতোক্ষণ পর্যন্ত এ যমীনে মানবীয় মান-মর্যাদাকে অমানবিকতায় রূপান্তরের জন্যে মানুষের ওপর মানুষের এ গোলামী অব্যাহত থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত 'জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র এ কাজও অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে। একারণেই প্রতিটি মোমেনের ঘাড়ে এই বায়াতের যে চুক্তি বন্ধন রয়েছে তা তার কাছ থেকে পূরণ করার দাবী রাখে– নতুবা তার জন্যে ঈমানের দাবী অসার।

প্রিয় নবীর হাদীসের ভাষায়, 'যে ব্যক্তি জেহাদ করেনি, জেহাদের ইচ্ছাও মনে মনে পোষণ করেনি, সে যেন মোনাফেকীর কিছু অংশ নিয়েই মৃত্যুবরণ করলো।' (আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)।

'অতএব তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাও নিজেদের এ বেচাকেনার চুক্তিতে– যেটা তোমরা আল্লাহর সাথে সম্পাদন করেছো মূলত এ হচ্ছে এক মহান সাফল্য।'

তোমরা একারণে সন্তুষ্ট হয়ে যাও যে, তোমরা একান্ত নিষ্ঠার সাথে জানমাল আল্লাহর সমীপে পেশ করেছো এবং এর বিনিময়ে তাঁর কাছ থেকে তাঁর প্রতিশ্রুতি মতে জান্নাত গ্রহণ করেছো। কি তোমরা হারিয়েছো? যে মোমেন নিজের জানমাল আল্লাহর সামনে হাযির করেছে, সে কি আসলে কিছু হারিয়েছে? আল্লাহর কসম, সে কিছুই হারায়নি। জান! তাকে তো একদিন শেষ হতেই হবে, আর মাল, তাকেও তো একদিন নিঃশেষ হতে হবে। এ দুটোকে তুমি আল্লাহর পথে খরচ করো কিংবা আল্লাহর বিরুদ্ধে ব্যয় করো– উভয়টাই একদিন শেষ হয়ে যাবে। অপরদিকে জান্নাত এমন একটি অর্জনের নাম, যার সাথে কোনো কিছুরই তুলনা হয় না। তার কোনো বিনিময় বিকল্প নেই। অপরদিকে যে জিনিসের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা জান্নাত দিলেন তাতো শেষ হয়ে যাবেই, যেভাবেই খরচ করা হোক না কেন! মানুষ যখন আল্লাহর জন্যই বেঁচে থাকতে চায়, তখন তার মর্যাদা অনেক ওপরে উঠে যায়। যখন সে আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্যে– দ্বীনের প্রতিষ্ঠার জন্যে, সর্বোপরি মানুষের জন্যে একান্ত অবমাননাকর কাজ মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্যে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করবে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকেও তাকে নানারকম সাহায্য করা হবে। আবার যখন সে শহীদ হবে, তখন শহীদ হবে একান্ত ভাবে দ্বীনের জন্যে– যাতে করে সে একদিন এ কথার সাক্ষ্য দিতে পারে যে, তার জন্যে তার দ্বীন ছিলো তার জীবনের চাইতে বেশী প্রিয় এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এ অনুভূতি তার মধ্যে সদা জাগরূক থাকবে যে, সে যমীনের বহুবিধ বিধিবন্ধন থেকে অধিক অধিক শক্তিশালী– যমীনের ওপর সে কোনো বোঝা নয়– বরং তার মর্যাদা এখানে আরো অনেক ওপরে। ঈমানের মাঝে দিয়ে যাবতীয় বিপদ-মুসীবতে তাকে সাহায্য করা হয়, আকীদা বিশ্বাস জীবনের ওপর প্রাধান্য লাভ করে।

মূলত, কোনো রকম অর্জন থাকলে তাতো এই। এমন এক মহান অর্জন, যা মানুষের মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠা করে। আর এটা তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন মানবতাকে 'প্রয়োজনের' সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে দেয়া যাবে, ঈমানী পরীক্ষা নিরীক্ষা সে কামিয়াব হবে। আকীদা

বিশ্বাস জীবনের ওপর সে প্রাধান্য বিস্তার করবে। যখন এসব কিছুর ওপর জান্নাতকে যোগ করা হয়, তখন তা এমন এক ব্যবসায়ে পরিণত হয় যাকে সত্যিই সুসংবাদ হিসেবেই গণ্য করতে হবে এবং সুসংবাদের দিকেই তার দাওয়াত দেয়া হয়। এটা হচ্ছে এমন এক মহা সাফল্য– যাতে কোনো সন্দেহ নেই– নেই কোনো রকমের বিতর্ক।

এরশাদ হচ্ছে,

'অতপর তোমরা এমন এক বেচাকেনার সসংবাদ গ্রহণ করো, যা তোমরা আল্লাহর সাথে সম্পাদন করেছো– জেনে রেখো, এ হচ্ছে এক মহা সাফল্য।'

চলুন, কিছুক্ষণের জন্যে আমরা আল্লাহ তায়ালার এ আয়াতের সামনে একটু দাঁড়াই।

এই হচ্ছে আল্লাহর দায়িত্বে একটি সত্য ওয়াদা– এটা করা হয়েছে তাওরাতে, ইনজীলে ও কোরআনে। কোরআনে আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতির কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এতে কোনো রকম সন্দেহ নেই। কোরআনের এই ওয়াদা হচ্ছে অতি পরিচিত একটি ঘটনা। ইসলামী শিক্ষা মোতাবেক জেহাদের এই প্রতিফল একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা সময় ও কালের সীমাবদ্ধতার বাইরের বিষয়। মানুষের প্রতিটি দেশে প্রতিটি যুগে নিজেদের বাস্তব জীবনের মধ্যে সর্ব সময়ই–এর প্রয়োজন থাকে। এর কারণ হচ্ছে জাহেলিয়াত মূলত নিছক একটি মতাদর্শই নয় যে, তার মোকাবেলা আরেকটি মতাদর্শ দিয়ে করা যাবে, বরং তা হচ্ছে একটি বস্তুবাদী আন্দোলন– যার সম্পর্ক হচ্ছে এই বস্তুতান্ত্রিক জীবনের সাথে। এই জাহেলিয়াত এই বস্তুবাদী শক্তি নিয়েই আবির্ভূত হয় এবং একে নিয়েই সমাজে টিকে থাকার চেষ্টা করে। আর এভাবে যখন সে আল্লাহর দ্বীনের মোকাবেলা করে তখন তাকেও বস্তুবাদী শক্তি ও উপকরণ দিয়েই খতম করতে উদ্যত হয়। সে ইসলামের রাস্তা রুখে দাঁড়ায়। মানুষকে ইসলামের দাওয়াত শুনতে দেয় না। মানুষকে ইসলামের পাশে আসা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে। কেননা ইসলামই হচ্ছে এই বস্তুবাদী মতাদর্শের পথে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। ইসলাম বস্তুবাদিতার মূলকথা মানুষকে আরেক মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে চায়। এবস্তুবাদী একারণেই ইসলামকে টিকে থাকতে হলে তাকে জাহেলিয়াতের সাথে মোকাবেলা করতে হবে এবং তাকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করতে হবে। নতুবা ইসলামের আসল শিক্ষা কখনো অর্জিত হবে না।

ইসলাম এক আল্লাহর এবাদাত ও তার গোলামীর কথা বলে। অপরদিকে জাহেলিয়াত অসংখ্য মাবুদের আনুগত্য করে। যতোক্ষণ পর্যন্ত দেশ, রাষ্ট্র থেকে জাহেলিয়াতকে নিশ্চিহ্ন না করা হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের মূল উদ্দেশ্যই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অতএব কোরআনের দৃষ্টিতে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। আর এ পথে যারা বিপদ মুসীবত বরদাশ্‌ত করছে, তাদের জন্যে বহু ধরনের সফলতার ওয়াদা করা হয়েছে।

এবার তাওরাত ও ইনজীল আল্লাহর এই ওয়াদার প্রসংগ।

আজ যে তাওরাত, ইনজীল ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের হাতে আছে, সে সম্পর্কে এ কথা বলা মুশকিল যে, এগুলোই সে মৌলিক কেতাব যা নবীদের ওপর নাযিল হয়েছিলো। স্বয়ং ইয়াহুদী খৃষ্টানরাও এ কথা স্বীকার করে যে, এই কেতাবগুলোর মূল পাণ্ডুলিপি তাদের কাছে নেই। বর্তমানে তাদের হাতে যা আছে, তা আসল কেতাব নাযিলের অনেক পরে লেখা হয়েছে– মূল কেতাব তখন সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তাই আজ তাদের হাতে তাওরাত ইনজীলের আকারে যা কিছু আছে তার মধ্যে আল্লাহর শিক্ষার সামান্য কিছু অংশই মাত্র মওজুদ রয়েছে। অপর কথায় আল্লাহর মূল কেতাবের যা কিছু তখন তাদের মনে ছিলো তাই তারা একজন আরেকজনের কাছে শুনে লিখে

রেখেছে। এই কেতাবসমূহের মুখস্থ করারও বাকায়দা কোনো নিয়ম নীতি ছিলো না। যে ভাষায় এই কেতাব নাযিল হয়েছিলো তাও আজ বহুলাংশে বিলীন হয়ে গেছে। এতো কিছু সত্তেও প্রাচীন কেতাবসমূহে জেহাদের দিকে ইংগিত দিয়ে কথাবার্তা মওজুদ আছে। ইয়াহুদীদের বলা হয়েছে তাদের মূর্তিপূজক দুশমনদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে– যাতে করে আল্লাহর সত্যিকারের দ্বীনকে তারা হেফাযত করতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও মূল পাণ্ডুলিপিতে বিকৃতির কারণে 'জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' ও 'তাওহীদের' চেহারাই সেখানে পালটে গেছে।

অপরদিকে ইনজীল যা আজ তাদের হাতে আছে, তাতে জেহাদ সম্পর্কিত কোনো ইশারা ইংগীতও নেই। বর্তমানের ইনজীলসমূহ আসলেই এক একটা অর্থহীন কেতাব– যার কোনো বুনিয়াদই নেই, এদের মূল লেখকের নাম-পাত্তাও জানা নেই। অনেকাংশেই এগুলো হচেছ মূল কেতাবের কিছু কিছু অনুবাদ– যার মধ্যেও আবার কয়েক বছর পরপর পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়। বর্তমান খৃষ্টবাদ হচ্ছে এ ইনজীলসমূহেরই উৎপাদন। স্বয়ং খৃষ্টান গবেষকরাও স্বীকার করেন যে, এই ইনজীলে তা নয়– যা ঈসা মসীহর ওপর নাযিল করা হয়েছিলো (ইনজীল ছিলো একটি কেতাব আর এগুলোর সংখ্যা হচ্ছে ৪ যাতে আবার রয়েছে পারস্পরিক মতপার্থক্য। পঞ্চম ইনজীল যা সেন্ট বারনাবাস লিখেছিলেন, তা তুলনামূলকভাবে কিছু সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যাকে খৃষ্টান ধর্মযাজকরা বিনা কারণে প্রত্যাখ্যান করে রেখেছে)। তাছাড়া আল্লাহর নিজস্ব সাক্ষ্য প্রমাণেও এটা জানা যায় যে, এই কেতাবে তারা বহুবিধ বিকৃতি ঘটিয়ে রেখেছে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কোরআনে বলছেন, যারা আল্লাহর পথে জেহাদ করছে, যারা এই জেহাদ করতে গিয়ে অন্যদের হত্যা করছে, নিজেরা নিহত হচ্ছে, তাদের জন্যে জান্নাতের এই ওয়াদা রয়েছে। এর প্রমাণ রয়েছে তাওরাতে, ইনজীলে ও কোরআনে। অতএব তাই হচ্ছে অকাট্য ও চূড়ান্ত কথা। বর্তমানে এই ইহুদী খৃষ্টানদের হাতে যে কেতাব আছে, তাতে এই জেহাদের বিষয় উল্লেখ না থাকাই এটা প্রমাণ করে যে, এগুলো আসলেই কোনো আসল গ্রন্থ নয়। আসল গ্রন্থকে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বহু কিছুকে পরে তারা জুড়ে দিয়েছে। যেদিন থেকে দুনিয়ায় নবী আসা শুরু হয়েছে, যেদিন থেকে আল্লাহর দ্বীনের প্রবর্তন শুরু হয়েছে, সেদিন থেকেই জেহাদের এই বিধান মোমেনদের ঘাড়ে একটা অপরিহার্য করণীয় হিসেবে অব্যাহত ছিলো।

সত্যিকার মোমেনের পরিচয়

কিন্তু 'জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' শুধু ময়দানের সম্মুখ সমরের নামই নয়।তা হচ্ছে কতিপয় ঈমানী গুণাবলী, নৈতিক কর্মকান্ড ও ব্যবহারিক জীবনের কিছু গুণ বৈশিষ্ট্য। যারা আল্লাহর সাথে আনুগত্যের চুক্তি সম্পাদন করেছে, তারাই হচ্ছে মোমেন। যারা নিজেদের মাঝে ঈমানের এ গুণগুলোকে কার্যকর করেছে, তাদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে।তাওবাকারী, এবাদাতগুযার আল্লাহর প্রশংসাকারী, মোজাহেদ, রুকু আদায়কারী, সেজদা পালনকারী, নেকীর আদেশদাতা, অন্যায় থেকে প্রতিরোধকারী, আল্লাহর সীমা সরহদের সংরক্ষণকারী।

তাওবাকারীরা হচ্ছে সেসব লোক যারা বিগত গুনাহসমূহ থেকে ফিরে আসে। ক্ষমা চাইতে চাইতে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। তাওবার মানে হচ্ছে অতীতের ওপর লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা, সব রকমের না-ফরমানী থেকে ফিরে আসা। ভালো কাজ করা, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা, যাতে করে এটা বুঝা যায় যে, আসলেই এ ব্যক্তিটি তাওবা করেছে। তাওবার অর্থ পাক পবিত্রতা, পবিত্র থাকা ও ভালোর দিকে মনোনিবেশ করা। এবাদাতকারী ব্যক্তিরা হচ্ছে যারা এক আল্লাহর দিকে গোলামী ও গোলামীসুলভ আচরণ

নিয়ে মনোনিবেশ করে, তার পূর্ণাংগ মালিকানা স্বীকার করে। এই বিশ্বাস তাদের অন্তরে এমনভাবে জাগরূক থাকবে যেন সমস্ত অংগ প্রত্যংগ এর সাক্ষী দিচ্ছে। তাদের প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি আনুগত্যে তা প্রমাণ দেবে। অতপর তাদের এই ঘোষণায় স্বীকৃতি দিতে হবে যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তাদের মাবুদ, তাদের মালিক। বাস্তব জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করতে না পারলে এই দাবীর কোনোই অর্থ নেই।

আল্লাহর প্রশংসাকারী তারা– যাদের জন্য আল্লাহর অসীম নোয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করতে গিয়ে বিনায়বনত হয়। ভালো খারাপ উভয় অবস্থায়ই তাদের মুখ আল্লাহর প্রশংসায় থাকে পঞ্চমুখ, ভালো অবস্থায় আল্লাহর দানের শোকর আদায় করে, খারাপ অবস্থায় ধৈর্যধারণ করে। প্রশংসা শুধু ভালো সময়ের জন্যেই নয়, খারাপ সময় কিংবা বিপদ মুসীবত পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় ধৈর্যধারণ করে। মোমেন এ কথা ভালো করেই জানে যে, বিপদ মুসীবত, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আল্লাহর তরফ থেকেই আসে। এতে কোনো না কোনো মংগল অবশ্যই নিহিত আছে। হতে পারে আমি তা জানি না কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তো জানেন।

অতপর যে গুণটি (সায়েহুনা) বলা হয়েছে তার সম্পর্কে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন, এর মানে হচ্ছে মোহাযের, কেউ বলেন মোজাহেদ, আবার কেউ বলেন– যারা দ্বীনী ইলমের সন্ধানে বের হয় তাদেরকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কেউ আবার বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে রোযাদার। আমি মনে করি এর অর্থ হচ্ছে সে সব লোক, যারা আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র্য নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে। যেমন কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে,

'অবশ্যই এই আসমানসমূহ যমীনের সৃষ্টির মাঝে রাত ও দিনের বিবর্তনের সে সব জ্ঞানবান মানুষের জন্যে নিদর্শন রয়েছে– যারা দাঁড়িয়ে বসে পাশে শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, তারা আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি নিয়েও চিন্তা গবেষণা করে (এবং বলে) হে আমাদের মালিক, তুমি এর কোনোটাই অযথা সৃষ্টি করোনি।'

অতএব আল্লাহর এবাদাত, আল্লাহর প্রশংসা– আল্লাহর কাছে তাওবা করার বর্ণনার সাথে এই অর্থই এখানে বেশী মানানসই–কেননা এর পরই মোমেনদের আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের সুযোগ হয়। তার সৃষ্টির মাঝে সে তার মহান সৃষ্টি কুশল অনুভব করতে পারে, সে সত্য সম্পর্কেও সজাগ হতে পারে যার ওপর গোটা সৃষ্টি দাঁড়িয়ে আছে, এর অর্থ নিছক চিন্তা দর্শনের অনুভূতিই নয়, বরং এ হচ্ছে মানুষ গোটা জীবনভর আল্লাহর এই বিশাল সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করবে এবং এরই বাস্তব কাঠামোর ওপর নিজের জীবনের ভিত্তিমূল দাঁড় করিয়ে নেবে।

রুকুকারী সেজদা প্রদানকারী দ্বারা ওদের বুঝানো হয়েছে, যারা নামায কায়েম করে এবং নামাযের ওপর নিজেরাও কায়েম হয়ে যায়। অর্থাৎ এ যেন তাদের একটি প্রমাণিত গুণ, যেন রুকু-সেজদা তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য– যা তাদের অন্য মানুষদের থেকে আলাদা করে রেখেছে।

ভালো কাজের আদেশ প্রদানকারী ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার লোক দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যখন ইসলামী সমাজ আল্লাহর শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন এই সমাজ ও সমাজের লোকেরা শুধু আল্লাহরই ফরমা'বরদার হবে, অন্য কোনো তৃতীয় শক্তির মুখাপেক্ষী হবে না তখন। ভালো কাজের আদেশ, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা' এ সমাজের অংগে পরিণত হয়ে যাবে। তখন মোমেনদের কাজ হবে সমাজের অভ্যন্তরীণ ত্রুটি, বিকৃতি ও বিচ্যুতির সাথে সাথেই নিরাময় করতে থাকবে। কিন্তু যে সময় যমীনে কোনো ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে না অপর কথায় দুনিয়ার বুকে এমন কোনো জনসমষ্টি কিংবা সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকবে না যাকে ইসলামী বলা

যায়, যেখানে আল্লাহর শরীয়তের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব মওজুদ থাকবে। তেমন অবস্থায় ভালো কাজের আদেশ দেয়ার সব চাইতে বড়ো লক্ষ্য হবে সবচাইতে উৎকৃষ্ট কাজের প্রতি লক্ষ্য দেয়া অর্থাৎ প্রথমত আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব যমীনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তারপর তার ওপর ভিত্তি করে একটি সঠিক ইসলামী সমাজ গড়ে তুলতে হবে। অপরদিকে 'মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা'র বিষয়টিকে সবচাইতে নিকৃষ্ট মন্দ কাজ– অর্থাৎ আল্লাহ বিদ্রোহী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া অন্য কোনো কিছুর আইন ও ফায়সালা মেনে নিয়ে মানুষদের অন্য কারো গোলামী থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যারা মোহাম্মদ (স.)-এর ওপর ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জেহাদ করেছে এমন একটি ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিস্থাপন করেছে। যেখানে আল্লাহর শরীয়ত ছিলো একমাত্র আইন। এমন একটি মুসলমান জনসমষ্টি স্থাপন করেছিলো, যেখানে আল্লাহর শরীয়তেরই বিধান চলতো। অতপর যখন একদিন তাদের এই উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেলো, তখন তারা সে সব শাখা-প্রশাখার ব্যাপারে– যার সম্পর্ক আনুগত্য ও গুনাহের কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, ভালো কাজের আদেশ দিতো এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতো। যতোক্ষণ পর্যন্ত এই মৌলিক বিষয়টি, যার নাম আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা– কার্যকর না হয়েছে তারা শাখা-প্রশাখার দিকে মনোনিবেশ করেননি। তাছাড়া এটাও একান্ত জরুরী যে, 'ভালো কাজের আদেশ দেয়া ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা'র সত্যিকার অর্থ অবস্থার বাস্তবতা থেকে জানতে হবে। অতএব প্রথম দিকে শাখা প্রশাখার 'ভালো কাজের আদেশ' দেয়া যাবে না। আবার শাখা প্রশাখার 'মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা'ও যাবে না। যতোক্ষণ পর্যন্ত সমাজে ও রাষ্ট্রে আসল 'ভালো কাজটির' প্রতিষ্ঠা না হবে এবং আসল 'মন্দ কাজ'টি নিশ্চিহ্ন না হবে। আর সে আসল কাজ হচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ বিরোধী শক্তির নির্মূল সাধন করা– এই আসল 'ভালো মন্দের' প্রতিষ্ঠা ও নির্মূল না হলে ছোটখাটো 'ভালো কাজ' যেমন কোনো কাজে আসে না, তেমনি ছোটখাটো মন্দ কাজও সমাজকে বিধ্বংস করে দেয় না। মুসলমানদের প্রথম জনসমষ্টি তথা সমাজ গঠনের সময় এ নিয়মই সেখানে প্রচলিত ছিলো।

আল্লাহর সীমারেখা তথা আল্লাহর আদেশ নিষেধসমূহের ওপর নিজেরাও আমল করতো, অন্যদের ওপরও এ বিধানসমূহ কার্যকর করতো যারা আল্লাহর এ সীমারেখাকে বিনষ্ট করতো, লংঘন করতো, তারা তাদেরও প্রতিরোধ করতো। কিন্তু আল্লাহর 'এসব সীমারেখা' ও 'আমর বিল মারূফ ও নিহী আনিল মোনকার' শুধু এমন একটি সমাজেই কায়েম করা যেতে পারে যেখানকার মানুষ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে একটি মুসলিম জনসমষ্টি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। অতপর সে সমাজেই 'আল্লাহর দণ্ডবিধি'গুলো কায়েম করা যেতে পারে, যে সমাজে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর মালিকানা ও আল্লাহর আইন ও আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া অন্যকিছুই চলতে পারে না। যে সমাজ আল্লাহ ও তাঁর বিরোধী সব শক্তিকে নির্মূল করে তার ভিত্তিমূল আসল তাগুতকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। সে সমাজেই এই 'হুদুদুল্লাহ' তথা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম হতে পারে। মুসলমানদের আদেশ দেয়া হয়েছে আগে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে একটা সমাজের ভিত্তি স্থাপন করার৷ তা একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেই সেখানে আল্লাহর অন্যান্য আদেশ-নিষেধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

এই হচ্ছে সেই মোমেনের দল যাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা আনুগত্যের চুক্তি সম্পাদন করেছেন। এই হচ্ছে তাদের কিছু স্বতন্ত্র্য গুণাবলী– খাঁটি তাওবা এটা বান্দাকে আল্লাহর সমীপে নিয়ে আসে, তাকে গুনাহ থেকে রক্ষা করে এবং নেক কাজের দিকে উৎসাহ দেয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এবাদাত– যা তাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে, যার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে স্বয়ং আল্লাহর সন্তুষ্টি।

ভালো খারাপ উভয় অবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করে। আর এটা হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছার সামনে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার ওপর একান্তভাবে ভরসা করারই অপরিহার্য পরিণাম।

আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনের মাধ্যমে গোটা সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা, এমন সব নিদর্শন যা আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের সত্যতা সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করে।

নিজের জীবনে এবং অন্য মানুষদের জীবনে ভালো কাজের আদেশ দেয়া ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার এ নীতিমালাকে কার্যকর করা।

আল্লাহর সীমারেখাসমূহের সংরক্ষণ করার দাবী হচ্ছে যারা এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে– যারা একে বিনষ্ট করে তাদের এই বাড়াবাড়ির কাজ করা থেকে তারা বিরত রাখবে। অতএব এই হচ্ছে সেই মোমেনদের দল, যাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের এই চুক্তি করেছেন। তাদের কাছ থেকে তিনি জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান মালকে কিনে নিয়েছেন। যেদিন থেকে দুনিয়ার জীবন বিধান হিসেবে মানুষদের কাছে দ্বীন এসেছে যেদিন থেকে মানুষের কাছে নবী ও নবুয়ত আসতে শুরু করেছে। সেদিন থেকেই এই নিয়মও চলে আসছে যে, মোমেন আল্লাহর পথে আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করার জন্যে জেহাদ করবে। যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখাকে লংঘন করবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। হক ও বাতিলের, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের এক দীর্ঘ দ্বন্দ্ব, আল্লাহর আইন ও আল্লাহর বিরোধী আইন, হেদায়াত ও গোমরাহীর এ সংঘর্ষে হামেশাই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের কাছ থেকে তাদের জানমালকে জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নেয়ার এই চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছেন। জীবন কোনো হাসি তামাশার বিষয় নয়, জন্তু-জানোয়ারের মতো জীবন কোনো উদরপূর্তির বিষয়ও নয়, নিতান্ত দায়িত্বহীনভাবে সময় কাটানো– অপমান ও লাঞ্ছনা নিয়ে নামকাওয়াস্তে একটা নিরাপত্তা লাভ করা, অবহেলা ও আরামে সময় কাটানোর নামও জীবন নয়। জীবন হচ্ছে তা, যা হামেশা অন্যায় অসত্যের মোকাবেলা করবে, আল্লাহর পথে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে, আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার প্রাণান্তকর যুদ্ধে শহীদ হয়ে যাবে, তারপর আসবে চূড়ান্ত সাফল্য জান্নাত ও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি।

এই হচ্ছে সে জীবন যার দিকে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের এই বলে ডাকছেন, 'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তোমাদের এমন এক বিষয়ের দিকে তিনি ডাক দেন, যাতে জীবনের উপকরণ রয়েছে।'

ঈমানই হচ্ছে সকল সম্পর্কের ভিত্তি

যে সব মোমেনের কাছ থেকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান মাল খরিদ করে নিয়েছেন, তারা সবাই একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। এই অভিন্ন আকীদা বিশ্বাসই তাদের একজনকে আরেক জনের সাথে জুড়ে রেখেছে। এই সূরা মুসলিম দল ও তাদের বিপরীত দলের সম্পর্কের ব্যাপারে কতোগুলো কঠোর বিধান জারী করেছে, বিপরীত দল হচ্ছে যারা এই আকীদা বিশ্বাসকে গ্রহণ করেনি।

মক্কা বিজয়ের পর ইসলামী জামায়াতে যে অলসতার কিছু লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়েছিলো আবার এই একই সময়ে অসংখ্য নতুন নতুন দল ইসলাম গ্রহণ করেছিলো– যারা তখনো নিজেদের

জীবনকে পুরোপুরি ইসলামের রঙে রংগীন করতে পারেনি, তাদের মধ্যে তখনো আত্মীয়তার সম্পর্কটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে অবশিষ্ট থাকলো। এ সম্পর্কেই পরবর্তী আয়াতে কিছু নির্দেশ জারী করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ইতিপূর্বে যারা জান্নাতের বিনিময়ে নিজেদের জানমাল আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেয়ার চুক্তি করেছে, আবার যারা কখনো এই আকীদা বিশ্বাসে শামিল হয়নি, তাদের মধ্যে সমস্ত রকমের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলো, তারা যতোই তাদের নিকটাত্মীয় হোক না কেন। কেননা এই উভয় দলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভিন্নমুখী, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই এদের উভয়ের গন্তব্যস্থল ভিন্ন। বলা হয়েছে, (আয়াত ১১৩-১১৪)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে বাহ্যিকভাবে দেখা যাচ্ছিলো কিছু কিছু মুসলমান নিজেদের মোশরেক পিতামাতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করতেন। তারা আল্লাহর নবীকেও অনুরোধ করতো যেন তিনিও তাদের হয়ে আল্লাহর কাছে তাদের মোশরেক মাতাপিতার জন্যে দোয়া করেন। অতপর এই আয়াত নাযিল হয়। তাতে পরিষ্কার করে একথাটা বলে দেয়া হয় যে, এসব গোনাহ মাফ চাওয়ার মধ্যে রক্তের সম্পর্কের কোনোই স্থান নেই। আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে একে আল্লাহর জন্যে সম্পর্ক বলা যায় না। তাই আল্লাহর নবী ও তাঁর সাথী মোমেনদের জন্যে এটা কোনোক্রমেই বৈধ নয় যে, তারা এমনটি করবে, কোনো অবস্থায়ই যেন তারা এটা না করে, তাদের জন্যে এটা শোভনীয়ও নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তারা এটা জানবে যে, তাদের পিতা মাতারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, এই সিদ্ধান্ত তাদের 'মৃত্যু' দিয়েই বুঝে নিতে হবে– যদি তাদের শেরেকের ওপর মৃত্যু হয়, তাহলে তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সে অবস্থায় এই আশাও নিঃশেষ হয়ে গেলো যে, তারা কখনো নাজাতের পথ পাবে।

মূলত এই আকীদা বিশ্বাসই হচ্ছে সেই মূল বিষয় যার মাধ্যমে একজন মানুষের সাথে আরেক জন মানুষের সম্পর্ক নির্ণিত হয়। মূলে যদি আকীদা বিশ্বাসের এই বীজ স্থাপিত হয়, তাহলে তার ওপর অন্য সব কয়টি সম্পর্কই দাঁড়াতে পারে। বীজ থেকে আস্তে আস্তে সব ধরনের সম্পর্ক অংকুরিত হতে থাকে। অতপর সেখানে আর কোনো বংশের সম্পর্ক থাকে না, থাকে না কোনো গোত্রের, জাতির ও ভৌগোলিক সীমা-সরহদের, এগুলো তখন সবই নিঃশেষ হয়ে যায়। হ্যাঁ, একবার যদি ঈমানের ও আকীদার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়, তাহলে তার অধীনে অন্যান্য সব মানবীয় সম্পর্কই স্থাপিত হতে পারে, আর যদি এই ঈমানের সম্পর্কই প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে মানবীয় সম্পর্কের অন্য কোনো কিছুই এমন নেই যা একজন মানুষকে আরেক জন মানুষের সাথে জুড়ে রাখতে পারে।

বলা হয়েছে, (আয়াত ১১৫)

অতএব ইবরাহীমের স্বীয় পিতার জন্যে আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাওয়ার বিষয়কে প্রমাণ হিসেবে একটি অনুকরণযোগ্য ঘটনা হিসেবে পেশ করার কারোই উপায় নেই। কেননা ইবরাহীমের মাফ চাওয়ার ঘটনাটি ছিলো ভিন্ন একটি কারণে। ইবরাহীম মনে করেছিলেন, এভাবে মাফ চাওয়ার কারণে হয়তো তার ঈমান নসীব হবে এবং আল্লাহ তায়ালা হয়তো তাকে এই দোয়ার ফলে হেদায়াত দান করবেন। কেননা পিতার সাথে ইবরাহীমের এমন একটি ওয়াদা ছিলো–

'তোমার ওপর সালাম বর্ষিত হোক, আমি অচিরেই তোমার জন্যে আমার মালিকের দুয়ারে ক্ষমা চাইবো। কেননা তিনি আমার ওপর একান্ত মেহেরবান। আমি তোমার কাছ থেকে, তোমার

মাবুদদের কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিচ্ছি– যাদের তোমরা আল্লাহর বদলে পূজা করছো, (১) এবং আমি আমার মালিকের দরবারে দোয়া করবো। আশা করা যায় আমি আমার মালিকের কাছে দোয়া করা থেকে নিরাশ হবো না।'

কিন্তু যখন ইবরাহীমের পিতা শেরেকের ওপরই মরে গেলো এবং এটা ইবরাহীমের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, সে ছিলো আল্লাহর দুশমন, হেদায়াপ্রাপ্তির আর কোনো সুযোগ সম্ভাবনাই বাকী নেই, তখন সে ও তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলো তার সাথে যাবতীয় সম্পর্কচ্ছেদ করে নিলো।

'অবশ্যই ইবরাহীম ছিলো এক বিনয়াবনত ও পরম ধৈর্যশীল ব্যক্তি।'

ইবরাহীম আল্লাহর দরবারে ছিলো একান্ত বিনয়াবনত। যারা তাকে কষ্ট দিয়েছে তাদের জন্যে ছিলো কঠোর ধৈর্যশীল। তার পিতা তাকে কষ্ট দিয়েছে কিন্তু সে ছিলো ধৈর্যশীল। অতপর যখন কাফের হিসেবে তার মৃত্যুর ফলে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, আসলেই সে ছিলো আল্লাহর দুশমন, তখন সাথে সাথে তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলো এবং পুনরায় আল্লাহর কাছে বিনয়ী হয়ে গেলো।

হাদীসের বর্ণনা মতে জানা যায় যে, যখন ওপরের এই আয়াত দুটো নাযিল হলো, তখন মুসলমানদের মাঝে যারা নিজ নিজ মোশরেক পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দোয়া করতো, তারা ভয় পেয়ে গেলো। তাদের আশংকা হলো যে, এই কাজের দ্বারা আবার গোমরাহ হতে যায়নি তো! কেননা তারা আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করেছে– তাদের এই মানসিক অবস্থার ওপরই পরবর্তী আয়াতটি নাযিল হয়েছে। (আয়াত ১১৫)

এ ব্যাপারে তাদের সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে ইসলামের এই নীতিও বর্ণনা করা হয়েছে যে, সরাসরি শরীয়তের কোনো আদেশের বরখেলাফ না করা হলে তার জন্যে শাস্তির নিয়ম নেই এবং আগে বলে না দেয়া কোনো কাজের ওপরও কোনো রকম পাকড়াও হয় না।

'আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে, কোনো সম্প্রদায়কে একবার হেদায়াত দান করার পর পুনরায় তাদের গোমরাহ করে দেবেন। যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের তিনি এ কথা পরিষ্কার করে বলে না দেবেন যে, তাদের কোন কোন বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সবকিছু সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।'

আল্লাহ তায়ালা সে সব কিছুর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। যেগুলোর ব্যাপারে তাকে আগে ভাগেই কিছু বলে দেয়া হয়নি। অমুক কাজটি তোমার করতে হবে, অমুক কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে, আবার অমুক কাজটি গুরুত্ব সহকারে আঞ্জাম দিতে হবে। এটা পূর্বে না বলে দিয়ে তিনি কখনো কাউকে সে কাজের জন্যে আযাব দেন না। এটা এ কারণে যে, মানুষের জ্ঞান সীমিত ও ক্ষুদ্র। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই জানেন। কোনো কথা বলে দেয়া ও তার ভেতরের রহস্য বর্ণনা করা তো তাঁরই কাজ।

আল্লাহ তায়ালা এই দ্বীনকে আসান বানিয়েছেন, কঠিন বানাননি। যা কিছু থেকে তিনি নিষেধ করেছেন তাকে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। আবার যা কিছু করতে বলেছেন তাও পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। আবার কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো স্পষ্ট করে বলে দেননি যে, সে ব্যাপারে কী করতে হবে, (এটা এ জন্যে নয় যে আল্লাহ তায়ালা তা বলতে ভুলে গেছেন। মূলত তার পেছনে রয়েছে একটি হেকমত ও কোনো কিছুকে সহজ করার উদ্দেশ্য,) যে সব ব্যাপারে তিনি

(১) দেখুন এই লেখকের গ্রন্থ 'মায়ালিম ফিততারীক্ব

নীরবতা দেখিয়েছেন, সে সব ব্যাপারে খামাখা গায়ে পড়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও তিনি মানা করেছেন কেননা অনেক সময় জিজ্ঞেস করার কারণেও বিষয় কঠিন হয়ে পড়ে (এ পর্যায়ে বনী ইসরাঈলের গাভী কোরবানীর বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য)। অতএব যে সব বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা কোনো আদেশ নিষেধ জারী না করে নীরবতা পালন করেছেন, সে ব্যাপারগুলোকে হারাম ঘোষণা করার কারোর অধিকার নেই। কিংবা যেগুলো আল্লাহ তায়ালা বলেননি, তা থেকে নিজেরা বিরত থাকবে অথবা অন্যদের বিরত রাখবে, এই সমগ্র কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বান্দাহদের ওপর আল্লাহর রহমত ও দয়া প্রমাণ করা।

রক্ত, বংশ ও গোত্রীয় সম্পর্কের উর্ধে উঠা এবং জান মালকে আল্লাহর আদেশের সামনে গুরুত্ব না দেয়ার এই বিধান বর্ণনা করার পর পরবর্তী (আয়াত ১১৬) আয়াতে বলা হয়েছে যে, সাহায্যকারী বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা– বিশ্ব চরাচরের মালিক ও হায়াত মওতের একচ্ছত্র মালিক তিনি।

'নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা– তাঁর জন্যেই যাবতীয় আসমান ও যমীনের বাদশাহী, তিনিই জীবন দেন। তিনিই মৃত্যু দান করেন। আর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের আর কোনো পৃষ্ঠপোষক বা বন্ধু নেই।'

অতএব সম্পদ ও জীবন, আসমান ও যমীন, জীবন ও মৃত্যু, বন্ধুত্ব ও সাহায্য–এর সবকিছুই আল্লাহর হাতে, আর কারো হাতে নয়। যাবতীয় প্রাপ্তি ও সম্পদের সমাহার একমাত্র তাঁর সাথে সম্পর্ক জোড়ার ওপরই নির্ভর করে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও আত্মীয়তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখানে অত্যন্ত খোলাখুলি বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সে সময়ে সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষের মনে এ সব সম্পর্কের ব্যাপারে যে বিষয়গুলো লুকিয়ে ছিলো এবং এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে যে উদ্বেগ বিরাজ করছিলো, সে ব্যাপারেও সুস্পষ্ট বিধান ঘোষণা করা হয়েছে। আসলে এমন ধরনের চূড়ান্ত হুকুম নাযিল হওয়া জরুরী ছিলো। এই সূরার মাঝে মুসলিম সমাজের সাথে তাদের আশেপাশের মানুষদের সম্পর্ককে বিশেষ এক স্তরে রেখে বিচার করা হয়েছে– এমনকি মৃত মোশরেক আত্মীয়স্বজনদের জন্যে দোয়া করতেও তাদের নিষেধ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিলো একটাই এবং তা হচ্ছে ইসলামের বন্ধন ছাড়া পারস্পরিক সম্পর্কের আর দ্বিতীয় কোনো সেতুবন্ধ রচনা না করা এবং অন্য যাবতীয় সম্পর্কের ধারণা থেকে নিজেদের মনকে পবিত্র করা। ইসলামী আন্দোলনের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে এ কথার ওপর যে, যাবতীয় জামায়াতী যিন্দেগী ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি হবে একমাত্র ইসলামী আকীদা বিশ্বাস। আকীদা বিশ্বাসের সব কয়টি নীতিমালার মাঝেও এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাবতীয় চেষ্টা সাধনা আন্দোলন সংগঠনের নীতিমালারও এটি একটি অন্যতম নীতি। এটাই হচ্ছে মৌলিক বক্তব্য, যা এখানে শেষ ও চূড়ান্ত বক্তব্য হিসেবে বারবার পেশ হয়েছে।

তবুক যুদ্ধের বিস্তারিত আলোচনা

ঈমানের ব্যাপারে বাইয়াতের এই চুক্তির গুরুত্ব বর্ণনা করার পর এখানে বলা হচ্ছে যে, এই ধরনের একটি চুক্তির দাবীই হচ্ছে একজন সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া থেকে পেছনে পড়ে থাকা তা যে কোনো কারণেই হোক একটা বড়ো ধরনের অপরাধ। সেই নির্দিষ্ট যুদ্ধে যা কিছু সংঘটিত হয়েছিলো কিছু লোকের পেছনে পড়ে থাকা কিছু লোকের দ্বিধা সংকোচ, তা মোটামুটি সবার জানা ছিলো বলে আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টিকে এ ভাবে গুরুত্ব দিয়ে পেশ করেছেন। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজের রহমত ও দয়ার মাধ্যমে এসব একনিষ্ঠ

মোমেনের দিকে দৃষ্টিপাত করছেন। তাদের মাঝে যে দ্বিধা সংকোচ ও পেছনে পড়ে থাকার সমস্যা দেখা দিয়ে ছিলো আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করার কথা ঘোষণা করছেন, তা বড়ো হোক কিংবা ছোট। এভাবে সে তিন ব্যক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো, যাদের ব্যাপারটি আগে মূলতবী করে রাখা হয়েছিলো। এরা হচ্ছে সে সব ব্যক্তি, যারা আল্লাহর রহমতের আশায় তাঁর একটা অনুগ্রহমূলক সিদ্ধান্ত পাবার অপেক্ষা করছিলো, বেশ কিছুকাল সময় অপেক্ষা করার পর তাদের ব্যাপারে এখানে সিদ্ধান্ত দেয়া হলো। (আয়াত নং ১১৬-১১৭)

নবীর প্রতি তাওবা শব্দের ব্যবহার দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট যুদ্ধের (তাবুক) ঘটনায় যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, সে ব্যাপারে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন বুঝানো হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এ আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে আগের আয়াতের সাথে- যেখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মাফ করো দিন! তুমি কেন তাদের (যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি দিলে? যতোক্ষণ না তুমি সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীদের ভালো করে চিনে না নেবে।'

এটা তখনকার ঘটনা, যখন কিছু অর্থশালী মোনাফেক ছোটখাটো ওযর আপত্তি পেশ করে নবীর কাছে অনুমতি চাইলো। নবী নিজের মহানুভবতা ও ধৈর্যশীলতার কারণে তাদের অনুমতি দিয়ে দিলেন। এটা ছিলো তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত (এজতেহাদ) এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে এ জন্যে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে একটু সতর্ক করে দিয়ে বললেন, তাদের অনুমতি না দিলেই ভালো হতো। এতে করে সঠিক ওযর যাদের ছিলো তাদের সাথে মিথ্যা ওজুহাত পেশকারী মোনাফেকদের চিনে নেয়া যেতো এবং গোটা ব্যাপারটি বেশ কিছুদিন যাবত এভাবে ঝুলে থাকতো না।

মোহাজের ও আনসারদের প্রতি তাওবা দ্বারা সম্ভবত তাদের কথাই বুঝানো হয়েছে, যাদের কথা পরবর্তী আয়াতে এ ভাবে বলা হয়েছে,

'যারা একান্ত কঠিন সময়ে তার আনুগত্য করেছে, এমনকি তাদের একটি ছোট দলের চিন্তা বাঁকা পথে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো।'

এদের মধ্যে কিছু লোক জেহাদের জন্যে বাইরের কোনো দেশের সফরকে নিজেদের জন্যে কঠিন মনে কর ছিলো। তারপরও তারা এক পর্যায়ে মূল বাহিনীর সাথে যোগ দিলো- একটু পরেই আমি এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আসলে এরা ছিলো নিষ্ঠাবান মোমেন। আবার কিছু লোক যারা মোনাফেকদের কথা শুনলো, যারা এ কথা বলে ভয় দেখালো যে, রোমানদের মোকাবেলা করতে যেয়ো না। কিছু লোকের ওপর এর কিছু প্রভাবও পড়েছে। অবশ্য পরে আল্লাহ তায়ালা তাদের মনে স্থিতি এনে দিলেন। এভাবে তাদের দ্বিধাও আস্তে আস্তে কেটে যেতে লাগলো।

এখানে আল্লাহ তায়ালা এ যুদ্ধকে একটি কঠিন সময় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাই আমি এখানে সে সময় কালীন কিছু ঘটনা ও অবস্থা পেশ করতে চাই। এই সংক্ষিপ্তসার আমি 'সীরাতে ইবনে হিশাম', 'এমতায়িল আসমা মাকরেজী', ইবনে কাসীরের 'বেদায়াহ ও নেহায়াহ্ ও তাফসীরে ইবনে কাসীর' থেকে উদ্ধৃত করছি, যাতে করে তখনকার ঘটনা, তার প্রভাব ও পরিণাম সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করা যায়।

'যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না, যারা পরকালের ওপর ঈমান আনে না, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু হারাম করেছেন তাকে যারা হারাম মনে করে না, আহলে কেতাবদের মাঝে যারা এই

খাঁটি দ্বীনকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করো, যতোক্ষণ না তারা অপমানিত হয়ে জিযিয়া (করো) দিতে বাধ্য হয়।'

কোরআনের এ আয়াতটি নাযিল হবার পর আল্লাহর নবী সাহাবীদের যুদ্ধের প্রস্তুতির আদেশ দিলেন। (এখানে মনে রাখা দরকার যে, রোমানদের সাথে 'মুতার' যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো এই আয়াত নাযিলের আগে। বর্তমানে যে আদেশটি নাযিল হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরআনের শেষের দিকের সূরাতেও এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত আদেশটি বলে দেয়া) যে সময় রসূল আদেশটি দিলেন, তখন মানুষদের কিছুটা অভাবের সময় ছিলো, প্রচন্ড গরমের মওসুম ছিলো, দেশে দুর্ভিক্ষের ছিলো লক্ষণ। মানুষের সার্বিক অবস্থা ছিলো খুবই খারাপ। অপরদিকে গাছে গাছে ফল পাকতে শুরু করেছিলো। মানুষরা ফলবতী গাছের ছায়ায় বসে ফল খেতে এবং আরাম করতে চাইছিলো। এর আগে রসূলুল্লাহ (স.) কোনো যুদ্ধের জন্যে যখন মদীনার বাইরে যেতেন তখন তিনি যুদ্ধের সম্পূর্ণ নতুন এক কৌশল হিসেবে একটা ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। যেদিকে তাঁর যাওয়ার উদ্দেশ্য থাকতো, তিনি সম্পূর্ণ উল্টো দিকে বের হতেন। কিন্তু তবুকের যুদ্ধের ব্যাপারটা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই যুদ্ধে যোগদান করা প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে ছিলো ফরযে আইন, আল্লাহর নির্দেশিত ফরয। একদিকে খবর এলো যে, দুশমন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানায় চলে এসেছে। এ অবস্থায় রসূল (স.) স্পষ্টত লোকদের বলে দিলেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সিরিয়ার সীমান্ত, যাতে করে মানুষদের মনে কোনো ভুল বুঝাবুঝি না থাকে। সবাই যেন গন্তব্যস্থল মোতাবেক নিজেদের প্রস্তুতি নিতে পারে। যাত্রা ছিলো সুদীর্ঘ, সময়টা ছিলো বড়ো খারাপ। দুশমনদের সংখ্যা ও অস্ত্রবল ছিলো বিপুল। সাধারণ মুসলমানদের কাছে এই গোটা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দেয়ার দরকার ছিলো। আল্লাহর রসূল সবার সামনে বলে দিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

একজন মোনাফেক যুদ্ধে না যাওয়ার জন্যে তাঁর কাছে এসে এই বলে অনুমতি চাইলো, আমি বড়ো প্রেমিক মনা মানুষ। শুনেছি, রোমান মহিলারা খুব সুন্দরী। আমার আশংকা হচ্ছে আমি হয়তো তাদের দেখে কোনো মুসীবতে পড়ে যাবো। আল্লাহর নবী তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। সাথে সাথেই আল্লাহ তায়ালা ধমকের সুরে আয়াত নাযিল করলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করুন, কেন তুমি তাদের অনুমতি দিলে, যতোক্ষণ না তোমার কাছে এ কথাটা পরিষ্কার হয়ে যায়, কারা এই ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী।'

মোনাফেকদের আরেক দল নিজেদের মধ্যে একজন আরেকজনকে বললো, এই গরমে তোমরা বের হয়ো না। আসলে এরা জেহাদে যেতে চাই ছিলো না। সত্যের ওপর তাদের সন্দেহ ছিলো, সর্বোপরি তারা রসুলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিলো। তখন আল্লাহর আয়াত নাযিল হলো

'এবং তারা বললো, তোমরা গরমে বের হয়ো না। তুমি তাদের বলো, জাহান্নামের আগুন তো এর চেয়ে অনেক বেশী কষ্টকর। কতো ভালো হতো, যদি তারা এই বিষয়টি বুঝতে পারতো! অতএব, তাদের কম হাসা উচিত, নতুবা পরিণামে তাদের বেশী কাঁদতে হবে। এখানে যা করবে পরকালে সেই বিনিময় তারা পাবে।'

রসূলুল্লাহর কাছে একবার খবর এলো যে, কিছু সংখ্যক মোনাফেক সুয়ায়লাম নামক ইহুদীর ঘরে বৈঠকে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত করেছে যে, মানুষকে তাবুকের যুদ্ধে যাওয়া থেকে নিষেধ করতে হবে। রসূল (স.) তালহা বিন ওবায়দুল্লাহর নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে পাঠালেন। তাদের আদেশ

দিলেন, সুয়ায়লাম ইহুদীর সে ঘর জ্বালিয়ে দিতে। তালহা তাই করলেন, যেহাক বিন খলিফা ঘরের পেছন দিয়ে পালিয়ে গেলো। কিন্তু তার পা কেটে গেলো। তার সাথীরা সবাই পালিয়ে গেলো। অবশ্য পরে যে হোক তাওবা করে নিয়েছিলো। অতপর আল্লাহর নবী সফরের প্রস্তুতি জোরেশোরে নিতে শুরু করলেন। মানুষদের জেহাদের হুকুম দিলেন এবং তাদের দ্রুত প্রস্তুতি নিতে বললেন। অর্থশালী লোকদের বললেন, আল্লাহর পথে মাল সামান দান করতে। যাদের কাছে যুদ্ধের খরচপাতি ও সওয়ারী নেই, তাদের জন্যে এসব কিছুর আয়োজন করতেও তিনি বিত্তশালী লোকদের বললেন। কিছু কিছু মালদার ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রচুর খরচ করলেন। এ পর্যায়ে হযরত ওসমান বিন আফফান ছিলেন সবার আগে। এ অভিযানে তিনি সব অর্থশালী লোকদের চাইতে বেশী খরচ করেছেন। ইবনে হিশাম বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা সূত্রে বলেছেন যে, হযরত ওসমান তাবুকের যুদ্ধে অর্থ সংকটে নিমজ্জিত মোজাহেদদের জন্যে এক হাজার দীনার খরচ করেছেন। এই বিশাল অংকের অর্থ খরচ করায় আল্লাহর রসূল এতো আনন্দিত হলেন, তিনি বললেন, হে আল্লাহ, তুমি তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও, আমি তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। মোসনাদে আহমদের বর্ণনা মতে আবদুর রহমান বিন হুবাব সুলমা বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে গরীব যোদ্ধাদের সাহায্য করার উৎসাহ দিয়ে ভাষণ দিলেন। ওসমান বিন আফফান ভাষণ শুনে বললেন, আমি একশত উট ও তাদের যাবতীয় সামানের দায়িত্ব নিলাম। হাদীসের বর্ণনাকারী বলছেন, আল্লাহর নবী মেম্বরের এক সিঁড়ি নীচে এলেন। এরপর ওসমান বললেন, আমি আরো একশত উট ও তাদের যাবতীয় সামানের দায়িত্ব নিলাম, বর্ণনাকারী বলছেন, আমি দেখলাম তিনি এভাবে নিজের হাত বের করে দেখালেন এবং নিজের হাত নেড়ে বললেন, এরপর ওসমানের ওপর আর কোনো আমল নেই অর্থাৎ বাকী জীবন তার আর কোনো নেক আমল দরকার হবে না। এভাবেই হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। বায়হাকীতে আমর বিন মারযুকের বর্ণনায় বলা হয়েছে, রসূল (স.) তিনবার বললেন– ওসমান তিনশত উট ও তাদের সব সাজ-সরঞ্জামের দায়িত্ব নিলেন।

ইয়াহিয়া বিন আবি কাসীর ও সায়ীদ বিন কাতাদার বর্ণনায় ইবনে জারীর, হেকাম বিন উবান একরামার সূত্রে পাওয়া বর্ণনায় ইবনে আবি হাতেম কিছু কিছু শাব্দিক মত-পার্থক্যের সাথে এটি লিখেছেন।

আল্লাহর রসূল তাবুকের যুদ্ধের সময় আল্লাহর রাহে দান করার ওপর ভাষণ দিলেন তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ চার হাজার দেরহাম পেশ করলেন। তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার কাছে আট হাজার দেরহাম ছিলো, চার হাজার আমি নিয়ে এসেছি আর বাকী চার হাজার রেখে দিয়েছি। আল্লাহর রসূল বললেন, যেটা তুমি দান করেছো এবং যেটা তুমি রেখে এসেছো– উভয়টার ওপরই আল্লাহ তায়ালা বরকত দিন।

অতপর আবু আকীল এলেন এক সা' খেজুর নিয়ে। বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, আমি দু' সা' খেজুর পেয়েছিলাম। এক সা' নিয়ে এসেছি আল্লাহর জন্যে। আরেক সা' রেখে এসেছি পরিবার পরিজনদের জন্যে। মোনাফেকদের একদল এটা দেখে তাকে নানা রকম অপবাদ দিতে লাগলো। তারা বললো, ইবনে আওফ যা কিছু দিয়েছে তা নিছক প্রদর্শনীর খাতিরেই দিয়েছে এবং আবু আকীলের দান সম্পর্কে বললো আল্লাহ ও তাঁর রসূল কি এই ব্যক্তির এক সা' খেজুরের মুখাপেক্ষী?

আরেক বর্ণনায় তারা আবু আকীল থেকে বলছেন যে, তিনি সারারাত এক ইহুদীর কাজ করে দু 'সা' খেজুর পেয়েছিলেন, তার এক 'সা' তিনি নিজের পরিবার পরিজনের জন্য রেখে এসেছেন, আরেক 'সা' নিয়ে এসেছেন আল্লাহর পথে জেহাদের জন্যে, এখানেও মোনাফেকরা বলেছে যে, আবু আকীল এটা এ জন্যেই করেছে যে, লোকেরা তার কথা বলুক।

অতপর একদল পুরুষ রসূলের দরবারে এলো। এরাই হচ্ছেন সেই ক্রন্দনকারী দল। তারা ছিলো আনসার ও অন্য কিছু লোকের সমন্বয়ে সাতজন ব্যক্তি। তারা রসূলের কাছে সওয়ারী চাইলো। অর্থাৎ তারা সওয়ারী চাইলো যাতে চড়ে তারা যুদ্ধের যমীনে হাযির হতে পারে। এটা তাদের প্রয়োজন ছিলো। আল্লাহর নবী বললেন– আমার কাছে এমন কিছু নেই যাতে আমি তোমাদের আরোহণ করাতে পারি। এই লোকগুলো ফিরে গেলো, এমন অবস্থায় যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো। তারা ছিলো চিন্তিত। কেননা তাদের কাছে যুদ্ধে যাবার মতো খরচপাতি ছিলো না।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে, ইবনে ইয়ামীন বিন উমায়ের বিন কা'ব নুয্রী একবার আবু লায়লা আবদুর রহমান বিন কা'ব ও আবদুল্লাহ বিন মুগাফফালের সাথে সাক্ষাত করলেন (এই দু'জন ছিলেন সেই সাত জন ক্রন্দনকারীদের অন্যতম)। তিনি দেখলেন এরা দু'জন কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কাঁদছো কেন? তারা বললেন, আমরা আল্লাহর নবীর কাছে গিয়েছিলাম যুদ্ধের সওয়ারী চাইতে। কিন্তু তাঁর কাছে আমাদের আরোহণ করানোর মতো কোনো সওয়ারী ছিলো না আর আমাদেরও এমন কোনো সংগতি নেই যে, আমরা তাঁর সাথে শামিল হতে পারি। তিনি একথা শুনে তার নিজের পানি পান করানোর উটটি তাদের দিয়ে দিলেন। সাথে কিছু খেজুরও দিলেন। তারা এতে খুশী হয়ে রসূলের সাথে রওনা দিয়ে চলে গেলেন। ইবনে ইসহাক থেকে ইউনুস বিন রাকিবের বর্ণনায় আছে, আলবা বিন যায়েদ (ক্রন্দনকারী সাত জনের একজন) রাতের বেলায় ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছা মতো অনেক নামায আদায় করলেন। তারপর আল্লাহর কাছে কাঁদতে লাগলেন, বললেন, ইয়া আল্লাহ, তুমি জেহাদের আদেশ দিলে এবং সে জন্যে উৎসাহও দিলে। কিন্তু আমাকে এমন কোনো সামান দিলে না যা দিয়ে আমি শক্তি পেতে পারি। তোমার রসুলের কাছেও এমন কোনো সওয়ারী ছিলো না– যাতে তিনি আমাকে যুদ্ধের জন্যে আরোহণ করাতে পারেন। আমি প্রত্যেক মুসলমানকে তার প্রত্যেকটি যুলুম, যা সে আমাকে পৌছিয়েছে।শারীরিকভাবে হোক, আর্থিকভাবে হোক অথবা অন্য কোনো ভাবে, তা সাদকা করে দিলাম। অতপর সকাল বেলায় সে লোকদের সাথে শামিল হয়ে রসূলের কাছে গেলো। আল্লাহর রসূল জিজ্ঞেস করলেন, গত রাতের সদকা প্রদানকারী ব্যক্তি কোথায়? কিন্তু কেউই দাঁড়ালো না। তিনি আবার বললেন, সাদকা প্রদানকারী কোথায় সে যেন দাঁড়ায়! অতপর সে ব্যক্তি দাঁড়ালো। রসূলুল্লাহ তাকে বললেন, সুখবর গ্রহণ করো, যার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, তোমার সাদকা সে সব যাকাতের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে, যাকে আল্লাহর দরবারে কবুল করা হয়েছে।

অতপর আল্লাহর রসূল মদীনা ও তার পার্শ্ববর্তী কবিলার প্রায় তিরিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের পথে যাত্রা করলেন। মুসলমানদের একটি ছোট দল অবহেলা ও অলসতার কারণে, তাদের নিয়তে কোনো সন্দেহ ও খারাপ উদ্দেশ্য নিহিত ছিলো না, পেছনে থেকে গেলো। এদের মধ্যে সে তিনজন ব্যক্তির নামও ছিলো যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত মুলতবী করা হয়েছে। অর্থাৎ কাব বিন মালেক, মেরারা বিন রাবী, হেলাল বেন উমাইয়া (এদের বিস্তারিত বিবরণ একটু পরেই আমি বর্ণনা করবো)। আরো ছিলো আবু খায়সামা ও ওমায়র বিন ওয়াহাব জমূরীর নাম।

রসূলুল্লাহ নিজের বাহিনীকে একত্রিত করার তাঁবু গাড়লেন 'সানিয়্যাতুল বিদা' নামক স্থানে। মোনাফেকের সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই তার তাঁবু কিছুটা নীচে আলাদা স্থানে গাড়লো। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সংখ্যা খুব কম ছিলো না। অবশ্য দ্বিতীয়

বর্ণনায় জানা যায়– যারা পেছনে থেকে গেছে, তাদের সংখ্যা একশ'র কম ছিলো, রসূলুল্লাহ (স.) যখন রওনা দিলেন, তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই তার মোনাফেক সাথী ও আরো যারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিমজ্জিত ছিলো, তারা সবাই পেছনে রয়ে গেলো।

অতপর আল্লাহর রসূল বাহিনী নিয়ে চলতে থাকলেন। দু' একজন মাঝে মাঝে বাহিনী থেকে আলাদা হতে থাকলো। লোকেরা রসূলকে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ, অমুক ব্যক্তি পেছনে রয়ে গেছে। তিনি বললেন, তার কথা ছেড়ে দাও। এর মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকলে আল্লাহ তায়ালা তাকে তোমাদের সাথে মিলিয়ে দেবেন। নতুবা তাকে পেছনে ফেলে রেখে আল্লাহ তায়ালা তাদের থেকে তোমাদের শান্তি দিলেন। এমনকি এক পর্যায়ে একজন এসে বললো, আবু যর পেছনে রয়ে গেছে। আসলে তার উটটাই ছিলো মন্থরগতিসম্পন্ন। রসূল বললেন, তার কথা ছেড়ে দাও। এর মধ্যে কোনো ভালোই থাকলে আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তাকে তোমাদের সাথে মিলিয়ে দেবেন। আর যদি এমনটি না হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তার কাছ থেকে শান্তি দিলেন। ওদিকে আবু যর তার উটের পাশে বসে অপেক্ষা করছিলেন, এই বুঝি উট চলতে শুরু করে। তখন দেখা গেলো যে, উট বড়ো দেরী করে ফেলছে। তখন তিনি সমস্ত সামানপত্র নিজের কাঁধে তুলে নিলেন এবং পদব্রজেই রসূলের পেছনে চলতে শুরু করলেন। যখন আল্লাহর নবী দ্বিতীয় মনযিলে পৌঁছলেন, তখন কোনো একদল সাথী পেছনে দেখলেন এবং বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, একজন ব্যক্তি আমাদের পেছনে একা একা হেঁটে হেঁটে আসছে। আল্লাহর নবী বললেন, আল্লাহ করুন যেন আবু যর হয়। যখন লোকেরা ভালো করে আগন্তুকের প্রতি তাকালো, তখন দেখলো ইয়া রসূলুল্লাহ আসলেই এ ব্যক্তি হচ্ছে আবু যর। আল্লাহর রসূল বললেন, আল্লাহ তায়ালা আবু যরের ওপর রহম করুন। সে একাই লড়বে একই মরবে এবং একাই তাকে পুনরায় উঠানো হবে।

এদিকে রসূলের চলে যাওয়ার কয়দিন পর আবু খায়সামা মদীনায় ফিরে এলো। তখন প্রচন্ড গরমের সময়। সে এখানে এসে দেখলো, তার দু স্ত্রী বাগানে দুটি সুন্দর জায়গা বানিয়ে তার জন্যে ঠান্ডা পানীয় নিয়ে অপেক্ষা করছে। সাথে কিছু ভালো ভালো খাবার। যখন সে বাগানে ঢুকলো এবং নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলো, উভয় স্ত্রী ও তাদের যাবতীয় আয়োজন সে দেখলো। অতপর বললো আল্লাহর নবী প্রচন্ড খরায় তাপে গরমে থাকবেন, আর আবু খায়সামা থাকবে ঠান্ডা ছায়ার মধ্যে ভালো খাবার ভালো পানীয় ও দু'জন সুন্দরী মহিলার পাশে! এটা কোন্ ধরনের ইনসাফ? অতপর বললো, আমি তোমাদের কারো আরামদায়ক স্থানে যাবো না, আমি বরং রসূলের সাথে গিয়ে মিলিত হবো। তোমরা আমার যাবার প্রস্তুতি করো, আমার খরচপাতি জমা করে দাও। অতপর সে নিজের পানি ধোয়ানোর উট বের করলো এবং তার ওপর চড়ে রওনা করে রসূলের খোঁজে বের হলো। যখন রসূলুল্লাহ তাবুকের পাশে পৌঁছে গেলেন, তখন তিনি এসে রসূলের সাথে মিলিত হলেন।

ওদিকে ওমায়ের বিন ওয়াহাব জুময়ীও রসূলের খোঁজে মদীনা থেকে বের হয়ে তাবুকের দিকে রওনা দিলেন। এরা রাস্তায় এসে একজন আরেকজনকে পেলেন। তাবুকের একান্ত পাশে পৌঁছে আবু খায়সামা ওমায়েরকে বললেন, আমার গুনাহ হচ্ছে একটা, আমি এর একটা সমাধান করতে চাই। তুমি যদি একটু পরে আসো, তাতে তেমন কোনো ক্ষতি তো নেই। আমি আগে গিয়ে রসূলের সাথে দেখা করি। কথানুযায়ী ওমায়ের তাই করলেন।

আবু খায়সামা রসূলের কাছে যখন পৌছলেন, তখন তিনি তবুকে শিবির শুরু করতে যাচ্ছিলেন। কিছু লোক রসূলকে বললেন, একজন সওয়ারী এদিকে আসছে। আল্লাহর রসূল বললেন, আল্লাহ করুন এ আবু খায়সামা হোক। লোকেরা বললো, হাঁ এতো সত্যিই আবু খায়সামা। আবু খায়সামা উট থেকে নেমে আগেই রসূলের কাছে গেলেন এবং তাকে সালাম দিলেন। রসূল (স.) বললেন, হে আবু খায়সামা তোমার অমংগল হোক, (একান্ত ধমক দেয়ার জন্যে)। অতপর তিনি সমগ্র কাহিনী রসূলকে শোনালেন। রসুলুল্লাহও এসব শুনে তার জন্যে কিছু ভালো কথা বললেন এবং দোয়া করলেন। ইবনে ইসহাক বলেন, মোনাফেকদের মধ্যে বনী আমর বিন আওফের ভাই ওদিয়া বিন সাবেত ও বনী সালমা গোত্রের পৃষ্ঠপোষক আসজা গোত্রের এক ব্যক্তিও ছিলো, যার নাম মোখশেন বিন হুমায়র। ইবনে হিশামের মতে তার নাম ছিলো মোখশী। তারা একজন আরেকজনকে বললো, রসূল (স.) যখন তাবুকের দিকে রওনা দিলেন, তখন এরা রসূলের দিকে ইশারা করে বললো, তোমরা রোমানদের যুদ্ধকে আরবদের পারস্পরিক গোত্রীয় যুদ্ধ মনে করেছো নাকি? আল্লাহর কসম, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি আগামী কাল তোমাদের সবাইকে রশিতে বেঁধে ফেলা হবে। আসলে এরা এসব কথা মুসলমানদের ভয় দেখানো ও কাপুরুষতা সৃষ্টি করার জন্যেই ছড়াচ্ছিলো।

অতপর মোখশে বিন জুমায়র বললো- তোমাদের এসব কথার ফলে আমাদের ব্যাপারে কোরআনের কোনো আয়াত নাযিল হবার আগে ভালো হবে আমাদের সবাইকে যদি একশত করে বেত্রাঘাত করা হয়।

ইবনে ইসহাক আরো বললেন, আমি যদ্দূর জানতে পেরেছি, রসূল (স.) আম্মার বিন ইয়াসারকে বললেন, তুমি এই জাতির কাছে যাও। কেননা এরা নিজেরা জ্বলে গেছে। যাও, যা কিছু এরা বলেছে সে ব্যাপারে এদের কাছে জিজ্ঞাসা করো। যদি তারা অস্বীকার করে, তাহলে বলবে, হাঁ তোমরাই তো এসব কথা বলেছিলে। কথানুযায়ী আম্মার সেখানে গেলেন এবং তাদের এ কথা বলে দিলেন। তখন তারা রসূলের কাছে ফিরে এসে নানা রকম ওজুহাত পেশ করতে শুরু করলো। ওদীয়া বিন সাবিত রসূলের কাছে এলো। তখন রসূলুল্লাহ তাঁর সওয়ারী দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। ওদীয়া রসূলের উটনীর পেটে বাঁধা রশি ধরে রেখেছিলো এবং বলতে থাকলো, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা তো এদিক সেদিকের কথা বলে একটু তামাশা করছিলাম। এ কথার ওপর আল্লাহর এই আয়াত নাযিল হলো।

'তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, তারা বলবে, আমরা তো একটু খেল তামাশা করছিলাম। তুমি তাদের বলো, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রসূলের সাথে তামাশা করছো?'

মোখশেন বিন জুমায়র বললো, আমাকে আমার নাম ও আমার পিতাকে তার নাম বসিয়ে দিলো। এই আয়াতে যাকে মাফ করা হয়েছে সে ছিলো এই মোখশেন বিন জুমায়র। সে নিজের নাম বদলে আবদুর রহমান রেখে নিলো এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করলো, আল্লাহ তায়ালা যেন তাকে শহীদের মৃত্যু দেন এবং কেউ যেন তার এ শহীদী মৃত্যুর খবর না জানে। পরে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন এবং কেউই এ ব্যাপারে কিছুই জানতে পালো না। ইবনে লাহিয়া, আবি আসওয়াদ থেকে এবং আবি আসওয়াদ ওরওয়া বিন যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন,

রসূল (স.) যখন অর্ধেক মাস পর তবুক থেকে ফিরলেন। সেখানে তাঁকে কোনোই যুদ্ধ করতে হয়নি। রাস্তায় মোনাফেকদের একটি দল একান্ত গাফেল অবস্থায় খারাপ উদ্দেশ্যে রসুলের ওপর আক্রমণ করতে চাইলো। তারা ইরাদা করেছিলো, পাহাড়ের ওপর থেকে তাঁর ওপর পাথর

ফেলে দেবে অথবা তাঁকে পাথরের নীচে চাপা দেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলকে এ খবর আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো। সাথে সাথেই তিনি লোকদের বললেন, যেন পাহাড়ের উপত্যকার পথ ধরে এগিয়ে চলে। তিনি নিজে পাহাড়ের ওপরের পথ দিয়ে চলতে থাকলেন। যে সব মোনাফেক এ ষড়যন্ত্র করেছিলো তারা তাঁর সাথে সাথেই ছিলো। তারা পুরো পরিকল্পনা এঁটে রেখেছিলো। রসূল (স.) আম্মার বিন ইয়াসার ও হোয়ফা বিন আল ইয়ামানকে তাঁর সাথে চলার জন্যে আদেশ দিলেন। আম্মার উটের রশি ধরলেন। হোযায়ফা উট চালিয়ে নিচ্ছিলেন। এ অবস্থায় যখন তারা চলতে থাকলেন, তখন লোকেরা শুনলো যে, তারা এদের ঘিরে ফেলেছে। রসূল (স.) কিছুটা রেগে গেলেন। হোয়ফা রসূলের রাগ দেখলেন। হোযায়ফার কাছে একটি ঢাল ছিলো, তিনি এ ঢালকে তাদের সওয়ারীর মুখের দিকে রাখলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা যখন হোযায়ফাকে দেখলো, তখন তাদের বিশ্বাস হয়ে গেলো যে, তিনি তাদের পরিকল্পনা টের পেয়ে গেছেন। তখন তারা তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে মানুষদের সাথে মিশে গেলো। হোযায়ফা সরাসরি রসূলের কাছে চলে এলেন এবং তাঁর সাথে দেখা করলেন। রসূল (স.) এদের উভয়কে আদেশ করলেন, তারা সে মোতাবেক দ্রুত এ পথ অতিক্রম করে চলে গেলেন এবং ওধারে গিয়ে অন্য মানুষদের জন্যে অপেক্ষা করলেন। অতপর রসূল হোয়ফাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি কি এদের চিনতে পেরেছো। তিনি বললেন, রাতের অন্ধকারে এরা যখন হামলা করার জন্যে এসেছে, তখন আমি শুধু এদের সওয়ারী চিনেছি। অতপর রসূল তাঁকে বললেন, তুমি জানো– এই আরোহীদের উদ্দেশ্য কী ছিলো? তিনি বললেন, না আমি জানি না। এরপর আল্লাহর নবী আম্মার ও হোযায়ফাকে বললেন এ ষড়যন্ত্রকারীদের লক্ষ্য কি ছিলো। তিনি এদের কাছে এই ষড়যন্ত্রকারীদের নাম পর্যন্ত বলেছেন এবং তাদের বললেন, কথাটা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে। তারা উভয়ে আরয করলো ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি কি এদের হত্যার আদেশ দেবেন না? আল্লাহর নবী বললেন, আমি এটা পছন্দ করি না লোকেরা বলাবলি করবে যে, মোহাম্মদ নিজ সাথীদের হত্যা করে।

যুদ্ধে না যাওয়া তিন সাহাবীর তওবা কবুল

ইবনে কাসীর বেদায়া ওয়ানেহায়ায় লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে রসূলাল্লাহ (স.) এ ষড়যন্ত্রকারীদের নাম শুধু হুযায়ফা বিন আল ইয়ামানকে বলেছেন। ইবনে কাসীরের বর্ণনায় এটিই অধিকতর সত্য।(১) তাবুকের যুদ্ধে মুসলমানদের ওপর যে কঠিন দুঃসময় আপতিত হয়েছে তার বিবরণ কয়েকটি রেওয়াতেই বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর তার তাফসীরে বলেন,

'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা নবীর ওপর, মোহাজেরদের ওপর ও আনসার ওপর দয়া করেছেন। সে সব মোহাজের ও আনসার যারা নিতান্ত কঠিন অবস্থায় নবীর অনুসরণ করেছে এমন কি তাদের একটি ছোট দলের অন্তর বাঁকা পথে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের মাফ করে দিলেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ছিলেন তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।'

এ আয়াতটি মোজাহেদ এবং অন্যান্যদের মতে তবুকের যুদ্ধের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। এর কারণ ছিলো, মুসলমানরা তখন অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় তবুকের দিকে রওনা দিয়েছিলো। সময়টা ছিলো দুর্ভিক্ষের, গরম ছিলো অনেক বেশী– পথের সাজ সরঞ্জাম ও পানির পরিমাণ ছিলো খুব কম। কাতাদা বলেন, মুসলমানরা তবুকের দিকে প্রচন্ড গরমের সময় বের হয়েছিলো। এতো কঠিন কষ্ট ছিলো যার বিস্তারিত বিবরণ শুধু আল্লাহরই জানা। তারা ভীষণ ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। এমনকি আমাদের সামনে বলা হচ্ছিলো যে, তারা দু'জন মানুষ একটি খেজুর অর্ধেক

(১) ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত সীরাতে ইবনে হিশাম গ্রন্থে অবশ্য আমি এ ঘটনার উল্লেখ পাইনি।

অর্ধেক করে খেতেন। বেশ কিছু বার এমন হয়েছে যে, একটা খেজুর কয়েকজন লোক ভাগ করে খেয়েছেন। একজন একটু চুষে কিছু পানি পান করে নিতেন, আবার দ্বিতীয়জন তার কিছু অংশ জিহবায় চুষে সামান্য পানি খেয়ে নিতেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর করুণার দৃষ্টি দিলেন, তাদের ভালোয় ভালোয় যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনলেন।

ইবনে জারীর আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের বর্ণনায় ওমর ইবনে খাত্তাব সম্পর্কে বলছেন, তিনি বলেছেন, আমরা রসূলের সাথে তবুকের দিকে রওনা দিলাম। আমরা একটি শিবিরের পাশে পৌঁছলাম। আমরা অত্যন্ত কঠিন পিপাসায় কাতর হয়ে গেলাম। এমনকি এক পর্যায়ে আমাদের মনে হয়েছিলো যে, আমাদের ঘাড় বুঝি ভেংগে যাবে। আমাদের কোনো একজন লোক যখন পানির জন্যে গিয়ে ফিরে আসতো না, তখন আমরা ধরেই নিতাম যে, আসলেই সে ব্যক্তির ঘাড় ভেংগে পড়েছে, সে আর বেঁচে নেই। কিছু কিছু লোক নিজেদের উট যবাই করে উটের থলিতে জমা করে রাখা পানি পান করতো। কিছু পানি বুকের সাথে জড়িয়ে পরের জন্যে বাঁচিয়ে রাখতো।

ইবনে জারীর আয়াতে বর্ণিত 'কঠিন সময়' এর অর্থ বলেছেন, যোদ্ধাদের কাছে সফরের প্রয়োজনীয় খরচপাতি, সাওয়ারী জন্তু, খাবার ও পানীয় বস্তুর তীব্র অভাব ছিলো। 'তাদের মধ্যকার একটি দলের মন বাঁকা হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো।' এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে যে, তাদের সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার উপক্রম হয়ে ছিলো। তারা রসূলের দ্বীনে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করলো। যে কষ্ট তারা ভোগ করছিলো, তার কারণে এবং সফর ও যুদ্ধের কষ্টের কারণে তাদের অন্তরে কিছু বক্রতা সৃষ্টি হচ্ছিলো। কিন্তু অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর দয়া করলেন। তারা দ্বীনের ওপর আবার দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। এই কঠিন পরিস্থিতিতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে যে বিভিন্ন ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মানুষের জন্ম হয়েছে, তার চিত্র আল্লাহ তায়ালা এসব বর্ণনায় আমাদের সামনে রাখছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সে সব মানুষের ঈমানের বিভিন্ন পর্যায়গুলো আমাদের সামনে তুলে ধরা। একদল ছিলো পাকাপোক্ত ঈমানদার। আরেক দল যাদের অন্তরে যুদ্ধের কঠিন অবস্থার কারণে কিছুটা দ্বিধা সংশয় সৃষ্টি হয়েছিলো। একদল ছিলো, যারা কোনো সন্দেহের কারণে নয়, এমনিই আরামের জন্যে জেহাদ থেকে বেঁচে থাকতে চাইলো। একদল ছিলো যাদের মধ্যে সামান্য কিছু মোনাফেকী ছিলো আরেক দল লোক ছিলো যারা মোনাফেকীতে অভ্যস্ত। অপর একদল মোনাফেক– যারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করলো।

এর প্রতিটি স্তর ও এদের প্রতিটি দলের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, একদিকে আল্লাহ তায়ালা সে সময়কার লোকদের সামাজিক ও জাতীয় সংগঠনের অভ্যন্তরীণ পরিচয় তুলে ধরেছেন। অপরদিকে এর ফলে তবুকের যুদ্ধ যে কতো কঠিন ও দুঃসহ যাত্রার ব্যাপার ছিলো, তাও সবার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়। সম্ভবত রোমানদের সাথে মোকাবেলার মুসলমান দলের এই অবর্ণনীয় কষ্ট তাদের ঈমানী মর্যাদাকে সমুন্নত করা ও তাদের পারস্পরিক মানদণ্ড নির্ধারণের জন্যেই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো। যুদ্ধের এই কঠিন অবস্থায় কিছু লোক যুদ্ধে না গিয়ে পেছনে পড়ে থাকলো। তাদের অধিকাংশই ছিলো মোনাফেক, যাদের বর্ণনা আমি করেছি। কিছু সংখ্যক মুসলমান যারা সন্দেহ-সংশয়ে নয়, এমনিই অলসতা ও অতিশয় আরামপ্রিয়তার জন্যে পেছনে থেকে গেছে, এরা ছিলো আবার দু'ভাগে বিভক্ত। এক ছিলো তাদের দল, যাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত আগেই বলা হয়েছে। এরা নেক আমলের সাথে কিছু কিছু খারাপ কাজও মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়েছিলো এবং তারা নিজেদের গুনাহের কথা নিজেরা স্বীকার করে নিয়েছে।

দ্বিতীয় ছিলো সে দল যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত মুলতবী করে রাখা হয়েছিলো। এরা আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা করছিলো। আল্লাহ তায়ালা তাদের হয় আযাব দেবেন, না হয় তিনি তাদের মাফ করে দেবেন। এখানে তাদেরই ঘটনা আসছে। তাফসীরে এদের ঘটনা ও তার বিস্তারিত শিক্ষা যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করার আগে চলুন আমরা শুনি, এ তিনজনের একজন তার নিজের কাহিনী সম্পর্কে কি বলেন। এই ব্যক্তি হলেন কাব বিন মালেক। এই দীর্ঘ হাদীসটি ইমাম আহমদ, বোখারী, মুসলিম বর্ণনাকারী যাহবীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন, কাব বিন মালেকের ছেলে আবদুল্লাহ ও তার ছেলে আবদুর রহমান এই হাদীস তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ বিন কাব তার পিতা যখন বার্ধক্যের সময় অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন, তখন তিনি তার পথ প্রদর্শক ছিলেন। কা'ব বলছেন, আমি তবুকের যুদ্ধ ছাড়া কোনো যুদ্ধে রসূলের পেছনে থাকিনি। অবশ্য আমি বদরের যুদ্ধেও শরীক হতে পারিনি। কিন্তু সে যুদ্ধে শরীক না হওয়ার জন্যে কাউকে শাস্তির হুমকি দেয়া হয়নি। আল্লাহর নবী ও মুসলমানরা কোরায়শদের কাফেলার পথ রোধ করার জন্যে অভিযানে বের হয়েছিলেন। পরে ঘটনাক্রমে আল্লাহর ইচ্ছায় উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেলো।

আমি 'বাইয়াতে আকাবা'র রাতে আল্লাহর নবীর পাশে উপস্থিত ছিলোম। আমরা রসূলের পাশে বসে আনুগত্যের ও অংগীকারের শপথ করছিলোম। বদরের প্রান্তরে যোগদানের মতোই সে অংগীকারকে আমি বেশী ভালোবাসি, যদিও বদরের ঘটনা মানুষের মাঝে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

তবুকের যুদ্ধে রসূলের পেছনে থেকে যাওয়ার আসল ঘটনা হচ্ছে এই যে, আমি তখন এতো সম্পদের অধিকারী ছিলাম যে, অন্য কোনো সময়ে আমার হাতে এতো মাল সম্পত্তি ছিলো না। আল্লাহর কসম, আমার কাছে তখন দুটো সওয়ারীর উট মওজুদ ছিলো, অন্য কোনো সময়ে এমনটি হয়নি। রসূলুল্লাহ যখন সাধারণত কোনো যুদ্ধের জন্যে বের হতেন, তখন ভিন্ন এক যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করতেন। যেদিকে যাবার এরাদা থাকতো, সেদিকে না গিয়ে অন্যদিক দিয়ে মদীনা থেকে বের হতেন। কিন্তু তবুকের যুদ্ধে তিনি এ ধরনের কোনো কৌশল অবলম্বন করেননি। পরিষ্কার করে বলে দিলেন– তিনি সিরিয়া অভিমুখে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে যাবেন। এটা ছিলো প্রচন্ড গরমের সময়। রাস্তা ছিলো অনেক দীর্ঘ, পথে পাহাড় ও মরুভূমি ছিলো। শত্রুর সংখ্যা আমাদের তুলনায় ছিলো অনেক বেশী। আল্লাহর নবী পরিষ্কার করে সবাইকে বলে দিলেন– সবাই যেন দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে পূর্ণাংগ প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

রসূলের সাথে যাবার মতো মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিলো অনেক। তাদের সবার নাম সংরক্ষণের জন্যে সেখানে কোনো খাতাপত্র ছিলো না।

কা'ব বলেন, যদি কোনো মানুষ অনুপস্থিত থাকতে চাইতো– যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে তা প্রকাশ করার জন্য কোনো ওহী না আসতো সে অনুপস্থিত থাকতে পারতো। রসূলুল্লাহ (স.) যে সময় এ যুদ্ধের কথা বললেন, তখন গাছে গাছে ফলে পাক ধরেছে। তার ছায়ায় বসে থাকাটা আমার ভালো লাগতো। রসূল ও তার সাথী মুসলমানরা যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব শেষ করে নিয়েছিলেন। আমিও প্রতিদিন সকাল বেলায় তাদের সাথে যেতাম, কিন্তু কোনো রকম সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছাড়াই ফিরে আসতাম। ওদিকে মনে মনে বলতাম যে, আমি যখনি চাইবো সাথে সাথেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবো। এভাবেই আস্তে আস্তে মুসলমানদের যাবতীয় প্রস্তুতি

শেষ হয়ে গেলো। রসূলুল্লাহ ও মুসলমানরা যুদ্ধের জন্যে রওনা হয়ে গেলেন। তখন পর্যন্ত আমি কোনো রকম প্রস্তুতিই গ্রহণ করিনি। তারা আস্তে আস্তে অনেক দূরে চলে গেলেন। এদিকে আমি তখনো দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছি। এরপর একবার সিদ্ধান্ত করলাম, আমি রওনা দেবো এবং অচিরেই তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হবো। আফসোস! কতো ভালো হতো যদি আমি তখন তা করতাম। কিন্তু মনে হয়, এটা আমার তাকদীরের লিখন ছিলো না। আল্লাহর রসূলের চলে যাওয়ার পর আমি মদীনার যেদিকেই বের হতাম নিজেকে বড়ো চিন্তিত ও অপরাধী মনে হতো। অনুসরণ করার মতো কাউকেই পেতাম না। মদীনার গলি ছিলো জনমানবহীন। শুধু মোনাফেক, কতিপয় অসুস্থ ও পংগু ব্যক্তি ছাড়া মদীনায় তখন কেউই নেই। তবুকে পৌঁছার আগ পর্যন্ত আল্লাহর নবী আমাকে স্মরণ করেননি। তবুকে পৌঁছে মানুষের মাঝে বসে তিনি জানতে চাইলেন, কা'ব বিন মালেক কোথায়! বনি সালমার এক ব্যক্তি বললো– ইয়া রসূলাল্লাহ, তাকে তার দুটি চাদর ও দু পাশের দিকে তাকানোর কাজটি এখানে আসা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এ কথা শুনে মোয়ায বিন জাবল বললেন, তুমি তার সম্পর্কে খুবই খারাপ কথা বললে। আল্লাহর কসম ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছুই জানি না। আল্লাহর রসূল চুপ থাকলেন। কা'ব বলেন, যখন আমি জানতে পারলাম যে, রসূল তবুক থেকে ফিরে আসছেন, তখন আমি ভয়ানক চিন্তিত হয়ে গেলাম। আমি আস্তে আস্তে মিথ্যার কথা স্মরণ করতে থাকলাম এবং মনে মনে বলতে থাকলাম যে, আগামীকাল আমি তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে কিভাবে বাঁচবো? এ ব্যাপারে আমি আমার পরিবারের প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষের কাছেই অভিমত চাইতে থাকলাম। কিন্তু যেদিন বলা হলো যে, সত্যিই রসূল মদীনায় এসে পৌঁছে গেছেন, সেদিন আমার মন থেকে এসব বাতিল খেয়াল সব মুছে গেলো, এমনকি এ কথাও বুঝে নিলাম যে, এ ধরনের কোনো কিছু দিয়েই আমি তাঁর কাছ থেকে বাঁচতে পারবো না। অতএব আমি মনে মনে পাকাপোক্ত এরাদা করে নিলাম যে, আমি তাঁর কাছে গিয়ে সত্য কথা বলবো।

আল্লাহর নবী শহরে প্রবেশ করলেন। যখনি তিনি কোনো সফর থেকে শহরে ঢুকতেন তাঁর নিয়ম ছিলো আগে মাসজিদে আসতেন। দু'রাকয়াত নামায পড়ে মানুষের সাথে দেখা করার জন্যে বসে যেতেন। আজও নিয়ম অনুযায়ী যখন তিনি এ দুটো কাজ করলেন, তখন– যারা তাঁর সাথে জেহাদে অংশগ্রহণ করেনি তারা একে একে নানা ওযর-আপত্তি, ওজুহাত-বাহানা ও মিথ্যা কসম নিয়ে তাঁর সামনে হাযির হতে লাগলো। এদের সংখ্যা আশির চাইতে কিছু বেশী হবে। আল্লাহর রসূল তাদের এই বাহ্যিক আচরণ গ্রহণ করলেন। আবার তাদের কাছ থেকে বায়য়াত নিলেন। তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, তাদের ভেতরের ব্যাপারটি তিনি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলেন। এমন সময় আমি এলাম। যখন আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনি রাগের হাসি হাসলেন। অতপর আমাকে বললেন, এদিকে এসো। আমি এলাম, এমনকি আমি তাঁর সামনে বসে গেলাম। তিনি আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, বলো তুমি কেন পেছনে থেকে গেলে? কেন তুমি কি যুদ্ধের সওয়ারী খরিদ করোনি? আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, যদি আজ আমি আপনার সামনে না হয়ে কোনো দুনিয়াদার মানুষের সামনে বসা থাকতাম, তাহলে আমি মনে করতাম আমি কোনো বাহানা পেশ করে তার অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে যাবো। আমি কথা বলতে জানি; কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি জানি আজ যদি আপনার সামনে মিথ্যা বলি যাতে আপনি আমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, কিন্তু এসত্তেও পরে আল্লাহ আপনাকে আমার ওপর অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর যদি আমি আপনাকে সত্য কথা বলি যার কারণে আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে

যাবেন। কিন্তু আমার আশা আছে এর পরিণাম ভালোই হবে। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার আসলেই কোনো ওযর ছিলো না। যখন আমি আপনার পেছনে রয়ে গেছি সে সময়ের চাইতে অন্য কোনো সময়ই আমি এতো সম্পদশালী ছিলাম না। রসূলুল্লাহ বললেন, এ ব্যক্তি সত্যই বলেছে। তিনি আরো বললেন, তুমি ওঠো, যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তোমার ব্যাপারে ফয়সালা না করেন (আমি কিছুই করতে পারবো না)। অতপর আমি উঠে চলে গেলাম। বনী সালমার কিছু লোক আমার পেছনে পেছনে আসতে থাকলো। তারা বললো, আল্লাহর কসম, আমাদের জানা মতে তুমি তো এর আগে কোনো গুনাহ করোনি। কিন্তু তুমি কি এতোই অক্ষম হয়ে পড়েছিলে যে, তুমি তাদের মতো কোনো ওযর-আপত্তি ও বাহানা পেশ করতে পারলে না, যারা জেহাদে পেছনে পড়ে রয়েছিলো। এভাবে ওযর পেশ করলে আল্লাহর রসূল তোমার জন্যে গুনাহ মাফ চাইতেন, তা কি তোমার জন্যে যথেষ্ট ছিলো না। কা'ব বলেন, এরা আমাকে এভাবে তিরস্কার করতেই থাকলো। এমনকি এক পর্যায়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম যে, আমি আল্লাহর নবীর কাছে ফিরে যাবো এবং নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবো। এ সময় আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, আরো কারো সাথে কি এমন ব্যবহার করা হয়েছে, যেভাবে আমার সাথে করা হয়েছে। তারা বললেন, হাঁ, আরো দু'জনের সাথে ও একই আচরণ করা হয়েছে। তারাও তোমার মতো কথা বলেছে এবং তাদেরও তোমার মতো জবাব দেয়া হয়েছে। আমি জানতে চাইলাম, এরা কারা? তারা বললো– এরা হচ্ছেন মারারা বিন রাবী' এবং হেলাল বেন উমাইয়া ওয়াকেফী। আমি দেখলাম, তারা আমার সামনে এমন দু'জন লোকের কথা বললো, যারা উভয়েই ছিলেন নেক মানুষ, যারা উভয়েই বদরের যুদ্ধে শামিল হয়েছেন, তাদের উভয়ের মধ্যেই আমার জন্যে অনুকরণের বিষয় ছিলো। যখন তারা তাদের দু'জনের কথা বললো, তখন চলে গেলাম।

কা'ব বলেন, রসূলুল্লাহ আমাদের তিনজনের সাথে কথা না বলার জন্যে লোকদের আদেশ দিলেন। পেছনে রয়ে যাওয়া লোকদের মধ্যে আমরা তিনজনই বাকী রইলাম, যাদের ব্যাপারে এই ফয়সালা দেয়া হয়েছে। মানুষেরা আমাদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। অথবা তিনি বলেন যে, মানুষেরা সবাই আমাদের জন্যে বদলে গেছে, এমন কি এ যমীনটাও যেন আমার জন্যে বদলে গেছে। মনে হলো– এ যমীন যেন আর সেই যমীন নয়– যাকে আমরা এতোদিন ধরে চিনতাম। পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত আমাদের এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। আমার বাকী দু'সাথী অবস্থার সামনে অক্ষম হয়ে ঘরে বসে গেলো। আমি ছিলাম আমার সম্প্রদায়ের মাঝে শক্তিশালী এবং কঠিন। আমি ঘর থেকে বের হতাম, মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করতাম, বাজারে গলিতে ঘুরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না। আমি রসূলের কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম করতাম, তিনি নামাযের পর বৈঠকে লোকদের নিয়ে বসতেন। মাঝে মাঝে ভাবতাম, তিনি কি আমার সালামের জবাবে ঠোঁট নেড়েছিলেন? অতপর তাঁর একান্ত পাশে গিয়ে নামাযে দাঁড়াতাম এবং চুরি করে করে তাঁকে দেখতাম। যখন আমি নামাযে থাকতাম, তখন তিনি আমার দিকে তাকাতেন। আবার আমি যখন তাঁর দিকে তাকাতাম, তখন তিনি দৃষ্টি সরিয়ে নিতেন।

যখন মুসলমানদের এই অবরোধ দীর্ঘ ও কঠোর হতে লাগলো, তখন আমি একদিন আবু কাতাদার বাগানের দেয়ালের পাশে গেলাম। সে ছিলো আমার চাচাতো ভাই, সবার চাইতে আমার কাছে বেশী প্রিয় ব্যক্তি। আমি সেখানে গিয়ে তাকে সালাম দিলাম, সে কোনো জবাব দিলো না। অতপর আমি বললাম, হে আবু কাতাদা, তোমাকে আমি আল্লাহর ওসীলা দিয়ে বলছি, তুমি কি জানো না যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসি। সে চুপ থাকলো, কোনো কথাই বললো

না। আমি দ্বিতীয় বার এই একই কথা বললাম, সে এবারও চুপ থাকলো। আমি তৃতীয় বার আবার বললাম, এবার আবু কাতাদা বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। এ সময় আমার দু' চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নামলো, আমি পেছনে ফিরে দেয়ালের এদিকে চলে এলাম।

এই সময়ের কথা। একদিন আমি মদীনার বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় একজন সিরীয় নিবতী, যে ফসল বিক্রির জন্যে মদীনায় এসেছিলো, বললো, কা'ব বিন মালিকের ঠিকানা কে বলতে পারে? মানুষরা সবাই তাকে আমার দিকে ইশারা করলো। সে কাছে এলো। আমার হাতে সম্রাট গাসসানের একটি চিঠি দিলো। আমি পড়ালেখা জানতাম, পড়লাম, তার মধ্যে যা ছিলো তা এই, 'আমরা জানতে পেরেছি যে, তোমার সাথী তোমার ওপর ভারী অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে এতো হীন করে পয়দা করেননি– পয়দা করেননি এভাবে বিনষ্ট কোনো জীব হিসেবে। তুমি এসে যাও আমাদের কাছে। আমরা তোমার সাথে সহানুভূতিমূলক আচরণ করবো। 'আমি যখন এই চিঠি পড়ছিলাম, তখন মনে মনে বললাম, এটা অবশ্যই আরেকটি পরীক্ষা! আমি সম্রাটের চিঠিখানা চুলার আগুনে জ্বালিয়ে ফেললাম।

আমাদের অবরোধের পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর একদিন আল্লাহর রসূলের একজন প্রতিনিধি আমার কাছে এলেন এবং আমাকে বললেন, আল্লাহর নবী তোমাকে আদেশ দিয়েছেন, তোমার স্ত্রী থেকে আলাদা থাকো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দেবো? তিনি বললেন, না, তুমি তার কাছে যাবে না। এই একই ধরনের আদেশ আমার বাকী দু' সাথীকেও পাঠানো হয়েছে। আমি ঘরে এসে নিজ স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার আপন লোকদের কাছে চলে যাও। ওখানেই থাকো, যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা এর একটা ফয়সালা না করেন।

হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী রসূলুল্লাহর কাছে এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! হেলাল একজন অক্ষম ও বৃদ্ধ লোক। তার কোনো খাদেম নেই। এ অবস্থায় আপনি কি এটা অপছন্দ করবেন, যদি আমি তার খেদমত আঞ্জাম দেই। আল্লাহর রসূল বললেন, না। তবে সে যেন তোমার পাশে না আসে। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, সে তো কিছু করার জন্যে নড়াচড়াও করতে পারে না। সে তো তখন থেকেই কান্নাকাটি করছে, যখন আপনি তাকে এই আদেশ শুনিয়েছেন। তার অবস্থা এখনো তাই।

আমার ঘরের দু'একজন লোক আমাকে বললো, হয়তো রসূল তোমার স্ত্রীকেও এ ধরনের অনুমতি দিতে পারেন। তিনি তো হেলালের স্ত্রীকে তার স্বামীর খেদমতের অনুমতি দিয়েছেন।

আমি বললাম, না এ ব্যাপারে আমি রসূলুল্লাহর কাছে কোনো অনুমতি চাইবো না। আমি একজন জোয়ান পুরুষ। জানি না এই অনুমতি চাইতে গেলে তিনি এর কি জবাব দেন।

কা'ব বলেন, আমরা দশ দিন আরো অপেক্ষা করলাম। যেদিন থেকে আমাদের অবরোধের হুকুম দেয়া হয়েছে, সে থেকে পুরো পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলো। কা'ব বলেন, পঞ্চাশ দিন পর আমি আমার ঘরগুলোর মধ্যে একটি ঘরের ছাদে ফজর নামায পড়লাম। এ সময় আমি এমন অবস্থায় বসেছিলাম যার বর্ণনা আল্লাহ তায়ালা আয়াতে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমি জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেছি। যমীন নিজের বিশালতা সত্তেও আমার জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গেলো। আমি প্রশস্ত পাহাড়ের ওপর থেকে একজন চীৎকারকারী ব্যক্তির আওয়ায শুনলাম। সে খুব জোরে বলছিলো, হে কা'ব বিন মালেক শুভ সংবাদ তোমার জন্যে! আমি সাথে সাথেই সেজদায় পড়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, খুশীর সময় এসে গেছে। রসূল (স.) ফজরের নামাযের পর

আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের তাওবা কবুল করার কথা ঘোষণা দেন। অতপর মানুষেরা আমাদের শুভ সংবাদ দেয়ার জন্যে বের হলো। একজন মানুষ আমার দিকে ঘোড়ায় চড়ে আসছে। কাবীলায়ে আসলামের একজন লোক দৌড়ে আমার কাছে এলো, সে পাহাড়ের ওপর উঠলো, তাই ঘোড়ার আরোহীর আসার আগেই তার আওয়ায আমি শুনতে পেলাম, অতপর সে ব্যক্তি আমার কাছে এলো, যার আওয়ায আমি আগেই শুনেছি, সে আমাকে শুভ সংবাদ দেয়ার জন্যে এলো। তাই আমি আমার দুটো কাপড় খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। কেননা সে আমাকে ভালো একটি সুসংবাদ দিতে এলো। সেদিন তাকে দেয়ার মতো আমার কাছে আর কিছুই ছিলো না। অতপর আমি দু'টি কাপড় ধার নিয়ে (চাদর ও লুংগী) তা পরিধান করে রসূল (স.)-এর সাথে দেখা করার জন্যে চলে গেলাম। লোকেরা দলে দলে আমাকে শুভ সংবাদ দিতে লাগলো যে, আমার তাওবা কবুল করা হয়েছে। তারা বলছিলো যে, তোমার কল্যাণ হোক, আল্লাহ তায়ালা তোমার তাওবা কবুল করেছেন।

এমন সময় আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। রসূল (স.) তখন মসজিদে অবস্থান করছিলেন। মানুষেরা সবাই তাঁর পাশে বসা ছিলো। তালহা বিন ওয়াবয়দুল্লাহ দৌড়ে এসে আমার সাথে মোসাফাহা করলো এবং মোবারকবাদ জানালো, মোহাজেরদের মধ্যে আর কেউই দাঁড়াননি। আবদুল্লাহ বলেন, কা'ব কখনো তালহার এই নেকীর কথা ভুলেননি। কা'ব বললেন, যখন আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে সালাম করলাম, তখন তিনি বললেন, তাঁর চেহারা তখন খুশীতে ঝলমল করছিলো, তোমার আজকের দিনটি মোবারক হোক। তোমার মা যেদিন তোমাকে জন্ম দিয়েছে তার পর থেকে আজকের দিনটি তোমার জন্য সবচেয়ে বেশী উৎকৃষ্ট। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, এটা কি আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি বললেন, না আমার পক্ষে থেকে নয়, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। খুশীর সময় রসূলুল্লাহর চেহারা এমনি ঝলমল করতো যেন চাঁদের একটি টুকরা। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার তাওবা কবুলের শোকরিয়া হিসেবে আমি আমার সম্পদকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের খেদমতে পেশ করতে চাই। তিনি বললেন, নিজের জন্য কিছু মাল রেখে দাও, এতেই তোমার কল্যাণ রয়েছে। আমি বললাম, আমি আমার সে অংশ রেখে দিচ্ছি যা আমার খায়বরে আছে। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সত্যবাদিতার জন্যই মুক্তি দিলেন। আমর তাওবার পূর্ণতার এটাও একটা অংশ যে, আমি শুধু সত্যই বলবো। আমি এ কথা রসূলুল্লাহর সাথে আলোচনার পর মুসলমানদের মাঝে এমন কেউই নেই যাকে সত্য কথা বলার জন্যে আমার মতো কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। অতপর যেদিন থেকে রসূলের সাথে আমি এ ওয়াদা করেছি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ইচ্ছাকৃত কোনো মিথ্যা কথা আমি বলিনি। আমি আশা করি আল্লাহ তায়ালা বাকী জীবনও আমাকে মিথ্যা থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করলেন- 'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা নবীর ওপর..... সত্যবাদী লোকদের সাথে থেকো।'

কা'ব বলেন, আল্লাহর কসম, ইসলাম গ্রহণের পর আজ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা আমার ওপর এতো বিশাল নেয়ামত দান করেননি, যা আমার মতে রসূলের সামনে সত্য কথা বলার মতো মূল্যবান হতে পারে। যদি আমি সেদিন রসূলের সামনে অন্য লোকদের মতো মিথ্যা কথা বলতাম, তাহলে আমিও তাদের মতো ধ্বংস হয়ে যেতাম যেমনি করে অন্যান্য মিথ্যা কথা বলা লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা এ পর্যায়ে যে ওহী পাঠিয়েছেন-তাতে সে সব লোকদের জন্যে এমন সব কথা বলেছেন যা অন্য কোনো গুনাহগারের ব্যাপারে সম্ভবত খুব কমই বলেছেন।

'অচিরেই তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা তোমার সামনে কসম খেয়ে বলবে তোমরা তাদের অবজ্ঞা করো, কেননা এরা হচ্ছে কতিপয় নাপাক মানুষ......... ।

এই ছিলো সেই তিন ব্যক্তির কাহিনী, যা এদের মধ্যে একজন কা'ব বিন মালেক বর্ণনা করেছেন। এর প্রতিটি বাক্যে রয়েছে শিক্ষা। এতে ইসলামী সমাজের মূল কাঠামোর পরিষ্কার একটি চিত্র ভেসে উঠেছে। দেখানো হয়েছে সে কাঠামো কতো মযবুত বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের ভেতরটা কতো পরিচ্ছন্ন, তাদের সাংগঠনিক জীবনের ধারণা কতো পরিষ্কার। সর্বোপরি দাওয়াতের জন্যে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের মূল্য ও তার আনুগত্য যে কতো জরুরী তা এতে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

এই হচ্ছে কা'ব বিন মালেক ও তার দু'জন সাথী– যারা রসূলের একান্ত কঠিন সময়ে তাঁর সাথে যুদ্ধে যাওয়া থেকে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন।

মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা তাদের পেয়ে বসেছিলো, যা তাদের ছায়ায় বসা ও আরামের দিকে আকৃষ্ট করে দিয়েছিলো। তারা তাদের আরামকে দূরবর্তী সফরের কষ্ট, গরম ও যাবতীয় চেষ্টা-সাধনার ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলো। কিন্তু রসূলুল্লাহর চলে যাওয়ার পর কা'ব নিজের অপরাধ অনুভব করতে পারলেন। তার পারিপার্শ্বিকতা তাঁর অনুভূতিকে জাগিয়ে দিয়ে গেলো। তিনি এ জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দেখলেন, মোনাফেক ও অক্ষম ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউই পেছনে পড়ে নেই, অর্থাৎ দুর্বল, বৃদ্ধ, বালক বালিকা, মহিলা ও অসুস্থ লোকেরাই তখন মদীনায় থাকলো। এর অর্থ হচ্ছে কা'বের ভাষায়, অর্থনৈতিক সংকট মুসলমানদের রসূলুল্লাহর সাথে জেহাদে যাওয়া থেকে আসলেই বাধা দিতে পারেনি। ঘরের মধ্যে শুধু কতিপয় অক্ষম অচল ব্যক্তিই দেখা গেলো অথবা এমন সব ব্যক্তি যাদের ওপর মোনাফেকীর বদনাম রয়েছে। অপর কথায় মুসলিম জামায়াতের কোমরের হাড় কাঠামো তাদের অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবেলায় ছিলো অনেক শক্তিশালী।

এটা ছিলো ঘটনার একটি দিক।

দ্বিতীয় দিকটা ছিলো তাকওয়া। তাকওয়াই হচ্ছে সে জিনিস, যা একজন গুনাহগারকে সত্যের স্বীকারোক্তি ও গুনাহ স্বীকারে উৎসাহ যোগায়। এর পরের ব্যাপারটা আল্লাহর হাতে। এটাই ছিলো সেই ঈমানের চেতনা, যা কা'বকে দিয়ে বলিয়ে ছিলো যে, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি কথা বানাতে জানি, আজ যদি আমি আপনার সামনে না হয়ে কোনো দুনিয়াদার লোকের সামনে থাকতাম, তাহলে আমি বাহানা বানাতাম এবং এভাবেই আমি ছাড়াও পেয়ে যেতাম। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি জানতাম, আমি মিথ্যা বলে আপনাকে হয়তো আজ সন্তুষ্ট করে দিতে পারবো কিন্তু আগামীকাল আল্লাহ তায়ালাই আপনাকে তা বলে দিয়ে আপনাকে আমার ওপর অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর সত্য কথা বলে আপনার অসন্তুষ্টি গ্রহণ করলেও ইনশাআল্লাহ আমি জানি এর পরিণাম ভালোই হবে। আল্লাহর কসম, আমার কোনোই ওযর ছিলো না। আপনার থেকে পেছনে থাকার সময় আমি যথেষ্ট সম্পদশালী ছিলাম, এ ছাড়া আর কোনো কারণ ছিলো না।

এতে বুঝা গেলো, গুনাহগার মোমেনের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা হাযির আছেন। সে একেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। তার কাছে আল্লাহর সান্নিধ্য সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিষয়। তার রহমতের অত্যন্ত বিশ্বস্ত আশাবাদী সে। আল্লাহভীতি তার মনে খুবই গভীর। যদিও রসূলের সন্তুষ্টি এদিক থেকে খুবই প্রয়োজনীয় ছিলো। মান-মর্যাদা ও সম্মানের উৎস ছিলো এটিই। যার প্রতি আল্লাহর রসূল সন্তুষ্ট হতেন সমাজে তার মূল্য মর্যাদা এমনিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো। অপরদিকে যার ওপর আল্লাহর রসূল অসন্তুষ্ট হতেন, তার সমাজে কোনো মূল্যই অবশিষ্ট থাকতো না, কিন্তু একজন ঈমানদার ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে এই সন্তুষ্টি হাসিল করতে চাননি।

রসূলুল্লাহ বাকী মুসলমানদের এই তিন জন ব্যক্তির সাথে একটি সামাজিক অবরোধের আদেশ দিলেন। মানুষ সবাই তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেলো। তাদের সামনেই তাদের দুনিয়া বদলে গেলো। জীবন এক ধরনের বদ্ধ কয়েদখানার মতো হয়ে গেলো। তারা বাজারে যান কিন্তু কেউ তাদের সাথে কথা বলে না, এমনকি ঘরেও তাদের সাথে কারো কথা বলা নিষেধ। এমনকি কা'ব তার প্রিয় চাচাতো ভাই আবু কাতাদার দেয়াল ডিংগিয়ে তাকে আল্লাহর ওয়াস্তা দিয়ে তার সাথে কথা বলতে চান, তিনি শুধু এটুকুই বলেন যে, আল্লাহ ও রসূল ভালো জানেন।

একেই বলে সাংগঠনিক জীবনের শৃংখলা, একেই বলে জামায়াতী জিন্দেগীতে নেতার আনুগত্য। পরাজয়ের একান্ত কঠিন সময়ে হোক– কিংবা বিজয়ের প্রচুর আনন্দের সময় হোক, এই আনুগত্যের শৃংখলা মেনে চলতে হবে। রসূল আদেশ দিলেন, কেউ এই তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলতে পারবে না। কোনো একটি মানুষ এদের সাথে একটি কথা বলার জন্যে আর মুখ খুললো না। কোনো একজন মানুষ তার সাথে দেখা করে না, কেউ তাকে কিছু দেয় না– তার থেকে কেউ কিছু গ্রহণও করে না, এমনকি তার আপন মানুষরাও বদলে গেলো। কেউ তার সালামের জবাব দেয় না। কারো কাছে কিছু চাইলে সে কোনো প্রতিউত্তর করে না। অপর কথায় এ ছিলো সম্পূর্ণত একটি সামাজিক অবরোধ। মসজিদে গিয়ে নামায পড়েন। একান্তে রসূলের পাশে দাঁড়ান। ভাবেন, হয়তো এই বুঝি আল্লাহর নবী তার দিকে তাকাবেন, কিন্তু না। তিনি নিজেও যে আল্লাহর আদেশের বাইরে যেতে পারেন না।

এ কঠিন অবস্থায় এলো আরেকটি কঠিন পরীক্ষা। সম্রাট গাসসানের কাছ থেকে চিঠি এলো, তোমার অবস্থা এতো খারাপ হয়ে যায় নি যে, তোমাকে অবমাননা করা হবে। তুমি আমাদের কাছে এসে যাও, আমরা তোমাকে পূর্ণ মর্যাদা দান করবো। কিন্তু কা'ব সে চিঠিকে চুলায় ফেলে দেন। অবরোধের কঠোরতা এখানেই শেষ নয়, আল্লাহর নবী (স.) আদেশ দিলেন স্ত্রী থেকেও আলাদা থাকতে। কা'ব নিজের প্রিয় স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা করতে থাকেন।

এ ছিলো তাদের জীবনের এক দিক। এরপর এলো জীবনের দ্বিতীয় দিক। এ দিকটা হচ্ছে তাদের হাসি আনন্দের, নতুন জীবন পাওয়ার। তাদের তাওবা কবুলের সুসংবাদের। সুসংবাদ আবার তাদের নিজ লোকদের কাছে ফিরে যাবার, নতুন জীবন পাওয়ার। কা'ব বলছেন, আমি এমন অবস্থায় বসে ছিলাম যার চিত্র আল্লাহ তায়ালা কোরআনের এই আয়াতে পরিষ্কার করে এঁকে দিয়েছেন। জীবন আমার ওপর সংকীর্ণ হয়ে এই যমীন তার বিশাল বিশালতা সত্তেও আমার পর তা সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এরপর আমি চীৎকার করে সুসংবাদ বহনকারী এক ব্যক্তির আওয়ায শুনলাম। পাহাড়ের ওপর থেকে আগন্তুক বলছে, হে কা'ব বিন মালেক সুসংবাদ গ্রহণ করো। সাথে সাথে আমি সেজদায় নত হয়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারলাম আমার বিপদের ক্ষণ শেষ হয়ে এসেছে। আল্লাহর নবী নিজেই ফজরের নামাযের পর মসজিদে আমার তাওবা কবুলের ঘোষণা দিয়েছেন। দলে দলে লোকেরা আমার দিকে এই সুসংবাদ দেয়ার জন্য আসতে শুরু করলো। মাত্র একদিন আগে যারা আমার সালামের জবাব দেয়নি, আজ তারা পাহাড়ের ওপর চড়াও হচ্ছে, যাতে করে সুসংবাদের আওয়াযটা আমাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারে। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম সমগ্র দুনিয়া যেন আমার জন্যে আবার বদলে গেলো। আমি রসূলুল্লাহর সাথে

দেখা করার জন্যে মাসজিদে এলাম। তাঁর চারদিকে বসা লোকজন। তিনি চাঁদের মতো ঝলমল করা মুখ দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

এতে বুঝা গেলো, সে সমাজে দুনিয়াবী ঘটনাবলীর সাথে দ্বীনী ব্যাপারসমূহের একটা পরখ ছিলো। তাওবা কবুল হওয়ার বিষয়টা মর্যাদার দিক থেকে ছিলো অনেক বড়ো একটা বিষয়। এটা যেন একটা নতুন জীবন- যা একজন গুনাহগার মানুষকে সমাজের এক উঁচু স্তরে বসিয়ে দেয়। মানুষ ঘোড়া দৌড়ায়ে তাকে সুখবর দেয়ার জন্যে আসে- যে ব্যক্তি কোনো আরোহণ পায় না সে পাহাড়ে চড়ে চীৎকার করে সুসংবাদ দেয় যে, কা'ব তোমার বিপদের সময় শেষ হয়ে গেছে। কারণ তোমার তাওবা কবুল হয়ে গেছে। কা'ব-এর কাহিনী আমাদের কাছে নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ ও এর অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তথ্য পরিষ্কার করে দেয়।

'এমন কি যখন যমীন তার বিশালতা সত্তেও সংকীর্ণ হয়ে গেলো, যখন তার নিজের জীবন তার কাছে সংকীর্ণ হয়ে গেলো এবং তার এটা পাকাপোক্ত বিশ্বাস হয়ে গেলো যে, আল্লাহ ছাড়া আসলে কোনোই আশ্রয়-স্থল নেই।'

যমীন তো তার অধিবাসীদের কারণেই বিস্তৃত হয়। যখন যমীনের বাশিন্দারা সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়, তখন বিশাল হওয়া সত্তেও যমীনকে মনে হয় একান্ত সংকীর্ণ। শুধু তাই নয়- এমতাবস্থায় খোদ মানুষের নিজের জীবনটাই তার নিজের ওপর একান্ত ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হয়ে আসে- সব আশ্রয়, সব সাহায্য তার শেষ হয়ে যায়। সে তার দু'চোখে দেখতে পায় যে, তার সামনে আর কোনোই আশার আলো নেই। এখানে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনোই আশ্রয়স্থল নেই। কোনো ব্যক্তি কিংবা কোনো স্থান আর তাকে আশ্রয় দিতে পারে না। যমীন, আসমান ও এর গোটা চৌহদ্দির একক মালিকানা তার। কিন্তু এখানে সে বিপদ মুসীবত পরীক্ষা, কষ্ট ও আনন্দের চিত্র তুলে ধরার জন্যে কথাগুলো বলা হয়েছে- কা'ব এবং তার দু'জন সাথী যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাদের সামনে এই মুসীবত থেকে বের হওয়ার কোনো পথই দেখা যাচ্ছিলো না। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তাদের ওপর দয়া করতে পারেন। অবশেষে সত্যিই আল্লাহ তাদের দিকে দয়ালু দৃষ্টি দিলেন। এর বর্ণনা করা হয়েছে এই ভাবে, 'অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের তাওবা কবুল করলেন- যেন তারাও আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে পারে। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।'

অর্থাৎ সে বিশেষ গুনাহ থেকে আল্লাহ তায়ালা তাদের তাওবা কবুল করলেন যেন তারাও আগের গুনাহ থেকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে পারে। তার প্রমাণ কা'ব এভাবে দিলেন, তিনি রসূলকে বললেন, আমার তাওবার অংশ এটাও যে, আমি আমার সমগ্র ধন-সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নামে সদকা করে আমি এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাই। আল্লাহর নবী তাকে কিছু সম্পদ রেখে দিতে বললেন। সে মতে কা'ব খায়বরে তার যে সম্পদ আছে তা রেখে দিতে চাইলেন। কা'ব আল্লাহর রসূলকে বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, নিছক সত্য কথা বলার জন্যে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের অন্য কোনো মানুষকে এতো বড়ো পরীক্ষায় ফেলেছেন বলে আমি জানি না।

অতপর কা'ব যেহেতু শুধু সত্য কথা বলার জন্যেই আল্লাহর এই অনুগ্রহ পেলেন, তাই তিনি হামেশা সত্য বলার প্রতিজ্ঞা করলেন। তিনি সারা জীবন এই প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআনে' এ ব্যাপারে আর অধিক বর্ণনা করতে চাই না। আল্লাহ তায়ালা যা কিছু পেশ করার তাওফীক দিয়েছেন তা আশা করি যথেষ্ট হবে।

যারা তবুকের যুদ্ধে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণে যেতে পারেনি, যারা এ পর্যায়ে পেছনে রয়ে গেছে, আবার পেছনে পড়ে থাকা এই তিন ব্যক্তির সত্যবাদিতার গোটা কাহিনী বর্ণনার পর এবার সাধারণ মুসলমানদের তাকওয়া ও ঈমানের ব্যাপারে সত্যবাদী লোকদের সাথে থাকার আদেশ দেয়া হচ্ছে। মদীনাবাসী ও তার আশেপাশে অবস্থিত লোকদের মাঝে যারা এভাবে জেহাদের ময়দান থেকে পেছনে পড়ে থাকবে, তাদের জন্যে যেমন নিষেধাজ্ঞা আসছে, তেমনি মোজাহেদদের জন্যেও শুভ পরিণামের ওয়াদা এখানে পেশ করা হয়েছে। (আয়াত ১১৯-১২১)

মদীনাবাসীরাই ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী আন্দোলনকে জায়গা দিয়েছিলো– তারাই ছিলো এর সব চাইতে আপন ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। এই দাওয়াতের সাথে ও এই দাওয়াতের কারণেই তাদের এই ঘনিষ্ঠতা ছিলো। তারাই বিপদের সময় রসূলকে আশ্রয় দিয়েছে, তারা তাঁর সাথে আনুগত্যের চুক্তি সম্পাদন করেছে। তামাম আরব উপদ্বীপে তারাই প্রথম এই দাওয়াতের বুনিয়াদ রেখেছে এবং এই দাওয়াতের মেরুদণ্ডে পরিণত হয়েছে। এভাবে মদীনার আশেপাশে যে কবীলাগুলো বসবাস করতো, তারা ইসলামের বাহ্যিক পোশাকে পরিণত হয়ে গেছে। অতএব এদের কোনো ব্যক্তিকে কোনো কারণে রসূলের পেছনে পড়ে থাকা, নিজেদের জানমালকে রসুলের ওপরে স্থান দেয়া– শরীয়তের দৃষ্টিতে, নৈতিক দৃষ্টিতে, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কিংবা অন্য কোনো ভাবেই ঠিক নয়। তাই আল্লাহর নবী শীতের মওসুমে বের হন কিংবা গরমের সময়, কষ্টের সময় হোক কিংবা আরামের সময়, দুর্ভিক্ষের কঠিন সময় হোক কিংবা আর্থিক সচ্ছলতার সময়ে, সর্বাবস্থায় তাদের আল্লাহর নবীর সাথে আনুগত্য করা উচিত। এতে করে আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিলো, তারা যেন এই দাওয়াতের কষ্টসমূহকে বরদাশ্ত করার শিক্ষা হাসিল করতে পারে। আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ আঞ্জম দিতে পারে। কেননা মদীনাবাসী ও তার পার্শ্ববর্তী লোকেরা ছিলো রসূলের সব চাইতে নিকটতম মানুষ। তাদের এই 'ওযর' থাকার কথাও নয় যে, তারা কিছুই জানতো না, তারা তো সব কিছুই জানতো বুঝতো। তাদের জন্যে এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় যে, তারা প্রয়োজনের সময় রসূলের পেছনে রয়ে যাবে কিংবা কোনো সময় নিজেদের প্রয়োজনকে তার ওপর প্রাধান্য দেবে।

এদের এই সবিশেষ গুরুত্বের কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাদের বললেন, তাকওয়ার পথ অবলম্বন করতে এবং সদা সত্যবাদী লোকদের সাথে থাকতে, যারা কখনো জেহাদের ডাকে রসূলের পেছনে থাকেনি। যাদের মন কখনো পেছনে থাকার কথা চিন্তাও করতে পারেনি। যাদের কদম একান্ত কঠিন সময়েও এতোটুকু নড়েনি। তারাই ছিলো মূলত সে সব নির্বাচিত খাঁটি মানুষ, যারা প্রতিপদে রসূলকে অনুসরণ করেছে। আল্লাহ তায়ালা তাই বলছেন,

'হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং হামেশা সত্যবাদীদের সাথে থাকো।

অতপর জেহাদের সময় রসূলের সাথে বের না হয়ে পেছনে পড়ে থাকার সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

'তারা যে, নিজেদের জীবনকে রসূলের জীবন থেকে বেশী প্রিয় মনে না করে।'

প্রাকারান্তরে যারা পেছনে থেকে গেছে, তাদের এ আয়াতে প্রচন্ড ধমক দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের এবং মদীনার আশেপাশে যারা অবস্থান করছে, তাদের এ আচরণ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। রসূলের কোনো সাথীর ব্যাপারে এটা বলা যে, 'নিজের জীবনকে রসূলের জীবন থেকে বেশী ভালোবাসে' এ থেকে বড়ো ধমক দেয়ার ভাষা আর কী হতে পারে! এটা মোমেনদের জন্যেও একটি প্রচ্ছন্ন ইশারা যে, তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর নবীর জীবনকে নিজেদের জীবনের চাইতে বেশী ভালোবাসবে, তাকে মনে করতে হবে যে, তিনিই হচ্ছেন এই দাওয়াতের প্রাণশক্তি। তার জীবন অন্য মানুষদের তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ মান-মর্যাদা, লাজ লজ্জা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সব কিছুর দাবী হচ্ছে এই যে, একজন মোমেন আল্লাহর নবীকে সব কিছুর ওপরে স্থান দেবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা দান ও অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদের কোনো রকম কোনো নেকীই বরবাদ করে দেন না।

এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পথে পিপাসা লাগলে তাতে নেকী আছে। কষ্ট পেলে তাতে বিনিময় আছে। ক্ষুধার কষ্টে নেকী আছে। কাফেরদের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি যা কিছুই তুমি এপথে পাবে তার সব কিছুতেই তোমার জন্যে নেকী আছে। এপথে চলে শত্রুর কাছ থেকে যা কিছু তোমরা পাবে তাতেও তোমাদের জন্যে নেকী আছে। এর প্রতিটি কদমে মোজাহেদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নেকীর ব্যবস্থা রয়েছে। কোনো একটি ছোটো-খাটো আমলও বিনষ্ট হয় না।

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়েও পুরস্কার রয়েছে। সে অর্থ ছোট হোক কিংবা বড়ো, তার প্রতিটি অর্থ কণাতে নেকী আছে। মোজাহেদ কোনো উপত্যকা সফর করলে কিংবা কোনো রাস্তা আল্লাহর পথে অতিক্রম করলে তাতেও আল্লাহর পক্ষ থেকে নেকীর ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ মোজাহেদের আল্লাহর পথের প্রতিটি কাজ তা ছোট হোক কিংবা বড়ো, তার একটা পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহর কসম, তিনি আমাদের বড়ো উৎকৃষ্ট বিনিময় দিচ্ছেন। এই বিনিময় উঁচু মর্যাদা ও দানশীলতার সর্বোচ্চ স্তরের ওয়াদা। আল্লাহর নবী আল্লাহর পথে যে পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করেছেন তার তুলনায় আমাদের কষ্ট নিতান্ত তুচ্ছ। আমরা তো এই দাওয়াতে সামান্য প্রতিনিধি মাত্র, তাঁর মৃত্যুর পর এই দায়িত্ব আমাদের ওপর দেয়া হয়েছে। এই দাওয়াতের আমরা কতিপয় ক্ষুদ্র আমানতদার মাত্র।

কোরআনের আয়াতে যেভাবে জেহাদের ময়দান থেকে পেছনে পড়ে থাকার ওপর আযাব ও ভয়ের কথা বলা হয়েছে, তাতে অবস্থা এমন হয়েছে যে, আশেপাশের মানুষরাও সবাই মদীনায় অবস্থান করতে লাগলো, যাতে করে যে কোনো সময় আল্লাহর নবী ইশারা করলেই জেহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে মদীনার অধিবাসী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষদের যখন বলা হলো যে, জেহাদের আহ্বান পাওয়ার পর মদীনার লোক ও তাদের পার্শ্ববর্তী লোকদের পেছনে পড়ে থাকা উচিত নয়। একারণেই গোটা জনপদের সবকয়টি মানুষই যে কোনো সময় জেহাদের জন্যে বের হয়ে যেতে উদগ্রীব থাকেন। কিন্তু অবস্থা যখন বদলে গেলো। ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা গোটা আরব উপদ্বীপে যখন ছড়িয়ে পড়লো। ইসলাম যখন গোটা আরবের 'দ্বীনে' পরিণত হয়ে গেলো। তখন একান্ত জরুরী ছিলো তাদের সামনে জেহাদের সর্বাত্মক ঘোষণার কথাটা পরিষ্কার করে একটা নীতিমালা হিসাবে তৈরী করে দেয়া।

অনৈসলামিক সমাজে বসে ফেকাহার চর্চা সময়ের অপব্যবহার বৈ কিছুই নয়

তবুকের যুদ্ধে মুসলমান ফৌজদের সংখ্যা ছিলো তিরিশ হাজার। এর আগে কখনো কোনো যুদ্ধে এতো সংখ্যক মোজাহেদ একত্রিত হয়নি। রসূল (স.) তাবুক থেকে ফিরে আসার পর যুদ্ধে যোগদান করার জন্যে সদা প্রস্তুত ফৌজদের সংখ্যা আরো বহু বেড়ে গেলো। এ অবস্থায় অত্যন্ত জরুরী ছিলো মোজাহেদদের তাদের জীবনের সর্বস্তরে দায়িত্ববান করে দেয়া। ময়দানে যুদ্ধ করা, ভূমি চাষাবাদ করা, ব্যবসা বাণিজ্য করা সহ আরো বহুবিধ সামাজিক কাজ-কর্ম যার ওপর একটি জাতি বেঁচে থাকতে পারে। ১২২ নং আয়াতটি এই প্রসংগেই নাযিল হয়েছে,

'ঈমানদারদের কাজ এটা নয় যে, তারা সবাই একত্রে বাইরে চলে যাবে। এমন কেন হয় না যে, তাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে এক একটি দল বের হয়ে আসবে, যেন তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং যখন তারা নিজের জাতির লোকদের কাছে ফিরে আসবে, তাদের আল্লাহর ভয় থাকবে। আশা করা যায় তারা এতে করে আল্লাহর আযাব থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।'

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বেশ কিছু বর্ণনা এসেছে এবং তা হচ্ছে সে দলটি কোন্‌টি, যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করবে এবং ফিরে এসে নিজ জাতির লোকদের আল্লাহর ভয় দেখাবে। আমার কাছে এ আয়াতের তাফসীরে একথাটি সঠিক যে, মোমেনদের গোটা দল যেন কখনো এক সাথে বের না হয়, বরং প্রতিটি গোত্র থেকে একটি অংশ বের হবে। ঘরে কারা থাকবে, ঘর থেকে বের হয়ে এটা পালাক্রমে নির্বাচন করা যেতে পারে। ভিন্ন দেশের সফরে হোক কিংবা স্বীয় দেশে হোক। জেহাদের ময়দানে হোক কিংবা অন্য কোনো কাজে হোক। একদল লোককে হামেশাই আল্লাহর নবীর পাশে থাকা দরকার। তাঁর কাছ থেকে দ্বীনের সরাসরি জ্ঞান অর্জন করে নিজের জাতির লোকদের সে অনুযায়ী তা শিক্ষা দেয়ার জন্যে এটা নেহায়াত জরুরী।

এভাবে পালাক্রমে দল বাছাই করার এই ব্যাখ্যা যেটা আমি গ্রহণ করেছি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হাসান বসরী, ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীরও সেই মত প্রকাশ করেছেন। তাদের সবার কথার মূল বক্তব্য হচ্ছে, গোটা দ্বীনটা হচ্ছে একটি আন্দোলন। এই আন্দোলন তথা দ্বীনকে সে-ই সঠিক অনুধাবন করতে পারে, যে ব্যক্তি নিজেও এর সাথে নড়াচড়া করে। অতএব দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান- জেহাদের জন্যে যারা বের হবে, তারাই এ দ্বীনকে বেশী করে অনুধাবন করতে পারবে। ততোই তার কাছে এই দ্বীনের মর্মার্থ সঠিকভাবে স্পষ্ট হয়ে যাবে। যখন ব্যক্তি নিজে এ আন্দোলনের সাথে চলতে শুরু করবে, তখন এর নিদর্শনসমূহ ও ব্যবহারিক প্রয়োগ আন্দোলনের পর্যায়ক্রমিক অবস্থার আলোকেই সে বুঝতে সক্ষম হবে। যারা ঘরে বসে থাকবে, তারা দ্বীনের এ মূল্যবান দিক বুঝার জন্যে হামেশাই সে সব লোকদের মুখাপেক্ষী থাকবে, যারা আন্দোলনে থাকার কারণে এই জিনিসগুলোকে ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছে। কেননা তারা সে জিনিসগুলো দেখতে পায়নি, যা দ্বীনের বাস্তব ব্যাখ্যার আলোকে একজন আন্দোলনের সচেতন ব্যক্তি বুঝতে পেরেছে। বিশেষ করে যেই সফরে স্বয়ং আন্দোলন ও জেহাদের মহানায়ক আল্লাহর নবী মওজুদ রয়েছেন। একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে জেহাদে নবীর সাথে অংশ গ্রহণটাই দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্যে যথেষ্ট।

ফেকাহ শাস্ত্র ফেকাহ শাস্ত্রবিদ সম্পর্কে আমার এ আলোচনা সম্ভবত আমাদের প্রচলিত ধ্যান ধারণার বিপরীত। আমাদের সমাজের ধারণা হচ্ছে, যারা যুদ্ধ জেহাদ থেকে দূরে থাকবে, তাদের

কাছে ঘরে বসে বসে দ্বীনের চর্চা– ফেকাহর জ্ঞান হাসিলের সময় থাকবে অনেক বেশী। কিন্তু এ ধারণা আসলে ইসলামের প্রকৃতির বিরোধী কথা। আন্দোলনই হচ্ছে এই দ্বীনের প্রাণ। আন্দোলন ছাড়া এই দ্বীনের টিকে থাকার কোনোই উপায় নেই। অতএব তারাই এ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারবে, যারা দ্বীনের সাথে দ্বীনের জন্যে আন্দোলনে সদা তৎপর থাকবে এবং মানুষের ব্যবহারিক জীবনে তাকে প্রয়োগ করার জন্যে সচেষ্ট হবে। এই দ্বীনকে একটি আন্দোলনের মাধ্যমেই জাহেলিয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে। যখনি তুমি দ্বীনকে ব্যবহারিক পর্যায়ে এনে মানুষের জীবনে তাকে বাস্তবভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করা হবে, তখনি দ্বীনের সঠিক জ্ঞান হাসিল করা সহজ হবে।

অভিজ্ঞতার ফলে এটা দেখা গেছে, যারা দ্বীনের বাস্তব আন্দোলনে অংশ নেয় না, তারা এই দ্বীনকে বুঝতেও সক্ষম হয় না। নিছক বই-পুস্তকের অধ্যবসায়ে ঢুকে থাকা ব্যক্তি কখনো দ্বীনের মূল সত্যের নাগাল পায় না। দ্বীনের আন্দোলন যখন ওয়াজেব হয়ে যায়– তখন ঘরের চার দেয়ালে বসে থাকা একজন ফেকাহ শাস্ত্রবিদের পক্ষে দ্বীন বুঝা-বুঝানো কখনো সম্ভব হয় না। এখন প্রয়োজন দ্বীনের খোলাখুলি আন্দোলনের। প্রয়োজন দ্বীনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার একটি সুসংহত প্রচেষ্টা! এখন যদি তার বদলে কিছু ফেকাহর হুকুম আহ্বান সাধনার জন্যে কেতাবের বিরাট স্তূপ আয়োজন করা হয়, তাহলে দ্বীনের বাস্তব জ্ঞান থেকে তারা দূরেই থেকে যাবে। বাস্তব কাজের সাথে যাদের সম্পর্ক নেই, তারা বাস্তব সমস্যার ব্যাপারে ফেকাহর মাসয়ালা কিভাবে বের করবেন? পাশ্চাত্য দুনিয়ার চিন্তা- নায়করা একে 'তাজদীদ' কিংবা নবায়ন নাম দিয়েছে। মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করা, আল্লাহর যমীনকে একমাত্র তাঁরই প্রদত্ত শরীয়ত ও বিধান দ্বারা শাসন করা ও যাবতীয় আল্লাহ বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করার পরেই এই ফেকাহর প্রয়োজন হবে। অন্যথায় এসব লোকের পক্ষে কোনো দিনই দ্বীনের আসল 'রূহ' বুঝা সম্ভব হবে না। ইসলামী ফেকাহর আসল সৌন্দর্য বুঝাও এদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইসলামী ফেকাহ হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনেরই পরিণাম ফল। দ্বীন ছিলো আগে ফেকাহ এসেছে পরে। এর উল্টোটা নয়। আর এটাই হচ্ছে আসল কথা। প্রথমে আল্লাহর একত্ব, তাঁর গোলামী ও এবাদাত অস্তিত্ব লাভ করেছে। পরে এর ওপর ভিত্তি করে একটি সমাজের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে, যে সমাজ নীতিগতভাবে একথা মেনে নিয়েছে দ্বীন শুধু আল্লাহরই চলবে, জীবনের কোনো দিক ও বিভাগে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো শরীয়ত, আইন ও বিধান চলবে না। এই সমাজ অস্তিত্ব লাভ করার সাথে সাথে আল্লাহ ছাড়া অন্য সব বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে, এ পর্যন্ত এসেই এ সমাজ ব্যবস্থা জীবনের পুনর্গঠনে হাত দিয়েছে– যার ভিত্তি ছিলো সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর শরীয়তের ওপর। তার সামনে কিছু শাখা-প্রশাখার সাথে জড়িত বিষয়ও ছিলো– যাও এসেছে মূল শরীয়ত থেকেই। সমাজ বাস্তব ও কার্যত নিজের পুনর্গঠন আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়তের ছায়ায় বসেই আঞ্জাম দিয়েছে, যাতে করে সর্বত্র ও সর্বস্তরে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হয়।

অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতাকে সামনে রেখে শরীয়তের হুকুম আহকাম ও সিদ্ধান্ত তৈরী করতে হয়েছে। তখনি ইসলামী ফেকাহর ভিত্তি স্থাপিত হয়। আর এটা জানা কথা যে, এই কাজটি সম্পাদিত হতো একটি প্রাকৃতিক চাহিদা ও প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে। এটা ছিলো একটি জীবন্ত আন্দোলনের পরিণতি– শুষ্ক কেতাব থেকে বিনা প্রয়োজনে কতিপয় অপ্রাসংগিক মাসয়ালা এখানে বের করা হয়নি, যার সাথে বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনের কোনোই সম্পর্ক নেই। এ

কারণেই আমাদের ইতিহাসের ফেকাহ শাস্ত্রবিদরা ছিলেন দ্বীনের বাস্তব ও ব্যবহারিক জ্ঞানের বিরাট বিরাট এক একটি আধার। তারা হামেশাই চাইতেন একটি জীবন্ত সমাজের জন্যে একটি আধুনিক ও প্রাণবন্ত ব্যবস্থা বানাতে। তারা নিজেরা যামানার প্রয়োজন ও তার উত্তাপ সম্পর্কে ছিলেন একান্তভাবে পরিচিত।

আজ আমাদের সামনে কী আছে?

আজ আমাদের সামনে এমন কোনো মুসলিম সমাজ নেই,যে সমাজ এটা ফয়সালা করে নিয়েছে যে, দ্বীন শুধু আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট হবে। গোলামী ও শরীয়তের বিধি প্রণয়নে কোনো মানুষের অংশ থাকবে না। কিংবা এই সিদ্ধান্ত করেছে যে, সে সমাজের আইন হবে শুধু মাত্র আল্লাহর শরীয়ত। এমন প্রতিটি আইন বিধানকে সে বাতিল বলে প্রত্যাখ্যান করবে, যাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সূত্র থেকে হাসিল করা হয়েছে। আজ কেউই এমন কোনো দাবী পেশ করতে পারে না যে, এমন কোনো একটি সমাজ দুনিয়ায় আছে যাকে এই নিয়মের আওতায় 'ইসলামী সমাজ' বলা যাবে! একারণেই আমি বলছি, যে মুসলমান ইসলামকে জানে, তার গতি ও লক্ষ্য অনুধাবন করে না, তার গোটা ইতিহাস জানে না, সে বর্তমান অবস্থায় ইসলামী ফেকাহর প্রবর্তন করার দাবীই করতে পারে না। অপরদিকে দুনিয়ায় এমন সব সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে, যার শরীয়ত ও কানুন কোনো অবস্থায়ই ইসলামী নয়, তা ইসলামী ফেকাহ ও কানুনের ছায়ায় থাকাও পছন্দ করে না। সেখানে একজন বিবেকবান মুসলমান তো সর্বাগ্রে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, যেখানে আল্লাহর একত্ব, তাঁর গোলামী ও তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কমপক্ষে একটি জনপদ, একটি দেশ, একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে, যার মধ্যে সার্বভৌমত্ব ও চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হবে। শরীয়ত ও কানুন শুধু হবে আল্লাহর। অতপর সে বিবেকবান মুসলমানটি সমাজে ইসলামী কানুন প্রতিষ্ঠা পদ্ধতি তালাশ করবে। ঠিক সে সময়ই ইসলামী ফেকাহর প্রবর্তন প্রণয়নের প্রশ্ন আসবে। যে দেশ, জাতি ও সম্প্রদায়ের বুনিয়াদ ইসলামী আইনকানুন বিধি-বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেখানে সেই আইন কানুনের ভিত্তিতে ফেকাহর মাসয়ালা বের করা একটি অর্থহীন প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা এমন এক কাজ, যার চিন্তা কোনো বিবেকবান মানুষই করতে পারে না।

ফেকাহ ও কানুনও একটি জীবন্ত বিষয়– যা দ্বীনের অগ্রগতির সাথে সাথে উন্নতি লাভ করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা একত্ব ও তাঁর সার্বভৌমত্বই একটি মুসলিম সমাজের গোড়া পত্তন করেছে। অতপর সে সমাজেই মুসলমান নিজেদের জন্যে ইসলামী ফেকাহ চালু করেছে। এই ক্রম পর্যায়ের ধারা অত্যন্ত জরুরী। আগে একটি মুসলিম দল ও মুসলিম সমাজের অস্তিত্ব প্রয়োজন, যার বুনিয়াদ হবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ওপর। সে সমাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে আল্লাহর যমীনে আল্লাহ আইন ও তাঁর শরীয়ত প্রয়োগ করা। কোনো অবস্থায়ই আগে এমন হবে না যে, সমাজ প্রতিষ্ঠার আগে একটা ইসলামী ফেকাহ তৈরী করা হবে– যেটা পরে কোনো দিন যদি কোথায়ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে এনে 'ফিট' করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী ফেকাহ আগে থেকেই তৈরী করে রাখা কোনো কিছু নয় যে, তাকে সমাজে এমনিই বসিয়ে দেয়া হবে এবং সবাই বুঝে নেবে যে, ইসলামী ফেকাহ ইসলামী সমাজ ও আইন কানুন প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে।

মূল কথা, ফেকাহ হচ্ছে প্রতিটি হুকুম আহকাম, ধরণ ও প্রকৃতির দিক থেকে গোটা ইসলামী শরীয়তকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার নাম। ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট,

এর অবকাঠামো নির্দিষ্ট, এর যাবতীয় প্রাসংগিক বিষয়সমূহ একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্যে তৈরী। আর এসবগুলোর মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করার জন্যেই সেখানে আগে একটি সুসংহত ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজন, যা পুরোপুরি সেই ইসলামী পরিমন্ডলেই অবস্থান করে। তাকে কখনো বাইরে থেকে এনে এখানে 'ফিট' করা যায় না। তাই সর্বাগ্রে আজ প্রয়োজন একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্যে একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার। অতপর সে সমাজে অবস্থার আলোকে অসংখ্য নতুন নতুন চাহিদা ও প্রয়োজন থাকবে, যাকে সামনে রেখেই তখন ইসলামী ফেকাহ তৈরী হবে। আগে থেকে তৈরী করে রাখা কোনো ফেকাহ দিয়ে এ কাজ করা সম্ভব হবে না। সে ধরনের ফেকাহর কেতাবে যে সব মাসয়ালা মাসায়েল, হুকুম আহকাম লিখিত আছে, সেগুলো সেই সমাজের জন্যেই প্রণীত হয়েছিলো। তখনকার প্রয়োজন হিসেবে এর প্রতিটি হুকুম ছিলো জীবন্ত ও বাস্তব। কিন্তু এখন কোথায়ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে তার নির্দিষ্ট প্রয়োজন ও চাহিদার আলোকে ইসলামী ফেকাহর প্রণয়ন করতে হবে। অবস্থার এ বাস্তবতা ও গুরুত্বকে বুঝতে হবে। ইসলাম হচ্ছে মূল– ফেকাহ হচ্ছে সেই মূলের ওপর দাঁড়ানো হুকুম আহকামের সমষ্টি।

জেহাদের কিছু অপব্যাখ্যা

এর পরবর্তী আয়াতে ইসলামের জেহাদী প্রকৃতি ও ধরন আলোচনা করা হচ্ছে। এপথেই আল্লাহর রসূল চলেছেন। তারপর তার খলীফারাও এভাবে একই নীতির ওপর চলেছেন।

আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে বলছেন, (আয়াত নং ১২৩ ও তার তরজমা)

এ আয়াত ইসলামী বিজয়ের কথা বলেছে, যারা ভৌগোলিকভাবে দারুল ইসলামের সাথে ও তার পাশ্ববর্তী এলাকার সংস্পর্শে এসেছিলো। এখানে বিজয়ের বিভিন্ন পর্যায় দেখানো হয়েছে। সর্বশেষে গোটা আরব উপদ্বীপ ইসলাম গ্রহণ করে তার ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মক্কা বিজয়ের পর আরবভূমির কম এলাকাই অবশিষ্ট ছিলো, যারা ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করেনি। এরপর এলো তবুকের ঘটনা। তবুক সিরিয়ার একটি অঞ্চল, যা ছিলো রোমানদের সীমানার পাশে। এখান থেকেই রোমান সাম্রাজ্যের এলাকা শুরু হয়। পরে খলীফাদের সময়ে মুসলমান সেনাবাহিনী রোমান ও ইরানীদের এলাকাসমূহ জয় করে নিয়েছে। দেখতে দেখতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য অস্তিত্ব লাভ করলো, যার সীমানা এক অঞ্চল থেকে সুদূর আরেক আঞ্চলে বিস্তৃত ছিলো। এই বিশাল সাম্রাজ্যে তখনি অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দেখা দিলো, যখন একটি বৃহৎ দেশের মধ্যে ছোটো ছোটো বহু রাজত্ব কায়েম হয়ে গেলো। বিভিন্ন শ্লোগান ও নাম নিয়ে লোকেরা নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষায় মেতে উঠলো। আস্তে আস্তে বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে জাতি, সম্প্রদায়, বংশ এমনকি ছোট ছোট কবিলার রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেলো। একটি জাতি এই ভাবে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়া ছিলো ইসলাম বিরোধীদের একটি ষড়যন্ত্র। কিন্তু আমরা যাদের মুসলমান নাম দিয়েছি তারাও অন্ধভাবে এই বিজাতীয় ষড়যন্ত্রের সামনে মাথানত করে দিয়েছে। এখন দল উপদল বিভিন্ন ভাষার সমন্বয়ে গঠিত জনবসতি ও বর্ণে চিহ্নিত জাতির উত্থান হলো– যা ইসলামী ঐক্যকে ভেংগে টুকরা টুকরা করে দিয়েছে। এরা যখন পুণরায় এক কেতাব, এক দ্বীন, এক আল্লাহ, এক দ্বীনের শ্লোগানের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবে তখনই একটি সম্মিলিত জাতীয়তা গড়ে উঠবে, মূলত এর ওপরই নির্ভর করে তাদের ওপর আল্লাহর সাহায্য আসা।

আরেকবার চলুন এই আয়াতটির সামনে আমরা দাঁড়াই।

'হে ঈমানদাররা, সেসব কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের সাথে (ভৌগোলিকভাবে) মিশে আছে, তারা যেন (এ যুদ্ধে) তোমাদের মাঝে কঠোরতা ও দৃঢ়তা দেখতে পায়। জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের সাথে রয়েছেন, যারা আল্লাহকে ভয় করে।

আমরা এখানে স্পষ্টত দেখতে পাচ্ছি যে, বলা হয়েছে কাফেরদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের সাথে লেগে আছে, তাদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হচ্ছে। এখানে একথা বলা হয়নি যে, তারা যদি যুলুম ও বাড়াবাড়ি করে অথবা তোমাদের এলাকায় জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ করে, তাহলেই তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এটাই হচ্ছে এ ব্যাপারে আল্লাহর শেষ হুকুম যে, এই সত্য দ্বীনকে নিয়ে তোমরা যমীনের এদিক সেদিক বের হয়ে যাবে। এপথের যাবতীয় বাধা-বিপত্তিকে পদদলিত করে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে মুসলমানদের জন্যে ফরয। আর এটাই হচ্ছে সেই মূল বিষয়, যেখান থেকে জেহাদের বিধান শুরু হয়েছে। এই জেহাদ কোনো প্রতিরক্ষামূলক জেহাদ নয়। প্রতিরক্ষামূলক জেহাদের আদেশ দেয়া হয়েছিলো যখন মদীনায় প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো– তখন।

আজকাল যে সব লোক ইসলামের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও জেহাদের বিধানের ওপর কথাবার্তা বলেন, তাদের কিছু লোক কোরআনে বর্ণিত জেহাদের এই আয়াতটির ব্যাখ্যাকে এড়িয়ে চলতে চান। তারা এপর্যায়ে কোরআনের এই আদেশটিকে আগের আদেশসমূহের মতো কোনো শর্তের অধীন করে দিতে চান, তারা এটা প্রমাণ করতে চান যে, জেহাদের এই আদেশ হচ্ছে তখনকার, যখন মুসলমানদের ওপর যুলুম অত্যাচার হতে থাকে কিংবা কাফেরদের কাছ থেকে যুলুম অত্যাচারের আশংকা থাকে। কিন্তু কোরআনের এই পরিষ্কার আদেশটি কোনো শর্তের সাথে জড়িত নয়। এই আদেশ যাবতীয় শর্ত শরায়েত ও বাহানা ওজুহাতমুক্ত এবং জেহাদের ব্যাপারে এটাই শরীয়তের শেষ আদেশ। কোনো কিছুর ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনো বিধান জারী করার ব্যাপারে কোরআনের নীতি হচ্ছে সবখানেই মূল আদেশকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করে দেয়া হয়। এক জায়গায় বর্ণিত কোনো আদেশকে আরেক জায়গায় কোনো শর্তের অধীন করা হয় না। যদি বর্ণিত আদেশটিতে কোনো শর্ত বা অন্য কোনো কথা জড়ানো থাকে কিংবা কোনো বিশেষ অবস্থার সাথে তাকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় তাহলে তাও বলে দেয়া হয়, আমি ইতিপূর্বে দশম পারার সূরা তাওবার শুরুতে অতপর মোশরেক ও আহলে কেতাবের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে আয়াতগুলোর শুরুতে একথা বলেছি যে, কোনো বিশেষ পর্যায়ে নাযিল করা আয়াত ও চূড়ান্ত আদেশ নাযিলের মধ্যে পার্থক্য কি এটা আসলে গোটা ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা ও গতির সাথে সম্পৃক্ত থাকে। যে আদেশটি বিশেষ কোনো অবস্থাকে সামনে রেখে দেয়া হয়, তার সাথে সে আদেশের পার্থক্য সহজেই বুঝা যায়– যা কোনো বিশেষ শর্ত ও অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নয়। এপর্যায়ে আলোচনা এখানেই যথেষ্ট মনে করছি।

আজকাল কিছু লোক আমাদের সমাজে আছে, যারা ইসলামের আন্তর্জাতিক বিধি বিধান সম্পর্কে কিছু লিখতে চায়, তারা ইসলামের জেহাদ বিষয়টি সম্পর্কেও আলোচনা করে এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত যাবতীয় কোরআনের আয়াতের তাফসীর করার চেষ্টা করে। তারা এখানে এসে ভীত ও আতংকিত হয়ে প্রশ্ন করে যে, এই কি তাহলে ইসলামের বিধান? তারা আশ্চর্য হয়ে ভাবতে থাকে, আল্লাহ তায়ালা কি ভাবে মোমেনদের আদেশ দিলেন যে, তারা সব সময় তাদের

পাশের কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করবে! তাহলে যতোদিন কাফের দুনিয়ায় থাকবে, ততোদিন তাদের সাথে আশেপাশের এই কাফেরদের যুদ্ধ বিগ্রহ তো লেগেই থাকবে। তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়, আল্লাহ তায়ালা এমন আদেশ দিলেন! অতপর তারা এ পর্যায়ের অন্যান্য আয়াত যা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন শর্ত ও সীমারেখার ভেতরে নাযিল হয়েছে, সেগুলোকে নিয়ে আসে এবং সে সব বিশেষ অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট আয়াতকে এই আয়াত– যা যাবতীয় শর্তের সীমারেখা থেকে মুক্ত– এর ওপর প্রাধান্য দিতে শুরু করে। আমি অবশ্য জানি এ লোকগুলো কেন আতংকগ্রস্ত। কেন এরা এই ধরনের পরাজিত মানসিকতার শিকার। আসলে এরা ভুলে যায় ইসলামী 'জেহাদ দুনিয়ার কোনো প্রচলিত যুদ্ধ নয়, এটা হচ্ছে 'জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'– আল্লাহর পথে জেহাদ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহর এই সার্বভৌম ক্ষমতা যারা দখল করতে চায়, সে সব শয়তানী ও আল্লাহ বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করে দিতে হবে। মানুষকে মানুষের গোলামী করা থেকে নাজাত দিতে হবে। মানুষকে তার জন্মগত আযাদী ফিরিয়ে দিতে হবে। আল্লাহর যমীনে যারা শেরেক ও কুফরের ফেতনা ছড়াতে চায়, তাদের শক্ত হাতে প্রতিহত করতে হবে, তাদের হাত থেকে সেই শক্তি ছিনিয়ে নিতে হবে যেটা দিয়ে তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ অব্যাহত রাখতে হবে– যতোক্ষণ না পর্যন্ত এ যমীনে শেরেক ও কুফরের ফেতনা বাকী থাকবে– দ্বীন শুধু আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এই জেহাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, একটি মানবীয় ধর্মকে আরেকটি মানবীয় ধর্মের ওপর বসিয়ে দেয়া হবে। বরং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব রচিত যাবতীয় মত ও মতবাদের ওপর আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করবে। এটা এজন্যেও নয় যে, একটি জাতির আইন ও শাসন ক্ষমতাকে আরেকটি জাতির ওপর এনে বসানো হবে– বরং তা হচ্ছে আল্লাহর শাসন ও তার আইনকে মানুষের শাসন ও তার আইনের ওপর বিজয়ী করতে হবে। এটা যমীনের ওপর আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করার জন্যে– বান্দার ওপর তার নিজের কিংবা অন্য কয়জন বান্দার রাজত্ব কায়েম করার জন্যে নয়। একারণেই তাকে সারা জাহানে সারা আলমে সমগ্র মানব জাতির স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করতে হবে। এটা দেখা অপ্রয়োজনীয় যে, কারা ইসলামের পরিসীমায় দাখেল হয়েছে, কারা হয়নি। এ যমীন সমগ্রটাই আল্লাহর, যেখানে মানুষ বসবাস করে। আল্লাহ বিরোধী শয়তানী শক্তিও সমগ্র যমীনে মওজুদ রয়েছে– যারা প্রতিনিয়ত তাদের অন্য মানুষকে গোলামী করতে বাধ্য করছে।

ওপরে বর্ণিত এই মূল সত্যকে যখন মানুষ ভুলে যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা এটা ভেবে আতংকিত হয় যে, এটা কেমন কথা যে, একটি দ্বীন একটি জীবন বিধান দুনিয়ার সব কয়টি ব্যবস্থার ওপর ছেয়ে যাবে! একটি মানব গোষ্ঠী অন্য সব কয়টি মানুষকে নুইয়ে দেবে। তারা যে বিষয়টি থেকে ভয় পেয়ে এমন আচরণ করছে। তা যদি তেমন ধরনের কিছুই হতো, তাহলে অবশ্যই এতে আশংকাগ্রস্ত হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা নয়।

আসল কথা হচ্ছে এরা ইসলামকে যেমন বুঝতে পারেনি, তেমনি ইসলামী জেহাদকেও এরা বুঝতে পারেনি। অথবা জেনে বুঝে না জানার ভান করছে।

মূলকথা হচ্ছে, ইসলামী জীবন যাপন পদ্ধতি দুনিয়ার আর সবকয়টি জীবন পদ্ধতির চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আর এটাও সত্য কথা যে, ইসলামী জীবন পদ্ধতি ইসলাম বিরোধী জীবন

পদ্ধতির সাথে একত্রে চলতেই পারে না। আজকের সব কয়টি জীবনদর্শন ও জীবনপদ্ধতিই হচ্ছে মানুষের তৈরী করা। এর একটিও একথা দাবী করতে পারে না যে, দুনিয়ায় টিকে থাকার অধিকার একমাত্র তার কাছেই আছে। একমাত্র আল্লাহর এই জীবন বিধানই এ দাবী করতে পারে যে বেঁচে থাকার একমাত্র অধিকার এ বিধানেরই আছে। আল্লাহর এ বিধানের দাবী হচ্ছে, তার সামনে পৃথিবীর অন্য কোনো বিধানই টিকে থাকবে না, যাতে করে মানুষ তার নিজেরই মতো আরেকটি মানুষের গোলামী থেকে নাজাত হাসিল করতে পারে এবং তামাম মানুষ জাতি এতো উন্নীত হয় যে, একমাত্র আল্লাহ তাবারকা ও তায়ালা ছাড়া কারো কাছেই সে মাথা নত করবে না।

যেসব ভীত সন্ত্রস্ত কাপুরুষের কথা বললাম, তারা সবাই হচ্ছে পাশ্চাত্য পন্ডিতদের শাগরেদ, তারা খৃষ্টান ইহুদীদের ভয়ে কম্পমান। এরাই নির্লজ্জের মতো ইসলামের ওপর এ অপবাদ দেয় যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রসারিত হয়েছে। এ অপবাদের অপরিহার্য পরিণাম হিসেবে এটা ধরে নিতে হয় যে, ইসলামের জেহাদ ও যুদ্ধ হচ্ছে অমুসলিমদের জোর করে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে দাখিল করা। জানা কথাই এর ফলে চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার বিষয়টি ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

আসল ঘটনাটা কিন্তু কোনো দিনই তা নয়।

ইসলাম সেই মূলনীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যাকে কোরআন বলেছে-- 'দ্বীনে কোনো জোর জবরদস্তি নেই। কেননা হেদায়াত গোমরাহী থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে।' কিন্তু প্রশ্ন আসে, তাহলে তলোয়ার দিয়ে মোজাহেদরা কী প্রয়োগ করবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের জান মালকে জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন বলে কেন বলা হলো- 'তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে, এই লড়াইয়ে তারা অন্যদের হত্যা করবে আবার নিজেরাও নিহত হবে।' এর জবাব হচ্ছে, এই জেহাদ জোর করে কারো আকীদা বিশ্বাস পরিবর্তনের জন্যে নয়, বরং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু। কোনো নির্দিষ্ট আকীদা বিশ্বাসে কাউকে বাধ্য করার তো প্রশ্নই এখানে আসে না।

এ জেহাদ হচ্ছে মূলত মানুষের আকীদার স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। ইসলাম আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বান্দাদের মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তির সাধারণ ঘোষণা জারী করে- যেদিকে সাধারণত আল্লাহ বিরোধী শক্তিগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথানত করতে মানুষদের বাধ্য করে।

এ ধরনের কাজে লিপ্ত প্রতিটি কাজের সাথে ইসলামের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। সে সমস্ত প্রতিষ্ঠান, সংঘ সংগঠন, শাসন ক্ষমতা- যা এভাবে মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথানত করতে বাধ্য করে, ইসলাম তার সব কয়টি জিনিসের বিরোধীতা করে, উপরন্তু যে সব সংস্থা এ সংগঠনসমূহের জন্যে মাল সামান অস্ত্রশস্ত্র প্রচার প্রোপাগান্ডার উপায়-উপকরণ প্রচার মাধ্যম সরবরাহ করে, ইসলাম সেগুলোরও প্রচন্ড বিরোধিতা করে। এ সব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহই হচ্ছে দুনিয়ার সাধারণ মানুষ ও ইসলামের মাঝে আজ একটা বিরাট বড় রকমের বাধা। এ মাধ্যমগুলো মানব জাতিকে ইসলামের চিরন্তন স্বাধীনতার কথা শুনতে দেয় না। ইসলামের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোকে এ সব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের জন্যে মৃত্যুর পরোয়ানা মনে করে। এরা এ পথে নিজেদের কামিয়াব করা ও ইসলামের বক্তব্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার বহু উপায় উপকরণ ব্যবহার করে। এর ফলে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতার পথে বিরাট একটা বাধার সৃষ্টি হয়। ইসলাম এক্ষেত্রে মানুষকে তার জন্মগত আকীদা ও চিন্তার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রাণপণ লড়াই করতে চায়। অতএব এটা হচ্ছে চিন্তা ও আকীদার স্বাধীনতার পথে বাধাসমূহ নির্মূল করার সংগ্রাম। কাউকে তার চিন্তাধারা বদলে দেয়ার জন্যে জোরজবরদস্তি প্রয়োগ করা নয়।

ইসলাম যে চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ও যে পথে ইসলাম মানব জাতিকে আহ্বান করতে চায়, যাকে ইসলাম তার একান্ত কর্তব্য বলে মনে করে তা হচ্ছে, মানুষের চিন্তার স্বাধীনতার পথে যা কিছু বাধা তাকে নির্মূল করতে তলোয়ার প্রয়োগ করতে ইসলাম কুণ্ঠিত নয়। অথচ ইসলাম এবং একান্তভাবে ইসলামই মানব জাতির সামনে এই পয়গাম পেশ করেছে যে, মানুষের চিন্তা যেন পূর্ণাংগ স্বাধীন হয়, চিন্তার স্বাধীনতার পথে কারো পক্ষ থেকে যেন জোরজবরদস্তি না করা হয়। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে– ইতিহাসের প্রথম দিন থেকেই মানুষকে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের পথে না চলার জন্যে এ সব সংস্থা সংগঠন, দল রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তসমূহ নানা প্রকারের যুলুম-অত্যাচার ও শক্তি প্রয়োগ করেছে। ইসলাম যখন এ মানুষের রচিত বাধাসমূহকে– যা মানুষকে ইসলামের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে– নির্মূল করে দেবে, তখন ইসলাম তাকে স্বাধীনভাবে যে কোনো আকীদা যে কোনো পথ ও মত গ্রহণে বাধা দেবে না। তখন নাগরিকদের পূর্ণাংগ অনুমতি ও আযাদী থাকবে। যারা চাইবে তারা ইসলামী আকীদা গ্রহণ করবে, যারা চাইবে তারা অন্য যে কোনো মত পথ ও আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ করতে পারবে। অতএব নাগরিকরা যদি নিজেদের পূর্ণাংগ স্বাধীনতা প্রয়োগ করে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তারা মুসলমানদের ভাই বলে গণ্য হবে এবং মুসলমানদের মতো যাবতীয় অধিকার ও সুযোগ সুবিধে ভোগ করবে। অথবা তারা যদি নিজেদের আগের ধর্মমতে কিংবা পূর্ণাংগ আযাদীর সাথে অন্য কোনো আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ করে, তাহলে জিযিয়া নামক একটা কর দিয়ে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় নাগরিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে যার পরিমাণ সে করের চাইতে বহু গুণ বেশী। এ করটা হচ্ছে তাদের আনুগত্য ও শান্তি শৃংখলার প্রতি ক্রমাগত নিষ্ঠার নিদর্শন। এ ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে সে সব দাবী কখনো করা হবে না, যা এই রাষ্ট্রের মুসলমান নাগরিকদের কাছে করা হবে। সর্বোপরি তারা রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালে মুসলমানদের মতো সম পরিমাণ অধিকার পাবে। তাদের অক্ষম-পংগু-অসুস্থ ব্যক্তিরা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ঠিক তেমন পরিমাণ সুবিধাই পাবে, যেমন পাবে মুসলমান নাগরিকরা।

মানব জাতির গোটা ইতিহাসে ইসলাম কখনো কোথাও কোনো একজন মানুষকে তার আকীদা বিশ্বাস বদলাতে বাধ্য করেনি। অপরদিকে খৃষ্টবাদের ইতিহাস খুলে দেখুন। তারা তো পুরো জাতিকেও এ জন্যে যবাহ করতে দ্বিধা করেনি। এমন বহু ক্ষেত্রে হয়েছে যে, তারা গোটা জাতিকেই নিছক আকীদাগত পার্থক্যের কারণে ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। অতীতে এর প্রমাণ রয়েছে স্পেনে আর বর্তমানে রয়েছে জাঞ্জিবারে। এর একমাত্র কারণ ছিলো এরা গোটা দেশের মানুষকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলো। তারা তাদের অধীনস্থ লোকদের শুধু মুসলমান হবার কারণে গোটা সম্প্রদায়কেই উৎখাত করে দিয়েছে। আবার কখনো কখনো একারণেও তাদের হত্যা করা হয়েছে যে, তারা একটি নির্দিষ্ট খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলো না। মিসরের যমীন থেকে যে, বারো হাজার খৃষ্টানকে হত্যা করা হয়েছে তা এর একটা উদাহরণ মাত্র। এই ১২ হাজার খৃষ্টানকে ক্ষমতাসীন খৃষ্টান শাসক এ জন্যেই হত্যা করেছে যে, তার সাথে তাদের আকীদাগত সামান্য একটু মতপার্থক্য ছিলো, আর সে মতপার্থক্য ছিলো, এই যে, ঈসা মসীহ কি তার পিতা (ফাদার) থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, না পিতা ও পবিত্র আত্মা (হলি স্পিরিট)-এর উভয়টা থেকেই। অথবা পবিত্র আত্মার সৃষ্টি কি শুধু পিতা থেকেই, না পিতা ও পুত্র (মসীহ) উভয়

থেকেই। কিংবা ঈসা মাসীহ কি অস্তিত্ববিহীনতা থেকে অস্তিত্বে এসেছে, না অস্তিত্ব থেকে শুরু হয়ে ভিন্ন কোনো খাতে প্রবাহিত হয়েছে। এই সামান্য মতপার্থক্যের দরুন মিসরের শাসক নিজে খৃষ্টান হওয়া সত্ত্বেও এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। (১)

পরাজিত ও মানসিক দিক থেকে নিষ্প্রভ মুসলমানরা জেহাদের এই আহ্বানে কিছুটা ভয় পেয়ে যায়। কারণ তারা দেখতে পায়। তাদের চার পাশে রয়েছে অসংখ্য কাফের ও মোশরেক তারা মনে করে এই আয়াতের জেহাদের এই নিশর্ত আহ্বান মেনে নিলে তাদের নিজেদেরই কাফের ও মোশরেকদের বিরুদ্ধে জেহাদে নেমে যেতে হয়। অথচ এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ যারা মুসলমানী নাম ধারণ করে সমাজে মুসলমান নামেই পরিচিত হচ্ছে। এরা ভাবতেই পারে না যে, এদের এই হুকুম দেয়া হচ্ছে যে, তাদের সাথে তোমরা লড়াই করো যতোক্ষণ না যমীনে কোনো ফেতনা থাকবে এবং দ্বীন পূর্ণাংগভাবে আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এটা এমন এক কঠিন কাজ যা এই নামের মুসলমানরা যেমন চিন্তা করতে পারে না, তেমনি এরা সে অনুযায়ী কোনো কাজও করতে চায় না।

আসলে এই নামের মুসলমানগুলো এ কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়, এই আয়াতে কাফের ও মোশরেকদের সাথে জেহাদের যে বিধান জারী করা হয়েছে, তা কখন কাদের লক্ষ্য করে জারী করা হয়েছে। এটা ছিলো সে সময়ের কথা যখন রসূলের নেতৃত্বে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইসলামের বুনিয়াদে স্থাপিত হয়েছিলো। সমগ্র আরব উপদ্বীপ তখন এই নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার সামনে বিনত হয়ে পড়েছিলো। সে সমাজ তার জীবনের সব কয়টি দিক ও বিভাগকে আল্লাহর আইনের সামনে সোপর্দ করে দিয়েছিলো। সমাজের এ অবস্থা আনয়ন করার জন্যে আগেই সেখানে একটি দল সংগঠিত হয়েছিলো– যারা জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে নিজেদের জান মাল বিক্রি করে দিয়েছে। এর ফলে তাদের ওপর দিনে দিনে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত নাযিল হয়েছে। প্রতিটি অভিযানে প্রতিটি যুদ্ধে ময়দানে তারা সাফল্য লাভ করে এগিয়ে যাচ্ছিলো।

এখন দুনিয়ার অবস্থা আবার সে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে– যখন আল্লাহর নবী দুনিয়ায় এসেছিলেন। আজ আবার এটা জরুরী হয়ে পড়েছে যে, মানুষকে কালেমায়ে শাহাদাতের দিকে ডাকতে হবে। 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রসূল।'

মোহাম্মদ (স.) শুরুর দিকে তাঁর স্বল্প সংখ্যক সাথী নিয়ে ক্রমাগত জেহাদ ও যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করলেন। মদীনায় এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রথম শুরু হয়েছিলো। পরে তা চূড়ান্ত সফলতার দুয়ারে পৌঁছে। আজও সে সময়ের মতো গোটা ব্যাপারটি আকীদা তথা তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের বক্তব্য দিয়ে শুরু করতে হবে। তারপর সেখানে আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদেরও সে সকল পরিণতি দেখাবেন যা তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা দেখেছেন। তবে আজকের দিন ও সেদিনের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য আছে এবং তা হচ্ছে সে সময়ের মুসলমানরা আজকের মুসলমানদের মতো ফালতু ছিলো না– যা বিভিন্ন মত, পথ ও

---

(১) শুধুমাত্র খৃষ্টান ধর্মাবলী না হওয়ায় বোসনিয়ার মুসলমানদের ওপর দিয়ে যে হত্যাযজ্ঞ বয়ে গেছে তা ইতিহাসে পাঠকদের আরো বহু বছর মনে থাকবে।–সম্পাদক

দলাদলির ফলে উদ্দেশ্যহীনভাবে বসে জমা হয়ে গেছে। তাকে আজ ভাষা, বর্ণ, বংশ ও ভৌগোলিক জাতীয়তার ভাগাভাগি টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। তারা অচিরেই এমন একটি জাতিতে পরিণত হবে, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ঝান্ডাবাহী হবে না। তাদের দ্বীন, ধর্ম, জীবন পদ্ধতি, আচার আচরণ শুধু এই কালেমার ভিত্তিতেই পরিচালিত হবে। এর পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে তারা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষকে আল্লাহ বিরোধী শাসক ও শোষকদের গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্যে এগিয়ে আসবে।

মানুষ বর্তমান অবস্থায় ইসলামী বিধি বিধান বুঝতে সক্ষম হচ্ছে না। তাদের অবস্থা হচ্ছে, তারা মানসিকভাবে দুর্বল ও কাপুরুষ। বাতিলের মোকাবেলায় দ্বীনকে নিয়ে বের হবার সাহস তাদের নেই। ইসলামী হুকুম-আহকাম, ফেকাহ তারাই পুরোপুরি বুঝতে পারে, যারা দ্বীনের পথে দ্বীনের জন্যে প্রত্যক্ষ জেহাদের কাফেলায় শরীক হয়ে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে বের করে আনার চেষ্টা করবে, আল্লাহ বিরোধী প্রতিটি শক্তির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। এই বাস্তব জেহাদের আন্দোলনে বসেই ইসলামী বিধি বিধান বুঝা সম্ভব। স্মরণ রাখতে হবে যে, দ্বীনের জ্ঞান, ইসলামী ফেকাহর জ্ঞান কোনো দিনই ঘরের চার দেয়ালে বসে অর্জন করা যাবে না। যারা ফেকাহর কেতাবসমূহের ঠান্ডা পাতাসমূহে ঘুরে বেড়ায়, তাদের জন্যেও ফেকাহর জ্ঞান আসেনি। এই ফেকাহ ও তার জ্ঞান হচ্ছে একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম- জীবনের পাতায় পাতায় যা লেখা আছে তার নাম। আন্দোলনের কাফেলার চলন্ত গতিতে শামিল না হলে এই বিধি কোনো কাজেই আসবে না। এর দ্বারা কখনো ইসলামী ফেকার মূলতত্ত্ব বুঝে আসবে না, আমাদের অতীত ফকীহরা সবাই ছিলেন আল্লাহর পথের মোজাহেদ। তারা কখনো কোনো বাতিল কিংবা আল্লাহ বিরোধী শক্তির সাথে আপোষ করেননি।

এ ধরনের গুণসম্পন্ন মানুষকে উদ্দেশ্য করেই এই আয়াত নাযিল হয়েছিলো যে, 'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা তোমাদের দেশের সীমানার সাথে লেগে থাকা কাফেরদের সাথে জেহাদ করো- এমনভাবে লড়বে, যেন তারা তোমাদের মাঝে কঠোরতা ও দৃঢ়তা দেখতে পায়। জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই পরহেযগার লোকদের সাথে রয়েছেন।'

এ আয়াতে 'কাফেরদের মাঝে যারা তোমাদের সাথে লেগে রয়েছে' কথার দ্বারা প্রথমত রোমানদেরই বুঝানো হয়েছে। অথচ রোমানরা ছিলো আহলে কেতাব (খৃষ্টান)। কিন্তু মূলকথা হচ্ছে, এরা চিন্তা ও কর্মে যে প্রতিনিয়ত 'কুফরী' পন্থা অবলম্বন করেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ তায়ালা ইতিপূর্বেই এই সূরায় বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর যে কেতাব তাদের ওপর নাযিল করেছেন, তারা সে কেতাবে দারুণ বিকৃতি করে আল্লাহর কেতাবকে বদলে দিয়েছে। অপরদিকে বাস্তব জীবনে মানুষের তৈরী করা মানুষের প্রণীত আইন কানুনকে অন্য মানুষের ওপর প্রয়োগ করেছে। এভাবেই তারা চিন্তা ও কর্মের কোনো কিছুতেই কুফরী না করে থাকেনি! আহলে কেতাবদের যারা আল্লাহর কেতাবের বিকৃতি করে- যারা আল্লাহর আইনের বদলে অন্য কোনো আইন দিয়ে বিচার ফয়সালা করে এবং সে বিচার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে, তারা তো প্রকারান্তরে আল্লাহকে অস্বীকার (কুফর) করলো। তারা যেখানেই থাক না কেন, তারা যে কালেই অবস্থান করুক না কেন, কোরআনের দৃষ্টিতে তাদের অবস্থান এই। এই আয়াতে যুদ্ধ ও জেহাদের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে মানুষের কঠোর ও দৃঢ়তার আদেশও দিচ্ছেন।

মানবাধিকার লংঘনে ইসলামের কঠোর নিষেধাজ্ঞা

'আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই পরহেযগার- যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের ভালোবাসেন।' আয়াতের পূর্ববর্তী বর্ণনা ধারায় 'তাকওয়ার' কথা বলা হয়েছে। এমন তাকওয়া যার জন্যে এমন কাজ যারা করে আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালোবাসেন। তা এমন তাকওয়া, যা কাফেরদের মধ্যে যারা মুসলমানদের সাথে লেগে থাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে, যারা এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করবে এবং আল্লাহ বিরোধী শক্তিসমূহের নির্মূল করার জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে- যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর যমীনে কুফর ও শেরেকের ফেতনা নির্মূল হয়ে যাবে এবং দ্বীন শুধু এক আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু জেহাদে অংশগ্রহণকারী তাকওয়া অনুসরণকারীকে জানতে হবে যে, কঠোরতা ও দৃঢ়তা শুধু তাদের সাথেই দেখাতে হবে- যারা ময়দানে তাদের সাথে সম্মুখ সমরে নিয়োজিত হবে। দ্বীনের সার্বজনীন নম্রতা শালীনতার ভেতরে থেকেই তাকে চলতে হবে। কোনো অবস্থায়ই এই কঠোরতা ও দৃঢ়তাকে অন্য সবার জন্যে প্রযোজ্য মনে করা যাবে না।

তাকওয়ার দাবী হচ্ছে- প্রতিপক্ষের সামনে ইসলাম গ্রহণ, জিযিয়া প্রদান কিংবা সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করা এর যে কোনো একটা বেছে নেয়ার সুযোগ দিতে হবে। তাকওয়ার এটাও দাবী যে, যদি প্রতিপক্ষের সাথে আগে কোনো চুক্তি করা থাকে, তাহলে ঘোষণা দিয়ে সে চুক্তি বাতিল করতে হবে। এটা অবশ্য সে ক্ষেত্রে, যেখানে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা থাকবে। এখানে চুক্তি দ্বারা সে যিম্মীদের চুক্তির কথা বুঝানো হয়েছে, যারা জিযিয়া আদায় করে এবং ইসলামের প্রদত্ত নিরাপত্তা মেনে নিতে রাযী থাকে, এ ছাড়া কোনো অবস্থায় চুক্তির প্রশ্নই আসে না। হাঁ কখনো যদি কোথাও মুসলমানরা দুর্বল থাকে, তাহলে তা ভিন্ন কথা তখন তারা অন্য কারো সাথেও অস্থায়ী কিংবা স্থানীয়ভাবে চুক্তি করে নিতে পারবে। এ হচ্ছে জেহাদের ময়দানে প্রদত্ত ইসলামী শিষ্টাচারের নমুনা। এ হচ্ছে এ পর্যায়ে আল্লাহর নবীর শিক্ষা।

বারিদা থেকে মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বারিদা বললেন, রসূলুল্লাহ (স.) যখন কাউকে কোনো বাহিনীর ওপর আমীর নিযুক্ত করতেন বিশেষ করে যে সব অভিযানে তিনি নিজে যেতেন না এমন সব অভিযানে যখন কাউকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতেন, তখন তিনি আমীরকে আদেশ দিতেন, ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেন সে আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজের মুসলমান সাথীদের সাথে সদাচরণ করে। অতপর বলতেন, বিসমিল্লাহ, তোমরা আল্লাহর নামেই লড়াই করবে আল্লাহর সাথে যারা কুফর করে তাদের সাথেই লড়বে। যুদ্ধ করবে কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কোনো মৃতদেহকে অপমান করবে না। কোনো শিশুকে হত্যা করবে না, যখন তোমরা মোশরেকদের মধ্য থেকে তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হবে, তখন তাদের তিনটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করবে। যদি তারা কোনো একটিকে মেনে নেয়, তাহলে তাদের ওপর হাত উঠানো থেকে তোমরা বিরত থাকবে। (তিনটি বিষয় হচ্ছে) তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবে। তারা যদি তা গ্রহণ করে, তাহলে তোমরা তা মেনে নাও এবং তাদের ওপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। অতপর তাদের বলো, তারা যেন হিজরত করে তাদের এলাকা ছেড়ে মুসলমানদের এলাকায় চলে আসে। যদি তারা তা গ্রহণ করে, তাহলে তাদের বলো, তাদের এবং মোহাজেরদের অধিকার ও দায় দায়িত্ব হবে একই পর্যায়ের। যদি তারা হিজরত করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদের বলো, তারা হবে বেদুইন মুসলমানদের মতো। এই বেদুইন মুসলমানদের জন্যে আল্লাহর যে হুকুম তা এদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। তবে (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)

'গনীমত' এবং (যুদ্ধ ছাড়া লব্ধ সম্পদ) 'ফাই'তে তাদের কোনো অংশ থাকবে না। কিন্তু তাদের (বেদুইন মুসলমানদের মতো) অন্যান্য মুসলমানদের সাথে মিলে জেহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে। যদি তারা তাও মানতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদের কাছ থেকে 'জিযিয়া' কর দাবী করো। যদি তারা তা আদায় করতে রাযী হয়, তাহলে তোমরা তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করো এবং তাদের ওপর চড়াও হওয়া থেকে হাত গুটিয়ে নাও। জিযিয়া দিতেও যদি তারা অস্বীকার করে, তাহলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করো।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের বর্ণনায় বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর কোনো একটি যুদ্ধে এক নিহত মহিলা পাওয়া গিয়েছিলো। অতপর আল্লাহর রসূল সবাইকে (এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও) মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন।

রসূলুল্লাহ (স.) মোয়ায বিন জাবালকে ইয়ামানের লোকজনদের দ্বীন শেখানোর জন্যে পাঠালেন। তিনি তাকে ওসীয়াত করলেন– তুমি এমন একটি সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো, যারা আহলে কেতাব। তুমি তাদের দাওয়াত দেবে তারা যেন একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং আমি (মোহাম্মদ) আল্লাহর রসূল। যদি এ বুনিয়াদী দাওয়াতে তারা তোমার কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর দিনে রাতে পাঁচবার নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তা মেনে নেয়, তাহলে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর যাকাত আদায় ফরয করেছেন– যা তাদের ধনীদের থেকে আদায় করে তাদের গরীবদের ফেরত দেয়া হবে। যদি তারা তোমার একথা মেনে নেয়, তাহলে তুমি অবশ্যই তাদের ভালো মাল সম্পদ (যা আদায় করে নেয়ার তোমার কোনো শরীয়তসম্মত অধিকার নেই) থেকে সাবধান থাকবে। মযলুমের দোয়া থেকে সাবধান থেকো, কেননা মযলুমের দোয়া ও আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা থাকে না।

আবু দাউদ নিজস্ব বর্ণনায় জাহিনার একজন ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমরা হয়তো কোনো জাতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে হয়তো তোমরা তাদের ওপর বিজয়ীও হবে। এমন অবস্থায় তারা মাল সম্পদ দিয়ে তাদের জীবন ও সন্তানাদি বাঁচাতে চাইবে। কোনো শর্তের বিনিময়ে তোমাদের সাথে সন্ধি করতে চাইবে। সে অবস্থায় তোমরা (শর্তের বাইরে) তাদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবে না কেননা তা তোমাদের জন্যে জায়েব হবে না।

আরবায বিন সারিয়া থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমরা আল্লাহর রসূলের সাথে খায়বরের দুর্গে অবতরণ করলাম। আল্লাহর নবীর সাথে এ সময় আরো অনেক মুসলমান ছিলো। খায়বরের শাসক ছিলো খুব দাম্ভিক ও বিদ্রোহী প্রকৃতির। সে রসূলের সম্মুখে এসে বললো, হে মোহাম্মদ, আপনি আমাদের গাধাগুলো যবাই করবেন, আমাদের ফল খাবেন এবং আমাদের মহিলাদের হত্যা করবেন? এতে আল্লাহর রসূল ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, হে ইবনে আওফ, নিজের ঘোড়ার ওপর আরোহণ করো। অতপর তিনি ঘোষণা দিলেন, জান্নাত মোমেন ছাড়া অন্য কারো জন্যেই হালাল নয়। তিনি লোকদের নামাযের জন্যে জমায়েত হতে বললেন। সবাই জমায়েত হলে তিনি তাদের নামায পড়ালেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি মনে করে যে, সে তার খাটের ওপর আছে, এটা কি কেউ ভাবে যে আল্লাহ তায়ালা এছাড়া আর কিছু হারাম করেননি, যা কোরআন মজীদে আছে। তোমরা শুনো, আমি তোমাদের নসীহত করলাম, কিছু জিনিসের আদেশ দিলাম আর কিছু জিনিস থেকে তোমাদের বারণ করলাম

এবং তা কোরআনের (আদেশের) মতোই, কিংবা (ব্যাখার দিক থেকে) তার চাইতেও বেশী। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে এটা হালাল করেননি যে, তোমরা আহলে কেতাবদের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করবে না। তাদের মহিলাদের আঘাত করবে না, তাদের ফল খাবে না। যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা সে দায়িত্ব পালন করে- যেটা তাদের পালনীয় দায়িত্ব।

কোনো একটি যুদ্ধে- প্রত্যক্ষ মোকাবেলার পর- আল্লাহর রসূলের কাছে বলা হলো যে, কয়েকটি শিশু সন্তান যুদ্ধের মাঝে মারা গেছে। একথার ওপর আল্লাহর রসূল ভীষণভাবে দুঃখিত হলেন। কোনো একজন বললেন, আপনি কেন চিন্তিত হচ্ছেন, এরা তো ছিলো মোশরেকদের সন্তান। এ কথা শুনে আল্লাহর নবী (স.) খুবই রাগ করলেন। বললেন, এরা তোমাদের চাইতে ভালো, এরা তো প্রকৃতির ওপর রয়েছে। তোমরা কি মোশরেকদের সন্তান নও? অতএব, শিশু-কিশোরদের হত্যা করা থেকে বেঁচে থাকো শিশু হত্যা থেকে বেঁচে থাকো।

খোলাফায়ে রাশেদীনও এভাবে আল্লাহর রসূলের শিক্ষার ওপর আমল করেছেন। ইমাম মালেক আবু বকর সিদ্দীকের এক রেওয়ায়াত বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি বলেছেন অচিরেই তোমরা এমন একটি জাতি পাবে, যারা মনে করে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর জন্যে আটকে রেখেছে। অতএব তোমরা তাদের ছেড়ে দাও, তারা যে ভাবে নিজেদের আল্লাহর জন্যে আটকে রেখেছে- কোনো মহিলাকে কিংবা কোনো শিশু সন্তানকে অথবা খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছে এমন কোনো ব্যক্তিকে কখনো হত্যা করবে না।

যায়েদ বিন ওয়াহাব বলেন, আমাদের হাতে ওমর (রা.)-এর চিঠি এসেছে। তিনি তাতে লিখেছেন, (গনীমাতের কিংবা অন্য কোনো মাল-সম্পদে) তোমরা বাড়াবাড়ি করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না। কোনো শিশুকে হত্যা করো না। যমীনে চাষাবাদকারীদের বেলায় আল্লাহকে ভয় করো।

ওমরের ওসীয়াতসমূহের মধ্যে এটাও ছিলো যে, কোনো বৃদ্ধকে, কোনো মহিলাকে, কোনো শিশুকে হত্যা করবে না। দুটো বাহিনীর মোকাবেলার সময় ও ভীষণ মারামরি কাটাকাটির সময়ও এদের বাঁচাতে চেষ্টা করবে।

এই হচ্ছে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধি বিধান উন্নত শিষ্টাচার, যা শত্রুর সাথে যুদ্ধের সময়ও অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এসব হাদীস ও খোলাফায়ে রাশেদীনের দৃষ্টান্ত বহু জায়গায় বহুভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষের মর্যাদাকে কি ভাবে সমুন্নত রাখতে হবে এবং যুদ্ধকে কিভাবে এর বৈষয়িক শক্তিসমূহের মধ্যেই সীমিত করে রাখতে হবে। এই বৈষয়িক শক্তিগুলোই মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে বের করে আসার পথে বাধার সৃষ্টি করে, মূলত এই বৈষয়িক শক্তি সামর্থগুলোই আল্লাহর পথে, ইসলামের পথে মানুষের জন্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এসত্তেও ইসলাম এমনকি জেহাদের ময়দানে এ শক্তিগুলোকে নির্মূল করার সময়ও দয়া ও আন্তরিকতার সর্বজনীন ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করাকে তার ওপর ওয়াজেব করে দিয়েছে।

(দুঃখের সাথে আমাকে বলতে হছে, ইসলামের শত্রুরা অত্যন্ত নির্লজ্জতার সাথেই সর্ব যুগে বিভিন্ন অপবাদ পেশ করেছে, এখনো করে যাচ্ছে। ইসলামের গোটা ইতিহাস, তার প্রতিটি যুদ্ধ ও ঘটনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে চিত্র আমাদের সামনে ভেসে উঠে তা বরং সম্পূর্ণ এর বিপরীত। পৃথিবীর যুদ্ধসমূহের ইতিহাসে একমাত্র ইসলামই যুদ্ধের ময়দানে দয়া ও অনুগ্রহ, শিষ্টাচার ও নম্রতা তথা মানবীয় মর্যাদার উৎকর্ষতার প্রমাণ দিয়েছে।)

'কঠোরতার' যে বিষয়টি আয়াতে বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, মোকাবেলার সময় যুদ্ধের ময়দানে কঠোর ও দৃঢ় হতে হবে। তার অর্থ এ নয় যে, মহিলা শিশু, অসুস্থ, অক্ষম, বৃদ্ধ ও যারা প্রত্যক্ষ মোকাবেলার তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়– তাদের সাথে অমানবিক আচরণ করতে হবে।

বর্তমান সভ্যতার দাবীদার জাতিসমূহ আহত ও নিহত মানুষদের সাথে যে আচরণ করছে, তাদের মৃতদেহকে টুকরো টুকরো করে যেভাবে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছে, তার সাথে ইসলামের বর্ণিত, এই 'কঠোরতা দৃঢ়তার' কোনোই মিল নেই। যারা প্রত্যক্ষ সমরে মুসলমানদের সামনা সামনি হয় না, তাদের হেফাযতের জন্যে সুস্পষ্ট বিধান দেয়া হয়েছে। 'কঠোরতা ও দৃঢ়তার' মানে হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় বিধি বিধান মেনে চলে তার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে শত্রুসেনাদের মোকাবেলায় 'কঠোর ও দৃঢ়' থাকতে হবে। যে সম্প্রদায়ের জন্যে দয়া ও অনুগ্রহ প্রদানের ব্যাপক বিধান দেয়া হয়েছে, যুদ্ধের ময়দানে তাদের এ আদেশের বাইরে রাখতে বলা হয়েছে। এ না হলে ইসলামী জেহাদের মূল উদ্দেশ্যই– মানবতার উৎকর্ষ সাধন– ব্যর্থ হয়ে যাবে। অন্যদিকে যুদ্ধের আহত নিহতদের ব্যাপারে ইসলামের প্রদর্শিত নীতিমালা– অত্যাচার করা, অংগ প্রত্যংগকে বিকৃত করা এবং লাশকে অপমান করা থেকেও বিরত থাকতে হবে।

এ সূরায় মোনাফেকদের আচার আচরণ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শেষের দিকে এসে আবার বলা হচ্ছে মোনাফেকরা কি ভাবে কোরআনের আয়াত ও সূরাকে গ্রহণ করে, কিভাবে একে হাসি তামাশার বিষয়ে পরিণত করে। অপরদিকে কোরআনের আয়াত এবং এর সূরার প্রতি মোমেনদের আচরণ কেমন, তাও বলা হয়েছে। (আয়াত ১২৪-১২৭)

'তোমাদের কারো ঈমান কি এতে বৃদ্ধি পেয়েছে।'

এ প্রশ্নটি মূলত এক সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিই করতে পারে। শুধু সে ব্যক্তিই এই প্রশ্নটি করতে পারে, যে এই নাযিল করা আয়াতের কোনো প্রভাব নিজের অন্তরে অনুভব করে না। নতুবা এমন প্রশ্ন সে করতেই পারতো না। সে তো বরং বলতো, এ আয়াতের প্রভাব তার অন্তরে কেমন ঠেকেছে। অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করতো না, জিজ্ঞেস করার জন্যে যে শব্দ সে বেছে নিয়েছে তাতেই বুঝা যায় যে, সে আসলে আল্লাহর আয়াতের সাথে তামাশা করছে। কোরআনের আয়াতকে প্রকারান্তরে সে প্রভাববিহীন প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। এ কারণেই তার জবাব এই বলিষ্ঠ বাক্যের দ্বারা দেয়া হয়েছে,

'হাঁ ঈমানদারদের ঈমান তো এর ফলে বেড়ে গেছে। তারা সুখবরও পাচ্ছে। অপরদিকে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তাদের নাপাকি এতে আরো বেড়ে গেছে। তারা কাফের অবস্থায়ই মৃত্যু মুখে পতিত হবে।'

অর্থাৎ ঈমানদারদের জন্যে ঈমানের আরেকটি উপকরণ এখানে সংযোজিত হলো। তাদের অন্তর আল্লাহর 'যেকেরে' আরো প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত আরো বেশী করে অনুভব করে যে, তিনি তাদের জন্যে এই নতুন আয়াতটি নাযিল করেছেন, তাদের পথ প্রদর্শনের উপায় বাতলে দিয়েছেন। বান্দার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তিনি তাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এসব কারণে কোনো নতুন আয়াত নাযিল হলে ঈমানদারদের ঈমানী শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে যাদের অন্তরে মোনাফেকী ও ব্যাধির নাপাকি ছেয়ে আছে, এতে তাদের সে অপবিত্রতা আরো বহুগুণ বেড়ে যায়। আর এ ভাবেই তাদের পরিণাম অর্থাৎ মওত হবে কুফরীর ওপর। এই হচ্ছে রাব্বুল আলামীন আল্লাহর সঠিক ও অকাট্য বাণী। তাঁর অমোঘ ফায়সালা। কিন্তু মোনাফেকদের অবস্থা হলো, তাদের অন্তর ছিলো কালো, কোনো মানুষের বক্তব্য কোনো হেদায়াত কোনো পরীক্ষাই তাদের সঠিক পথে আনতে পারলো না।

এরশাদ হচ্ছে,

এখানে ফেতনা ও বিপদ মুসীবত বলতে বুঝানো হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সব গোপন কথা ফাঁস করে দেন, কিংবা মোমেনদের আল্লাহ তায়ালা তাদের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই সাহায্য করেন। এসব কিছুই বারবার রসূলের যামানায় বারবার সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু মোনাফেকদের অবস্থা হচ্ছে এসব কিছু থেকে কোনো রকম শিক্ষা গ্রহণ করে না এবং তাওবা করে তারা সঠিক পথেও আসে না। এই আয়াতের শেষের দিকে মোনাফেকদের চরিত্রের একটি সূক্ষ্মদিক তুলে ধরা হয়েছে। তাদের কাপুরুষতা, ভীতি ও আশংকা এতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

বলা হয়েছে,

'যখনি কোনো সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অপরের দিকে তাকায়। আবার বলাবলি করে কেউ কি তোমাকে দেখছে? অতপর চলে যায়। আল্লাহ তায়ালাও তাদের ফিরিয়ে দেন, কেননা এরা একটি নির্বোধ জাতি।'

এভাবে যখনি আয়াত নাযিল হয় এবং মুসলমানরা আল্লাহর আয়াতটি পড়তে থাকে, তখন তাদের অবস্থা এমন হয় যে, একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাকে এখানে কেউ দেখে ফেলেনি তো?' এ কথা বলে আবার মোমেনদের দিকে তাকায়। তখন ভয়ে ও আশংকায় আস্তে আস্তে সেখান থেকে তারা কেটে পড়ে। আর তাদের এই সন্দেহজনক আচরণ ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে আল্লাহ তায়ালাও তাদের অন্তরকে ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে দেন। হেদায়াত থেকে তাদের মন ভিন্ন দিকে সরিয়ে দেন। কেননা 'এরা হচ্ছে এমন জাতি, যারা কিছুই বোঝে না।' এভাবেই একয়টি কথা তাদের মানসিক অবস্থার একটা পূর্ণাংগ চিত্র এঁকেছে।

নিজ জাতির সাথে রসূলের সম্পর্ক

যে দুটো আয়াত দিয়ে এ সূরাটির সমাপ্তি টানা হয়েছে, সেগুলোর মক্কায় অবতীর্ণ কিংবা মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে– উভয় ধরনের বর্ণনাই রয়েছে। আমি শেষের মতকেই গ্রহণ করেছি। এ আয়াত দুটোর মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার দলীল স্বয়ং এই শেষ আয়াত দুটো এবং গোটা সূরায় বর্ণিত বিষয়। এই দুটো আয়াতের একটিতে রসূলের সাথে তার জাতির লোকদের সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি তার জাতির লোকদের শুভ ও কল্যাণ কামনার আগ্রহ পোষণ করেন। তিনি তাদের প্রতি ছিলেন দয়ালু ও অনুগ্রহশীল। তাদের কষ্টে তিনি কষ্ট পেতেন। এ কথাগুলোর মধ্যে মদীনার যিন্দেগীর চিত্রই মনে বেশী করে আঁকা হয়েছে। আবার এদিক থেকেও মদীনার জীবনের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে যে, তার উম্মতদের তার সাথে সাহায্য সহযোগিতার আদেশ দেয়া হয়েছে, তার আনীত দাওয়াত কবুল করা, তাকে দুনিয়ার মানুষের কাছে পৌছানো, ইসলামের দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করা এবং এ পথের যাবতীয় কষ্ট মুসীবত বরদাশ্ত করার আদেশ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, যদি লোকদের মধ্যে কেউ তার কাছ থেকে সরে যেতে চায়, কেউ যদি ফিরে যায়, তাহলে তিনি যেন এককভাবে আল্লাহর ওপরই ভরসা করেন। আল্লাহ তায়ালাই তার জন্যে যথেষ্ট। তিনিই তার সাহায্যকারী বন্ধু। (আয়াত ১২৮ – ১২৯)

আয়াতে এটা বলা হয়নি যে, তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল এসেছে। বরং বলা হয়েছে, 'তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন রসূল এসেছে'। মূলত এ দুটো কথা বলার ধরন ও বর্ণনার ধারায় একটা বড়ো রকমের তফাৎ রয়েছে। 'তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে' কথাটার মধ্যে অধিক অনুভূতি রয়েছে। রসূলুল্লাহর সম্পর্ক তার জাতির সাথে ছিলো একান্ত নিজস্ব ও ঘনিষ্ঠ– এ কথাটাই এখানে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। যখন কাউকে বলা হয়, 'এটা তারই অংশ',

তখন তার সম্পর্ক, তার আন্তরিকতা, সহমর্মিতা– সব কিছুই এক ভিন্ন পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয়। এ অবস্থায় তার অন্তরের গভীরে এ অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, এর সাথে আমার বৈরিতা ও ভিন্নতা থাকা উচিত নয়, কেননা এতো একান্ত আমার নিজস্ব। বিশেষ করে যখন সেই ব্যক্তি উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন, তার অন্তর অন্যের জন্যে ভালোবাসায় ভরপুর থাকে।

'তার ওপর এটা কঠিন যে, তোমাদের তিনি কষ্ট দেবেন। তিনি তোমাদের ব্যাপারে আগ্রহশীল'।

এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে তোমাদের কষ্ট তাঁকে পীড়া দেয়। তোমাদের কষ্টকে তিনি নিজের কষ্ট মনে করেন। তিনি আন্তরিকভাবেই তোমাদের ভালো চান তিনি কখনো তোমাদের কষ্টে ফেলতে চান না। এমন কোনো আদেশ তোমাদের তিনি দেন না, যা তোমরা আদায় করতে পারবে না। তিনি যদি তোমাদের জেহাদের হুকুম দেন, তার অর্থ এ নয় যে, তোমরা তার কাছে প্রিয় নও। তিনি তামাদের ভালোর জন্যেই তা করেন। এটাও মূলত তোমাদের প্রতি তাঁর এক ধরনের অনুগ্রহ বিশেষ, যাতে করে তোমরা অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন থেকে বাঁচতে পারো, গুনাহ খাতা থেকেও বাঁচতে পারো। তোমাদের ব্যাপারে তিনি কল্যাণের আগ্রহী। কারণ তিনি চান এ দুনিয়ায় তোমরা এ দাওয়াত বহনকারীর মর্যাদা পাও এবং পরকালে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একান্ত সন্তুষ্টি হাসিল করো এবং এসব কিছুর চূড়ান্ত পুরস্কার হিসাবে তোমরা চিরন্তন জান্নাতের মালিক হতে পারো, যার ওয়াদা তোমার আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে মোমেনদের দিয়ে এসেছেন।

এখান থেকে বক্তব্য শুরু হয়েছে রসূলকে উদ্দেশ্য করে– যদি এরা তোমার কথা না শুনে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। ভরসা তোমার আল্লাহর ওপরই করা উচিত। তিনিই তোমার জন্যে যথেষ্ট।

যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি বলো, আমার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি। তিনিই মহান আরশের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনিই শক্তি ক্ষমতা বাদশাহী ও মহত্ত্বে একক ক্ষমতাবান। যে ব্যক্তি তাঁর আশ্রয়ে আসে, তিনি তার জন্যে যথেষ্ট হন।'

এই হচ্ছে জেহাদ ও যুদ্ধ সম্পর্কে সূরার শেষ বক্তব্য। এই জেহাদের বিপদ মুসীবতে তিনিই হচ্ছেন একক আশ্রয়। শুধু তাঁর ওপরই ভরসা করা উচিত। শুধু তাঁর কাছ থেকেই সাহায্য, শক্তির আশা করা উচিত। কেননা 'তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের মালিক'।

সূরা তাওবার সারসংক্ষেপ

এ সূরার ভূমিকা বর্ণনাকালে এবং সূরার বাদবাকী অংশ পেশ করার সময় আমি উল্লেখ করেছি যে, এ সূরাটায় মুসলিম সমাজের সাথে অমুসলিমদের সম্পর্ক সংক্রান্ত চূড়ান্ত বিধি বিধান আলোচিত হয়েছে। সুতরাং মুসলিম অমুসলিম সম্পর্কের ব্যাপারে এই সূরাই যখন সর্বশেষ বিধান ও সর্বশেষ বক্তব্য দিয়েছে, তখন এ বিষয়ে এ সূরা থেকেই বিধান গ্রহণ করা শ্রেয়। অনুরূপভাবে, এতদসংক্রান্ত যে সব প্রাথমিক বিধি বিধান ইতিপূর্বে নাযিল হয়েছে এবং যাকে আমরা সাময়িক ও পর্যায়ক্রমে বিধান নামে আখ্যায়িত করেছি, তার মধ্যে এ সূরাকে সীমিত না করাই হবে সমীচীন। সূরার ভূমিকায় ও অন্যান্য জায়গায় আমি এটাও আলোচনা করেছি যে, কোনো বিধানকে এভাবে সাময়িক এবং কোনো বিধানকে চূড়ান্ত বলে আখ্যায়িত করার ভিত্তি হলো প্রথমত আয়াতসমূহের নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতা এবং শেষত ইসলামী আন্দোলনের ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা ও এ আন্দোলনের আলোকে ইসলামী বিধানের প্রকৃতি উপলব্ধি করা।

আর এই ইসলামী বিধান এমনই বস্তু, যা এই বিধানকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে একে নিয়ে যারা জেহাদী আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়, কেবল তারাই যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে। আর মানুষকে তাদের প্রকৃত প্রভুর আনুগত্যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাদেরকে আল্লাহর গোলামদের গোলামী থেকে মুক্ত করার মাধ্যমেই ইসলামকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।

মনে রাখতে হবে যে, আন্দোলনকে বুঝা ও ইসলাম সংক্রান্ত বই পুস্তক পড়ে বুঝা এক কথা নয়। উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ঘরে বসে বসে শুধু ইসলামের বই পুস্তক পড়তে থাকলে তা বাস্তব ময়দানের আন্দোলন ও তার দাবী সম্পর্কে মানুষকে উদাসীন করে দেয়। কেননা সে আন্দোলন করেও না এবং তার মজাও টের পায় না। যারা আন্দোলনের ময়দানে নামে ও আন্দোলনকে উপলব্ধি করে, তারা ইসলামকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পায় এবং কিভাবে ইসলাম জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করে তাও দেখতে পায়। প্রতি পদক্ষেপে ও প্রতি স্তরে সে ইসলামকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। সে দেখতে পায় ইসলাম কিভাবে চলন্ত বাস্তবতার মোকাবেলায় নিজের বিধি বিধান প্রণয়ন করে। এই বিধি বিধান সে এমনভাবে প্রণয়ন করে যে, সে বাস্তব জগতকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করতে সক্ষম হয় এবং নিত্য পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিকে নিজের মুঠোর মধ্যে তাকে ধারণ করে রাখে।

সর্বশেষে, এই চূড়ান্ত বিধানসমূহ এই সূরায় এমন সময়ে এসেছে যখন মুসলিম সমাজ ও জাহেলী সমাজের অবস্থা উভয়ের একই রকমই ছিলো। উভয়ে এই পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ ও একই বিধি বিধান প্রণয়নের দাবী জানাচ্ছিল। কিন্তু যদি কোনো সময় মুসলিম জাতির অবস্থা ও তার আশপাশের জাহেলী সমাজের অবস্থা অন্য রকম হয়, তাহলে এর পূর্ববর্তী সূরায় তার উপযোগী সাময়িক বিধানসমূহ নাযিল হয়েছে। তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পুনরায় যখন কোথায়ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন তা তৎকালীন পরিস্থিতির আলোকে সংশ্লিষ্ট ইসলামী বিধান বাস্তবায়িত করে সমস্যাবলীর সমাধান করে নেবে। তবে তাকে একথাটা অবশ্যই জেনে নিতে হবে যে, সেই বিধানগুলো সাময়িক এবং সেই ইসলামী রাষ্ট্রকে চূড়ান্ত ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা চালাতে হবে। সেই চূড়ান্ত বিধানই তার সাথে বাদবাকী অমুসলিম বিশ্বের চূড়ান্ত সম্পর্ক নির্ণয় করবে।

আমাদের এ চেষ্টায় আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র তাওফিক দাতা এবং তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী।

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজ্র
সূরা আন নাহ্ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহ্যাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড

সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ্
সূরা আল হুজুরাত
সূরা ক্বাফ
সূরা আয যারিয়াত
সূরা আত তূর
সূরা আন নাজম
সূরা আল ক্বামার

২০তম খন্ড

সূরা আর রাহমান
সূরা আল ওয়াক্বেয়া
সূরা আল হাদীদ
সূরা আল মোজাদালাহ
সূরা আল হাশর
সূরা আল মোমতাহেনা
সূরা আস সাফ
সূরা আল জুমুয়া
সূরা আল মোনাফেকুন
সূরা আত তাগাবুন
সূরা আত তালাক্ব
সূরা আত তাহ্রীম

২১তম খন্ড

সূরা আল মুলক
সূরা আল ক্বালাম
সূরা আল হাক্কাহ
সূরা আল মায়ারেজ
সূরা নূহ
সূরা আল জ্বিন
সূরা আল মোযযাম্মেল
সূরা আল মোদ্দাসসের
সূরা আল ক্বেয়ামাহ
সূরা আদ দাহর
সূরা আল মোরসালাত

২২তম খন্ড

সূরা আন নাবা
সূরা আন নাযেয়াত
সূরা আত তাকওয়ীর
সূরা আল এনফেতার
সূরা আল এনশেক্বাক
সূরা আল বুরুজ
সূরা আত তারেক
সূরা আল আ'লা
সূরা আল গাশিয়া
সূরা আল ফজর
সূরা আল বালাদ
সূরা আশ শামস
সূরা আল লায়ল
সূরা আল এনশেরাহ
সূরা আত তীন
সূরা আল আলাক্ব
সূরা আল ক্বদর
সূরা আল বাইয়্যেনাহ
সূরা আয যেলযাল
সূরা আল আদিয়াত
সূরা আল ক্বারিয়াহ
সূরা আত তাকাসুর
সূরা আল আসর
সূরা আল হুমাযাহ
সূরা আল ফীল
সূরা কোরায়শ
সূরা আল কাওসার
সূরা আল কাফেরূন
সূরা আন নাসর
সূরা লাহাব
সূরা আল এখলাস
সূরা আল ফালাক্ব
সূরা আন নাস

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন-এর সম্মানিত ডাইরেক্টর
মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ী
রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত

বর্তমান সময়ের ৫টি মূল্যবান সীরাত গ্রন্থ

বিশ্ব সীরাত প্রতিযোগিতায় প্রায় ১২শ' পান্ডুলিপির মধ্যে
প্রথম পুরস্কার বিজয়ী গ্রন্থ

'আর রাহীকুল মাখতূম'

ঐতিহাসিক প্রামাণ্যচিত্র 'দ্যা ম্যাসেজ' ছবির কাহিনীর বাংলা রূপান্তর

'মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম'

প্রিয় নবীর ব্যক্তি জীবনের অনুপম সংগ্রহ

'তিনি চাঁদের চেয়ে সুন্দর'

প্রিয় নবীর সুন্নতের অনুশাসনগুলোর বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণধর্মী বই

'সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান'

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বাধিক
নির্ভরযোগ্য জীবনী গ্রন্থ

'সীরাতে ইবনে কাছীর'

سيّد قطب

في ظلال القرآن

باللغة البنغالية

المجلد الثاني

ترجمة القرآن

حافظ منير الدين أحمد

إكاديمية القرآن لندن